উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৭০তম বর্ষ

(১৩৭৪-মাঘ হইতে ১৩৭৫-পৌষ)

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

বার্ষিক মূল্য ৭৲ প্রতি সংখ্যা ৭০ প.

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(মাঘ—১৩৭৪ হইতে পৌষ—১৩৭৫)

লেখক-লেখিকাগণ ও তাঁহাদের রচনা

লেখক-লেখিকা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর	আগমনী (কবিতা) ...	৪৩২
	মনের মন্দির (ঐ) ...	৫০৩
শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)	মায়ের বাড়ী (ঐ) ...	১৮৯
শ্রীঅটলচন্দ্র দাশ	পথ-সন্ধান (ঐ) ...	২৫৪
	আপন জন (ঐ) ...	৫৩১
শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	যুক্তি বিজ্ঞান ও ধর্ম ...	১৫২
	স্বামীজী-মানসে গঙ্গা ...	৫৩৮
ব্রহ্মচারী অমিতাভ	সৃষ্টিতত্ত্বে বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান	১৫৭
ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার	স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বিংশ শতকের ধর্ম ...	৯
শ্রীঅমিয় দত্ত	শরৎ-তীর্থ পানিত্রাসে ...	৬৩৫
শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ	ভুবন-বিজয়ী বীর সন্ন্যাসী (কবিতা)	৮
	শ্রীরামকৃষ্ণ ও কাপ্তেন ...	৭৯
স্বামী অমৃতত্বানন্দ	মানবের স্বরূপচেতনা ও মূল্যবোধ ...	৩৫৭
শ্রীঅরবিন্দ পালই	নবযুগের নারীজাতি ও ভগিনী নিবেদিতা	৩০২
শ্রীঅশোককুমার সরকার	স্বামীজীর জীবন—দেবস্য কাব্যম্ ...	১২৯
'আনন্দ'	অবতার (কবিতা) ...	২৮৭
ডক্টর আশা দাশ	ঔপনিষদিক শিক্ষায় প্রকৃতির ভূমিকা	৬৭৫
শ্রীমতী ইন্দুবালা মিত্র	দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ...	৩১৩
শ্রীইন্দ্রমোহন চক্রবর্তী	'অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ' (কাব্যানুবাদ)	১৩৭
শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	কাশী	৬২১, ৬৮৩
শ্রীউমাপদ নাথ	আপনাকে চেনো (কবিতা) ...	৬২৬
শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়	ভক্তের জন্য ভগবানের ব্যাকুলতা ...	৭৭
শ্রীকানাইলাল সামন্ত	প্রতীক্ষা (কবিতা) ...	৫৭০
	উৎসর্গ (ঐ) ...	৬৮৯

লেখক-লেখিকা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীকালিদাস রায়	বুদ্ধের বাণী (কবিতা)	২২
	সন্ধ্যামণি (ঐ)	১২৮
	অবারিত দ্বার (ঐ)	২৪৬
	পারের কড়ি (ঐ)	৫০১
শ্রীকালীজীবন চক্রবর্তী	ব্যাকরণ-কথা	৩৩. ৭১, ১৪৩, ১৯৬, ২৪৩
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	ফেরার পথে (কবিতা)	৫০১
শ্রীগুরুদাস দাশ	স্বামী বিবেকানন্দ (ঐ)	৩২৮
	'সম্ভবামি যুগে যুগে'	৪১১
শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত	বাংলার শরৎ ও মা (কবিতা)	৮৮৬
শ্রীগোরাচাঁদ কুণ্ডু	চিরপরীক্ষার্থী শ্রীরামকৃষ্ণ	৬৫
স্বামী চণ্ডিকানন্দ	মা (গান)	৪৭৩
শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী	স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'	৯৩
শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী	মৃত্যুর অমৃতলোকে (কবিতা)	৮৪
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার	নিবেদিতা (গান)	৬৬৮
স্বামী জীবানন্দ	দেশপ্রেম ও স্বামী বিবেকানন্দ	৮৬
	শ্রীরামকৃষ্ণ (কবিতা)	২০৪
	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (ঐ)	৩৭৬
	মায়ের পূজা	৪৮১
	শ্রীশ্রীকালী	৫৮২
	বিশ্বজননী শ্রীশ্রীসারদাদেবী	৬৮৫
ব্রহ্মচারী জ্ঞানচৈতন্য	স্বামী বিবেকানন্দ ও সারা বার্নহার্ড	১৩৮
	অল্লা-উপনিষৎ	৪২৩
স্বামী জ্ঞানদানন্দ	শ্রীশ্রীরাজামহারাজের পুণ্য স্মৃতিকথা	৬৭০
শ্রীজ্যোতির্ময় নন্দ	শ্রীশ্রীভবতারিণীস্তোত্রম্	২৩৩
স্বামী তথাগতানন্দ	সীতা চরিত্রের একটি দিক	৩৬৮
স্বামী তেজসানন্দ	আমাদের শিক্ষাদর্শ	৬৬২
শ্রীদিলীপকুমার রায়	দুর্গা-লক্ষ্মী (কবিতা)	১৩২
	শ্যামা মা (ঐ)	৪৮৭
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ	মৃত্যুর আঘাত ও জীবনের ধর্ম	২১২
স্বামী ধ্যানানন্দ	শ্রীসারদারামকৃষ্ণাষ্টকম্	৬৬১
স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ	'জ্যান্ত দুর্গা'	৪২১
শ্রীননীগোপাল ঘোষাল	বিবেকানন্দ (কবিতা)	৩৮৩
শ্রীনরেন্দ্র দেব	'তত্ত্বমসি' (কবিতা)	৫০২

লেখক-লেখিকা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়	স্বামী বিবেকানন্দ ও নারী-সমাজ	৬১৬
ভগিনী নিবেদিতা	শঙ্করের ধ্যাননেত্রে দেবী কালিকা (অনুবাদ)	৩৯
	চরণচিহ্ন (কবিতা): অনুবাদ	৫৪৯
	দেবাদিদেব মহাদেবের কাহিনী (অনুবাদ)	৬০৫
	[অনুবাদক: শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ]	
স্বামী নির্বেদানন্দ	স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি (অনুবাদ)	৪৪, ১০৩, ১৪৮, ২১৪, ৩১৯, ৩৭৭, ৪৩৫
স্বামী নিরাময়ানন্দ	চেরাপুঞ্জির চিঠি	২৭
ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী	সমাজ-সেবার নবরূপ	৪৭০
শ্রীনৃপেন আকুলি	'তব তত্ত্বং ন জানামি' (কবিতা)	৫২২
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মোহান্ত	লোক-নায়ক (কবিতা)	৩৮
শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	মহানায়ক বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক সাম্য	২৩৬
শ্রীপ্রণবকুমার ভট্টাচার্য	দুর্গাপূজার ইতিহাস	৫২৪
	গৌড়দেশের ভৌগোলিক ইতিহাস	৫৫০
শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ	পাতা ঝরে, পাতা আসে	২০১
	আধুনিকতার অগ্রদূত রাজা রামমোহন	২৯৯, ৩৭১, ৪১৪
	অন্তরে বাহিরে তুমি (কবিতা)	৫২২
শ্রীপ্রবীরকুমার রায়	গান	৬২৭
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন	আচার্য শঙ্কর	১৭৭
স্বামী প্রশান্তানন্দ	শান্তি	৪২৯
শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য	শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত 'বেদান্তকেশরী' (কাব্যানুবাদ)	৯৭, ১৫৫, ২১০, ২৬৮, ৩৮৪, ৪৪০
বনফুল	কবে (কবিতা)	৪৯৬

লেখক-লেখিকা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	রমাঁ রলাঁর দৃষ্টিতে গান্ধী ও বিবেকানন্দ	২৩
	যুগসারথি (কবিতা)	৭০
	মন্মনা ভব (ঐ)	১৮৪
	শেষ বসন্তে (ঐ)	২৬৩
	জেগে থাকো (ঐ)	৪৬৯
স্বামী বিজয়ানন্দ	স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর স্মৃতি	৪৮৮
বিজ্ঞানভিক্ষু	স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	৬০১, ৬৯৬
শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ	স্বামী শিবানন্দ-স্মরণে (কবিতা)	৬১৫
স্বামী বীরেশ্বরানন্দ	ভগবানলাভের পথ	৪৫৭
শ্রীভবতোষ শতপথী	জাগো নর-নারায়ণ (কবিতা)	৪০১
ডক্টর মতিলাল দাশ	প্রার্থনা (কবিতা)	৩২৮
শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	মায়ের স্নেহ (কবিতা)	৫০৮
শ্রীমতী মায়াঞ্জনা গোস্বামী	স্বামী বিবেকানন্দের কবিতা প'ড়ে (কবিতা)	৪৯০
শ্রীমতী মিনতি সেন	শঙ্কর-পার্বতীর মিলন-তীর্থে	৫২৯
প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা	শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ	৫০৯
	মানবসেবায় নিবেদিতা	৫৭১
ডক্টর মুরলীমোহন বিশ্বাস	'নমামি শশিনং ভক্ত্যা'	৫১৯
শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস	শ্রীরামকৃষ্ণ-শরণে (কবিতা)	৮১
ডক্টর যামিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার ব্যাপকতা	২৫৯
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ	আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার (অনুবাদ) [অনুবাদক : ব্রহ্মচারী জ্ঞানচৈতন্য]	৩০৬, ৩৪৬
ডক্টর রমা চৌধুরী	'তোমার নিজের পদ্মকে বিকশিত কর'	৫১২
শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	আলমোড়া-যাত্রীর ডায়েরী	১৯০, ২৫৫
	শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের তৃতীয় পর্ব	৬২৭
ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার	আমেরিকায় বিবেকানন্দ-স্মৃতি	৪৭৪
রেজাউল করীম	শিক্ষাসমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দের দান	৫০৪
শ্রীশঙ্কর রায়চৌধুরী	নিবেদন (কবিতা)	৩৭০
শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী	বুদ্ধবাণী (কবিতা)	১৭৬
শ্রীশান্তশীল দাশ	আকাঙ্ক্ষা (কবিতা)	১৩১
	যখন আঁধার নামে (কবিতা)	৬৩৪

লেখক-লেখিকা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীশিবশম্ভু সরকার ··· ···	চিরায়ত (কবিতা) ···	৩০৫
	ঈশ্বরকোটি (ঐ) ···	৪১৩
শ্রীমতী শেফালিকা দেবী ··· ···	মৃত্যু ও অমৃতত্ব ···	৪৩৩
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ··· ···	পতিতপাবন ···	৪৯৭
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ··· ···	‘আনন্দের পূর্ণ ঘট’ ···	১৯
	‘বন্দি তোমায়’ ···	১০০
	মার্টিন লুথার কিংগ্ ···	২৫১
	স্বামী বিরজানন্দের সহিত কথোপকথন	২৮৯
	‘কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম’ ···	৪৬৬
	মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি ···	৬০৭
	ভগিনী নিবেদিতা ও ভারতীয় নারী	৬৯০
শ্রীসন্তোষকুমার তালুদার ··· ···	সাগর-সন্ধানে পরমহংস ···	২০৫
স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ··· ···	মানবাত্মার উজ্জীবক স্বামী বিবেকানন্দ (অনুবাদ) ···	৮২
	[অনুবাদক : শ্রীশৈলেশকুমার সেন]	
শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত ··· ···	নিবেদিতার সমাজ-চিন্তা	৮৯, ১৩৩, ১৮৫, ২৬৭, ২৯৪, ৩৫১, ৪০৩
	ইতিহাসের মহাসন্ধিক্ষণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	৫১৫, ৫৬২
সীতা দেবী ··· ···	ভগিনী নিবেদিতা ···	৪৮৫
শ্রীসুখরঞ্জন চক্রবর্তী ··· ···	মহাকাব্য হিসাবে মঙ্গলকাব্যের স্থান	২৬৪
	ভারতের জাতীয় ঐক্য ···	৫৬৫
সুফিয়া কামাল ··· ···	সে পরমহংস-স্মৃতি (কবিতা) ···	৫২৩
শ্রীসুজয়গোপাল রায় পোদ্দার ··· ···	ধর্ম ও রাজনীতি ···	৩৬৫
শ্রীসুবর্ণকমল রায় ··· ···	শ্রীশ্রীবিজ্ঞানানন্দ মহারাজের উপদেশ	৬৮০
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ··· ···	শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে : ধনী কামারনী	১২১
	শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে : প্রসন্নময়ী ···	৩৬১
স্বামী সুত্রানন্দ ··· ···	মিজো ও কাছাড় জেলার পাহাড়ী ···	৫৫৯
অন্যান্য : ··· ···	স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র	৬, ৩৯৮
	স্বামী প্রেমানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র	৬৪, ১১৮, ১৭৪, ২৩১
	‘বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল’— যুবশিক্ষণ-শিবির ···	১০৬

	বিষয়	পৃষ্ঠা
অন্যান্য ঃ	পরলোকে স্বামী সুন্দরানন্দ …	২৮৮
	আবেদন	৩৪৪, ৪৪২, ৫৩২, ৫৪৮, ৬৪৫
	স্বামী সুবোধানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র	৩৪৫, ৪০২
	স্বামী বিজ্ঞানানন্দ শতবর্ষ জয়ন্তী …	৬৪৬
	নিবেদিতা শতাব্দী জয়ন্তী …	৬৪৭
	আমাদের মা …	৬৫৮
কথাপ্রসঙ্গে : … …	উদ্বোধনের নববর্ষ …	২
	বিবেকানন্দ-ভাবধারা-প্রচারের প্রয়োজনীয়তা …	২
	উদ্বোধনের প্রস্তাবনা …	৪
	শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাস্তবতা …	৫৮
	সংযম ও শক্তি …	১১৪
	ভগবান বুদ্ধ …	১৭১
	আচার্য শঙ্কর ও বুদ্ধ …	১৭৩
	যুগ-প্রয়োজন ও রামকৃষ্ণ-ভাবধারা	২২৬
	'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ' …	২৮২
	শিক্ষার উন্নয়ন …	৩৩৯
	'মামেকং শরণং ব্রজ' …	৩৯৪
	'সকলি তোমারি ইচ্ছা' …	৪৫০
	'চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ' …	৪৫৪
	'মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে' …	৫৪৩
	নারীপ্রগতি ও নিবেদিতা …	৫৪৬
	নিবেদিতা—জাতির পুনর্জাগরণে …	৫৯৮
	শ্রীশ্রীমা …	৬৫৪
দিব্য বাণী : … …		১, ৫৭, ১১৩, ১৬৯, ২২৫, ২৮১ ৩৩৭, ৩৯৩, ৪৪৯, ৫৪১, ৫৯৭, ৬৫৩
সমালোচনা : .. …		৪৯, ১০৭, ১৬১, ২১৮, ২৭০ ৩২৯, ৩৮৫, ৪৪৩, ৫৩৩, ৫৮৭ ৬৪১, ৭০৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদঃ …	৫১. ১০৯, ১৬৩, ২২০, ২৭৫ ৩৩২, ৩৮৭, ৪৪৫, ৫৩৬, ৫৯০, ৬৪৮, ৭০৫
বিবিধ সংবাদ : … …	৫৫, ১১১, ১৬৭, ২২৩, ২৭৯, ৩৩৫, ৩৯১, ৪৪৮, ৫৪০, ৫৯৬, ৬৫২, ৭০৮

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ের ট্রাষ্টিগণের পক্ষে স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

উদ্বোধন

দিব্য বাণী

"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি।"২.৭—তৈত্তিরীয়োপনিষদ

দেহাতীত. অনির্বাচ্য, নিরাধার, দৃষ্টির অতীত
ব্রহ্মরূপে আপনারে করে কেহ প্রত্যক্ষ যখন,
স্থিত হয় ইন্দ্রিয়-অতীত সেই বোধে, ব্রহ্মজ্ঞানে,
অভয় পদবী লাভ, অভয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করে সে তখন।

ক্ষীণাঃ স্ম দীনাঃ সকরুণা জল্পন্তি মূঢ়া জনাঃ
নাস্তিক্যন্ত্বিদন্তু অহহ দেহাত্মবাদাতুরাঃ।
প্রাপ্তাঃ স্ম বীরা গতভয়া অভয়ং প্রতিষ্ঠাং যদা
আস্তিক্যন্ত্বিদন্তু চিনুমঃ রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্॥
কুর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ।
কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্—রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্॥—স্বামী বিবেকানন্দ

আপনার দেহাতীত অস্তিত্বের বোধ যার নাই—
দেহকেই আত্মা বলি ভাবি যারা চলে আজীবন—
নাস্তিক্য ইহারই নাম—মূঢ় তারা ; তারাই সদাই
'ক্ষীণ মোরা, দীন মোরা' বলি করে করুণ ক্রন্দন!
রামকৃষ্ণদাস মোরা—(দেহাতীত চিদানন্দময়
অবিনাশী সত্তাকেই আপন স্বরূপ বলি জানি')
অভয়-পদেতে মোরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছি যখন—
আস্তিক্য ইহারই নাম- হয়েছি যে বীর, গত-ভয়!
ত্রিভুবন উপাড়িব, গ্রহ-তারা করিব চর্বণ!
জান না কি কেবা মোরা ?—মোরা রামকৃষ্ণদাস—
(আত্মবলে মোরা বলীয়ান)!

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের নববর্ষ

শ্রীভগবানের কৃপায় উদ্বোধন পত্রিকা ৭০তম বর্ষে পদার্পণ করিল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুআরি (সন ১৩০৫ সাল, ১লা মাঘ) পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ইহার প্রবর্তক। পত্রিকাটির নামকরণও তিনিই করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ইহার নিয়মিত প্রকাশ ও প্রাথমিক পরিচালনা সম্ভব হইয়াছিল। পত্রিকার সম্পাদনা, নবপ্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন কার্যালয়'-এর এবং পত্রিকা-মুদ্রণের জন্য সদ্যক্রীত 'উদ্বোধন-প্রেস'-এর পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান সবই তাঁহাকে একাই করিতে হইত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মুখপত্র উদ্বোধন-পত্রিকা স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত প্রস্তাবনা লইয়া আত্মপ্রকাশের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। বাংলা ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের মূল রচনা এবং তাঁহার ইংরেজী বাণী ও রচনার বাংলা অনুবাদ প্রথমে এই উদ্বোধন পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়া পরে পুস্তকাকার ধারণ করে। ইহা ছাড়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দপ্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসীসন্তানগণের এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষপ্রমুখ গৃহীভক্তগণের ও তৎকালীন বহু মনীষীর লেখায় সমৃদ্ধ উদ্বোধন পত্রিকার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় ভাবসমৃদ্ধির দিক দিয়া, এবং যে ভাবধারা ভারতীয় জাতির সুদীর্ঘকালের নিদ্রা হইতে জাগরণের কারণ তাহার পরিবেশনের মাধ্যমে জনসেবার দিক দিয়া এক অনবদ্য গৌরবে পূর্ণ। সুধী লেখক, গ্রাহক ও পাঠকবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতায় সুদীর্ঘ ৬৯ বৎসর ধরিয়া উদ্বোধন সেই মহান ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়া আজ ৭০তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে; এই প্রচেষ্টায় যাঁহারা সহায়ক, যাঁহারা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রসার এবং ভারতের রাষ্ট্র সমাজ শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ক চিন্তাতে ইহার অনুপ্রবেশকে জাতির সামগ্রিক উন্নতির সহায়ক, বিশেষ করিয়া বর্তমান সময়ের সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সকলকেই আমরা নববর্ষের যাত্রারম্ভের সময় কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। আর যাঁহাদের অপার করুণায় পত্রিকাটি 'ব্যক্তিত্ব' বজায় রাখিয়াই এই সুদীর্ঘ-কালের পথ সহজে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে, সেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চরণে প্রার্থনা করি, ভবিষ্যতেও যেন তাঁহাদের করুণা সমভাবে বর্ষিত হয় ইহার শিরে, বর্ষিত হয় জাতির কল্যাণে ভারতের প্রাণবাণীতে উদ্বুদ্ধ হইতে ইচ্ছুক প্রত্যেকেরই উপর।

বিবেকানন্দ-ভাবধারা-প্রচারের প্রয়োজনীয়তা

কোন ভাবকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া নিজ জীবনে উহার রূপায়ণই সেই ভাবের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচার সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা যেন না ভুলি, ইহা ছাড়াও আমাদের আরো কিছু করণীয় আছে। নিজে ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের পক্ষে যাহা কল্যাণকর বলিয়া স্থির-নিশ্চয়ে বুঝি, অপরের চোখের সামনে তাহা তুলিয়া ধরাও বিশেষ প্রয়োজন; বিশেষ করিয়া বর্তমান সময়ে— যখন চারিদিক হইতে অগভীর-চিন্তা-প্রসূত আদর্শের প্রচার ব্যাপকভাবে চলিতেছে এবং সে আদর্শগ্রহণ মনের স্বাভাবিক নিম্নাভিমুখী প্রবৃত্তির অনুগ ও সহজসাধ্য অথচ

বর্তমান যুগের একটি উচ্চ আদর্শের সহিত মিলিত থাকিয়া আপাতদৃষ্টিতে মহনীয়রূপে প্রতীত বলিয়া যুব-মন সে আদর্শের-স্রোতে জীবনতরী ভাসাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। ভারতের চিরন্তন জাতীয় ভাবেরই অধুনাতন রূপ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব যতদিন না আমরা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করিতেছি, ততদিন আমাদের সামগ্রিক উন্নতি ও জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধান অন্য কোন কিছুতেই সম্ভব নয়। নবযুগ-প্রবর্তক এই ভাবধারাই দৃষ্ট বা অদৃষ্টভাবে কার্যকরী হইয়া অগ্নিযুগের হোতাদের এবং মহাত্মাজী, নেতাজী প্রভৃতির জীবনে মূর্ত হইয়া দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছে, ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, চারুকলা প্রভৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটাইয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পরই যেন আমরা আনন্দেই হউক, অবসাদেই হউক, আর প্রয়োজন নাই বলিয়া বা অন্য যে কোন কারণেই হউক এই ভাব হইতে, স্বার্থত্যাগ- ও সংযম-ভিত্তিক ভাবরাশি হইতে, সত্যদৃষ্টি অর্জন করিয়া মানুষকে সেই দৃষ্টিতে দেখার ভিত্তিভূমি হইতে সরিয়া আসিয়া অন্য ভূমিতে দাঁড়াইয়া ব্যক্তিগত ও জাতিগত দুঃখকষ্ট প্রভৃতি হইতে মুক্তিলাভের পথের সন্ধান করিতেছি—অবস্তুতর দৃষ্টিতে মানুষকে দেখিয়া তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের ও সামাজিক রীতিনীতির মূল্যায়ন ও সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা একদিক দিয়া উন্নতির পথে অগ্রগমন হইলেও অপর দিক দিয়া অধোগতিই। বহিঃপ্রকৃতির বিজয়লব্ধ বিজ্ঞান- ও শিল্প-সম্ভূত শক্তি আজ জগতে যুগান্তর আনিয়াছে এবং অর্থনীতিভিত্তিক সাম্যস্থাপনের প্রচেষ্টা মানুষের জাগতিক প্রয়োজন মিটাইবার সমস্যার অভিনব সমাধান ঘটাইয়া ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু এগুলির সঙ্গে যাহা আসিয়াছে, তাহার দিকে তাকাইতে প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষকেই আজ ভীতি-সন্ত্রস্ত হইতে হইতেছে। মানবজাতি মণি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু উহা আসিয়াছে রূপকথার কালনাগিনীর মাথায় চড়িয়া। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির লোভ-হিংসাদি আদিম প্রবৃত্তিগুলি এবং বস্তুর অনুধ্ব-সীমিত জ্ঞানকেই সর্বোচ্চ জ্ঞান বলিয়া ধারণাই এই কালনাগিনী। সেই-ই জড়সর্বস্ব, ইন্দ্রিয়-সর্বস্ব নিম্নভূমিকেই মানুষের অস্তিত্বের একমাত্র ভূমি বলিয়া আমাদের ভাবিতে শিখাইয়াছে, মানুষের সর্ববিধ প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করিতে শিখাইয়াছে এই ভূমিতেই। এই খলতায় মানুষকে ভুলাইয়া আজ সে সমগ্র মানব-সভ্যতাকেই দংশন করিতে উদ্যত। একদিকে জড়বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান ও বিপুল শক্তির প্রায় সবটুকুই সে পতনোদ্যত খড়্গের মত ঝুলাইয়া রাখিয়াছে মানবসভ্যতার শিরের উপর; অপরদিকে অর্থনৈতিক সাম্যস্থাপনের পরিপন্থী ভাবাইয়া, বস্তুর অতীতে তাকাইতে না দিয়া এবং সেই দৃষ্টিকেই সব কিছুর মূল্যায়নের কষ্টিপাথর বুঝাইয়া সে আজ মানুষের বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা- ও প্রয়াস-লব্ধ হৃদয়ের প্রায় সমস্ত শুভবৃত্তি ও শুভকারী সমাজপ্রথাগুলিকে কুসংস্কার আখ্যা দিয়া পরিত্যাগ করাইতে উদ্যত, মনুষ্যসমাজকে বুদ্ধিবৃত্তিমাত্রে অতি-উন্নত একটি "পিপীলিকা-সমাজে" পরিণত করিতে সচেষ্ট।

এই সঙ্কট এড়াইবার উপায় কি? মানুষ কি বহিঃ-প্রকৃতিকে জয় করিবার প্রচেষ্টা ছাড়িয়া দিবে, বিজ্ঞান ও শিল্পের অগ্রগমন রোধ করিবে, যাহাতে মানুষ মারণযজ্ঞের জন্য আরও ভীষণ অস্ত্র প্রস্তুত করার পথের সন্ধান না পায়? এরূপ প্রশ্নকরাই বাতুলতা। সমভাবে বাতুলতা প্রতিটি মানুষের জন্য খাদ্য বাসস্থান চিকিৎসা

শিক্ষা প্রভৃতিতে সমান অধিকারদানের প্রয়াসের বিরুদ্ধে কিছু চিন্তা করা। কোন 'মানুষ'-ই তাহা করিতে পারে না। তাছাড়া চাওয়া-না-চাওয়ার প্রশ্নই উঠে না—মানুষের শিল্প-বিজ্ঞানের জ্ঞান এবং সাম্যবাদের তরঙ্গ স্বাভাবিক নিয়মেই ক্রমবিস্তৃত হইয়া চলিবে। একমাত্র উপায় কেবল মণিটির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া নাগিনীটির সর্বনাশা খলতার কথা স্মরণে রাখিয়া তাহার বিনাশসাধনের প্রচেষ্টা—মানুষের হৃদয়ের আদিম প্রবৃত্তিগুলি (যেগুলিকে জয় না করিতে পারিলে উচ্চতর জীবনসত্য কোনদিনই প্রতিভাত হয় না) পূরণের পথ প্রশস্ততর না করিয়া যাহাতে সে সেগুলিকে জয় করিয়া বস্তু-সীমিত অস্তিত্ব অপেক্ষা জীবনের উচ্চতর অস্তিত্বের, বিষয়-সম্ভোগজনিত আনন্দ অপেক্ষা উচ্চতর আনন্দের সন্ধান পায় তাহার প্রচেষ্টা করা ; এককথায়, কেবলমাত্র বহিঃপ্রকৃতিকে নয়, অন্তঃপ্রকৃতিকেও জয় করিবার জন্য সমভাবে সচেষ্ট হওয়া।

স্বামী বিবেকানন্দ সেই কথাই পৃথিবীর সকল দেশের মানুষকে শুনাইয়া গিয়াছেন : অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি—উভয় প্রকৃতির সহিতই লড়াই করিয়া উভয়কে জয় করিয়া চলাই মানবজাতির যথার্থ উন্নতির পথ। একমাত্র পথ।

মানব সভ্যতার একটি সঙ্কট-মুহূর্ত আসিয়াছে এখন। বিজ্ঞানশিল্পাদির জ্ঞান ও শক্তিকে যাঁহারা প্রয়োগ করিবেন তাঁহাদের দৃষ্টি সত্যালোকমণ্ডিত না হইলে, তাঁহাদের হৃদয় মানবপ্রেম, সহানুভূতি, স্বার্থহীনতা প্রভৃতি শুভবৃত্তিগুলির আকর না হইলে অন্য কোন উপায়েই, আন্তর্জাতিক নিয়ম করিয়াই হউক বা সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে আলোচনা করিয়াই হউক, মানবজাতিকে বাঁচানো সম্ভব হইবে না। অন্যদিকে সাম্যস্থাপনের জন্য মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাস, পবিত্রতা প্রভৃতিকে এবং উহার সহায়ক সমাজপ্রথাগুলিকে সমূলে বিনাশ করিয়া, মানুষের উন্নততর দৃষ্টিলাভের প্রয়াসকে নিম্নস্তরে টানিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া—অন্তঃপ্রকৃতির দাসত্বকেই মুক্তি ভাবিয়া যে গৌরব অনুভব করিতে হইবে, তাহারই বা কি অর্থ বা প্রয়োজন আছে? অন্তঃপ্রকৃতিকে মানুষ যত বেশী জয় করিতে পারে, নিজ আনন্দের জন্য বহির্জগৎ হইতে কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন তাহার ততই কমে, অপরের ভাগে অংশ দাবি করা তো দূরের কথা নিজের সব কিছুই অপরকে দিবার প্রবৃত্তিই তাহার ক্রমবর্ধিত হইতে থাকে। এরূপ মানুষ সাম্য-স্থাপনের পরিপন্থী না সহায়ক? বরং বলা যায়, এই পথেই জগৎ আদর্শ ও স্থায়ী সাম্যের সন্ধান পাইবে। সাম্যবাদকে, সমাজবাদকে তাই মিলিত করিতেই হইবে ধর্মের সঙ্গে, কারণ ধর্মই মানুষের এই সব শুভবৃত্তিগুলিকে উদ্বুদ্ধ করিবার শ্রেষ্ঠ সহায়ক।

'উদ্বোধনের প্রস্তাবনা'

ভারতবর্ষ মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া সাধনা করিয়া আসিয়াছে, এবং উহাতে সিদ্ধিও লাভ করিয়াছে। এবিষয়ে সারা জগতের গুরু সে। ভারতের সে জাতীয় জীবনের বিভা ম্লান হইয়াছিল সত্য, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হয় নাই কখনো। অন্তর্জীবনের এই ঔজ্জ্বল্যের অভাব ভারতকে জাগতিক বিষয়েও অবনত করিয়াছে। জাগতিক উন্নতির গুরু গ্রীকজাতি। তাহার বংশধরগণ, পাশ্চাত্য জাতিগুলি, জাতীয় বৈশিষ্ট্যের "মুখোজ্জ্বলকারী"। আমরা কিন্তু "প্রাচীন আর্যকুলের গৌরব" নহি। এই দুটি ভাবেরই সমন্বয় চাই সারা জগতেই, এবং

সে সমন্বয়ের আদর্শ দেখাইবে ভারতবর্ষ। স্বামীজী তাই 'উদ্বোধনের প্রস্তাবনা'য় এবিষয়ে আলোচনা করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।"

কি করিয়া তাহা করিতে হইবে, নবযুগের আদর্শরূপে, অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি উভয়েরই বিজয়ী, জাগতিক বিষয়েও অতি উন্নত অথচ দেবভাবাপন্ন হইয়া জগতে 'বাজ্রীর মত' দাড়াইতে পারিবে সে কোন্ পথে চলিলে ?

সে বিষয়েও স্বামীজী আলোকসম্পাত করিয়াছেন 'উদ্বোধনের প্রস্তাবনা'য়। বলিয়াছেন, আমাদের নিজস্ব ভাবকে সুদৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিয়া, সে নিজস্ব ভাবকে উজ্জ্বলতম করিয়া তুলিয়া আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে পাশ্চাত্যের শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি ও অন্যান্য শুভকর বিষয়গুলি।

এই সমন্বয় করিতে যাইয়া আমাদের যে বিভ্রান্ত হইবার আশঙ্কা আছে, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। অত্যন্ত সতর্ক হইয়া, স্থিরবুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া আমরা যেন কোন কিছু গ্রহণ বা ত্যাগ করি। আমাদের ভিতর যাহা কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়াছে সেগুলিকে ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া ত্যাগ করিতে হইবে; পাশ্চাত্য ভাবরাশি গ্রহণ করার সময় তাহার শুভকারী অংশটুকুই শুধু গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার জন্য দেশের প্রত্যেক কল্যাণকামীর গভীর চিন্তার প্রয়োজন।

উদ্বোধন পত্রিকার জীবনোদ্দেশ্য দেশের কল্যাণকামী বুধমণ্ডলীর সহায়তা লইয়া এই চিন্তা পরিবেশন—"বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' নিঃস্বার্থভাবে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য উদ্বোধন সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে এবং দ্বেষবুদ্ধি-বিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্যপ্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে।" আজ ভারতের সমস্যাসঙ্কুল ক্ষণে উদ্বোধনের সপ্ততিতম বর্ষের প্রারম্ভে দেশের মনীষিবৃন্দকে স্বামীজীর এই সাদর আহ্বান জানাইতেছি; প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে শক্তি জ্ঞান ও প্রেমের, ত্যাগ ও সেবার ভাবের উদ্বোধনের জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি ভারতের জাতীয়তার মূর্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দের চরণে।

"তাহারাই যথার্থ জীবিত, যাহারা অপরের জন্য জীবনধারণ করে। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া নাই, মরিয়া আছে।"

"একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাবিই; তা একটা ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে মরা ভাল।"

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(স্বামী বিবেকানন্দকে লিখিত)

১

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণভরসা

The Math, Belur P.O.
20th Feb. 1902

শ্রীচরণেষু

অদ্য তোমার আর একখানি পত্র পাইলাম। পূর্ব পত্রের জবাব আমি registered letter দ্বারা পাঠাইতেছি ২।১ দিনের মধ্যে। ·

রামদাদার স্ত্রীকে দেখতে আমি তিন দিন গিয়াছিলাম, প্রত্যহ জ্বর ১০৩ ৪ হয়। ডাক্তারেরা examine করিয়া বলে কোন প্রকার দোষ হয় নাই, কিন্তু আমার সন্দেহ হওয়ায় পরশু দিন Dr. R. L. Dutt-কে আনাইয়াছিলাম। সমস্ত examine করিয়া বলিল দুটা lungs-এ tuberculosis হইয়াছে, তবে এখনও 1st stage. এখানে রাখিলে কোন উপকার হইবে না, একটা উত্তম স্থানে change করা আবশ্যক। আমরা বলিলাম—শয্যাগত, কেমন করিয়া যাইবেন? Dr. Dutt বলিল ১৫ দিন পরে একটু বিশেষ হইলে লইয়া যাওয়া উচিত। আমি ২।১ দিন মধ্যে পুনরায় যাইয়া সকল জানিয়া তোমায় লিখিব।…অদ্য বেলা ১০টার সময় একটা deffered telegram আসিয়াছে, Nepal-এর রাজা অদ্য ১১টার সময় কলিকাতায় আসচেন। … পথে Jalpaiguri হতে deffered wire করেছেন। পত্র-পাঠ শরৎ গিয়াছে receive করিবার জন্য। তাঁহারা Parsi Bagan house-এ থাকবেন। শরৎ ফিরিয়া আসিলে সবিশেষ সংবাদ পাইব এবং তোমায় লিখিব।…

নিবেদিতার শরীর যে খুব ভাল তা নয়। সে school-এর জন্য বাড়ী দেখছে, শীঘ্রই start করবার ইচ্ছা। নিবেদিতারও ইচ্ছা নয় যে, সদানন্দকে দিয়ে কোন কর্ম করায়। … আমি বলিলাম, …তাহার দ্বারা কোন কর্ম হইবে না। এবারে গিয়াও তোমার আদেশমত বলিব। Raja Peary Mohan আমাদের পত্র লিখিবে বলিয়াছিল; কিন্তু লেখে নাই। শীঘ্রই শরৎ দেখা করিতে যাইবে। অদ্য যাইবার কথা ছিল; কিন্তু তাহার রবিবার দিন হ'লে ভাল হয়, অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়, নচেৎ অন্য দিনে ব্যস্ত থাকে। রবিবারে আমরা ২ জনে যাব, সেবারেও ২ জনে গিয়াছিলাম।

Mrs. Bull & Miss Macleod Okakura-কে তার করিয়াছে। জবাব আসিলে তাহারা Elora Caves & Mount Abu প্রভৃতি স্থান দেখিতে যাইবে। রবিবার দিন তাহারা বৈকালে মঠে আসিবে। তোমার আবার diabetes বেড়েছে শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। মধ্যে মধ্যে এক এক দিন মাংস খাবে বৈকি! আমি Doctor-কে জিজ্ঞাসা করিয়া তোমায় লিখিব।

মঠের পশু সব একপ্রকার ভাল আছে; তবে বড় বোকাটার একটু অসুখের মতন হইয়াছে। অদ্য একটু ভাল বলিয়া বোধ হয়। হাবু, তমুকে সমন ধরান হইয়া গেছে, এখন written statement file করে নাই।

তোমার কত টাকা আছে শীঘ্রই লিখিয়া পাঠাইবে। কোন্ নাগাদ বাটীতে তোমার মা ও দিদিমাকে লইয়া যাইব লিখিয়া পাঠাইবে। By. Parcel দ্বারা ওল ও আপেল পাঠান হইয়াছে, পাইয়াছ কি না? অদ্য বিলাতী একটা ছোট Postal Parcel redirect করিয়া দিয়াছি, প্রাপ্তি-সংবাদ লিখিবে। এখানকার উপস্থিত একপ্রকার মঙ্গল।

With love & pranams
Afftly yours
Brahmananda.

(২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা

The Math,
2nd March, 1902

শ্রীচরণেষু—

২ দিন হইল তোমাকে এক বিস্তারিত পত্র লিখিয়াছি, তাহা বোধ হয় পাইয়া থাকিবে। Raja Peary Mohan-এর চিঠি এইসঙ্গে পাঠাইলাম, দেখিবে। শীঘ্রই তাঁহার সহিত আবার দেখা করিব। নেপালের রাজা এখনও আসেন নাই, কল্য সংবাদ পাইয়াছি। তাঁহার ছেলে কেবল আসিয়াছে ও Parsi Bagan বাটীতে আছে।

Niveditaর বাটীর ঠিক হইয়াছে, Circular Roadএর ধারে। Jagadish Boseএর বাটী ঠিক করিয়াছে, তথায় school করিবে।

... অদ্য কলিকাতায় বিশেষ আবশ্যক বশতঃ যাইতে হইবে। ...

মঠের ২।৩ জনের Influenza-র মত হইয়াছিল, উপস্থিত একটু ভাল আছে। অদ্য নিবেদিতার friend Miss Hay Baghbazarএ lecture দিবে। সেজন্যও যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

অদ্য তোমার Cash মোটামুটি মিলাইয়া দেখিলাম; তাহাতে ৩৭০০৲ (তিন হাজার সাতশত টাকা Govt Paper আর Cash ৩৫২৲ (তিনশত বায়ান্ন) টাকা মজুত আছে। আর টাকা শত খানেক Miss Macleod প্রভৃতির কাছে advance দেওয়া আছে। তাহারা আসিলে শীঘ্র দিবে। মোটামুটি এই (হিসাব) পাঠাইলাম। যদ্যপি সমস্ত detail চাও তাহা ১৫ দিন সময় দিলে ভাল হয়, কারণ এখন উৎসব সন্নিকট। তাহার পর নিবেদিতা একটা Public lecture দিবে, Arrangementএর জন্য একটু ব্যস্ত থাকিতে হবে। যথাসাধ্য তাকে help করা উচিত। ... বোকাটা ভাল হইয়া গিয়াছে। উপস্থিত একপ্রকার মঙ্গল। তোমার মঙ্গল লিখিয়া সুখী করিবে। তুমি আমাদের প্রণাম জানিবে।

ইতি দাস—
Afftly yours
Rakhal

ভুবন-বিজয়ী বীর সন্ন্যাসী

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ

জ্যোতির্ঘনতনু সপ্ত-ঋষির ঋষি বরেণ্য, আপ্ত, সমাধিমান,
জ্ঞানে ও পুণ্যে, প্রেমে, করুণায় মানব কি হায়, দেবদেবীগণও ম্লান।
অবিশ্বাসের অন্ধকারায় দিশেহারা জীব মরণের পথে চলে,'
পৃথিবী-মায়ের মূক কান্নায় বৈকুণ্ঠের রত্ন-আসন টলে।
করে আহ্বান শিশু-ভগবান—'আমি যাই, তুমি সাথে চল মম কাজে,
নিখিল ধরণী তমোনিমগ্ন— সমাধিমগ্ন থাকা কি তোমার সাজে ?'

ধরিত্রী-মা'র কোল আলো করি নেমে এলে তুমি বিবেকানন্দ বীর !
জ্ঞান সূর্যের দীপ্ত আলোয় নিঃশেষে মুছি' তিমির শতাব্দীর।
—'কোথা ঈশ্বর ? সম্মুখে তোর ! চোখ খুলে দেখ্'— শুনে শুনে দিলে ডাক
একি অপরূপ মূর্তি তোমার ! মর্ত্য মানব বিস্ময়ে নির্বাক !

'বনে নির্জনে, বিজন গুহায়, মঠে মন্দিরে, কোথায় খুঁজিস তাঁরে ?
তিনি নিরন্ন আতুরের বেশে, তব দ্বারদেশে এসেছেন বারে বারে।
জীবরূপে শিব এসেছেন দ্বারে, তুমি কি তাঁহারে করিয়াছ অর্চনা ?
তুমি কি তাঁহারে বক্ষে জড়ায়ে— প্রেমের অশ্রু ফেলিয়াছ এক কণা ?'

ভুবন-বিজয়ী বীর সন্ন্যাসী, চিরপবিত্র, নিত্যসিদ্ধ, জ্ঞানী—
ক্ষুধিতে বিলালে অমৃতভাণ্ড, দীনে দিলে কোল, পতিতে লইলে টানি।
বৈরাগ্যের মূর্ত প্রতীক, তোমার মাঝারে বিবেক ধরেছে কায়া,
কোথা বন্ধন ? কে রোধিবে গতি ? বিধি লজ্জিত, পরাজিতা মহামায়া।

সাগরপারেও বন্দিত তুমি, কণ্ঠ তোমার দেশে দেশে মন্দ্রিত,
মরণবিজয়ী মাভৈঃ মন্ত্রে লক্ষ হৃদয় করিলে সঞ্জীবিত।
উপনিষদের পাঞ্চজন্য ফুকারি জাগালে বিশ্বচিত্তভূমি—
রামকৃষ্ণের আদরের ধন, সারদামায়ের স্নেহের দুলাল তুমি !

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বিংশ শতকের ধর্ম

ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার

এক পরম সত্যের কথা বারংবার উচ্চারিত হয়েছে তাঁর কণ্ঠে। বিংশ শতকের ধর্ম হবে এমন যা বিজ্ঞানের সমস্ত সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে চলতে পারে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের আবিষ্কারনীতির উপর যুগোপযোগী ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দ একথাই দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন, বিংশ শতক যে ধর্মকে চায় তা প্রতিটি যুক্তিবাদী মানুষের বাক্য ও চিন্তার স্বাধীনতাকে স্বীকার ও সমর্থন করবে, যার সঙ্গে বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত সর্বাধুনিক সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে নিজের ভাবের ঐক্য দেখাতে পারবে। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও আদর্শ স্বাধীন চিন্তার সমর্থক। কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে তা নির্বিচারে স্বীকার করে না বা একেবারে অভ্রান্ত ব'লে মেনে নেয় না। একমাত্র সত্যকে আবিষ্কার ও শুধু সত্যের উপাসনা তার লক্ষ্য। যে ধর্মকে আমরা বর্তমান যুগের উপযুক্ত ব'লে মনে করি তা-ও সত্যের অভেদ্য ও অচল শৈলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন বৈজ্ঞানিক ধারায় আবিষ্কৃত ও সমর্থিত যে সত্য সেই সত্যই আধুনিক যুগের উপযোগী ধর্মের ভিত্তি হবে। বিবেকানন্দ বলেন, তা ই হ'লো প্রকৃত ধর্ম, একারণেই তা সমস্ত সত্যান্বেষী মানুষের সংস্কারমুক্ত চিত্তের উপর নিজের সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। বিজ্ঞানসমর্থিত এই ধর্মে সাম্প্রদায়িক ধর্মের মতো মুক্তির কোনও বাঁধাধরা যুক্তিহীন পরিকল্পনা থাকতে পারবে না।

বিবেকানন্দ বলেছেন, প্রাচীন ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা নিজেদের স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী এবং ধারণার সাহায্যে বিশ্বের মূলতত্ত্ব ও বিশ্ববৈচিত্র্যের পেছনে এক অখণ্ড সত্তার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করেছিলেন। আবার আধুনিক বিজ্ঞানীরাও জড়পদার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে সেই মূলসত্যকে নির্ণয়ের চেষ্টা করতে করতে সেই একই গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলেছেন, একথা বলা হয়। তবে 'অখণ্ড সত্তা' সম্বন্ধে অবশ্যই দ্বিমত আছে, যেহেতু বিজ্ঞান বিনাপ্রমাণে ঐ 'সত্তার' অস্তিত্ব মেনে নিতে পারে না। তবে আধুনিক বিজ্ঞান কার্য-কারণবাদের মধ্যে নিহিত সত্যের উপযোগিতা সবেমাত্র উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। প্রতিটি পদার্থের মধ্যে তার কারণ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, যেহেতু কার্য-ই কারণের স্থূল অভিব্যক্ত রূপ। একারণেই বলা যেতে পারে কার্য ও কারণ এক পদার্থেরই ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা। আজ আমরা পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানের কক্ষপথে অবস্থান করছি। কিন্তু একথা স্বতই মনে জাগে বিজ্ঞান আমাদের জীবনে পূর্ণতা এনেছে কি-না। বিশেষভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী অধ্যায়ে কতগুলি পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা-বিস্ফোরণের পরে এ প্রশ্ন সরব হয়ে উঠেছে। একথা অনস্বীকার্য, আজও বহু অজ্ঞেয় রহস্য রয়েছে, যার সমাধান বিজ্ঞান করতে পারেনি।

বিজ্ঞান, বিশেষতঃ ফলিতবিজ্ঞান আজ তার জয়রথ চালিয়েছে দুর্মদ গতিতে। আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের নানা উপকরণ সে এনে দিয়েছে— একথা যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি তার ভয়ঙ্কর রূপ। অবশ্য তার জন্যে অনেকে বিজ্ঞানকে

দায়ী ক'রে বসেন। বাস্তবিকপক্ষে বিজ্ঞানের নিজস্ব কোন কর্মশক্তি নেই। মানুষের লোভ যখন হিংস্র হ'য়ে ওঠে তখন তা বিজ্ঞানকে বিপথে চালিত করে। তার ফলে পৃথিবীতে নামে ধ্বংসের অশুভ ছায়া। কিন্তু বিজ্ঞানের এই রূপটিকে যেমন সত্য ব'লে মনে হচ্ছে, তেমনি সত্য তার কল্যাণময় রূপ। বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে স্বস্তি, দিয়েছে সুখ, দিয়েছে স্বাচ্ছন্দ্যের নানা উপকরণ, তবু মানুষ সুখী নয়। তার কারণ মানুষ নিজের চিত্তকে বশে রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। প্রাচীন ভারতীয় মনীষীরা বলেছেন,

'যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি॥'
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।২০

সহজ কথায় এর ভাবার্থ—মানুষ যদি সমগ্র আকাশকে একখণ্ড চামড়ার মতো গুটিয়ে ফেলতে পারে (অর্থাৎ মানুষ যদি এত শক্তিশালী হয়) তাহলেও তাদের দুঃখের অবসান হবে না। যেহেতু অন্তরের প্রজ্বলন্ত সেই পরম সত্তাটিকে না চিনলে দুঃখের পরিসীমা থাকে না।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, কোন্ পথে শান্তি আসতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য একটি গ্রন্থে[১] বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। তিনি বলেছেন মানুষ যদি বেদান্ত-অনুশীলনে আগ্রহী হয়, তাহলে সমস্যার সমাধান হ'তে পারে। বর্তমানে প্রযুক্তিবিদ্যার আত্যন্তিক উন্নতির জন্যে মানুষের হাতে এসে গেছে প্রচণ্ড ক্ষমতা। আজ সেই ক্ষমতায় মদমত্ত হ'য়ে মানুষ তার সেই যুগ-যুগান্তের সভ্যতার ধারা বিলোপ করতে চাইছে। যে সভ্যতা মানুষ গড়েছিল, তাকে সে নিজের হাতেই ভেঙে ফেলতে চাইছে, এর চেয়ে বিড়ম্বনা আর কি হ'তে পারে? এমন কোন পথ কি নেই যাতে মানুষ তার অন্তরের চিৎ-সত্তাকে উপলব্ধি ক'রে এই সভ্যতাকে আরো সুন্দর ক'রে তুলতে পারে? এই প্রশ্ন এখন বহু চিন্তাবিদের মনে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন,[২]

> 'We are in the middle of a race, between human skill as to means and human folly as to ends · unless men increase in wisdom as much as in knowledge, increase of knowledge will be increase of sorrow.'

বিবেকানন্দ বলেন, বেদান্ত মানুষকে নতুন জীবনের রূপ দেখাতে পারে। তিনি বলেছেন ধর্ম বলতে আমরা কি বুঝি—ত হ'লো আত্মসংযম ও আত্মজ্ঞান লাভ। তিনি বলেছেন, ধর্ম মানে আত্মানুভূতি। ব্রহ্ম থেকে সামান্য তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত সকলেই যথাসময়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবে। তাই আমাদের কর্তব্য সকলকে সেই পূর্ণতালাভের পথে সাহায্য করা। এই সাহায্য করার নাম ধর্ম, বাকী সব অধর্ম। ধর্ম আমাদের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়। এই বিশ্বসংসার ও শাশ্বত ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের প্রকৃত সম্পর্ক কতটুকু তার পরিচয় দেয় ধর্ম। ধর্মের মানে এই নয় যে, আমরা মন্দিরে গির্জায়, বা মসজিদে যাই কি-না বা আচার-বিচার ও ব্রতাদি উদ্‌যাপন করি কি-না। এ সবই ধর্মের বহিরঙ্গ। বিবেকানন্দ যে ধর্মের কথা বলেছেন, তাকে বলা যেতে পারে 'science of human possibilities'। তাকে গ্রহণ করলে মানুষ শান্তি পাবে, পৃথিবী থেকে সভ্যতার অবলুপ্তির আতঙ্ক দূরীভূত হবে। কার্ল মার্ক্স ধর্মকে বলেছেন, আফিমের আলেয়া বা আত্মসম্মোহন-

১ বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-চেতনা, ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার, রূপা অ্যাণ্ড কোং, ১৩৭৪।

২ The Impact of Science on Society, Bertrand Russel, p. 120-21.

কারী অন্ধ আত্মপ্রতারক। তাঁর ভাষায় 'a pleasing self-hypnotism and an unconscious self-deception।' আমার মনে হয় মার্ক্স ভারতীয় দর্শন পড়েননি, বিশেষতঃ বেদান্ত-দর্শন একেবারেই জানতেন না। পাশ্চাত্য ধর্মমতের উপর ভিত্তি করেই মার্ক্স তাঁর মতবাদ তৈরী করেছিলেন।

ম্যাক এবং কার্ল পিয়ারসন ঊনবিংশ শতকের পদার্থবিজ্ঞানের অতি-বাস্তবতাকে (naive realism) সংবেদনশীল ক'রে তুলেছিলেন। আধুনিককালে রাসেল ও হোয়াইটহেডের গাণিতিক আধা-বাস্তবতা (mathematical semi-realism) অতীতের চিন্তাধারাকে আবো প্রাণবন্ত ক'রে তুলছে।

আধুনিককালে হিউম ও কাণ্টের দর্শন পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং তাকে আধুনিক বিজ্ঞানের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। একথা বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের সেই অংশটির উপরেই প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে যেখানে পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব গাণিতিক ফর্মুলাতে[৩] প্রকাশ করা যেতে পারে। কিন্তু যাঁরা বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা পাঠ করেন বা তার ইতিহাস জ্ঞাত আছেন, তাঁদের অনেকে অবশ্য বিশ্বাস করেন না যে দর্শন-ই সঠিক পথ।[৪]

বর্তমানকালে একটি মতবাদ দানা বেঁধে উঠেছে পাশ্চাত্য জগতে—বিজ্ঞানের যে উন্নতি হচ্ছে তার মূলে রয়েছে এক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী। উচ্চতর পদার্থবিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের পেছনে রয়েছে এক নতুন ধরনের দার্শনিক বোধ, যার প্রভাব অনস্বীকার্য। প্রাচীন পদার্থ-বিদ্যা আমাদের বলে, আমরা যা দেখি তা বাস্তব ঘটনা। আবার আপেক্ষিকতাবাদ থেকে আমরা জানি, যা আমরা প্রত্যক্ষ করি তা সব কিছুই আপেক্ষিক। কোয়াণ্টাম-তত্ত্ব অনুসারে হ'লো আমরা সম্ভাব্য জিনিসকেই দেখি, ভবিষ্য সম্ভাব্যতাকে জানতে পারি, কিন্তু বাস্তব ঘটনা হ'লো, বিজ্ঞান ভবিষ্যতের কোন বিষয় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না, করলেও তাকে নির্ভর করতে হবে 'আকস্মিকতার উপরে', যাকে ইংরেজীতে বলা হয় 'laws of chance'।

পি. ডব্লু, ব্রিজম্যান (P. W. Bridgeman) পদার্থবিদ্যার তত্ত্বের উপর আপেক্ষিকতত্ত্ব এবং কোয়াণ্টার প্রভাব[৫] চমৎকার ভাবে পর্যালোচনা করেছেন। নতুন নতুন পর্যবেক্ষণ নব নব সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করছে। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন ধারণার। নব নব সত্যের আবিষ্কার নির্ভর করে বিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণের পদ্ধতির উপরে। অতএব এসবই আপেক্ষিক। যদি একথাটি ভালভাবে উপলব্ধি করা যায়, তাহ'লে ভবিষ্যতে যে-কোন বৈপ্লবিক চিন্তাধারার জন্য আতঙ্কিত হবার কারণ নেই, যেহেতু আইনস্টাইন ও প্লাঙ্কের গবেষণাও বর্তমানকালে পদার্থ-বিজ্ঞানের চিন্তাধারার জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। প্রকৃতির সম্বন্ধে আমাদের ধারণার পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমাদের একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যুক্তি-তর্ক, গণিত বা প্রাকৃতিক সূত্রাবলী—এ সব কিছুই আমাদের যা জানা আছে অর্থাৎ জ্ঞাত বস্তুসমূহকেই একত্র ও বিধিবদ্ধভাবে প্রকাশ করবার পন্থা মাত্র। পরিপূর্ণ সাফল্যলাভ এর সাহায্যে সম্ভব নয়।

৩ Sri Arthur Eddington, 'Philosophy of Physical Science', Cambridge, 1939

৪ H. Miller, 'Philosophy of Science', Isis, Vol. XXX 1939, p 32

৫ 'The Logic of Modern Physics', N. Y. 1928, The Nature of Physical Theory, Princeton, 1936.

আজ বিজ্ঞানের বিজয়বার্তার কথা সকলেরই জ্ঞাত। ইঞ্জিনীয়ারিং, শিল্প, চিকিৎসা প্রভৃতিতে বিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ আধুনিক মানুষের উপরে ক্রমান্বয়ে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করছে। এর অপপ্রয়োগে সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। আর একটি মহাযুদ্ধ শুরু হ'লে প্রকাশ পাবে মানুষের চরম মূর্খতা, যেহেতু দীর্ঘদিনের অধ্যবসায়ে গড়া এই সভ্যতা বিলীন হ'য়ে যাবে।

সাম্প্রতিককালে পদার্থবিদ্যার গবেষণা এক আশ্চর্যজনক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। বলা যেতে পারে সপ্তদশ শতকের গবেষণা বা চিন্তাধারার সঙ্গে এর কোন মিল নেই, প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। তথাপি নিউটনের বলবিদ্যা এবং ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চৌম্বকীয় তত্ত্ব এখনও গুরুত্বপূর্ণ সমাধান এনে দিচ্ছে। পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা অপসৃত, তার জায়গা জুড়ে বসেছে আপেক্ষিকতত্ত্ব ও কোয়ান্টামতত্ত্ব। এমনিভাবে বিজ্ঞানের রাজ্যে বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে। তথাপি পদার্থবিদেরা প্রকৃতির মূল বা উৎসের সন্ধানে গিয়ে তাঁদের অজ্ঞানতার সীমা সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন। অনেকটা একারণেই বিজ্ঞানের এলাকা বা সীমা সম্বন্ধে নানা জিজ্ঞাসা উঁকি দিয়েছে। বিজ্ঞানকে অবশ্যই ধর্মের বিজ্ঞান মেনে নিতে হবে। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন একথাই ব'লে গেছেন, ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। স্বামী বিবেকানন্দ আইনস্টাইনের এই সত্যবাণীর মূর্ত বিগ্রহ।

দুর্বল মানুষ হয়তো কখনো ধর্মের বিশেষ কোন 'বাদ'কে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চায়, নানা আচার-অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করে, পৌরাণিক কাহিনীতে আস্থাশীল হ'য়ে পড়ে। এগুলি সত্যি হ'তে পারে আবার না-ও হ'তে পারে, কিন্তু কোন বিশেষ মতবাদকে (doctrine) আশ্রয় ক'রে 'প্রকৃত ধর্ম' কখনও উঠতে চেষ্টা করে না বা তার পতনও ঘটে না। সত্য ধর্ম অনেক গভীরের বস্তু। তা প্রত্যক্ষ অনুভূতির দৃঢ় শিলাভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেকে বর্ণান্ধ হ'তে পারেন, কিন্তু অন্য সবাই অবশ্যই সূর্যোদয়ের বর্ণচ্ছটা লক্ষ্য ক'রে থাকেন। কারো হয়তো আদৌ ধর্মবোধ নেই, আবার অনেকের জীবন ঈশ্বরের জ্যোতিঃপুঞ্জের আভায় উদ্ভাসিত।

একথা না মেনে উপায় নেই, ধর্মজীবনে এক বিশেষ আদর্শ না থাকলে পথ চলা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রে দেখা গেছে অধিকাংশ প্রচলিত ধর্মমত যুগে যুগে বিজ্ঞান, ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের কাছে ঘা খেয়েছে। মনীষী হোয়াইটহেড বলেছেন :*

> 'Religion will not regain its old power until it can face change in the same spirit as does science. Its principles may be eternal, but the expression of those principles requires continual development.··· Religious thought developes into an increasing accuracy of expression, disengaged from adventitious imagery, and the interaction between religion and science is one great factor in promoting this development'

তাঁর কথায় ধর্মকে যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে। বিজ্ঞানের প্রভাবে পৃথিবীতে যে পরিবর্তন এসেছে, যে চিন্তাধারায় জগতে বিপ্লব

* Prof. A. N. Whitehead—Science And The Modern World, Cambridge, 1927, p. 234, 236.

ঘটে গেছে, সেই নব নব ভাবনার অস্তিত্বকে মেনে নিতে হবে, তা না হ'লে ধর্ম সর্বজনগ্রাহী হবে না। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সমগ্র জীবনে একথাই প্রমাণ-সহ ব'লে গেছেন, বেদান্তের বাণী শাশ্বত, সনাতন। বিজ্ঞানের সঙ্গে তার মিতালি আছে। বেদান্তের ভাবনা বিজ্ঞানকে উপেক্ষা ক'রে নয় এবং সেই চিন্তা কালের পরিবর্তনে পুরোনো, পরিত্যাজ্য হয়নি।

জড়বিজ্ঞান অধ্যাত্মবিজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়েছে অতি মন্থরগতিতে, বরং দীর্ঘদিন ধ'রে জড়বিজ্ঞান দর্শনকে ঠেলে নিয়ে গেছে যান্ত্রিক গণনার পথে, যাকে বলা হয় material determinism। উনবিংশ শতাব্দীর এক অধ্যায়ে ধারণায়, ভাবনায় মানুষের উন্নতির কথা-ই প্রধান ছিল, ফলে সমগ্র বিশ্বে আশার ক্ষীণ স্রোত যেন প্রবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু বিংশ শতকে ঠিক তার বিপরীত। শুধু নৈরাশ্যের অন্ধকার। লর্ড বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, মানুষের উদ্ভব এমন একটি কারণ থেকে, যা নিজ পরিণতি সম্বন্ধে অন্ধ। তার জন্ম, বৃদ্ধি, আশা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, ভয়, ভালবাসা, বিশ্বাস—এসবই এসেছে আকস্মিকভাবে, হঠাৎ-সৃষ্ট পরমাণুপুঞ্জ থেকে। কোন উদ্দীপনা, বীর্য, চিন্তা-ভাবনার প্রশস্ততা তাকে কবরের বাইরে টেনে নিতে পারে না। রাসেলের নিজের কথায়[৭]—

'That man is the product of causes which had no prevision of the end they were achieving, that his origin, his growth, his hopes and fears, his loves and his beliefs are but the outcome of accidental collocations of atoms, that no fire, no heroism, no intensity of thought and feeling can preserve an individual life beyond the grave that all labour of all the ages, all the devotion, all the inspiration, all the noon day brightness of human genius are destined to extinction in the vast death of the solar system and that the whole temple of man's achievement must inevitably be buried beneath the debris of a universe in ruins - all these things, if not quite beyond dispute, are yet so nearly certain that no philosophy which rejects them can hope to stand.'

অনেকে মনে করেন এই নৈরাশ্যবাদের মধ্যেই প্রয়োজন ধর্মের। এই অবস্থাতেই ধর্মের প্রয়োজনীয়তা বেশি। এ প্রসঙ্গে অনেক ধর্মপ্রবক্তাদের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যেহেতু আমাদের আলোচনাবৃত্ত বিজ্ঞানকে কেন্দ্র ক'রে, সেইহেতু দার্শনিক-গণিতজ্ঞ হোয়াইটহেডের বক্তব্য আবার তুলে ধরছি[৮]:

'The fact of the religious vision, and its history of persistent expansion, is our one ground for optimism. Apart from it, human life is a flash of occasional enjoyments lighting up a mass of pain and misery, a bagatelle of transient experience.'

আবার কতিপয় দার্শনিক, যেমন এডিংটন প্রভৃতির মতে জ্ঞানের বিস্তৃত অনুভূতি এবং মৌল পদার্থবিদ্যার আধুনিক উন্নতির ফলে দেখা যাচ্ছে পূর্বে বিজ্ঞান দার্শনিক ডিটারমিনিজ্‌মকে যেভাবে সমর্থন জানাচ্ছিল তা যেন দুর্বল হ'য়ে গেছে।

---

৭ Bertrand Russel—Mysticism and Logic, p. 47.

৮ A. N. Whitehead—Science and Modern World, p. 238.

যাই হোক না কেন, মানুষ ক্রমশঃ পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পারছে যে, বিজ্ঞানের ক্ষমতা ও সীমা কতটুকু। এডিংটনের আর একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না :

"The symbolic nature of the entities of physics is generally recognized, and the scheme of physics is now formulated in such a way as to make it almost self-evident that it is a partial aspect of something wider···. The problem of scientific world is part of a broader problem —the problem of experience. ···We all know that there are regions of the human spirit untrammelled by the world of physics. In the mystic sense of the creation around us, in the expression of art, in a yearning towards God, the soul grows upward and finds fulfilment of something implanted in its nature···whether in the intellectual pursuits of the spirit, the light beackons ahead and the purpose surging in our nature responds. Can we not leave it at that? Is it really necessary to drag in the comfortable word 'reality'?"

প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক মডেল এত সাফল্য এনে দিয়েছে যে, আমরা ক্রমশঃ যেন একথাই বিশ্বাস করতে চলেছি, বাস্তবতা বোধহয় এমনই কিছু। কিন্তু এটি মডেল ছাড়া আর কিছুই নয়। মডেলকে কেটে আমাদের খুশিমত ভাগ ক'রে পরীক্ষা করা যায়, একথা সত্য। মানুষকে যদি যান্ত্রিক ভাবা হয়, তাহলে সে যন্ত্রবিশেষ মাত্র, কিন্তু তাকে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেখলে অবশ্যই মনে হবে তার মধ্যে রয়েছে এক র‍্যাশানাল সত্তা এবং সজীব আত্মা। বিজ্ঞানকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, সে 'আত্মাকে' নিয়ম বা সূত্রের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে পারে না, বরং কারো প্রাণ 'ঈশ্বরমুখী' হবার জন্যে যে পথ কামনা করে সেই পথেই তাকে যেতে দেয়।

মানবজীবনের যা কিছু কাজ তা চলে দুটি রাজ্য জুড়ে। একটি হ'লো বহির্জগৎ, আর একটি তার অন্তর্জগৎ। এই দুটির মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া চলেছে রাত্রিদিন। বলা বাহুল্য এই দুটি জগতের সত্তা দেহে এক হ'লেও সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়। বাইরেকার যে জগৎ তার বাসিন্দা হচ্ছে জড় ও চেতন অবয়বী পদার্থ এবং তৎসংশ্লিষ্ট শক্তি আর অন্তর্জগতের সত্তা হচ্ছে নিরবয়ব সুখ, দুঃখ, হিংসা, প্রেম, ক্রোধ এবং অক্রোধ। দুটি রাজ্য অসংলগ্ন নয়, একটিকে পরিত্যাগ ক'রে অপরটি বেঁচে থাকতে পারে না। তাহ'লে মানুষের খোলসটি থাকে না। বিজ্ঞানের সাধনা বহির্জগতের স্বরূপ উপলব্ধি করবার সাধনা। সে আছে ঐ কাজে মগ্ন হয়ে। আর অধ্যাত্মবিদ্যার কাজ অন্তর্জগতের সন্ধান করা। অন্তঃস্থ 'আমি'র খোঁজ করা তার কাজ। বিজ্ঞান অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করে যে, একটিকে দিয়ে দুটি রাজ্যের জরীপ করা সম্ভব নয়। একারণেই বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, পরামনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা শুরু করেছে। এতদিন যে প্রথায় বিজ্ঞান কাজ করে এসেছে বর্তমান ক্ষেত্রে সেই প্রথার পরিবর্তন হ'তে বাধ্য, তথাপি একথা বিজ্ঞান স্বীকার করবে না তার পন্থা একেবারে অচল হবে।

বিজ্ঞানের ভিত্তি কোথায়—তা হ'লো সংশয়। সংশয় বা অবিশ্বাসকে আশ্রয় ক'রে গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের অসাধারণ ও বিস্ময়কর অগ্রগতি। তবে বিজ্ঞানকে একেবারে

অবিশ্বাসীও বলা চলে না। কারণ ধর্মের মতো বিজ্ঞানের মূলেও একটা 'বিশ্বাসের' স্থান আছে। তা ছাড়া বিজ্ঞান অচল। সেই বিশ্বাস হ'লো সমগ্র বিশ্বচরাচর জুড়ে এক শাশ্বত-সনাতন নিয়মে—যাতে সম্ভব হয়েছে বিশ্বের স্থিতি ও গতি। এই সনাতন নিয়মের অন্তরালে রয়েছে এক বিশ্বব্যাপী চেতনাশক্তি (যাকে বিশ্বাত্মা বলা চলতে পারে), তার কথা বিজ্ঞান স্বীকার করে না। বেদান্তের সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পার্থক্য শুধু এখানেই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—ধর্মের উদ্দেশ্য কি ?

> 'আত্মামাত্রই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাইরের ও অন্তরের প্রকৃতিকে বশীভূত ক'রে আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান এদের মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায়ের সাহায্যে নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। এই হচ্ছে ধর্মের পূর্ণাঙ্গ মতবাদ, অনুষ্ঠান, আচার, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ এর গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।'[৯]

বিবেকানন্দ যে বেদান্ত প্রচার করেছেন তা বিজ্ঞান ও ধর্মের সুসমঞ্জস মিলনভূমি। তা মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সার্থক সম্মিলন। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মানবিক শিক্ষা ও বিজ্ঞানকে স্বতন্ত্র পর্যায়ে ফেলার প্রবণতার সময়ে বেদান্ত তার যথার্থ স্থান লাভ করবে। কারণ বেদান্ত বলছে—এই উভয় বিদ্যা পরস্পরের অনুপূরক।

যে মৌল ধারণার উপর বেদান্তদর্শনের ভিত্তি তা কখনও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়। যুগ যুগ ধ'রে মানুষ নিজের কল্পনা ও চিন্তাশক্তির সাহায্য নিয়ে বিশ্বাস ক'রে এসেছে এই সত্যদ্রষ্টাদের অনুভূত অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে। তার অনুভূতির বলে গ'ড়ে তুলেছে দর্শন-চিন্তা। একে কেন্দ্রায়িত ক'রে সৃষ্টি হয়েছে দর্শনের, আস্তিক্যবোধের। এই উপনিষদ-ভিত্তিক দর্শনচিন্তা—একে কখনই অলীক বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলতে পারেন না চরম নাস্তিকেরাও। যেহেতু বেদান্তদর্শনের ভিত্তি কেবলমাত্র জ্ঞানাতীত লোকে বিচরণকালীন অনুভূতি নয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তি তার অন্যতম গ্রহণীয় বিষয়। এক সুচিন্তিত বিজ্ঞানবোধের উপর ইমারত গ'ড়ে তুলেছে বেদান্তদর্শন। তবে একথা সত্য, অনেকে হয়ত সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন। ভারতীয় ধর্ম-দর্শনে তাই পাশাপাশি সগুণ-নির্গুণের অধিষ্ঠান। কিন্তু ধর্ম যখন আচার অনুষ্ঠানকে সর্বস্ব ক'রে তার মধ্যে নিমজ্জিত হয়, তখন গোঁড়ামির উদ্ভব হ'তে বাধা এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন কক্ষে-গোত্রে দলাদলি তৎসহ উন্মত্তার অমানুষিক অত্যাচারের বীভৎস অভিনয়। এই 'ধর্মবুদ্ধি'কে ধর্মবুদ্ধি বলা হয় না, তাকে বলা উচিত কূটবুদ্ধি। তাহ'লে ধর্মবুদ্ধি কাকে বলবো ?

ইংরেজীতে যাকে 'reason' বলা হয় তাকেই বলা হয় বিশুদ্ধ বুদ্ধি এবং বলা বাহুল্য ঐটেই হ'লো ধর্মবুদ্ধি। এহেন ধর্মবুদ্ধির সঙ্গে বিজ্ঞান-বুদ্ধির সাদৃশ্য বর্তমান। স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মবুদ্ধি এই 'reasoning'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তার দৃষ্টি কুসংস্কারবিমুক্ত, সেইহেতু বৈজ্ঞানিক।

মনীষী রোঁমা রোঁলার কথায়,[১০]

> 'In the two words equilibrium and synthesis. Vivekananda's construc-

৯ Swami Vivekananda: Complete Works, Vol. I, p 124, 11th Edn.

১০ Romain Rolland: Life of Sawmi Vivekananda, Advaita Ashrama, Cal-13, 5th Ed, 1960, p 281.

tive genius may be summed up. He embraced all the paths of spirit : the four yogas in their entirety, renunciation and service, art and science, religion and action, from the most spiritual to the most practical … . He was the personification of the harmony of all human energy.'

'ভারসাম্য ও সমন্বয়—এই দুটি কথার মধ্যে বিবেকানন্দের সংগঠন প্রতিভাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়। সমগ্র সম্পূর্ণ চারটি যোগ, ত্যাগ ও সেবা, শিল্প ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও সর্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক থেকে সর্বাপেক্ষা ব্যবহারিক সব কাজ—এই সমস্তকেই তিনি অধ্যাত্মপথ ব'লে গ্রহণ করেছিলেন।…তিনি ছিলেন সকল প্রকার মানবিক শক্তির সামঞ্জস্যের মূর্ত প্রকাশ।'

বিজ্ঞান ও ফলিতবিজ্ঞানের অগ্রগতিকে এখন রুখে দেওয়া অসম্ভব। আর রুখতে গেলেও বিপদ। যেহেতু এতে ক'রে দীর্ঘদিন ধ'রে তিলে তিলে গ'ড়ে ওঠা সভ্যতার অবসান হবে। আমরা নিশ্চয় চাইবো না, বহু আগেকার দিনে, বর্তমান সভ্যতার শৈশবের দিনে ফিরে যেতে। অথচ মানুষ বিজ্ঞানের কাছ থেকে চাবিকাঠিটি হাতড়ে নিয়ে মারণযজ্ঞের কাজে তার ব্যবহার করছে। এর জন্যে প্রয়োজন সাম্যের; ভারসাম্যের। প্রয়োজন মানসিক বৃত্তি-প্রবৃত্তিদমনের, যাতে তা অপবৃত্তিতে পরিণত না হ'তে পারে। যাতে দ্বিতীয়বার হিরোসিমা নাগাসাকির সৃষ্টি হ'য়ে পৃথিবীর আরও কোন দেশের আগত-অনাগত নাগরিকের জীবন শতাব্দী ধ'রে বিপর্যস্ত না করতে পারে। শুনেছি জাপানের উপরে পারমাণবিক বোমা ফেলার সময় যেসব বিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের অনেকে আতঙ্কে, বিস্ময়ে, বেদনায় শিশুর মতো কেঁদে উঠেছিলেন। আইনস্টাইন চীৎকার ক'রে উঠেছিলেন, 'ওরা ঠকিয়েছে আমাকে। আমিই ওদের এই অনন্ত শক্তির উৎস খুঁজে দিয়েছি।' বিশ্বের তাবৎ কল্যাণকামী বিজ্ঞানী তাই গ'ড়ে তুলেছিলেন পারমাণবিক শক্তিকে প্রাণহরণের কাজে প্রয়োগের বিরুদ্ধে এক সক্রিয় আন্দোলন। চেয়েছেন অশুভবুদ্ধির উপরে শুভবুদ্ধির বিজয়-নিশান ওড়াতে। কিন্তু পারেননি। কেন পারেননি সে এক বিরাট প্রশ্ন। তবে একথা সত্যি, আজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পারমাণবিক অস্ত্রের যে মহড়া চলছে তার মূলে যেমনি রয়েছে ক্ষমতার প্রতি সর্বগ্রাসী লোভ, তেমনি আছে ধর্মবোধের, কল্যাণবুদ্ধির একান্ত অভাব। অথচ তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে একান্তভাবে। ধর্ম-চেতনা যতদিন না রাষ্ট্র-কর্ণধারদের মনকে প্রভাবিত করতে পারবে ততদিন তাঁরা এই পৈশাচিক লোভের কবলমুক্ত হতে পারবেন না। আজকের দিনে কোন্ ধর্ম মানুষকে শুভবুদ্ধি দেবে অথচ অবৈজ্ঞানিক তৈরী করবে না? একমাত্র বেদান্ত এই উভয় গুণের অধিকারী। এই বেদান্তের বাণী প্রচার করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বের দরবারে।

বিজ্ঞানের সন্ধানী আলোককণা যেমন দূর করে অজ্ঞানতার পুঞ্জীভূত অন্ধকার, ঠিক তেমনি ধর্মচেতনার আলোকতরঙ্গ-স্পর্শে অপসারিত হয় অজ্ঞানতার কুজ্ঝটি। বিজ্ঞানের বাস্তব সন্ধান এবং ধর্মের অলৌকিক ইঙ্গিত যে পরস্পরবিরোধী নয়, একটি সত্য ও সূক্ষ্ম সম্বন্ধসূত্র দিয়ে তারা গ্রথিত, এই পরমবোধ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সংস্কারমুক্ত চিত্তে অনুভব করেছিলেন। তিনি এই মহাসত্য অনুভব করেছেন যে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত নয়, বরং রমণীয়। জড়বিজ্ঞান

চিন্তাজগতের যে প্রান্তে পৌঁছে খেই হারিয়ে ফেলছে, বেদান্ত বা ধর্মবিজ্ঞানের অনুভূতি-উপলব্ধি সেই অসমাপ্ত পথরেখাকে নিয়ে গেছে সুদূরে, মিলিত করেছে জ্ঞানের পরম জ্যোতির্লোকে। শেষেরটি প্রথমের পরিপূরক, পরিপন্থী নয়। এই জ্যোতির্ময় চেতনার রঙে রাঙা হ'য়ে উঠেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

এ প্রশ্ন আজ জোরালো হ'য়ে উঠছে—কেমন ক'রে মানুষের সমাজে সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য এবং অহিংসার প্রতিষ্ঠা সম্ভব, যাতে সমগ্র বিশ্বে শান্তি থাকবে অব্যাহতভাবে। এর জন্যে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে উপনিষদে। প্রাচীন ভারতের বেদপন্থী সমাজে মানবজীবনের প্রধান কর্তব্য ও মুক্তিলাভের উপায় ছিল প্রিয়দ্রব্য-ত্যাগ ও দান। প্রথা ছিল যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন ক'রে যাজ্ঞিক লাভ করতেন ব্রহ্মলাভের পরমা শান্তি। তাই তাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে সেবার সম্পর্ক। সমাজে শান্তি, সাম্য, মৈত্রী ও ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে প্রয়োজন বেদান্তের আদর্শ-অনুসরণ। বিজ্ঞানের প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে বেদান্তের অনুশাসনে। বিজ্ঞানের জ্ঞানের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে অধ্যাত্মবিদ্যার উপলব্ধিকে।

মানুষ কি গ্রহণ করবে-- ভবিষ্যতে কোন্ ধর্ম থাকা উচিত, এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ দূরদ্রষ্টার মতো ব'লে গেছেন ১৮৯৬ সালে লণ্ডনে 'The Absolute and Manifestation' বক্তৃতায়। সেখানে তিনি বলেছেন,[১১]—

'বুদ্ধদেবের মধ্যে আমরা দেখি মহৎ সর্বজনীন হৃদয়, অনন্ত সহিষ্ণুতা। তিনি ধর্মকে সর্বসাধারণের উপযোগী ক'রে প্রচার করলেন। অসাধারণ ধী শক্তিসম্পন্ন শঙ্করাচার্য তাকে যুক্তির প্রখর আলোকে উদ্ভাসিত করলেন। আমরা এখন চাই, এই প্রখর জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধদেবের এই হৃদয়-- এই অদ্ভুত প্রেম ও করুণা সম্মিলিত হোক। এই সম্মিলন আমাদের শ্রেষ্ঠ দর্শনের সন্ধান দেবে। (তাহলে) বিজ্ঞান ও ধর্ম একত্র মিলিত হবে ও পরস্পরকে আলিঙ্গন করবে। এটিই হবে ভবিষ্যতের ধর্ম। আর যদি আমরা তাকে ঠিক ঠিক গড়ে তুলতে পারি, তাহলে নিশ্চয় বলা যেতে পারে যে, তা সর্বকালের ও সর্বাবস্থার উপযোগী হবে।'

ধর্মবিজ্ঞানের নির্দিষ্ট পথে চললে শক্তি আসে, আসে বিবেক, সমবেদনা, মানবতা, জীবে প্রেম প্রভৃতি মানবিক সদ্গুণ। এগুলি মানুষের মনে স্থায়িভাবে বাসা বাঁধে। অন্যায় থেকে বিরত হবার প্রেরণা, লোভ দমন করবার প্রবৃত্তি মানুষকে মহত্তর লোকে নিয়ে যায়।

ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়েই স্বতন্ত্রভাবে অসম্পূর্ণ। প্রাচীন সভ্যতা ধর্মানুশাসনে রচিত। তার ফলে ব্যবস্থার ফলাফল আংশিক এবং সীমাবদ্ধ। বর্তমান সভ্যতা ঠিক তেমনি সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। এর ফলও আংশিক এবং সীমিত। অতএব প্রয়োজন উভয়ের সার্থক মিলন। ধর্ম ও বিজ্ঞান-এর মাঝখানে যদি আধ্যাত্মিক শক্তির সেতু থাকে তাহলে যে-মানুষ সৃষ্টি হবে তা আদর্শ পুরুষ। গড়ে উঠবে নতুন সমাজ। তারই জন্য পৃথিবী অপেক্ষমাণ। মস্তিষ্ক ও হৃদয়—উভয়ের সমন্বয়-সাধনের প্রচেষ্টা বিবেকানন্দের অন্যতম প্রয়াস। তা যদি না হয় তাহলে বিশ্ব ধ্বংসের মুখে অনিবার্যভাবে এগিয়ে যাবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল উ. থান্ট এ সম্বন্ধে বলেছেন:

---

১১ Swami Vivekananda: Complete Works, Vol. II, p 140, 10th Edn.

'প্রতীচ্য জগৎ যে বস্তু-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে প্রাচ্যের অতুলনীয় আত্মবিজ্ঞানের সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। যদি স্বামীজীর এই সমন্বয়াদর্শকে কার্যকর না করা হয়, যদি নিছক মস্তিষ্কের উন্নতি ঘটিয়ে যাওয়া হয় এবং তার সঙ্গে একই ভাবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটানো না হয়, তাহলে আমরা অনিবার্য-ভাবে এক সঙ্কট থেকে অন্য সঙ্কটের দিকে এগিয়ে যাব।' (২৮. ৩ ১৯৬৩)

বিবেকানন্দ বলেন, বেদান্তের বাণীই আগামী দিনের বাণী, যেহেতু বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম কোন বিশেষ নামে বা আকারে আবদ্ধ নয়। বিজ্ঞানের রীতি প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বর্তমান। বিশ্বজগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ মূলতঃ এক অবিনাশী নির্বিশেষ অনাদি ও অনন্ত সত্তা আর বেদান্ত একথাই শিক্ষা দেয়। তিনি বলেন, একমাত্র বেদান্তই ধর্মকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত করতে পারে এবং তার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারে। বেদান্ত বলে, 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ তুমিই সেই সর্বব্যাপী শাশ্বত অব্যয় আত্মা। 'তুমিই ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে প্রতিভাত হইতেছ।' বেদান্ত সমগ্র বিশ্বচরাচরের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা অনুভব করাতে সাহায্য করে। সমগ্র মানবজাতিকে যাবতীয় জীবের সঙ্গে একাত্ম ব'লে উপলব্ধি করাই নীতিবাদের ভিত্তি হওয়া উচিত। তাহলে আমরা আর কারো উপরে হিংসা করবো না। কাউকে বঞ্চিত ক'রে নিজের উন্নতিসাধনের দুষ্প্রবৃত্তি জাগবে না কারো মনে।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের পরিসর ছিল স্বল্প। এই স্বল্পকালে তিনি জেনেছেন অনেক, উপলব্ধি করেছেন আরো অনেক, রচনা করেছেন নিজের অবগাহনের সরোবর। জ্ঞানের মহার্ণব ও বিজ্ঞানের সপ্ত সমুদ্র থেকে আনীত পুণ্য সলিল দিয়ে রচিত তাঁর মানস সরোবর, সেখানে অবগাহনস্নানে আপ্লুত স্বামী বিবেকানন্দ নিরাসক্ত বিজ্ঞানীর মন ও দৃষ্টি নিয়ে বিচার করেছেন আন্তর পৃথিবীকে ও বহির্বিশ্বকে। তাঁর হৃদয়ের অন্তঃপ্রদেশে ভক্তির ফল্গুধারা। জড়বিজ্ঞানের লীলাক্ষেত্র তাই নতমস্তকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে কুসংস্কারবিমুক্ত বৈজ্ঞানিক মন, ভক্তি ও বিচিত্র কর্মধারার ত্রিবেণী সঙ্গম স্বামী বিবেকানন্দকে।

ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্বং লয়ং যাতি তদ্‌ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্॥

— কৈবল্যোপনিষদ্

"আনন্দের পূর্ণ ঘট"

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী সাধনপর্বের শেষ দিকে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ভৈরবী ব্রাহ্মণীসহ শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কিছু দিনের জন্য কামারপুকুরে আসিয়াছিলেন তখন চতুর্দশ-বর্ষীয়া কিশোরী সারদা শিবপ্রতিম পতিকে বহুদিন পরে দর্শন করিয়া, কাছে পাইয়া, চিনিয়া এবং তাঁহার অপার্থিব প্রেম হৃদয়ঙ্গম করিয়া যে তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তীকালে স্ত্রীভক্তদের নিকট মাঝে-মাঝে তিনি বর্ণনা করিতেন। বলিতেন, ঐ সময়ে সর্বক্ষণ তাঁহার বোধ হইত যেন আনন্দের একটি পূর্ণ ঘট বুকের মধ্যে বসানো রহিয়াছে। "আনন্দের একটি পূর্ণ ঘট"—সরল এই কয়েকটি কথায় পল্লীরমণী জননী সারদা কী অসামান্য গভীরভাব প্রকাশ করিয়াছেন! শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিকগণ তাঁহার বাগ্‌নৈপুণ্যে হার মানিবেন। ঘট যখন জলে পূর্ণ হয় তখন ঘট এবং জল উভয়েরই সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসা মিটিয়া যায়। যতক্ষণ জল দূরে এবং ঘটও শূন্য ততক্ষণই নানা প্রশ্ন প্রত্যাশা, উদ্বেগ এবং চেষ্টা। ঘট যদি একবার ভরিয়া লইতে পারি তাহা হইলে তৃষ্ণানিবারণের এবং জল সম্পাদ্য আরও কত কাজ সম্বন্ধে যাবতীয় ভাবনার কোনও অবসর থাকে না। পূর্ণ কলস হইতে জল গড়াইয়া লইলেই হইল। জলের অভাবে আমরা তৃষ্ণায় কাতর হই, আরও কত না দুর্ভোগ সহ্য করি, কিন্তু অপর্যাপ্ত জল যখন গৃহে মজুদ তখন আর তৃষ্ণার ভয় নাই, জলকষ্টের লাঞ্ছনা হইতে আমরা তখন মুক্ত।

দৈহিক পিপাসা এবং দেহসংক্রান্ত আরও নানা প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যেমন জল চাই, তেমনি আত্মার ক্ষুধা দূর করিবার জন্য আমাদের দরকার হয় আনন্দ। জলের আধার যেমন ঘট, সেইরূপ আনন্দের পাত্র হইল আমাদের হৃদয়। হৃদয়কে যদি আনন্দ দিয়া ভরিয়া লইতে পারি তাহা হইলে চিত্তের সকল খেদ গ্লানি দুঃখ হাহাকার মিটিয়া যায়।

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ইন্দ্রিয়নিচয় দ্বারা উপভোগ করিয়া যে সুখ আমরা খুঁজি, উহা কিন্তু আনন্দ নয়। বৈষয়িক সুখ কখনও আমাদের প্রাণের হাহাকার মিটাইতে পারে না। বৈষয়িক সুখ ক্ষণিক কিছু তৃপ্তি আনে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে দশগুণ চঞ্চলতা এবং বিক্ষোভও সৃষ্টি করে। বিষয় ভোগ করিয়া আমরা কখনও দুঃখকে জয় করিতে পারি না। দুঃখকে যদি বাস্তবিক প্রতিহত করিতে হয় তাহা হইলে আমদানী করিতে হইবে আনন্দ। আনন্দের আকর হইল ভগবৎ-সত্তা। ভগবৎ-সত্তার সংস্পর্শ লাভ করিলে হৃদয়ে আনন্দের উদ্ভব হয়। সেই আনন্দ আমাদের চিত্তের সকল ক্ষুদ্রতা, বক্রতা, বিক্ষেপকে ডুবাইয়া দেয়। আনন্দ আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করে এক লোকাতীত ঐশ্বর্যে।

কিশোরী সারদার হৃদয়ে যে আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল উহা "আনন্দের পূর্ণ ঘট"। যাঁহার জীবনে বেদজ্ঞান মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, ব্রহ্মকে জানিয়া যিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছিলেন, ভগবৎ প্রেমের পরাকাষ্ঠায় যাঁহার দেহ মন-প্রাণ ভগবন্মাধুর্যে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাকে স্বামিরূপে পাইলে হৃদয়ে আনন্দের বন্যা তো নামিবারই কথা।

'লীলাপ্রসঙ্গ'-কার ঐ আনন্দের উপলব্ধি সারদার জীবনে কী রূপান্তর আনিয়াছিল তাহার সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। উহা তাঁহার আচরণ, কথাবার্তা ও কাজকর্মে এক অপরিসীম মাধুর্য সংক্রামিত করিয়াছিল। আনিয়াছিল এক আশ্চর্য প্রশান্তি, গভীর মননশীলতা, স্বতঃস্ফূর্ত নিঃস্বার্থপরতা। হৃদয়ে আর কোনও অভাব-বোধ ছিল না। মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি উদ্রিক্ত করিয়াছিল প্রখর সহানুভূতি। কোনও প্রকার কষ্ট, কোনও প্রকার অপমান লাঞ্ছনা আর প্রাণকে পীড়িত করিতে পারিত না। এক প্রদীপ্ত আলোক, এক নিবিড় শান্তি দিবারাত্র তাঁহার সকল সত্তায় পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকিত।

অবতারপুরুষের সান্নিধ্যে ও সেবায় বিশেষ অধিকারীর হৃদয় যে এমনিভাবে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, জননী সারদার অভিজ্ঞতা তাহারই উদাহরণ। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা এবং তাঁহাদের সঙ্গিগণের জীবনচর্যা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি শাস্ত্রের সত্যসমূহকে এ যুগে নূতন করিয়া প্রমাণ করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী-সঙ্গিনীগণের শ্রীকৃষ্ণ-সাহচর্যের পরম সার্থকতার কথা আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি গ্রন্থে পাঠ করি। যীশুখ্রীষ্টের অন্তরঙ্গ অনুচরগণ যীশুর তিরোধানের পর কোন্ বলে অশেষ নিপীড়ন, লাঞ্ছনা এবং অত্যাচারকে তুচ্ছ করিতে পারিয়াছিলেন? যীশুর সঙ্গজনিত দৈবী আনন্দ তাঁহাদের হৃদয়ে জমাট হইয়া সঞ্চিত ছিল বলিয়াই নয় কি?

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিতেছেন, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। সেই আনন্দ হইতে সকল প্রাণী জন্মগ্রহণ করে, সেই আনন্দে সকল কিছু সমাশ্রিত, আবার সেই আনন্দেই সকল কিছু ফিরিয়া যায়। ভৃগু ঋষির হৃদয়ে এই সত্য প্রতিভাত হইয়াছিল। এই ভার্গবী বিদ্যাকে জানিতে পারিলে "অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা।" যাবতীয় ভোগের সুখ আর পৃথক করিয়া তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় না, হৃদয়স্থিত আনন্দব্রহ্মের অনুভূতি দ্বারা ত্রিভুবনের সকল উল্লাসকে তিনি স্পর্শ করিতে পারেন। শুধু তাহাই নয়, দিকে দিকে তিনি তাঁহার নিজের অপার্থিব উল্লাস বিলাইয়া দেন। পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির যে মহত্ত্ব তাহা তাঁহার স্বতই করায়ত্ত। ব্রহ্মের সর্বতোব্যাপ্ত আনন্দকে ধারণ করিয়া তিনিই তো যথার্থ কীর্তিমান। সেই আনন্দের অনুভব ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বালকবৎ, জড়বৎ, উন্মাদবৎ তিনি কখনো বা অস্ফুট অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করিয়া সেই আনন্দের কথঞ্চিৎ আভাস দিয়া থাকেন, যথা—হা—বু, হা—বু, হা—বু অর্থাৎ, হায় হায়, কি বলিয়া তোমাদের বুঝাইব? হায় হায়, কেমন করিয়া তোমাদিগকে আস্বাদ করাইব?

গীতা বলিতেছেন, অধ্যবসায় ও চেষ্টা দ্বারা মনের বহির্মুখী বৃত্তি শান্ত করিয়া যদি একবার ভিতরে ডুবিতে পার, ডুবিয়া নিজের চিরশুদ্ধ চিরমুক্ত আত্মাকে স্পর্শ করিতে পার, তাহা হইলে "ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখং"—সেই বৃহৎ আত্মসত্যে ওতপ্রোত অপার আনন্দ তোমার অধিগত হইবে।

"যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব চ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥"

—তখন অন্তরের অন্তরে সকল সুখ, অন্তরের অন্তরে সকল স্বস্তি, অন্তরের অন্তরে সকল দীপ্তি। ব্রহ্মকে জানিয়া তখন ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি, ব্রহ্মে সকল সীমার মহামুক্তি।

দেখা যাইতেছে যে, ভগবানকে ভালবাসিয়া, তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহার লীলা আস্বাদন

করিয়া আনন্দের পূর্ণ ঘট যেমন হৃদয়ে বসিতে পারে, তেমনি বিশ্বসংসারের মূল জ্ঞানবিচার দ্বারা অনুভব করিয়া কিংবা যোগাভ্যাস দ্বারা মনকে বাহির হইতে ভিতরে গুটাইয়া, অন্তরের অন্তরে আত্মসত্তাকে স্পর্শ করিয়াও ঐ আনন্দকে অধিগত করা যায়। গীতা বলেন, আমরা যদি স্বার্থবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে আমাদের সকল কর্তব্য সমাধা করিতে পারি, তাহা হইলেও অশেষ চঞ্চলতার পশ্চাতে সেই নিবিড় সাম্যস্বরূপ আনন্দকে উপলব্ধি করা সম্ভবপর। যে কোনও ভাবে হউক ঐ আনন্দকে অনুভব করাই আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের পরম লক্ষ্য।

আন্তরিকভাবে যিনি শ্রীভগবানকে চান তাঁহার হৃদয়পাত্র আনন্দে একদিন পূর্ণ হইবেই। সকল ধর্মেই আমরা ঈশ্বরপ্রেমিক আউলদের পরিচয় পাই। প্রাচীন ইহুদীধর্মের উপাস্য যিহোভা যদিও অতি কঠোর বিচারকর্তা এবং শাসনদণ্ড লইয়া তাঁহার উপাসকগণকে সর্বদাই শাসাইতে তৎপর, তথাপি মাঝে মাঝে কোনও ভক্তকে ভয়ের পরিবর্তে নিষ্কাম ভালবাসা দ্বারা যিহোভার সম্মুখীন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফলে ঐ ভক্তের হৃদয়ে আনন্দের পূর্ণ ঘট বসিয়া যায়। উদ্বেল উদ্দীপনায় তিনি গাহিয়া উঠেন—

পাইয়াছি, পাইয়াছি আজ আমার প্রভুকে আমার পালকরূপে। আর আমার কোনও ভয় নাই, অভাব নাই। তিনি আমার আত্মাকে করিয়াছেন সঞ্জীবিত। তিনি তাঁর নামের বলে আমাকে অহরহ কল্যাণের পথে লইয়া চলিয়াছেন। নাই আর কোনও অশুভ, নাই আর কোনও মৃত্যুশঙ্কা। তিনি যে সর্বদাই আমার সাথে সাথে রহিয়াছেন। আমার হৃদয়পাত্র তাঁহার আনন্দে পরিপূর্ণ; না না ঐ পাত্রে আনন্দ আর ধরে না—উহা আজ উপছিয়া পড়িতেছে।

(রাজর্ষি ডেভিড-রচিত—গীতি, ২৪)

সন্ত নানক সাহেব ভগবদানন্দে বিভোর হইয়া গাহিতেছেন :

দুখ নাঠে সুখ সহজ সমায়ে অনন্ত আনন্দ গুণ গায়ো
কহ নানক হরি বন্ধন কাটে বিছুড়ত আন মিলায়ো।

—"আর কোনও দুঃখ নাই—দশদিক হইতে আনন্দের জোয়ার বহিতেছে—অনন্তকালস্থায়ী আনন্দ, হে প্রিয়, সেই বন্যায়, তোমার নাম গাহিয়া ভাসিয়া চলিয়াছি। নানক কহিতেছেন, হরি আমার সকল বন্ধন কাটিয়া দিয়াছেন। একদিন যে ছিল সুদূরে তাহাকে আজ তাঁহার নিকটে, অতি নিকটে টানিয়া আনিয়াছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি: "বাদুলে পোকা একবার যদি আলোর সন্ধান পায় তো সে আর অন্ধকারে যায় না। ভগবদানন্দের আস্বাদ পেলে বিষয়ানন্দ তুচ্ছ হয়ে যায়।"

যুগ যুগ ধরিয়া শাস্ত্র ও সত্যদ্রষ্টা সন্তগণ আমাদিগকে আনন্দের বার্তা শুনাইয়া আসিতেছেন এবং ঐ আনন্দকে লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। মূর্খ আমরা আমাদের আত্মম্ভরিতার জন্য তাঁহাদিগের কথায় কান দিই না, ভাবি উহা তাঁহাদের কবি-কল্পনা। আমরা নিজদের মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া ভিক্ষাপাত্র হাতে বাহিরের শত সহস্র দরজায় সুখ খুঁজিয়া বেড়াই। কত আঘাত, কত অপমান, কত লাঞ্ছনা ভোগ করি, তথাপি আমাদের চৈতন্য হয় না।

যিনি ধীমান তাঁহার দৃষ্টি আলাদা। তিনি বাহির হইতে চোখ ভিতরে নিক্ষেপ করেন। অন্তরের অন্তরে সকল আনন্দের খনি, প্রাণের

প্রাণ, আত্মার আত্মা শ্রীভগবানকে দেখিবার চেষ্টা করেন। প্রথমে উহা কল্পনা। কিন্তু বিশ্বাস, ভালবাসা ও ধৈর্য সহকারে সাধনে লাগিয়া থাকিলে ধীরে ধীরে কল্পনা বাস্তব হইয়া উঠে। ভগবানকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। আনন্দের পূর্ণ ঘট হৃদয়ে স্থাপিত হয়। সেই ঘট হইতে আনন্দ-কণা দিকে দিকে সিঞ্চিত হয়। আকাশ হয় মধুময়, বাতাস হয় মধুময়, জল স্থল হয় মধুময়। জীব জন্তু কীট পতঙ্গ সকলের মধ্যে সেই আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। সকল মানুষের মধ্যে সেই আনন্দকে আবিষ্কার করিয়া সকলের প্রতি আমরা মৈত্রী প্রসারিত করি। এই পৃথিবীতে স্বর্গ নামিয়া আসে। সহস্র বন্ধনের মধ্যে মুক্তি উদ্ভাসিত হয়।

বুদ্ধের বাণী

শ্রীকালিদাস রায়

তোমার অশোক অভয় বাণীটি
আবার ভুবন চাহিবে কবে?
ধনতন্ত্রের রণতন্ত্রের
শাসনে দলিত হবে সে যবে
দৈহিকতার ঐহিকতার
জ্বালায় জ্বলিবে বিশ্বজন,
তব বাণী ছাড়া নির্বাণগুরু
কিসে হবে জ্বালা নির্বাপণ?

রমাঁ রলাঁর দৃষ্টিতে গান্ধী ও বিবেকানন্দ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী থোরো (Henry D. Thoreau) তাঁর বিখ্যাত Walden গ্রন্থে লিখেছেন: "I know of no more encouraging fact than the unquestionable ability of man to elevate his life by a conscious effort."—"একটা জাগ্রত মন নিয়ে সাধনা করলে মানুষ নিঃসংশয়ে তার জীবনকে উন্নত করতে পারে, এর চেয়ে বড়ো আশাপ্রদ সত্য আমার জানা নেই!" গান্ধীজীর দুইখণ্ড জীবনস্মৃতি পড়তে পড়তে থোরোর কথা আমার মনে হয়েছে। মানুষ অতন্দ্র সাধনার দ্বারা সমস্ত দুর্বলতাকে অতিক্রম ক'রে নিজেকে একটা নূতনতর মানুষে রূপান্তরিত করতে পারে,—গান্ধীজীর আত্মজীবনী পড়লে এই সত্যকে স্বীকার ক'রে নিতে আমাদের মনে আর কোন কুণ্ঠা থাকে না।

জীবনস্মৃতির প্রথম খণ্ডের গোড়ার দিকেই আছে: And I was a coward. I used to be haunted by fear of thieves, ghosts and serpents.—"আমি ছিলাম ভীরু প্রকৃতির। চোরের, ভূতের আর সাপের ভয় আমার মনকে ঘিরে থাকতো।" এই ভীরু বালকই তো পরবর্তী জীবনে চিরাচরিত সামাজিক বিধি নিষেধ অবজ্ঞা করেছেন, অনমনীয় সাহসের সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্পর্ধিত ভ্রূকুটির সম্মুখীন হয়েছেন। একই সঙ্গে কত ফ্রণ্টেই না তিনি সংগ্রাম ক'রে গিয়েছেন! রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা দোর্দণ্ডপ্রতাপ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই তো লেগেই ছিলো! অর্থনীতির ক্ষেত্রেও সেই লড়াই কিছুমাত্র সহজ ছিল না। সমাজজীবনেও বদ্ধমূল কুসংস্কারগুলির মূলোচ্ছেদের ব্যাপারে তাঁকে বাধার পর বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রেও গান্ধীজীকে পৌরোহিত্যের শাসনের বিরুদ্ধে ঘোষণা করতে হয়েছে বিদ্রোহ। গান্ধীজীর একজন বিদেশী ভক্ত তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন: Never did a man fight so long, and continuously on so many issues.—এতগুলি সমস্যা নিয়ে এত দীর্ঘকাল ধরে এবং এমন নিরবচ্ছিন্নভাবে আর কোন মানুষ সংগ্রাম করেনি।

জীবনস্মৃতিতে অকুণ্ঠভাষায় গান্ধীজী পূর্বজীবনে চরিত্রের আরও দুর্বলতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই সব দুর্বলতার কাহিনী পাঠ ক'রে পাঠকপাঠিকাদের মনে স্বতই প্রশ্ন জাগে: কোন্ শক্তিতে ভয়-ক্রোধ-আসক্তিকে জয় করেছিলেন তিনি? কেমন ক'রে তিনি আপনাকে এমন একজন অনাসক্ত মহামানবে রূপান্তরিত করলেন? বেশীর ভাগ মানুষ নিজেকে নূতনতর মানুষে রূপান্তরিত করতে পারে না কেন? অপেরাজেয় শক্তি-অর্জনের রহস্য কোথায়?

এই কঠিন প্রশ্নের একটা সদুত্তর পেয়েছি দার্শনিক উইলিয়াম জেমসের The Will প্রবন্ধে। আমরা জীবনে কর্মকীর্তিহীন স্বপ্নবিলাসী আদর্শ হয়ে থাকবো, না সত্যানুরাগ প্রেম এবং মহাবীর্যের দ্বারা মনুষ্যত্বের মহিমায় দীপ্তিমান হয়ে উঠবো—এটা নির্ভর করছে আমাদের

চেষ্টার উপরে। যার উদ্যমের পুঁজি বলতে কিছুই নেই, সে একটা ছায়া ভিন্ন আর কি? যে মানুষ বড়ো হবার জন্য সাধনা করতে পারে, উদ্যম যার অফুরন্ত তাকেই আমরা বলি বীর। থোরো বলেছেন, conscious effort-এর দ্বারা মানুষ জীবনকে রূপান্তরিত করতে পারে। জেমসও এই effortকে, উদ্যমকে, সাধনাকে মূল্য দিয়ে বলেছেন: He who can make none is but a shadow; he who can make much is a hero.

আমাদের জড়তা, তামসিকতা, আলস্য, অবসাদ কি বীরের মহৎ জীবন যাপনের পথে প্রবলতম অন্তরায়? কেমন ক'রে আহরণ করা যায় সেই দুর্বার প্রাণশক্তি যার প্লাবনে সমস্ত জড়তা কোথায় বিলীন হয়ে যায়? টমাস কেম্পিসের Imitation of Christ-এ জড়তাকে কাটিয়ে উঠবার উপায়ের কথা আছে। তিনি বলেছেন, লোহাকে আগুনে রাখলে তার মরচে থাকে না। ঈশ্বরচিন্তার মধ্যে মনকে সবসময়ে ডুবিয়ে রাখলে সমস্ত জড়তা চলে যায়। তবে কি মন নিয়েই সব? জেমস বলছেন: The whole drama is a mental drama. The whole difficulty is a mental difficulty, the difficulty of keeping an object of thought in mind.—"সমস্ত নাট্যলীলার রঙ্গমঞ্চ তো আমাদের মনোভূমি। যত মুস্কিল সে তো আমাদের অবাধ্য মনটাকে নিয়ে। আমাদের মনে ধ্যেয়বস্তুকে আমরা যে অবিচলিত রাখতে পারিনে।" জেমস বলছেন, মনের মধ্যে একটা বড়ো আদর্শের দীপশিখাকে অনির্বাণ রাখিতে পারলে, চেতনার ভূমিতে ধ্যানের বিষয়টিকে নিয়ত জাগিয়ে রাখবার সামর্থ্য অর্জন করলে সাধনার পথে অবিচলিত থাকবার উদ্যমের কখনো অভাব হবে না।

ঠাকুর রামকৃষ্ণও কি মন-করীকে বশে রাখবার কথাই বারবার বললেন না? কত বিচিত্র উপমার সাহায্যেই না ঠাকুর বলেছেন মনটাকে নিশিদিন তাঁতে লাগিয়ে রাখার কথা! গীতারও শেষ কথা তো 'মন্মনা ভব'। অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় মন আমাতে সংলগ্ন থাকুক। সাধনার রাজ্যের শেষ কথা তো অনুক্ষণ ভাবনার দ্বারা ভজনা। এই ভজনা থেকেই তো শক্তি, 'ওঁ অব্যাবৃত-ভজনাৎ' আর ভক্তিতেই ভগবান-লাভ।

এত দুর্বলতা নিয়ে যিনি জন্মেছিলেন, তিনি যে শেষ পর্যন্ত এমন একটা দীপ্ত মুক্ত মহাজীবনের অধিকারী হতে পেরেছিলেন—তার রহস্যদ্বার বোধ হয় আমরা উদ্ঘাটিত করতে পেরেছি। মানসিক জড়তা বলে তাঁর মধ্যে কিছু ছিল না। দিব্যজীবন লাভের জন্য তাঁর সাধনা ছিল অতন্দ্র। প্রাণোদ্যমের এই প্রাচুর্য তিনি আহরণ করতেন কোথা থেকে? ঈশ্বরের চিন্তার মধ্যে মনকে সারাক্ষণ ডুবিয়ে রাখতেন তিনি। মনকে ক্ষণকালের জন্যও সত্য-নারায়ণের কাছ-ছাড়া করতেন না। চিত্তকে তন্দ্রায় কখনো আচ্ছন্ন হতে দিতেন না। সদাজাগ্রত সেই চিত্তের একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস ছিল সত্যনারায়ণকে মুখোমুখি দেখবো বলে! একটা উচ্চভাবরাজ্যে জাগ্রত মনের এই যে সতত বিহার—এর জন্য প্রচুর সাধনা দরকার। সত্যের প্রতি গান্ধীজীর অনুরাগ ছিল অপরিমেয়। তিনি বলতেন, সত্য ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর নেই। জ্যোতির জ্যোতি এই সত্যের যে-দীপ্তি আভাসে কচিৎ কখনো দেখেছিলেন তিনি তার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন জীবন-স্মৃতির শেষ অধ্যায়ে, 'চর্মচক্ষে যে সূর্যকে আমরা প্রত্যক্ষ করি তার তুলনায় কোটি কোটি গুণ জ্যোতির্ময় এই সত্য।' আভাসে সত্যকে যেটুকু দেখেছিলেন

সেটুকুই তাঁকে ঈশ্বরদর্শনের জন্য পাগল করবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আর টমাস কেম্পিসের সেই কথা: "লোহাকে আগুনের মধ্যে রাখলে মরচে তার চলে গিয়ে সে রক্তবর্ণ হয়ে যায়। তেমনি ঈশ্বরের দিকে সর্বদা মুখ ফিরিয়ে থাকলে আমরা জড়তা কাটিয়ে উঠে নূতন মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যাই।" গান্ধীজীর মুখ যে সর্বদা ঈশ্বরের দিকে ফেরানো ছিল। তাঁর মনটি যে ঈশ্বরচিন্তায় ডুবে থাকতো। গড়সের গুলিতে সহসা যখন মৃত্যুর সামনে এসে দাঁড়ালেন তখনও কণ্ঠে রামনাম ধ্বনিত হোলো। 'হে রাম' বলেই দেহ রাখলেন। ঈশ্বরের দিকে যিনি সদাসর্বদা মুখটি ফিরিয়ে থাকেন, একটা দিব্যভাবরাজ্যে মন যাঁর চিরজাগ্রত, সেই জাগ্রত উদ্যত মানুষের জন্যই তো বীরের মহিমময় জীবন!

একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে উঁকি মারে: যিনি ঈশ্বরদর্শনের জন্য এমন ব্যাকুল ছিলেন তিনি বিচিত্রকর্মজালে নিজেকে এমন করে জড়ালেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাবো তাঁর নিজের উক্তির মধ্যে। জীবনস্মৃতির 'বিদায়' অধ্যায়ে বলেছেন: To see the universal and all-pervading Spirit of Truth face to face one must be able to love the meanest of creation as oneself. "সার্বভৌম এবং সর্বব্যাপী সত্যনারায়ণকে মুখোমুখি দেখতে হলে সৃষ্টির অধমতম জীবটিকেও আত্মবৎ ভালোবাসতে পারা চাই।" সত্যদর্শনের ব্যাকুলতায় গান্ধীজী সর্বজীবকে আত্মবৎ ভালোবাসার সাধনায় ব্রতী হলেন। ভালোবাসার প্রকাশ তো রসনায় নয়, বচনে নয়,—কর্মে, আত্মত্যাগে। ভারতবর্ষের সর্বহারাদের প্রতি অপরিসীম প্রেমে, দুর্ভাগা স্বদেশের জনসাধারণের দুঃখমোচনকল্পে গান্ধীজী কর্মসাগরে ঝাঁপ দিলেন। সাম্প্রদায়িক ঐক্য, অস্পৃশ্যতা-নিবারণ, মাদকদ্রব্যবর্জন, পর্দাপ্রথার উচ্ছেদ, খাদি—তাঁর সমস্ত রচনাত্মক কর্মধারার উৎস জনসাধারণের প্রতি সুগভীর ভালোবাসা। প্রেমের আদর্শকে স্বীকার ক'রে নিলে রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে দূরে থাকা মুস্কিল হয়ে পড়ে। রাজনীতি সাপের মতোই পাকে পাকে জাতির জীবনকে ছিলো জড়িয়ে। বৃটিশ-শাসনের নাগপাশকে ছিন্ন না করে জাতির অনাহারক্লিষ্ট অর্ধনগ্ন কোটি কোটি নরনারীর কল্যাণসাধনের আর কোন রাস্তা খোলা ছিলো না। সত্যের প্রতি দুর্বার অনুরাগে গান্ধীজী রাজনীতির ক্ষেত্রে এসে পড়লেন। গান্ধীজী জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন: My devotion to Truth has drawn me into the field of politics. আরও লিখেছেন, যাঁরা বলেন ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগ নেই তাঁরা জানেন না ধর্ম বলতে কি বোঝায়।

রমাঁ রলাঁ বিবেকানন্দের জীবনীতে লিখেছেন, "প্রত্যেক মানব-যুগেরই এমন একটা বিশেষ ব্রত আছে যা একান্তভাবে সেই যুগের নিজস্ব। আমার ব্রত হচ্ছে বা হওয়া উচিত জনসাধারণকে উন্নত করে তোলা।" ভারতবর্ষে এই যুগব্রতপালনের কাজে দু'জন এগিয়ে এসেছিলেন প্রবল সত্যানুরাগ, বিপুল প্রেম এবং মহাবীর্য নিয়ে। একজন বিবেকানন্দ, আর একজন গান্ধী। আরও অনেকে এগিয়ে এসেছেন, কিন্তু এই দুই জনের সঙ্গে বোধ করি কারও তুলনা হয় না। একজন নিদ্রিত ভারতবর্ষের কানে মেঘমন্দ্রস্বরে উচ্চারণ করলেন, দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব। দরিদ্রেরা, মূর্খেরা তোমাদের দেবতা হোন। আর একজন সেই সুরেই ভারতবর্ষের কানে যুগ-প্রার্থনার মন্ত্র দিলেন: "Lord, give us the ability and willingness to identify ourselves with the masses,"—

"প্রভু, আমাদিগকে শক্তি দাও এবং ব্যাকুলতা দাও যেন জনসাধারণকে আমরা আত্মবৎ ভালোবাসতে পারি।" বিবেকানন্দ এবং গান্ধী দু'জনেই মূলতঃ ধর্মভাবাপন্ন। দু'জনেই ঈশ্বর-ভক্ত এবং ঈশ্বরের জন্য পাগল। ঈশ্বরলাভের পর পরিব্রাজক বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের কঙ্কাল-সার চেহারা স্বচক্ষে দেখলেন। কুমারিকা অন্তরীপে জনসাধারণের সেবায় জীবনকে নিবেদন করবার সংকল্প গ্রহণ করলেন। শিব-জ্ঞানে জীবের সেবায় নতুন ভারতবর্ষকে দীক্ষিত করবার গৌরব বিবেকানন্দেরই। গান্ধীজীও সত্যনারায়ণকে খুঁজতে গিয়ে দেখলেন এই 'জীবে প্রেম' ছাড়া সত্যকে মুখোমুখি দেখা সম্ভব নয়। লক্ষ্য সত্য; উপায় অহিংসা।

সেবার রাস্তায় এসে গান্ধীজী রাজনীতির ক্ষেত্রে এলেন; রাজনীতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারলেন না। বিবেকানন্দ রাজনীতির মধ্যে আসেননি। তবুও উভয়ের মধ্যে অনৈক্যের চেয়ে ঐক্যের দিকটাই গভীরতর সত্য। জনসাধারণের দিগন্তপ্রসারী দুঃখ দু'জনেরই মনে গভীর রেখাপাত করেছিলো এবং তাদের দুঃখমোচনকে উভয়েই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। উভয়ের সম্পর্ক: গান্ধী বিবেকানন্দেরই পতাকাবাহী। গান্ধী বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। রমাঁ রলাঁর মতে বিবেকানন্দ যে-মশাল প্রজ্বলিত করলেন সেই মশালই বহন ক'রে চলে-ছিলেন গান্ধীজী। আমরা কখনোই ভুলে যাবো না, এই যুগ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর যুগ। রলাঁ বলেছেন, এই যুগের হৃদয়ে অণু-পরমাণুতে অনু-স্যূত হয়ে আছে রামকৃষ্ণের ভাবধারা: শিব-বুদ্ধিতে জীব-সেবা। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণেরই ভাবধারার বাহক। তাঁর আবির্ভাব গুরুদেবের ভাবধারাকে কার্যে পরিণত করবার জন্যই। শ্রীঅরবিন্দে, রবীন্দ্রনাথে, গান্ধীতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তাধারারই নব নব ভঙ্গীতে অভিব্যক্তি।

"যাহা আমাদের নাই, বোধহয় পূর্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের (গ্রীকগণের) ছিল, যাহার প্রাণ-স্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই—সর্বদা-পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"

"ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্যজগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণ-প্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।" —স্বামী বিবেকানন্দ

["উদ্বোধনের প্রস্তাবনা"—'উদ্বোধন', ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা]

চেরাপুঞ্জির চিঠি

স্বামী নিরাময়ানন্দ

প্রায় তিন বছর হ'তে চলল এখানে এসেছি, 'উদ্বোধনের' পাঠক-পাঠিকারা ভুললেও, সম্পাদক মহারাজ আমাকে ভোলেননি, প্রায়ই একটি লেখার জন্য তাগিদ দেন। এখন লেখার মধ্যে রিপোর্ট বাজেট প্রভৃতি, সে সব তো উদ্বোধনের পাতায় চলবে না—যা চলতে পারত, তা হ'ল 'পার্বত্য উপজাতি-প্রসঙ্গ' অথবা 'ভারতের পূর্বপ্রান্তের সমস্যা'। কিন্তু আমি তো বিদেশী টুরিষ্ট নই যে, সাত দিনের মধ্যে একটা দেশ পরিক্রমা ক'রে একটা সাত খণ্ডের বই লিখে ফেলব, যা হবে বছরের 'বেস্ট সেলার' এবং একটি অসামান্য 'প্রামাণ্য' গ্রন্থ। অতএব চিঠিলেখার পদ্ধতিই গ্রহণ করতে হ'ল—এটিকে 'নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র' মনে করলেই সবচেয়ে ভাল হবে। সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দেবার দুরাকাঙ্ক্ষা এতে নেই, এতে পাওয়া যাবে এখানকার এমন কিছু, যা সাক্ষাৎ-ভাবে আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে এসেছে। সরেজমিনে অভিজ্ঞতা (Experience of field-worker) থেকে সামান্য কিছু লেখার ভবিষ্যৎ মূল্য অনেক বেশী—এই ধারণা থেকেই এ চিঠি লিখছি সম্পাদককে, লক্ষ্য পাঠক-পাঠিকা।

বর্তমানে ভারতের পূর্বপ্রান্তের বিশেষতঃ এ অঞ্চলের পার্বত্যজাতিদের সমস্যা ভারতীয় নেতাদের মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে বা ধরিয়ে দিচ্ছে (headache)। এর মধ্যে জড়িয়ে আছে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, নিজ নিজ ভাষাপ্রীতি, আঞ্চলিক জাতীয়তা—এর মধ্যে ছড়িয়ে আছে বিদেশী মিশনরীদের প্রচার ও কৌশল—প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির উস্কানি। সর্বোপরি আছে আমাদের অদূরদর্শিতা। রাজনীতির গভীর জলে গড়িয়ে পড়া প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমরা সমুদ্রের বালুকাবেলায় দাঁড়িয়ে ঝিনুক নিয়ে খেলেই সন্তুষ্ট হতে চাই, 'জানি না মোরা সাঁতার দেওয়া, জানি না জাল ফেলা'।

তবে যেহেতু আমরা খাসিয়া পাহাড়ে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করছি—সাক্ষাৎভাবে আমাদের অভিজ্ঞতায় এসেছে এমন-কিছু ধর্মীয় প্রসঙ্গ আলোচনা করব, এবং কোন মন্তব্য ছাড়াই। ঘটনাগুলি যেমন পর পর ঘটেছে সেই ভাবেই লিপিবদ্ধ করব, শেষে বলব—খাসিদের নিজস্ব ধর্মের কথা—তাদের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতে কি করণীয়।

আমাদের এই শিক্ষাপ্রচেষ্টা বাইরে থেকে কেউ ঠিক ধারণা করতে পারে না, বুঝতেও পারে না। হঠাৎ এসে দেখে মনে করে এখানে একটি উচ্চ বিদ্যালয় চলছে—তার সঙ্গে সংলগ্ন আছে একটি ছাত্রাবাস, কিন্তু দেখার চেয়ে এখানে অদেখাটাই বেশি—যথা চেরাপুঞ্জির কুড়ি মাইল উত্তর থেকে কুড়ি মাইল দক্ষিণ পর্যন্ত ছড়িয়ে প্রায় ৪০টি ছোট বড় বিদ্যালয়—তার মধ্যে ২৮টি প্রাথমিক, ১২টি মাধ্যমিক একটি আবার আবাসিকও আছে। যাঁরা এখানে আসেন তাঁদের আমরা মানচিত্রে ও ছবির এলবামে সেগুলি দেখিয়ে দিই।

যাক—এখন ফিরে আসি চেরাপুঞ্জি ছাত্রাবাসে—এখানে প্রায় ১০০টি ছেলে থাকে—অধিকাংশই খাসি এবং খ্রীষ্টান। বিদ্যালয়গুলির

শিক্ষক-শিক্ষিকারাও তাই। ছাত্রাবাসে আমাদের দুটি প্রার্থনাগৃহ আছে। একটি ছোট—আমাদের ও যারা স্বেচ্ছায় আসে তাদের জন্য; সেখানে সন্ধ্যায় মঠ-মিশনের প্রচলিত আরতি ভজন হয়। বড় হলটি ছাত্রদের; সকালে খাসি ভাষায় ভজন (স্বামী চণ্ডিকানন্দ-রচিত—Jingrwai Kyrsiew) হয়; দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সহিত বুদ্ধ ও যীশুর ছবি আছে, যাতে ছাত্রেরা সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে শেখে।

আমরা যতই বলি ও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রচার করি যে 'সব ধর্ম সত্য', মনে হয় সকলের অবচেতন মনের বিশ্বাস, 'আমার ধর্মই সত্য'; অনেকে প্রশ্নও ক'রে থাকেন, 'হিন্দুধর্ম সত্য হলে ইসলাম কি ক'রে সত্য হয়?' অথবা 'একেশ্বরবাদী পৌত্তলিকতা-বিরোধী ইসলাম সত্য হলে বহুঈশ্বরবাদী পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম কি ক'রে সত্য হয়?'—হিন্দু যতই দার্শনিক যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করুক সে পৌত্তলিক নয়, সে বেদান্তবাদী—দুনিয়ার লোক জানে হিন্দুরা প্রতিমাপূজার নামে পুতুলপূজাই করে। যাক এখানকার সমস্যাটি হিন্দু-মুসলমান নয়—হিন্দু-খৃষ্টানও নয়! কারণ খাসিরা হিন্দু নয়, হিন্দুধর্মের সহিত কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও তারা নিজেদের হিন্দু বলে না, হিন্দু দেবদেবী. হিন্দুশাস্ত্র, তীর্থ, হিন্দু রীতিনীতি কিছুই তারা জানে না। এই সুযোগেই গত এক শতাব্দী ধরে বিদেশী মিশনরীরা বৃটিশ সরকারের সাহায্যে নামমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে এই সব অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রকার খৃষ্টধর্ম প্রচার করেছে। ফলে আজ খাসিরা শুধু 'খাসি' নয়, তারা খৃষ্টান, অখৃষ্টান,—তারা ক্যাথলিক, প্রোটেস্টাণ্ট; আরও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত! সকলের মধ্যে সাধারণ একমাত্র খাসি ভাষা, কিছু কিছু খাসি রীতি-নীতি, উৎসব-আনন্দ।

এখন আমাদের ছাত্রাবাসে যে ছাত্রেরা থাকে তাদের ধর্মকর্ম কে দেখাশুনা করবে? আমাদের 'সেকুলার' রাষ্ট্র, আমরা তো পারি না—সব পিতামাতাও এ বিষয়ে উৎসাহী নন। তাছাড়া তাঁরা আমাদের কাছে ছেলে দিয়েছেন, লেখাপড়ার জন্যে—ধর্মশিক্ষার জন্যে ততটা নয়। এখন মাথাব্যথা হ'ল 'চার্চের'—বিভিন্ন চার্চ আছে, তাঁরা চান—আমাদের ছেলেরা রবিবার 'চার্চে' যাবে, ধর্ম শিক্ষা করবে। কেউ কেউ যায় —আমরা বাধা দিই না। কিছু গণ্ডগোল হলে অভিভাবককে বলে তাদের যাওয়া বন্ধ ক'রে দিই।

একদিন দুজন ছাত্রপ্রচারক এসে হাজির—এরা প্রচারক শিক্ষণ কেন্দ্রের (Theological College) ছাত্র—এরা দুটি ছাত্রকে তাদের মাতৃভাষায় বাইবেল শেখাবে। জিগ্যেস করলাম, 'কত ক'রে পাবে?' একজন উত্তর দিল, 'দশটাকা।' তাকে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি ঈশ্বরের সেবা করবে, না ম্যামনের (অর্থদেবতার) সেবা করবে?' সে বুঝতে পারল না—অপরজন বুঝতে পেরে হাসছে—ও বন্ধুকে বুঝিয়ে দিল। তার পর বললাম, 'তুমি যা বাইবেল বোঝাবে—তার থেকে ভাল ক'রে আমি বুঝিয়ে দেবো। অতএব কষ্ট ক'রে তোমাকে আসতে হবে না। আমি চার বছর খৃষ্টান কলেজে পড়েছি।' তাতে তারা সন্তুষ্ট হ'ল না—বলছে, 'আপনি তো খৃষ্টান নন—কি ক'রে খৃষ্টধর্ম শেখাবেন?' আমিও বললাম—'তুমিই বা কোন্ খৃষ্টধর্ম শেখাবে বল? ক্যাথলিক না প্রোটেস্টাণ্ট?' সে বলল, 'প্রোটেস্টাণ্ট।' আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'যীশুখৃষ্ট প্রোটেস্টাণ্ট ছিলেন, না রোমান ক্যাথলিক?' প্রশ্নটি শুনে দুজনেই ঘাবড়ে গেল। আমিও দেখলাম ওষুধ ধরেছে। বললাম, 'তোমরা এর উত্তর দিতে পারবে না।

জানি—তোমাদের শিক্ষকের কাছ থেকে এর উত্তর জেনে আর একদিন এসো।' তারা আর আসেনি।

এবার তিনটি 'ক্যাথলিক নান্'-এর কথা বলি। এখানে ক্যাথলিকরা মেয়েদের একটি ছাত্রাবাস চালান। তাঁদের মেয়েরা প্রাইভেট ছাত্রীরূপে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয় আমাদের হাই স্কুলের মাধ্যমে. এই সূত্রে ডিসেম্বরের শেষভাগে একদিন দুজন কেরলীয় নান্ এসেছেন। সেদিন আমাদের নিজস্ব প্রার্থনাগৃহে যীশুর জন্মোৎসবের আয়োজন হচ্ছে দেখে তাঁরা খুশী, আমরাও সুবিধা পেয়ে বললাম—'যদি আমাদের যীশুর একটি ভাল ছবি ও আপনাদের একখানি বাইবেল পাঠিয়ে দেন—খুব ভাল হয়।' তাঁরা যথাসময়ে পাঠিয়ে দিলেন ছবি, ক্যাথলিক বাইবেল ও কিছু কেক। কয়েকটি মোমবাতি জ্বালিয়ে—ঐগুলির সাহায্যে আমরা খৃষ্ট-জন্মোৎসব পালন করলাম। নিবেদিত কেক গ্রহণ করলাম ও ছেলেদের দিলাম এদিন অনেক খৃষ্টান ছেলেও আমাদের উপাসনাগৃহে ছিল। 'নান্'রা কয়েকদিন পরে বাইবেলখানি চেয়ে নিয়ে গেলেন—ছবিখানি আমাদের রয়ে গেল।

এ ঘটনা এখানেই শেষ হলে ভালই হ'ত। কিন্তু তা হল না। কয়েকদিন পরে আর এক বৃদ্ধা 'নান্' এলেন। ইনি নিউজীল্যাণ্ডের লোক, বৃদ্ধা বলেই বোধহয় খুব আলাপী; ভারতের কথা শুনেছেন ছেলেবেলা থেকে, এখানে নানাধর্ম আছে তাও শুনেছেন। পরধর্মসহিষ্ণুতার কথাও শুনেছেন, কিন্তু বোঝেন-নি, এখন চাক্ষুষ দেখে খুবই আশ্চর্য হচ্ছেন—আমাদের উপাসনাগৃহে যীশুর ছবি দেখে বললেন, 'আপনারা খৃষ্টান নন, তবে কিভাবে ও কেন আপনাদের উপাসনাগৃহে খৃষ্টের নামে বাতি জ্বালালেন, বাইবেল পড়লেন—আর কেক নিবেদন করলেন? আর এক কথা, ঐ কেক আপনারা খেলেন কি ক'রে?—ওতে তো খারাপ কিছু মেশানো থাকতে পারত।' আমি হো হো ক'রে হেসে উঠলাম—বললাম, 'তা হলে কি হত? আমরা যীশুর প্রসাদ খেয়ে স্বর্গে যেতাম আর যারা ও-সব মিশিয়েছে তারা কোথায় যায়—স্বর্গ থেকে দেখতাম।' মহিলা আমার হাসির কারণ ঠিক বুঝলেন কিনা তা আমিও বুঝতে পারলাম না। তিনি চিন্তিত ভাবে—একটু মাতৃভাবেও—আদেশের সুরে বললেন, 'না, ও রকম খাবেন না ভবিষ্যতে।' আমরা যখন চা খাবার কথা বললাম তখন তিনিও 'না' বললেন। আমরা আর পীড়াপীড়ি করলাম না। যাবার সময় বার বার বলতে লাগলেন, 'ভারতবর্ষ সত্যিই ধর্মের দেশ, সকল ধর্মের দেশ, সকল ধর্মের বীজই এখানে বেশ ফলে ওঠে। এদেশে অন্য ধর্মের প্রতিও যে রকম শ্রদ্ধা, তা আমরা কল্পনা করতে পারিনা। ভারতবর্ষে না আসলে আমি এ জিনিস ধারণাই করতে পারতাম না, আমাদের ধারণা—একদেশে একটিই ধর্ম থাকবে; অন্য ধর্মকে ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে হবে। এ এক অপূর্ব জিনিস দেখে গেলাম—অপরের ধর্মকে শ্রদ্ধা করা।' বৃদ্ধা তখন কতকটা আপন মনেই কথা বলে চলেছেন। আমরা তাঁকে ধীরে ধীরে গেটের দিকে আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

ক্যাথলিক মিশনের ফাদার পিটার আমাদের খুব বন্ধুলোক। দু-একবার শিলং-এ টেলিফোন করতে এসে আমাদের সঙ্গে দু-এক ঘণ্টা কাটিয়ে গেছেন। নিজের পুরাতন কথা কিছু বলেছেন—ইটালির লোক, এখানে আসার আগেই দারজিলিংএ খাসি ভাষা শিখে এসেছেন। ক্যাথলিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক তিনি—আমরা গেলে যত্ন ক'রে স্কুল, লাইব্রেরি, চ্যাপেল, হোস্টেল সব

দেখিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতেই কথা বলেন। খ্রীষ্টম্যাস উপলক্ষে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন, আমরা গেছি। আর এক বৃদ্ধ ইটালিয়ান ফাদার অনর্গল খাসি ভাষায় 'সুসমাচার' প্রচার ক'রে চলেছেন—খাসিরা খুব উল্লসিত, সাদা চামড়ার লোক আমাদের ভাষায় কথা বলছে! যেহেতু শ্বেত চর্ম, অতএব স্বর্গীয়, অতএব গ্রাহ্য। কিন্তু বাইরে এসে আর এক দৃশ্য দেখে আমরা অবাক্, তার থেকে বেশী অবাক্ খাসিরা! ছ-সাত জন সাদা চামড়ার লোক, ঠিক সাদা নয়, লালচে-সাদা আর চুলগুলি সোনালি—এরাও নিশ্চয়ই স্বর্গীয়, তবে কেন চার্চে ঢুকছে না? আবার বাইরে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছে? কেন? এরা কারা? এরা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি চালু করার জন্য আগত ইঞ্জিনিয়ার—যুগোস্লাভিয়ার মানুষ! হ্যাঁ, ইওরোপেরই মানুষ, খৃষ্টান নয়—কম্যুনিষ্ট! সে কি আর একটা ধর্ম? না—এরা ধর্ম ঈশ্বর এ সব মানে না, মনে করে ধর্ম-বিশ্বাস আফিমের মৌতাতের মতো মানুষকে ঝিমিয়ে রেখে দেয়! সেদিন এই পর্যন্ত।

কয়েকদিন পরে ফোন বেজে উঠল, সিমেণ্ট ফ্যাক্টরির ইঞ্জিনিয়র মিঃ ভট্টাচার্যের কণ্ঠ, 'মহারাজ?' 'হ্যাঁ, কি ব্যাপার?' 'আপনার একদিন একটু সময় হবে?' 'কিসের?' 'এই এখানকার যুগোস্লাভিয়ার সাহেবরা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানতে চায়। আমাকে বলছিল—আমি বলেছি, আচ্ছা ব্যবস্থা ক'রে দেবো। প্রথমে কথা ছিল ওদের ক্লাবে—শেষে ওরাই বলল ক্লাবে নয়, আমরাই যাব আশ্রমে স্বামীজীদের কাছে!'

যথাসময়ে তাঁরা এলেন পাঁচ কি ছজন—দুজন খুবই উৎসাহী—একজনের বয়স পঞ্চাশের কাছে। অপর জন তিরিশের ওপর। এঁরাই প্রশ্ন করবেন—ইংরেজী উচ্চারণ খুব আধো-আধো। সামান্য চা-পর্বের পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঠিক কি শুনতে চান আপনারা?' প্রবীণ জন বললেন, 'Historical and philosophical background of Hinduism (হিন্দু-ধর্মের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক পটভূমিকা)। বাধ্য হয়ে বেদ-উপনিষদ দিয়ে শুরু ক'রে রামায়ণ-মহাভারত ছুঁয়ে শঙ্কর ও স্বামীজী দিয়ে শেষ করলাম—ঘণ্টাখানেক লাগল। এইসব প্রসঙ্গে 'অবতার' 'জন্মান্তর' কথা-দুটি একাধিক বার উচ্চারিত হয়। প্রবীণ ও নবীন দুজনেই বলে উঠলেন—'এদুটি কথা আরও বুঝিয়ে বলা দরকার।' তার জন্য তাঁরা আর একদিন আসতে রাজী হলেন।—এসেছিলেন এবং খুব নিবিষ্ট মনে ছাত্রের মতো শুনেছিলেন এবং কতকগুলি সূক্ষ্ম প্রশ্নও করেছিলেন। বুঝলাম—অনীশ্বর কম্যুনিস্ট জগতে হিন্দু-চিন্তাধারা কোন্ পথে প্রবেশ করতে পারে।

এবার এমন একজনের কথা বলব—খাসিয়া পাহাড়ে তাঁর মতো লোকের সঙ্গে দেখা হওয়া অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত।

একদিন রবিবার দুপুরে—কয়েকজন শিলং থেকে আগত ভদ্রলোককে (visitor) নিয়ে ব্যস্ত আছি—আমাদের খাবার ঘণ্টা পড়-পড়—এমন সময় কাঁচের জানালা দিয়ে দেখছি পাগড়ি-মাথায় একজন লোক আসছেন, পিঠে একটা ঝোলা। প্রথমটা একটু পাগলা বলেই মনে হল—ঘরে ঢুকতেই জিগ্যেস করলাম, 'কাকে চান?' তিনি পরিষ্কার ইংরেজীতেই বললেন, 'এখানকার স্বামীজীর সঙ্গে কথা বলতে চাই, আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে ধর্ম সম্বন্ধে।' ব্যাপারটা গুরুতর বুঝে তাঁকে প্রশ্ন করলাম—'আপনি কতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবেন?' 'যতক্ষণ প্রয়োজন।' 'আপনার কিছু খাওয়া

হয়েছে ? কিছু খাবেন এখানে ? আমরা এখন খেতে যাচ্ছি।' তাঁকে এক পেয়ালা দুধ-মধু ও দুটি কলা পাঠিয়ে দিয়ে আমরা খেতে গেলাম। খাওয়ার পর ফিরে এসে দেখি, তিনি ঝোলা থেকে ৪।৫ খানি বই বার করেছেন —বাইবেল, কোরান, প্রভবানন্দ ও ইশার উড-কৃত উপনিষদের অনুবাদ এবং Thus Spake Vivekananda—এই বইগুলি নাড়ছেন।

শিলং-এর ভদ্রলোকদের ভার অপরের ওপর দিয়ে আমি এঁকে নিয়ে বসলাম—জিগ্যেস করলাম—'কি আপনার প্রশ্ন ?' তিনি বেশ শুদ্ধ ইংরেজীতে বললেন, "যীশুখৃষ্টকে আপনারা কি চোখে দেখেন ? শ্রীরামকৃষ্ণকেই বা কি ভাবে দেখেন ? পরিত্রাতা (Saviour) বলে দেখেন কি ? তা যদি হয়, পৃথিবীতে একাধিক পরিত্রাতার প্রয়োজন আছে কি ? একজনই তো যথেষ্ট। হিন্দুধর্মে একাধিক অবতার কেন ? 'Only begotten Son' একথা মানেন কিনা—বা এর অর্থ কি করেন ?"

প্রশ্নগুলি শুনে বুঝলাম—ইনি বহু পড়েছেন, বহু শুনেছেন এবং চিন্তাও করেছেন অনেক। উত্তর দেবার আগে একটু জানতে চাইলাম—আপনার বাড়ি কোন্‌খানে, নিজে খৃষ্টান হয়েছেন না জন্মগত ? এসব বই কোথা থেকে পেলেন—কতদিন ধরে পড়েছেন ? বললেন : বাড়ি মওলং-এ (শেলার পথে)—জন্মগত খৃষ্টান, তবে অন্যান্য ধর্ম ও ধর্মশাস্ত্র জানবার খুব আগ্রহ। জানতে চান—তাই বই সংগ্রহ ক'রে পড়েন, খৃষ্টে খুবই বিশ্বাস,—গীতাও পড়েছেন কিন্তু যখনই ধর্মের গ্লানি হয়—তখনই ভগবান্ অবতার হন, একথা ঠিক মানতে পারেননি—বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ যদি ভগবানেরই কথা হয় তো তার মধ্যে মিল নেই কেন ?

প্রশ্নগুলি তিনি একসঙ্গে করেননি—কথার পিঠে করেছেন। আমিও সাধ্যমত উত্তর দিয়েছি—সেগুলিই যে ঐ প্রশ্নের সঠিক উত্তর বা একমাত্র উত্তর তা নয়—তবে তাঁর প্রয়োজন-মত উত্তরও দিতে বাধ্য হয়েছি। সেগুলি সব এখানে দিলাম না অপরের প্রয়োজন নেই বলে—তবু দুএকটি দিলাম নমুনারূপে—প্রশ্নোত্তরযুদ্ধে কিভাবে তীক্ষ্ণবাণ বিনিময় হয় তা দেখাবার জন্য।

যীশুখৃষ্টকে আমি একজন অবতার বলেই মনে করি—যেমন কৃষ্ণ, বুদ্ধকেও মনে করি। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে—তিনি আমার গুরুদেবের গুরুদেব। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে অবতার-শ্রেষ্ঠ বলেছেন।

অবতার ও পরিত্রাতা এক কিনা জানি না। একমাত্র পরিত্রাতার কথা হিন্দুধর্মে নেই, ইসলামেও নেই। আমরা বেদান্তবাদী, আমরা পাপই মানি না—অতএব পরিত্রাণ বা পরিত্রাতা আমাদের চাই না।

'তা হলে আপনারা কি চান ?'

'আমরা মৃত্যুর পর স্বর্গ চাই না, চাই ইহজন্মেই একটা অনুভূতি।'

বুঝলাম বিষয়টা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে আসছে—তিনি একটু বিস্মিতভাবে জিগ্যেস করলেন—'স্বর্গ বা নরক আপনি মানেন না ?' দৃঢ়স্বরে বললাম, 'না'। তবুও তিনি বললেন—'এই দেখুন লিখেছে চার রকম নরক আছে—খৃষ্ট জন্মাবার আগে যারা মরেছে তারা এক নম্বর নরকে, খৃষ্ট জন্মাবার পর যারা ব্যাপ্টিজ্‌ম্ না নিয়ে মরেছে তারা দু নম্বর নরকে, খৃষ্টান পিতামাতার যে সব শিশু ব্যাপ্টিজ্‌ম্‌-এর পূর্বেই মরেছে তারা তিন নম্বর নরকে।' আমি আর বলতে দিলাম না—বললাম, 'ওসব থিওলজি মানি না, বুঝি না, শুনতেও চাই না।

ওগুলি ভগবানের কথা নয়, শাস্ত্রও নয়।'

তখন তিনি St. John খুলে বললেন—"তাহলে '*only begotten son*'-এর অর্থ নির্ণয় করেই আলোচনা শেষ করা যাক্।" আমিও বললাম—'সব খৃষ্টানরা এটা মানেন না। অন্য কোন Gospelএও এ ধরনের কথা নেই—না, যীশু-ও নিজে ওকথা বলেননি, তখন তিনি আবার 'Logos' নিয়ে আলোচনা চালাতে চাইলেন—আমিও বললাম, 'ঠিক কথা—St. John সহজ জিনিসকে কঠিন করেছেন—দুরূহ দুর্বোধ্য দর্শনারণ্যে প্রবেশ না ক'রে আসুন আমরা যীশুর জীবন ও বাণী থেকে নিজেদের জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করি—সঙ্গে সঙ্গে সকল দেশের ভগবৎকল্প অবতারপুরুষকে সম্মান করতে শিখি।' এরপর তিনি বইপত্র গুটিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে যেতে চাইলেন। আমিও বললাম, 'এখানে আপনার মতো একজন শিক্ষকের দেখা পাব কখনও ভাবিনি।'

এখন খাসিদের নিজস্ব ধর্ম সম্বন্ধে যা শুনেছি ও দেখেছি তারই কিছু বলে এ চিঠি শেষ করি। খাসিরা খুব ধর্মভীরু। তাদের বিশ্বাস সর্বোপরি এক সর্বশক্তিমান্ মঙ্গলময় ঈশ্বর আছেন—তাঁর থেকেই মানুষ এসেছে—এক হিসেবে তিনি পরম পিতা এবং সকলের আদিপুরুষ। মানুষ মরে গেলে স্বর্গে যায় ভগবানের কাছে—সন্তানসন্ততির কল্যাণ করতে পারে ও করে। এই থেকে পূর্বপুরুষ-উপাসনা এদের মধ্যে প্রচলিত। তবে যে মানুষের জীবনে দুঃখ কষ্ট রোগ ও মৃত্যু আছে—তার কারণ দুষ্ট শক্তি (evil spirit)—তাদের কিছুটা তুষ্ট করতে হবে আর কিছুটা ঈশ্বর ও পূর্বপুরুষ-উপাসনা সহায়ে তাঁদের শক্তিদ্বারা বশীভূত বা দূরীভূত করতে হবে।

পূর্বপুরুষদের স্মৃতিচিহ্ন ছড়িয়ে আছে খাসি-পাহাড়ের সর্বত্র। দাঁড়ানো বড় লম্বা পাথরগুলি পুরুষদের (*memorial monoliths*), আর শোয়ানো গোল পাথরগুলি মেয়েদের। মেয়ে বলতে মা ও দিদিমা—পুরুষ বলতে মামারা। বছরে একবার ক'রে এখানে তারা শ্রাদ্ধের মতো একটা অনুষ্ঠান করে।

আর ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য বছরে এরা নৃত্যের উৎসব করে, শিশু আনন্দে নাচা-কোদা করলে মা-বাবা যেমন সন্তুষ্ট হন, এদের বিশ্বাস ভগবানের চোখে মানুষ চিরশিশু, তাই তারা নাচের মাধ্যমে ভগবানকে সন্তুষ্ট করে। খাসিনৃত্য অতি শান্ত সংযত ও সুন্দর—এর মধ্যে উদ্দাম উচ্ছ্বাস নেই,—আছে তালে তালে পা ফেলে চক্রাকারে ঘোরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা—এক দলের পর আর একদল, তবে নাচে ছোট মেয়েরা—ছেলেরা চামর বীজন করে ও বাজনা বাজায়। নংক্রেম নৃত্য খুবই বিখ্যাত। খৃষ্টান অখৃষ্টান সবাই এতে যোগ দেয়, এ তাদের জাতীয় ধর্ম।

বিপদ-আপদের মহামারীর সময়ও এরা নৃত্য করে, পশুপক্ষী বলি দেয়। শোকের সময় এরা গান করে। আজকাল অবশ্য বাহিরের প্রভাবে অন্যান্য সঙ্গীতও এদের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

মনে হয় বেশী বাইরের প্রভাব এদের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। রামকৃষ্ণ মিশন এখানে শুধু শিক্ষাবিস্তারের ব্রত গ্রহণ করেছে, তবে শেলা অঞ্চলের অধিবাসী দুর্গাপূজা চায় বলে সে ব্যবস্থা করা হয়। নতুবা ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতা দিলেই এরা খুশী, খৃষ্টান যে হয়ে গেছে সে খুবই বিশ্বাসী খৃষ্টান। তবে তাদের মধ্যে ক্যাথলিক-প্রোটেস্টাণ্ট সাম্প্রদায়িকতা বেশ প্রবল, পরস্পর পরস্পরকে ধর্মান্তরিত করে। অখৃষ্টান খাসিদের মধ্যে সেংখাসি আন্দোলন একটি গড়ে উঠছে—তারা প্রকৃত খাসিধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তাদের বিশ্বাস খাসিরা সব একদিন তাদের এই নিজস্ব ধর্মেই ফিরে আসবে।

ব্যাকরণ-কথা

শ্রীকালীজীবন চক্রবর্তী

'সাধুত্ব-জ্ঞান-বিষয়া সৈষা ব্যাকরণ-স্মৃতিঃ'

—ভর্তৃহরি

'ব্যাকরণ' শব্দটি শুনিলেই যে মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, নিতান্ত ভদ্রতার তাগিদেই তাহা চাপিয়া যাওয়া হয়। একান্ত শিক্ষণীয় অন্য কোনও বিদ্যার বেলাতেই বোধ হয় এই অবস্থার সৃষ্টি হয় না। এই দিক দিয়া সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে ব্যাকরণই সর্বাধিক অপ্রিয়।

কিন্তু এই আপাত-নীরস ব্যাকরণেও রস আছে; ইহারও সাহিত্য আছে, আছে দর্শন, আর ইতিহাস তো আছেই। প্রাচীন ভারত যে-সব বিদ্যার চর্চা করিয়া একদা জগতে শীর্ষ-স্থানীয় হইতে পারিয়াছিল, এই ব্যাকরণ-বিজ্ঞান বা শব্দ-বিদ্যা তাহাদের একটি। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতীয় ব্যাকরণ-শাস্ত্রের সহিত পরিচিত হইয়া পাশ্চাত্যের বুধ-মণ্ডলী বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া একবাক্যে স্বীকার করেন যে, এই বৈজ্ঞানিক যুগেও পৃথিবীর আর কোনও ভাষায়ই অদ্যাপি এই ধরনের উন্নত ব্যাকরণের সৃষ্টি হয় নাই। সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণের আবিষ্কারের ফলেই আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞানের সৃষ্টি সহজ হইয়াছে।

সেই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে বেদের অন্যতম অঙ্গরূপে ইহার জন্ম হইলেও বেদের প্রাচীনতম অংশ যে মন্ত্র বা সংহিতা-ভাগ, তাহাতে ব্যাকরণ শব্দের প্রত্যক্ষ উল্লেখ দৃষ্ট হয় না; যদিও তন্মূলক 'ব্যাকুরু', 'ব্যাকরবাণি', 'ব্যাকরোৎ' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের প্রচুর উল্লেখ সেখানে বর্তমান। অথর্ববেদের গোপথ-ব্রাহ্মণেই (১।১।২৪, ২৭), (১।১।৫) অপরা বিদ্যার বর্ণনায় ষড়ঙ্গের অন্যতম রূপে ব্যাকরণের নাম করা হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে ইহাই বোধ হয় ষড়ঙ্গের প্রথম উল্লেখ। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৭।১।৪) ব্যাকরণকে বলা হইয়াছে 'বেদানাং বেদঃ'। এই কথায় ব্যাকরণের বেদার্থ-জ্ঞাপকতা সূচিত হয়। ঋগ্‌বেদ-সংহিতায় এমন একাধিক স্থল (১।১৬৪।৪৫, ৪।৫৮।৩, ১০।৭১।২, ৪) বর্তমান, যাহা হইতে ব্যাকরণ-চিন্তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তা'ছাড়া বৈদিক ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকাদিতে ব্যাকরণ-বিষয়ক নানা উপাদান ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

এইসব উপাদান যে বেদাঙ্গ-ব্যাকরণের নির্দেশক, তাহার কোনও প্রাচীন গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। কেহ কেহ প্রাতিশাখ্যগুলিকে বেদাঙ্গ-ব্যাকরণের পর্যায়ে ফেলিলেও ঐগুলির পর্যালোচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বেদাঙ্গ-ব্যাকরণ উহাদের তুলনায় অনেক বেশী উন্নত এবং অগ্রসর ছিল। তাছাড়া ব্যাকরণের প্রধান লক্ষণ যে ব্যুৎপাদন অর্থাৎ শব্দাদির ব্যুৎপত্তি-নির্দেশ বা বিশ্লেষণ, তাহার কোনও সন্ধানই প্রাতিশাখ্যে পাওয়া যায় না।

পাণিনীয় শিক্ষাতে বেদের হস্তপদাদি অঙ্গ-বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাকরণকে বেদের মুখ বলা হইয়াছে 'মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।' তাই মহাভাষ্যে পতঞ্জলিও ব্যাকরণকে ষড়ঙ্গের প্রধান বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই—'প্রধানঞ্চ ষট্‌সু অঙ্গেষু ব্যাকরণম্'—(পস্পশাহ্নিক)। এই সব স্থলে যে প্রাতিশাখ্য উপলক্ষিত হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

পূর্বোক্ত পস্পশাহ্নিকে ব্যাকরণের সংজ্ঞা- এবং প্রয়োজন-নির্দেশক কাত্যায়নের দুইটি বার্তিক উদ্ধৃত হইয়াছে—(১) 'লক্ষ্য-লক্ষণে ব্যাকরণম্' এবং (২) 'রক্ষোহাগমলঘ্‌বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্।' লক্ষ্য=শব্দ, লক্ষণ=সূত্র। সূত্র এবং তল্লক্ষ্য যে শব্দ এই দুই-এ মিলিয়া ব্যাকরণ। অর্থাৎ শব্দের ব্যুৎপত্তি, গতি-প্রকৃতি বা চরিত্র যেসব সূত্রের আলোচ্য বিষয় তাহাদের গ্রন্থনাই ব্যাকরণ-রচনা। ২য় বার্তিকটির পরিপ্রেক্ষিতে একটি শ্লোকও প্রচলিত আছে :

'বেদ-রক্ষা তদূহশ্চ ভেদ-সন্দেহ-বারণম্।
ফলং ব্যাকরণস্যাহুঃ শব্দজ্ঞানঞ্চ লাঘবম্॥'

বার্তিকোক্ত 'আগম' শ্লোকে অনুপস্থিত, আবার শ্লোকোক্ত 'শব্দ-জ্ঞান' বার্তিকে অনুপস্থিত। সে যাহাই হউক, ইহা হইতে ব্যাকরণশাস্ত্রের কার্যকারিতা অধিকতর বিস্তৃতভাবে জানা যাইতেছে। রক্ষা বা বেদ-রক্ষা—পতঞ্জলি বলিয়াছেন বেদ-পরিপালন; উহ অর্থে 'অনন্বিত বিভক্তি-লিঙ্গের পরিত্যাগ করিয়া অন্বয়যোগ্য বিভক্ত্যাদির কল্পনা'—বিশ্বকোষ, অসন্দেহ= ভেদসন্দেহ-বারণ, শব্দ-জ্ঞান অর্থে শব্দের শুদ্ধা-শুদ্ধিবোধ বা উহার সাধুত্ব- অসাধুত্ব-বিচার, আর লাঘব অর্থে অল্পায়াস-সাধ্য বা সংক্ষিপ্ত অথচ বহুফলপ্রসূ সূত্রাদির রচনা। আগম=আর্ষ অনুশাসন—'ব্রাহ্মণকে বিনা কারণেই সাঙ্গবেদ পড়িতে এবং জানিতে হইবে।'

ব্যাকরণের এই সব প্রয়োজন বা ফলশ্রুতি পাণিনির ব্যাকরণকে উপলক্ষ্য করিয়া বলা হইলেও তৎপূর্ববর্তী ব্যাকরণগুলির ক্ষেত্রেও ইহাদের অসদ্‌ভাব ছিল না। কারণ ঐ বেদ-রক্ষার প্রয়োজনরূপ সমস্যাটি পাণিনির বহু-পূর্ববর্তী, আর বস্তুতঃ অন্য প্রয়োজনগুলিও মূলতঃ ঐ বেদ-রক্ষার তাগিদেই উৎপন্ন।

বেদ-রক্ষা অর্থাৎ বৈদিক ভাষা ও সাহিত্যের বিশুদ্ধি-রক্ষা। ব্যাপক অর্থে উহাদের স্বাতন্ত্র্য-রক্ষা। আর্যদের প্রসারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে যে বিরুদ্ধশক্তির সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা ছিল স্থানীয় অবৈদিক তথা অনার্য গোষ্ঠীগুলির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইহাদের ভাষা ও সংস্কৃতি একেবারে অবহেলার যোগ্য ছিল না বলিয়াই উহার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব এড়াইবার জন্য বৈদিক ভাষা ও সাহিত্যের রক্ষাকবচরূপে ষড়্‌বেদাঙ্গের জন্ম। ইহাদের মধ্যে বেদাঙ্গ-ব্যাকরণের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বৈদিক ভাষা হইতে ম্লেচ্ছ বা অশুদ্ধ বা অপশব্দগুলিকে নিষ্কাশিত করিয়া উহাদিগকে বিতাড়িত করাই ছিল ব্যাকরণের কাজ। ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের অন্তর্গত ৭১ সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে চালুনির দ্বারা ছাতু ছাঁকিয়া পরিষ্কার করার মতো ভাষাকেও পরিষ্কার (অর্থাৎ অশুদ্ধ বা অপশব্দের প্রভাব-মুক্ত) করিবার কথা আছে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাকরণের অপর অন্বর্থ বা সার্থক নাম হয় 'শব্দানুশাসন'। মহাভাষ্যের প্রথম কথাই 'অথ শব্দানুশাসনম্'।

এই শব্দানুশাসনের আদি এবং সহজতম উপায়রূপে ব্যাকরণ-প্রক্রিয়ার উদ্ভব। কোন্ শব্দ সাধু, কোন্‌টি অসাধু বা অপশব্দ তাহা নির্ণয় করিবার জন্য উহার ধাতু-প্রত্যয়াদি-বিভাজন করিয়া দেখা দরকার। ইহাকেই বলা হয় শব্দের ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় বা সাধুত্ব-পরীক্ষা। এই পরীক্ষার 'নিকষ-পাথর'ই ব্যাকরণ। 'ব্যাকরণ'-শব্দের ধাতু-প্রত্যয়গত অর্থও তাহাই —শব্দকে বিশেষ আকৃতি দান করা, (বি-আ+কৃ··)। ব্যুৎপাদন বা বিশ্লেষণ ইহার প্রতিশব্দ। 'ব্যাকার' (বি+আকার অর্থাৎ বিশেষ আকার) ও 'ব্যাকৃতি' (বি+আকৃতি= বিশেষ আকৃতি) শব্দ ব্যাকরণের প্রায় সমার্থক।

যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ বা উপাদানের সমবায়ে শব্দের গঠন সম্ভবপর হইয়াছে, তাহাই ঐ বিশেষ আকার বা আকৃতি। বলাবাহুল্য শব্দের প্রকৃতি (মূল ধাতু), প্রত্যয় ও উপসর্গ প্রভৃতিই এই বিশেষ আকার। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে যে শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি সুনির্দিষ্ট বা নির্ণীত হইয়া গিয়াছে, তাহাই 'সংস্কৃত' বা 'ব্যুৎপন্ন' বা 'ব্যাকৃত' শব্দ। শব্দমণ্ডলীতে সে-ই কুলীন এবং পাঙ্‌ক্তেয়। এই অবস্থারই নামান্তর 'শব্দ-কৌলীন্য'। কেবল শব্দই নয়, বাক্যকে ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন পদে পরিণত করা, এমনকি একটি বৃহত্তর অভিপ্রায়কে খণ্ডিতাকারে কয়েকটি বাক্যে রূপায়িত করাও ব্যাকরণ। এই কার্যের কর্তা বা ব্যাকরণ-কর্তাই (ঠিক ঠিক বলিতে গেলে বলিতে হয় 'ব্যা-কর্তা') বৈয়াকরণ নামে প্রসিদ্ধ। রসিক দার্শনিকের দৃষ্টিতে এই সত্যেরই সুন্দর প্রতিফলন—

'যেনেদং ব্যাকৃতং সর্বং স বৈয়াকরণঃ পরঃ।'

দেবরাজ ইন্দ্র প্রথম বৈয়াকরণ। ইহার সাক্ষী তৈত্তিরীয় সংহিতা (৬।৬।৪।৭)। সেখানে দেবতাদের অনুরোধে ইন্দ্রকর্তৃক বায়ুর সহযোগে প্রথম বাগ্‌-বিভাজনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই প্রথম ব্যাকরণ-বিজ্ঞানের প্রবর্তনা। তৎপূর্বে তিনি বৃহস্পতির নিকটে শব্দ-বিদ্যা অধিগত করিতে গিয়া গুরু-শিষ্য উভয়েই যে 'নাস্তানাবুদ' হইয়াছিলেন, তাহা মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ব্যাকরণের পূর্বোক্ত 'লাঘব'রূপ প্রয়োজনের বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ব্যাকরণ-পদ্ধতির অভাবে ইন্দ্রকে একটি একটি করিয়া পদের উপদেশ দিতে গিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি দিব্য সহস্র বৎসরের চেষ্টাতেও সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। বৃহস্পতির গুরু ছিলেন ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রের ছাত্র ছিলেন ভরদ্বাজ।* সামবেদের কৌথুম-শাখার প্রাতিশাখ্য ঋক্‌তন্ত্রব্যাকরণের প্রারম্ভে এইরূপ গুরু-পরম্পরা দেখা যায়—"ব্রহ্মা বৃহস্পতয়ে প্রোবাচ বৃহস্পতিরিন্দ্রায়েন্দ্রো ভরদ্বাজায় ভরদ্বাজ ঋষিভ্যা ঋষয়ো ব্রাহ্মণেভ্যস্তং খল্বিমমক্ষরসমাম্নায়মিতি…."

কাজেই ইন্দ্রই প্রথম বেদাঙ্গব্যাকরণের রচয়িতা। তাঁহার সহযোগী বায়ুও সম্ভবতঃ এক ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। মৈত্রায়ণী সংহিতায় (৪.৫।৮) এবং কাপিষ্ঠল সংহিতায় (৪২।৩) ইহার ইঙ্গিত আছে। বায়ুপুরাণে (২।৪৪) বায়ুকে 'শব্দশাস্ত্রবিশারদ' বলা হইয়াছে। ১৭শ (খৃঃ) শতাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্যের সূচীতে এক 'বায়ু-ব্যাকরণে'র উল্লেখ বর্তমান।

ইন্দ্রের ব্যাকরণ পরবর্তীকালে 'ঐন্দ্রব্যাকরণ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইন্দ্র-শিষ্য ভরদ্বাজের মাধ্যমে এই ব্যাকরণ ঋষিদের নিকটে প্রচারিত হইয়া ক্রমে ঐন্দ্রব্যাকরণ-সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। ভরদ্বাজের নিজস্ব কোনও ব্যাকরণ ছিল কিনা জানা যায় নাই। পাণিনি পূর্বাচার্যরূপে এক ভরদ্বাজের নাম করিয়াছেন (পা. সূ. ৭।২।৬৩)। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (১৭।৩) এবং নিরুক্তে (৩।১৭, ৬.৩০) ভরদ্বাজের উল্লেখ আছে। তাঁহার নামে এক শিক্ষাগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। মহাভাষ্যে একাধিক স্থলে 'ভারদ্বাজীয়াঃ পঠন্তি' বলিয়া এক বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ের নাম করা হইয়াছে। সোমদেব-রচিত 'কথাসরিৎ-সাগরে' (২।৬, ৪।২৫), জয়দ্রথ-রচিত 'হর-চরিত-চিন্তামণি' নামক গ্রন্থে (২৭।৫১-৫২, ২৭.৭৯) এবং ক্ষেমেন্দ্র-রচিত 'বৃহৎকথামঞ্জরী'তে (কথাপীঠ-লম্বক, ২য় গুচ্ছ) বর্ণিত আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীয় মগধের নন্দরাজ-মন্ত্রী কাত্যায়ন ঐন্দ্রব্যাকরণের ছাত্র

* ঐতরেয়ারণ্যকে (২।২।৪) ইন্দ্র কর্তৃক ভরদ্বাজকে ঘোষবৎ এবং উষ্মবর্ণসমূহের উপদেশ দেওয়ার কথা আছে।

ছিলেন। পাটলিপুত্র নগরের অধিবাসী তাঁহার গুরু বর্ষ তপস্যার দ্বারা স্বামি-কুমার কার্ত্তিকেয়কে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ঐন্দ্রব্যাকরণ লাভ করেন। এই কাত্যায়নই আবার পাণিনি ব্যাকরণের বার্তিককার এবং শুক্লযজুর্বেদীয় প্রাতিশাখ্যের রচয়িতা। পাণিনি কুত্রাপি ঐন্দ্রব্যাকরণের উল্লেখ করেন নাই।

অনেকের অনুমান ঐন্দ্রব্যাকরণের ধারা বৈদিক প্রাতিশাখ্যাদির মধ্য দিয়া কলাপ ব্যাকরণে আসিয়া ঠেকিয়াছে। এই অনুমান অমূলক নয়। ঐন্দ্রব্যাকরণের প্রথম সূত্র "অথ বর্ণসমূহঃ", তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের প্রথম সূত্র "অথ বর্ণসমাম্নায়ঃ" এবং কলাপের প্রথম সূত্র "সিদ্ধোবর্ণসমাম্নায়ঃ"। এই ধরনের সাদৃশ্য প্রাতিশাখ্য ও কলাপের মধ্যে খুব বেশীই দেখানো যায়। ঐন্দ্রব্যাকরণের তুলনাযোগ্য প্রাপ্ত উপাদানের পরিমাণ অতি অল্প। তবে এই ব্যাকরণেও যে কলাপাদির মতো 'অকারাদি-হকারান্তা বর্ণমালা' অনুসৃত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঋক্তন্ত্রে এবং মহাভাষ্যে এই বর্ণ-সমাম্নায় বা বর্ণমালাকে বলা হইয়াছে 'ব্রহ্মরাশি' অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বর্ণরাশি। প্রাচীনকালে ইহাকে বর্ণ-মাতৃকা বা মাতৃকা-পাঠও বলা হইত। সম্ভবতঃ পাণিনিই সর্বপ্রথম তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে প্রচলিত বর্ণমালার পাঠ-ক্রমের ব্যত্যয় ঘটান প্রত্যাহার-সংজ্ঞাগঠনের উদ্দেশ্যে। 'প্রত্যাহার'-এর অর্থ সংক্ষেপ। অতি সংক্ষেপে বর্ণঘটিত সন্ধি প্রভৃতি ব্যাকরণ-কার্য প্রদর্শনের জন্য তাঁহাকে "অইউণ্", "ঋ৯ক্" ইত্যাদি ১৪টি প্রত্যাহার-সূত্রের সাহায্য নিতে হয়। ইহার ফলে ব্যাকরণ-সূত্র-রচনায় তিনি যে অপূর্ব লাঘব বা সংক্ষিপ্ততা ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাকে পাশ্চাত্য মনীষিগণ সবিস্ময়ে আখ্যা দিয়াছেন—'Algebrical brevity' অর্থাৎ বীজগণিতসুলভ সংক্ষিপ্ততা। লাঘবের অনুরোধে বৈয়াকরণগণ সূত্ররচনায় এই সংক্ষিপ্ততার এত বেশী পক্ষপাতী ছিলেন যে, ইহাকে আশ্রয় করিয়া ব্যাকরণক্ষেত্রে একটা প্রবাদবাক্য দাঁড়াইয়া গিয়াছিল—'অর্ধমাত্রা-লাঘবেন পুত্রোৎসবং মন্যন্তে বৈয়াকরণাঃ' অর্থাৎ সূত্ররচনার ব্যাপারে উহাকে যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করিতে গিয়া বৈয়াকরণগণ যদি কোনও উপায়ে একটি হলন্ত বা হসন্ত বর্ণও কমাইতে পারিতেন তবে তাঁহারা সেক্ষেত্রে পুত্রের জন্মোৎসবের আনন্দ অনুভব করিতেন।

সে যাহাই হউক, ঐ ১৪টি প্রত্যাহার-সূত্র শিবসূত্র বা মাহেশ্বর-সূত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। মূলতঃ এই প্রসিদ্ধির উপরে নির্ভর করিয়াই স্বয়ং মহেশ-উপদিষ্ট এক ব্যাকরণের অস্তিত্ব কল্পিত হইয়া থাকে। 'মহেশাদাগতম্' এই অর্থে ইহার নামও নির্দিষ্ট হইয়াছে 'মাহেশ'। নামমাত্র-সার এই ব্যাকরণের বাস্তবিকই কোন অস্তিত্ব ছিল কিনা সেই বিষয়ে একেবারে নিঃসংশয় হওয়া যায় নাই। এই সম্বন্ধে খুব প্রাচীন কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। শিবানুচর নন্দিকেশ্বরের নামে প্রচারিত 'কাশিকা' নাম্নী মাত্র ২৭-শ্লোকাত্মিকা এক পুস্তিকায় পূর্বোক্ত ১৪টি প্রত্যাহার-সূত্রের এক দার্শনিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতেছে। উপমন্যু নামক এক শিব-ভক্ত উহার 'তত্ত্ববিমর্শিনী' নামে এক টীকা রচনা করিয়াছেন। কাশিকার প্রথম শ্লোক-দুইটি বর্তমান প্রসঙ্গে সবিশেষ লক্ষণীয়—

"নৃত্যাবসানে নটরাজ রাজো ননাদ ঢক্কাং
নবপঞ্চবারম্।
উদ্ধর্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্ বিমর্শে
শিবসূত্রজালম্॥ ১॥

অত্র সর্বত্র সূত্রেষু অন্ত্যবর্ণচতুর্দশম্।

ধাত্বর্থং সমুপাদিষ্টং পাণিন্যাদীষ্টসিদ্ধয়ে" ॥ ২ ॥

ইহা হইতে জানা যায়, নটরাজ শিব তাঁহার তাণ্ডব-নৃত্যের শেষে তপস্যারত সনকাদি সিদ্ধদিগের উদ্ধার-হেতু যে ১৪ বার ঢক্কা (ডমরু) নিনাদ করিয়াছিলেন, তাহা শব্দ-বিদ্যা-লাভার্থী তাপস পাণিনির নিকটে ১৪টি প্রত্যাহার-সূত্ররূপে প্রতিভাত হয় এবং উহাদের শেষ ণ্, ক্, চ্ ইত্যাদি ১৪টি বর্ণ বা অনুবন্ধ পাণিনির ইচ্ছাপূরণের জন্য 'ধাত্বথং' 'সমুপাদিষ্ট' হইয়াছিল। 'ধাত্বর্থং' শব্দের ব্যাখ্যায় তত্ত্ববিমর্শিনীতে বলা হইয়াছে—"ধাত্বথং ধাতুমূলকশব্দশাস্ত্র-প্রবৃত্ত্যর্থম্ ইত্যর্থঃ।...তথা চোক্তমিন্দ্রেণ 'অন্ত্যবর্ণ সমুদ্‌ভূতা ধাতবঃ পরিকীর্তিতাঃ' "। এখানে ঐন্দ্রব্যাকরণের এই কারিকার্ধ হইতে এমন অনুমান করা অসমীচীন নয় যে, ইন্দ্র সম্ভবতঃ তৎপূর্ববর্তী মাহেশ-ব্যাকরণের ধাতু-বিষয়ক পূর্বোক্ত মতের পরিপ্রেক্ষিতেই এই শ্লোকাত্মক সূত্রটি রচনা করিয়া থাকিবেন। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালে রচিত বলিয়া অনুমিত দুই একটি শ্লোকে মাহেশ বা মহেশ্বরোপদিষ্ট ব্যাকরণের কথা বলা হইয়াছে—

'সমুদ্রবদ্ ব্যাকরণং মহেশ্বরে তদর্ধকুম্ভোদ্ধরণং বৃহস্পতৌ।
তদ্‌ভাগ-ভাগাচ্চ শতং পুরন্দরে কুশাগ্রবিন্দুৎপতিতং হি পাণিনৌ ॥'

এই শ্লোকটি কে কোথায় কি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, জানা যায় নাই। ইহাতে সুপ্রাচীন ব্যাকরণগুলির তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, মহেশ্বরের ব্যাকরণ ছিল সমুদ্রের মতো বিশাল, সেই সমুদ্রের এক কলসী জলের সমান ছিল বৃহস্পতির ব্যাকরণ, ইহার ভাগের ভাগ শতভাগের সদৃশ ছিল ইন্দ্রের ব্যাকরণ এবং সেই ইন্দ্রের ব্যাকরণের এক কুশাগ্রবিন্দু লইয়া পাণিনির ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল। আবার সপ্তশতী চণ্ডীর গোপাল চক্রবর্তি-রচিত টীকার প্রারম্ভে (১।১) উদ্ধৃত হইয়াছে —

'যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
কিং তানি পদ-রত্নানি সন্তি পাণিনি-গোষ্পদে ॥
ন দৃষ্টমিতি বৈয়াসে শব্দে মা সংশয়ং কৃথাঃ।
অজ্ঞৈরজ্ঞাতমিত্যেবং রত্নং কিং নহি বিদ্যতে ॥'

মহাভারতের 'জ্ঞান-দীপিকা' নাম্নী টীকার প্রারম্ভে টীকাকার দেববোধও এই শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেখানে মাহেশাদ্'-স্থলে 'মাহেন্দ্রাদ্' দৃষ্ট হয়। শুনা যায়, মহাকবি কালিদাস একদা কাশীধামে গিয়া সেখানে মহর্ষি বেদব্যাসের শ্রীমূর্তিদর্শনে তাঁহার প্রকাণ্ড উদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে শ্লেষপূর্বক বলিয়াছিলেন যে, আরও কত আর্ধ প্রয়োগ সেই উদরে ছিল বলা অসাধ্য অর্থাৎ পাণিনি-ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ বহু পদ ব্যাস-প্রণীত মহাভারতাদি পুরাণে সন্নিবিষ্ট হওয়ার পরেও আরও কত যে ঐরূপ অশুদ্ধ শব্দ ব্যাসের পেটে ছিল, তাহা বলা যায় না। এই উক্তির পরেই নাকি উদ্ধৃত শ্লোক দুইটি দৈববাণীরূপে শ্রুত হয় অথবা পার্শ্ববর্তী কোনও চতুর রসজ্ঞ পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ উহা রচনা করিয়া কবিকে শুনাইয়া দেন। উহার অর্থ ব্যাসদেব মাহেশ-রূপ ব্যাকরণ-সমুদ্র হইতে যেসব রত্নসদৃশ পদ উদ্ধার করিয়া স্বীয় গ্রন্থাদিতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, পাণিনির ব্যাকরণ-গোষ্পদে সেইসব কি করিয়া থাকিতে পারে? সচরাচর দেখা যায় না বলিয়াই ব্যাস-ব্যবহৃত শব্দসমূহে সাধুত্ব-বিষয়ক সংশয় করা অনুচিত, কারণ মূর্খের নিকটে অজ্ঞাত বলিয়াই কোন রত্নের অভাব প্রমাণিত হয় না।

পূর্বোক্ত কথাসরিৎসাগরাদি আখ্যান-গ্রন্থে এবং ভবিষ্যপুরাণে পাণিনিকে এক জড়বুদ্ধি-শিক্ষার্থিরূপে দাঁড় করাইয়া তাঁহাকে ঐন্দ্র-

ব্যাকরণের ছাত্র কাত্যায়নাদি কর্তৃক অবহেলিত ও অপমানিত অবস্থায় হিমালয়ে গিয়া তপস্যা-বলে মহাদেবের কৃপায় লব্ধবিদ্য এবং পরে কাত্যায়নাদির সহিত ব্যাকরণ-বিচারে জয়ী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ বিচারের ফলে ঐন্দ্রব্যাকরণ নষ্ট এবং তৎস্থলে পাণিনি-লব্ধ শব্দ-বিদ্যার অভ্যুদয় হইয়াছিল। লক্ষণীয় এই যে, কোথাও মাহেশ-ব্যাকরণের গ্রন্থীভূত অবস্থার তেমন স্পষ্ট কোন আভাস পাওয়া যায় না। পাণিনীয় শিক্ষায় আছে "শঙ্করঃ শাঙ্করীং প্রাদাদ্ দাক্ষীপুত্রায় ধীমতে" এবং "যেনাক্ষর-সমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ। কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তম্·· "ইত্যাদি। ভবিষ্যপুরাণে (২।৩১।১০)—"ইতি শ্রুত্বা মহাদেবঃ সূত্রাদি প্রদদৌ মুদা। সর্ববর্ণময়ান্যেব অইউণাদিশুভানি বৈ॥" সর্বত্রই মহাদেবের নিকট হইতে অক্ষর-বিষয়ক সংকেত-লাভের পর তাহারই অবলম্বনে পাণিনির ব্যাকরণ-রচনার কথা বলা হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মহাভাষ্যে কুত্রাপি মহেশ্বর-সম্পর্কিত ব্যাকরণাদি-বিষয়ক কোন প্রসঙ্গেরই উল্লেখ নাই। মোট কথা, 'মাহেশ'একেবারেই কিংবদন্তী-মূলক। (ক্রমশঃ)

লোক-নায়ক

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মোহান্ত

এমন অনেক লোক জন্ম নেয় মানুষের ঘরে
পেরিয়ে 'আমি' র সীমা জগতের দেহে হয় লীন ;
বাঁশির ধ্বনিতে যার শবৃদিত হ'য়ে ওঠে ক্ষীণ
অমৃত-পিপাসা। সেই সব মানুষের হাত ধরে
নতুন পৃথিবী চলে—পিছে ফেলে ক্লান্ত যুগ-সীমা।

বিষাক্ত বিশ্বের বুকে বলীয়ান নিস্পৃহ নির্ভীক
সে-মানুষ গড়ে তোলে সৃষ্টি-ক্ষম অস্ত্র মানসিক,
ধ্বংস করে গ্লানি কত, কত বিষ, যুগের কালিমা।

সংসারের পাঁক হতে পঙ্কজের শুভ সম্ভাবনা
কাব্য নয়, ইতিহাস। বুদ্ধ, যীশু, রামকৃষ্ণ তার
প্রমূর্ত প্রতীকরূপে খুলে দিল আলোকের দ্বার—
শান্তির প্রলেপ দিয়ে উপশমি' যুগের যন্ত্রণা।
এদেরই পতাকাবাহী যোদ্ধা চাই আজ ঘরে ঘরে —
'ইজমে'র যুদ্ধ নয়—শান্তির পতাকা যার করে।

শঙ্করের ধ্যাননেত্রে দেবী কালিকা*

ভগিনী নিবেদিতা

[অনুবাদ : অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ]

পূর্বপুরুষেরা হয়তো তাঁকে পর্বতমালায় দেখতে পেয়েছিলেন। অথবা অন্য কোথাও। কোন এক জায়গায় হিন্দুমানসে একথা উদ্ভাসিত হয়েছিল যে তুষারশিখর, চন্দ্রালোক আর স্থির জলরাশিতে এমন কোন সৌন্দর্য রয়েছে যা আর সব বর্ণবৈচিত্র্যময় দৃশ্যসৌন্দর্যের থেকে একেবারে আলাদা।

এ যেন জননী প্রকৃতি স্বয়ং ফুল ফল আর পাখীর নক্সা-আঁকা-পাড় সবুজ শাড়ীটি পরে অগণ্য মণিখচিত নীলাম্বরীতে মুখ ঢেকে রয়েছেন, তবু তাঁর অজস্র ঐশ্বর্যের অন্তরালে মাঝে মাঝে এমন কিছুর চকিত আভাস খেলে যায়, যা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এমন কিছু যা শুভ্র, পবিত্র, তপস্যাপূত, যা নৈঃশব্দ্যের অনিবার্য ইংগিত, যা স্তব্ধ, নিরাবেগ, চিরনিঃসঙ্গ। সমগ্র পৃথিবীর সৌন্দর্যে তখন দ্বৈতসত্তার ব্যঞ্জনা। আলোয়-অন্ধকারে, আকর্ষণে-বিকর্ষণে, অণুতে-বিশ্বে, কার্যে-কারণে—সর্বত্র হিন্দুমানস তখন এই দ্বৈত-সত্তারই প্রকাশ দেখতে পেয়েছে। শুধু তাই নয়, সমগ্র মানবসমাজের দিকে তাকিয়েও সে তাই দেখেছে—নর ও নারী, আত্মা ও দেহ—এই দ্বৈতসত্তার সম্মেলন।

এইখানেই সূত্রপাত। সাংকেতিকতার স্তরে এসে সর্ববস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তা যুক্ত হলো নররূপের সঙ্গে, আর শক্তিরূপে যা প্রকাশিত (যাকে আমরা প্রকৃতি বলি) নারী ও জননী-মূর্তির সঙ্গে তা অন্বিত হলো। এই কল্পনাপ্রসঙ্গে একথা স্মরণীয় যে, নর ও নারী—এ দুয়ে মিলে যেমন মানবতা, তেমনি ঈশ্বর ও প্রকৃতি এখানে পারস্পরিকভাবে একই সত্যের পরিপূরক প্রকাশরূপে স্বীকৃত। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, প্রকৃতির অন্তরাত্মার মতো সমগ্র প্রকৃতিও সেই ঈশ্বরসত্তারই প্রকাশ।

'ঈশ্বর ও প্রকৃতি কি দ্বন্দ্বরত?' এ শুধু এক মহাকবির জিজ্ঞাসা নয়, সমগ্র পাশ্চাত্যের ধর্মচেতনার এই প্রশ্ন। শত শতাব্দীর বিস্মৃতির অপরপ্রান্ত থেকে ভারতীয় ঋষির অস্ফুট কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—'আরো গভীরে চেয়ে দেখো ভাই! আসলে তারা দুই নয়, এক সত্তা।' এই দৃষ্টিকোণ থেকে সেই এক সত্তাই পুরুষ ও প্রকৃতি, আত্মা ও শক্তিরূপে প্রকাশিত।

অলোকসত্যের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ চিরদিনই একান্ত মানবিক। অন্তহীন প্রান্তরের বুকে এক বিরাট প্রস্তরবচ্ছায়া আমাদের মনে ঈশ্বরের মহিমার নানা বিচিত্র সৌন্দর্যময় অনুভব জাগিয়ে তোলে, কিন্তু একবারও এমন ভুল হয় না যে, ওই বস্তুটিই স্বয়ং ঈশ্বর। আলো আর দরজা, পাহাড় এবং ঢাল—এরাও এমনি প্রতীক। এই সব প্রতীক কখনও হৃদয়বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন ক'রে তাদের জন্য আত্মবিসর্জনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে না। ঈশ্বরের অন্য ছবি—মেষপালকরূপে বা চিরকালীন পিতারূপে—তাঁর ছবির সঙ্গে এসব প্রতীকের অনেক পার্থক্য!

এক বিচিত্র মানসিক উদ্‌ভ্রান্তি এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত। প্রতিটি প্রতীকের পটভূমিতে সত্যানুভব জড়িয়ে আছে তা নিশ্চিত বিশ্বাসে,

---

* Kali The Mother গ্রন্থের The Vision of Shiva রচনার অনুবাদ।

অনিবার্য আবেদনে, পরিপূর্ণতার তৃপ্তিতে এমন অমোঘ যে, সব পার্থক্য মুছে যায়, আমরা ভুলে যাই যে, এও শেষকথা নয়, ভুলে যাই যে এই প্রতীকের অন্তরালেই বিশাল সমগ্রতা নিহিত।

কোনো বিশেষ প্রতীকে আবদ্ধ হওয়ার বিপদকে হিন্দুধর্ম বড়ো বিচিত্রভাবে পরিহার করতে পেরেছে। পৃথিবীর সব জাতির মানুষের মধ্যে হিন্দুরাই তাই বাইরে থেকে সবচেয়ে বেশী এবং অন্তরে সবচেয়ে কম পৌত্তলিক। মণিখণ্ডের বিচিত্র দ্যুতির মতোই তাদের প্রতীকের বহুবর্ণময় প্রকাশ।

পুরুষ ও প্রকৃতি এক মহৎ সত্যের প্রতীক। প্রকৃতি ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ এর একটি ব্যাখ্যা। আত্মা ও অভিজ্ঞতা আর একটি ভাষ্য। বিদ্যুৎযন্ত্র ও তার পরিচালক বিদ্যুৎশক্তির রূপক হয়তো এর তৃতীয় অর্থ।

এই শেষ ব্যাখ্যাটি এক মুহূর্তের অভিনিবেশের অপেক্ষা রাখে। সর্বত্র আমরা দেখতে পাই শক্তি ও কর্মের প্রকাশের জন্য একে অন্যের স্পর্শের অপেক্ষা রাখে। এ দুয়েরই ভারতবর্ষীয় পরিচয় শিব ও শক্তি নামে। নাইট (বা ক্ষত্রিয় যোদ্ধা) যেমন অপেক্ষা করে তার মানসী রমণীর জন্য, যার প্রেরণা-স্পর্শ ছাড়া সে শক্তিহীন, শিষ্য যেমন অপেক্ষা করে গুরুর জন্য—যাঁর মধ্যে সে জীবনের সব অর্থ খুঁজে পায়, আত্মাও তেমনি নিশ্চল নিষ্ক্রিয়, বহিরঙ্গ স্পর্শহীন হয়ে থাকে যতক্ষণ না অধ্যাত্ম-বিপ্লবের চকিতস্পর্শে সমগ্র বহির্জগৎ—সমস্ত জীবন, প্রকৃতি এবং কাল ও অভিজ্ঞতা—আর সমস্ত অন্তর্জগৎ যে এক ঈশ্বরেরই প্রকাশ একথা সে উপলব্ধি করতে পারে।

প্রতীচ্যের ভাষায় এ সেই অনন্তসৌন্দর্যদৃষ্টি, আর প্রাচ্যের ঘোষণা—এই সেই আত্মোপলব্ধি।

কালী এমনই এক মহামুহূর্তের প্রতিমা—আত্মার উন্মোচিতদৃষ্টিতে বিশ্বসংসারে সর্বত্র ঈশ্বরের প্রকাশ দেখতে পাওয়া।

আমরা দেখেছি ঈশ্বরীয় সত্তার মানবীয় প্রকাশ আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সেই প্রকাশপদ্ধতি অনুধাবন করতে হলে একটি সমগ্র জাতির হৃদয় ও অনুভূতিলোকের সঙ্গে পরিচিতি আবশ্যিক। আদর্শ মনুষ্যত্ব আমাদের কাছে রাজা, প্রভু ও পিতার সমন্বয়ে গঠিত। সর্বোচ্চে সেই পরমপিতার স্থান। তাঁর সৈন্যদলের অগ্রভাগে তিনিই সেনাপতি ও সর্বাধিনায়করূপে চলেছেন। তাঁর সন্তানদের প্রতিটি কেশের সংবাদ তাঁর জানা। তাদের অন্যায়ের তিনি প্রতিবিধান করেন, রক্ষা করেন সব দুর্দৈবের হাত থেকে। জগৎরূপ দ্রাক্ষাক্ষেত্রটির তিনি একক অধিকারী, সযত্নে লালন ও গ্রহণ করছেন তাঁর প্রিয় দ্রাক্ষাগুচ্ছ। প্রেমে শাসনে শক্তিতে চিরপূর্ণ, আদর্শ গৃহী, আদর্শ বিচারক, আদর্শ শাস্তা। এই হলো পাশ্চাত্য কল্পনায় ভগবৎস্বরূপের মানবিক প্রকাশ।

ভারতের আদর্শ কতো আলাদা! জীবনের সেখানে একটিই পরীক্ষা, একমাত্র মানদণ্ড—একজন মানুষ কি ঈশ্বরকে জেনেছে, না জানে-নি; শুধুমাত্র তাই। ফলের আকাঙ্ক্ষা নেই, কর্মের প্রশ্ন নেই, সুখের অন্বেষণ নেই। শুধু কেবল প্রশ্ন—আত্মা কি পূর্ণতার সন্ধানে যাত্রা করেছে?

জনপ্রিয় নাটকে-যাত্রায় কী আশ্চর্য নিষ্ঠায় এই একটিমাত্র আবেগেরই রূপায়ণ আমরা লক্ষ্য করি। সেখানে রোমান্টিক প্রেরণা কখনো বড়ো কথা নয়। জ্যাক (নায়ক) যে তার জোয়ানকে (নায়িকা) পাবে (অথবা পাবে না) তা একান্ত বহিরঙ্গ ব্যাপারমাত্র—যা নাটকের গোড়াতেই সংক্ষেপে সেরে নেওয়া হয়। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা পুলকিত বিস্ময়ে স্তব্ধ

হয়ে অপেক্ষা করি—কখন এই মানুষগুলি ভগবানের দেখা পাবে? অথবা কখন তারা একথা উপলব্ধি করবে যে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই পাওয়ার যোগ্য নয়!

উপলব্ধির এই স্তরে উন্নীত হওয়ারই সর্বস্বীকৃত বহিঃপ্রকাশ—ত্যাগ। ভগবৎপ্রেমের আরক্ত-গোলাপটি সেই মুহূর্তে ভক্তহৃদয়ে বিকশিত হয়ে উঠে, সেই মুহূর্তে সে গেয়ে ওঠে, 'তৃষ্ণার্ত হরিণ যেমন ঝর্ণার উদ্দেশে ছুটে চলে, প্রভু, আমার হৃদয়ও তেমনি তোমার উদ্দেশে ধাবমান।' সমগ্র এশিয়া জানে যে, সেই মুহূর্তে জগতের আর সব কিছু তার কাছে অর্থহীন হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়-জগতের সব আকর্ষণ মুহূর্তে দুর্বহ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। গৃহ, পরিজন, জনসংসর্গ—সবই বন্ধন বলে মনে হয়। আহার নিদ্রা ও দৈহিক যত প্রয়োজন সব কিছু অসহ্য ও অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। হিন্দুকল্পনায় দেবাদিদেব মহাদেব তাই ভিখারীমাত্র। যজ্ঞাগ্নির ভস্মবিভূষিত তাঁর তনু তখন তুষারাবৃত মনে হয়, অযত্নবিন্যস্ত তাঁর জটাভার, শীতোষ্ণনিরপেক্ষ মৌন অসঙ্গ তাঁর অবস্থান। অনন্তধ্যানে তিনি চিরসমাহিত।

অর্ধনিমীলিত দুটি নেত্র। তাঁর প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কত জগতের উদয়-বিলয়, তাতে তাঁর কিছুই এসে যায় না। তাঁর সামনে সব কিছু স্বপ্নবৎ ভাসমান। এই অপূর্ব অবাস্তব মূর্তিটির এমনি অর্থ। কিন্তু একটি শক্তি তাঁর সদাকর্মচঞ্চল। তারই মধ্যে সব ইন্দ্রিয়ের সব শক্তি নিহিত। ললাটের মধ্যভাগে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির তৃতীয় নয়ন। এই তো একান্ত স্বাভাবিক যে আদর্শ মনুষ্যত্বের প্রতীক দেবাদিদেব শিবের আর এক নাম হলো বিরূপাক্ষ। পশুপতি তিনি। কণ্ঠ তাঁর সর্পবিষজর্জর, যে বিষ আর কেউ গ্রহণ করবে না। কাউকে তিনি কখনো ফিরিয়ে দেন না। উন্মাদ ও উৎকেন্দ্রিক, পাগল আর অদ্ভুত, অল্পবুদ্ধি যত মানুষ—তাদের সবার ঠাঁই রয়েছে তাঁর দুয়ারে। দৈত্যদানবকেও তিনি আপন ক'রে নিতে জানেন।

যা আর সবাই প্রত্যাখ্যান করে, তাই তিনি গ্রহণ করেন। জগৎরক্ষার জন্য তিনি যখন বিষগ্রহণ করেছিলেন, যে বিষ তাঁকে নীলকণ্ঠে পরিণত করেছে, তখনই জগতের সব বেদনা ও গ্লানির বোঝা তিনি টেনে নিয়েছেন।

এত সামান্য তাঁর সম্পদ! বাহন একটি বৃদ্ধ বৃষভ, ধ্যানের ব্যাঘ্রচর্ম আর একটি কি দুটি জপের মালা—আর কিছু নয়, কিছুই নয়!

সবার উপরে—তিনি এত অল্পে সন্তুষ্ট। এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু কি হতে পারে? শুধু পবিত্র বারি আর দু'চারটি আতপ চাল আর একটি কি দুটি বেলপাতা দিনে একবার করে তাঁকে দিলেই চলে। জাগতিক বিষয়ে মহাদেবটি একেবারে সরলতম। যে সমস্ত বস্তুর জন্য আমাদের এত সংগ্রাম, এত মিথ্যাচার, পরস্পরের এত হানাহানি—তার কিছুই তাঁর বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। বিশ্বাত্মা, অনন্ত-করুণাময়, অজ্ঞাননাশন দেবাদিদেব শিবের এমনি একটি ধ্যানমূর্তি ভারতীয় হৃদয়ে ভেসে ওঠে। হিমালয়ের তুষারপুঞ্জের জ্যোতি আর স্তব্ধ সরোবরে নবীন চন্দ্ররেখার স্থির প্রতিচ্ছায়ায় এমনই একটি মূর্তির প্রথম আভাস জেগেছিল। পরিপূর্ণ ত্যাগ, পরিপূর্ণ অন্তর্মুখীনতা, পরিপূর্ণ অনন্তের অন্তর্লীন হয়ে যাওয়া—শুধু এই কথা-গুলিই তাঁর সম্বন্ধে বলা যায়, যিনি 'মধুরের মধ্যে মধুরতম, ভীষণের মধ্যে ভীষণতম, যিনি বীরেশ্বর, যিনি বিরূপাক্ষ।'

প্রতিদিন ভারতের উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে তাঁর উদ্দেশে যে প্রার্থনামন্ত্র ধ্বনিত হয়, সেটি এই—

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতঙ্গময়,
আবীরাবীর্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখম্
তেন মাং পাহি নিত্যম্॥

আদর্শ মনুষ্যত্বের, পরিপূর্ণ দেবত্বের এমন এক প্রতীক এই শিব।

পুরুষ বা আত্মারূপে তিনি প্রকৃতি বা মায়ার—ইন্দ্রিয়জগতের বিচিত্র প্রকাশলীলার সহচর, স্বামী। এই সম্বন্ধেই আমরা তাঁকে কালীর চরণতলে দেখতে পাই। তাঁর প্রশান্ত ভঙ্গিমাটি নিষ্ক্রিয়তার প্রতীক। আত্মা বহির্জগতের প্রতি উদাসীন, অসম্পৃক্ত। কালী এক ভয়ংকর সংহারনৃত্যে মগ্ন। চতুর্দিকে তাঁর প্রলয়ের চিহ্ন ছড়ানো। গলায় তাঁর মুণ্ডমালা। এখনো তাঁর একহাতে রুধিরচর্চিত খড়্গ, আর এক হাতে সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড। সহসা অতর্কিতে তিনি তাঁর স্বামীর বুকে পা রেখেছেন। সেই স্পর্শে সচকিত শিব কালীর দিকে চোখ মেলে চাইলেন, স্থিরনেত্রে দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে রইলেন।

মায়ের ডান হাতদুটি আশীর্বাদের ভঙ্গিমায় বিন্যস্ত, প্রসারিত জিহ্বায় লজ্জা ও বিস্ময়ের আতিশয্যচিহ্ন—একদা যা গ্রাম্য মেয়েদের মধ্যে সহজেই দেখতে পাওয়া যেত।

আর শিব—তিনি কি দেখছেন? তাঁর কাছে এই ভয়ঙ্করী কৃষ্ণা নগ্নিকামূর্তি—নরমুণ্ডমালায় যাঁর ঈশ্বরের নামাঙ্কিত, রক্তবন্যায় যিনি দানবদের রুধির পান করান, মহানন্দে যিনি হত্যা করে চলেছেন, কোনো বেদনা যাঁর হৃদয়ে নাড়া দেয় না, যে তাঁর চরণাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, একমাত্র তাকেই যিনি আশীর্বাদ করেন—সেই কালী সমস্ত সৌন্দর্যের সার।

মায়ের পুঞ্জ কৃষ্ণকেশরাশি পিছন পানে ঝড়ের মতো উড়ে চলেছে, অথবা সমস্তবস্তুপ্রবাহ-বহনকারী সময়ের মতো দ্রুত ধাবমান। কিন্তু সেই পরম তৃতীয় নয়নের দৃষ্টিতে কালও এক, অখণ্ড, আর সেই একই ঈশ্বর। মায়ের নীলিমা ঘনকৃষ্ণ মেঘের কাছাকছি—এক বিশাল ছায়ার মতো। সেই মহাভয়ঙ্করীর হৃদয়গভীরে তিনি নির্নিমেষে চেয়ে আছেন। আর সেই উপলব্ধির সমাহিত চেতনায় তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন। আত্মা ও ঈশ্বরের এই তো চির-অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ!

কোন্ মননভূমি থেকে এমন ভাবনা উৎসারিত হয়, তা কি আমরা বুঝতে পেরেছি? কালী তো কেবল প্রতিমামাত্র নয়, আমাদের অন্তরতম অনুভবের উচ্চারণ।

উপলব্ধির দিব্যমুহূর্তে আত্মা মায়ের সাক্ষাৎ লাভ করে—কী উপায়ে করে? সবুজ বাগান, সহাস আকাশ, রৌদ্রাপ্লুত পুষ্পরাশি—এরা কেউ সেই সর্বেশ্বরকে ভোলাতে পারে না। আপাত মাধুর্যের অন্তরালে তিনি দেখতে পান জীবন জীবনকে আক্রমণে উদ্যত, নদী পাহাড়-পর্বতকে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে ধাবমান, মধ্যাকাশে আঘাত হানতে উদ্যত ধূমকেতু। তাঁর চারপাশে ধ্বনিত হচ্ছে সর্বজীবের আর্ত ব্যথিত ক্রন্দন, লুব্ধের হাহুতাশ আর ক্ষুদ্রের নিরীহের ভয়ার্ত কলরব। মমতাহীন, দায়িত্বহীন, মানবজাতির ক্রন্দনের প্রতি উদাসীন অথবা সে ক্রন্দনের প্রত্যুত্তরে উন্মত্ত অট্টহাস্যে মুখর কালস্রোত প্রবহমান।

সহজাত সংস্কারে হিন্দুর দৃষ্টিতে জগতের এমনি এক ছবি ভেসে ওঠে। শ্রান্তহৃদয় বলে ওঠে, 'সত্যি, জীবনের চেয়ে মৃত্যু অনেক বড়ো, অনেক ভালো।'

কিন্তু আত্মার দিব্যদৃষ্টির মুহূর্তটি তো তা নয়। পরিশ্রান্তির দীর্ঘশ্বসিত বিলাপ, করুণার

জন্য কাতর প্রার্থনা, অলস বৈরাগ্য—কিছুই সে মুহূর্তে নেই। মাথা নিচু কর, অমনি চিরন্তনী মহাজননীর উদ্দেশে ভারতবর্ষের বহু যুগের যন্ত্রণা ও হতাশায় মন্থনজাত বাণী শুনতে পাবে। যদিও ধ্বংসের নিনাদই তীব্রতর, আর সেই কণ্ঠস্বর মৃদুতম, তবু কান পেতে শোনো—

"আমায় তুমি সংহার করলেও একমাত্র তোমাকেই আমি বিশ্বাস করবো।"

শেষ অবধি শিবের এই ধ্যানদৃষ্টিতে ছাড়া আর কোনো উপায়ে কি কেউ ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছে? আমাদের জীবনের যত মহত্তম উপলব্ধি—তারা সব কি বেদনার পাত্রটি তিক্ততম রসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার মুহূর্তেই ধরা দেয়নি? সর্ব-রিক্ততার বুক-ভাঙা কান্নার মুহূর্তেই কি আমরা প্রেমের বিজয়ী মূর্তিতে পরমতমের দর্শন লাভ করিনি?

চেয়ে দেখো, মাগো, আমরাও তোমারই সন্তান! তুমি আমাদের সংহার করলেও আমরা তোমারই শরণাগত!

*　　*　　*

মুহূর্তটি অপগত, অপসৃত সেই দিব্যদৃষ্টি—মানবকল্পনার যা হয়তো সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক। সেই মুহূর্তটি পার হয়ে আমরা ফিরে এলাম আদিযুগের পার্বত্যপটভূমিকায়।

বৈদিক যজ্ঞের আয়োজন—আর্যগোষ্ঠীর লোকেরা সমবেত। যজ্ঞের সমিধভার বহন ক'রে বলিষ্ঠ এক বৃষভ ধীরস্বচ্ছন্দ গতিতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

অগ্নিসংযোগ হল, চারপাশের যজ্ঞকাষ্ঠকে দগ্ধ অঙ্গারে পরিণত ক'রে হোমকুণ্ডের মধ্যভাগ থেকে নীলাভ শিখা সমুত্থিত হল, তারই চারপাশে লেলিহান রক্তাভ অগ্নিরাশি। পুরোহিতেরা মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে চলেছেন, সমবেত জনসাধারণ অপেক্ষমান। আমরা চেয়ে আছি কখন কবির দৃষ্টিতে এই অগ্নির বিচিত্র মুখগুলি গড়ে তুলবে ঈশ্বর ও প্রকৃতি, আত্মা ও জীবনের এক দিব্যকল্পনা।

পণ্ডিতেরা বলেন, বৈদিক যজ্ঞাগ্নিরই রূপ-মূর্তি এই শিব। তিনিই বৃষভবাহিত কাষ্ঠরাশি থেকে সমুত্থিত নীলাভকণ্ঠ শুভ্র অগ্নিশিখা। আর কালী হলেন এই শিবের অন্যতম শক্তি, এই রক্তিম অগ্নিশিখার অন্যতম শিখা—যার দ্বারা অদগ্ধ সমিধরাশি কৃষ্ণ অঙ্গারে পরিণত হয়ে ভস্মসাৎ হয়। প্রসারিত জিহ্বায় সেই অগ্নিশিখার স্মৃতি।

স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি*

স্বামী নির্বেদানন্দ

বিবেকানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণেরই কর্মময় প্রতিরূপ

শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে নরেন্দ্রনাথের ভিতর প্রসুপ্ত শক্তিধর যুগনায়ককে দেখতে পেয়ে গুরুভাইদের তত্ত্বাবধানের গুরুদায়িত্ব তাঁর হাতে ন্যস্ত ক'রে দিয়েছিলেন, মানবসেবায় পরিপূর্ণরূপে নিজজীবন উৎসর্গ করার জন্য কিভাবে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং সবশেষে কিভাবে নিজের সমগ্র আধ্যাত্মিক শক্তি তাঁর ভেতর সঞ্চারিত ক'রে নিজে তাঁর সঙ্গে আধ্যাত্মিকতায় এক হয়ে মিশে গিয়েছিলেন, তা আমরা লক্ষ্য ক'রে এসেছি। আরো দেখেছি, এই বিবেকানন্দই শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের গভীর তাৎপর্যগুলি ধরতে পেরেছিলেন, এবং তা প্রচার ক'রে গেছেন প্রায় সারা জগৎ জুড়ে।

নিজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ সহায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীগুলি যাচাই ক'রে নিয়েছিলেন তিনি; তারপর শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে বসে লব্ধ সেই সব অমূল্য বাণীগুলি তিনি নিজ অনুভূতি-সঞ্জাত সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বিস্তৃতভাবে, সহজ সরল প্রকাশে তুলে ধরেছেন জগতের সমক্ষে। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী অবলম্বনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনকে উন্নত করার উপযোগী কতকগুলি মূল্যবান ও কার্যকরী সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ ক'রে ফেলেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেহধারণ করেছিলেন নিজ অনুভূতিসহায়ে শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত যুগযুগ-প্রচলিত সাধনপ্রণালীগুলিকে নতুন ক'রে সমর্থন করার এবং সেগুলিকে ব্যক্তিগত পূর্ণতালাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ বলে নির্দিষ্ট করার জন্য; আর বিবেকানন্দ এসেছিলেন জগতের কাছে সে বাণীর ভাষ্য ক'রে দিতে। ব্যক্তিগত পূর্ণতালাভের জন্য আন্তরিক ধারাবদ্ধ প্রচেষ্টাই মানবসভ্যতার মূল গাঁথুনি হওয়া কিজন্য প্রয়োজন, তা বুঝিয়ে দিতে এসেছিলেন তিনি; আর কিভাবে তা করতে হবে, তা দেখিয়ে দিতেও। মনুষ্যহৃদয়ের গভীরতর প্রদেশের স্পন্দন বিশ্লেষণ ক'রে, তার সমস্ত সংশয় ও দ্বিধা তন্নতন্ন ক'রে পর্যবেক্ষণ ক'রে তিনি মানুষের অকৃতকার্যতা ও বর্ণনাহীন দুঃখকষ্টের কারণ কি তা খুঁজে বের করেছিলেন। তাছাড়া মানবজাতির উন্নতির বহুশতাব্দী-বিস্তৃত চলার পথ সবটাই তিনি নিবিষ্টমনে পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখেছেন, তার ক্রমান্বয় উত্থান-পতনের কারণ অন্বেষণ করেছেন, সাংস্কৃতিক অগ্রগতির বিভিন্ন ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণগুলি তুলনা ক'রে দেখেছেন এবং বিশুদ্ধ যুক্তির নিক্তিতে মানব-সভ্যতার বিভিন্ন আদর্শগুলি ওজন করেছেন। আর কোন্ পথে চললে মানবজাতি গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যে উপনীত হতে পারবে, এই সব তথ্যসহায়ে তা আবিষ্কার ক'রে মানুষকে সে-পথের সন্ধান তিনি দিয়ে গেছেন।

শিষ্যের কথার ভেতর দিয়ে জগৎ তাঁর গুরুর কথাই শুনেছে; মানবজাতির সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর সম্পর্ক কোথায়, তা ক্রমে সে বুঝতেও পারছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বিবেকানন্দের জীবন

* লেখকের মূল গ্রন্থ 'Sri Ramakrishna & Spiritual Renaissance' হইতে অনূদিত—সঃ

মিলে কার্যতঃ একটি পরিপূর্ণ জীবন গড়ে উঠেছে। শিষ্য যেন গুরুরই কর্মময় প্রতিরূপ। গুরুর জীবন যেন বেদ, আর তাঁর যোগ্য শিষ্যের জীবন সে বেদের যথোপযোগী ভাষ্য এবং ব্যবহারিক জীবনে তা প্রয়োগ করবার সংক্ষিপ্ত নির্দেশ-গ্রন্থ।

বাস্তবিক, হিন্দুপুরাণের ভগীরথের মতো বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতার স্বচ্ছ সঞ্জীবনী ধারা নামিয়ে নিয়ে এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনরূপ গগনোপম উচ্চতা ও নিভৃততা থেকে; আর, অসুস্থতার আকর যা কিছু ক্লেদ, দূষিত চিন্তার যা কিছু খানা-খন্দ, তা সবই ভাসিয়ে দিয়ে নতুন, হৃদয়গ্রাহী, প্রাণের প্রাচুর্যে ভরা, আধ্যাত্মিক জীবন-সিঞ্চনে ধরণীকে উর্বরা ক'রে দেবার জন্য সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পাষাণ-কারা ভেঙ্গে সে স্রোতস্বতীকে মুক্ত ক'রে ক্রমবিস্তৃত ধারায় প্রবাহিতা ক'রে দিয়েছেন নিম্নের পাহাড় ও উপত্যকার ওপর দিয়ে।

দুর্ভেদ্য পাষাণ

নরেন্দ্রনাথ দত্তের সন্ন্যাস নাম স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতের তৎকালীন রাজধানী কলিকাতায় এক অভিজাত ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) পরিবারে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুআরি তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা ছিলেন তেজস্বিনী, অশেষগুণান্বিতা এবং আচরণে মহীয়সী। পিতা ছিলেন শিক্ষিত, স্বাধীনচিন্তাশীল, দয়ার্দ্রহৃদয় ও উদারপ্রকৃতি মানুষ; আড়ম্বরবহুল জীবন-যাত্রার প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল, বরং বলা চলে, একটু অমিতব্যয়ী ছিলেন তিনি। এদিক দিয়ে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর গুরুর পার্থক্য অনেক-খানি; কারণ···শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মেছিলেন পল্লীর সারল্যময় পরিবেশে। দৈহিক গঠন, মানসিক প্রকৃতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক থেকেও দুজনের মধ্যে ব্যবধান অনেক। শ্রীরামকৃষ্ণ কোমলকায় ছিলেন। তাঁর প্রকৃতিতে ছিল নারীসুলভ কমনীয়তার প্রলেপ; আর সুদৃঢ়-পেশীময় দেহ, 'প্রমেথিয়াস'-এর মতো দুর্দান্ত শক্তিমান এবং পূর্ণ পুরুষোচিত প্রকৃতিসম্পন্ন নরেন্দ্রনাথ ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। নিয়মিত ব্যায়াম-অভ্যাসের ফলে নরেন্দ্রনাথ কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, দৌড়, অশ্বচালনা, সন্তরণ প্রভৃতি সর্ববিষয়েই পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। নির্ভয় যথেচ্ছ গতিবিধির জন্য সঙ্গীদের ভেতর তিনি একটা বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে থাকতেন। যদি বলা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে খাঁটি ব্রাহ্মণোচিত সত্ত্বগুণের বিকাশ ছিল, তাহলে বলতে হবে তাঁর শিষ্যের ভেতর ছিল যথার্থ ক্ষত্রিয়ের রজোগুণের লক্ষণ। নরেন্দ্রনাথ তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই সঙ্গীতে অনুরাগী ছিলেন; কিন্তু একটু পার্থক্য ছিল—ভাবুক শ্রীরামকৃষ্ণ গাইতেন দেশপ্রচলিত সুরে পর্যটক বাউল প্রভৃতির কাছ থেকে শোনা ভজনগান, আর উৎসাহী বাস্তববাদী নরেন্দ্রনাথ যোগ্য শিক্ষকের কাছ থেকে দীর্ঘদিন নিয়মিতভাবে সঙ্গীতশিক্ষা লাভ ক'রে কণ্ঠ- ও যন্ত্র-সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সামান্য লেখাপড়া শিখতেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব রাজী হননি; এদিকে নরেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় পাস করেছিলেন। অসাধারণ বহুমুখী প্রতিভাবলে নরেন্দ্রনাথ কলেজের শিক্ষক ও সহপাঠীদের মুগ্ধ করেছিলেন, একজন দুর্দান্ত তার্কিক বলেও সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন তিনি। ছেলে-বেলা থেকেই কিন্তু ধর্মে তাঁর মতি ছিল; এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য নিশ্চিতই রয়েছে। অপরিণত বয়সে, যখন ছেলেরা খেলার চেয়ে আর কিছুতে বেশী আনন্দ পায় না, তখন

নরেন্দ্রনাথ খুবই ভালবাসতেন ভগবানের কোন মৃন্ময়-মূর্তির সামনে ধ্যানকরার ভঙ্গিতে দীর্ঘকাল বসে থাকতে।

কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে তিনি হাড়ে-হাড়ে যুক্তিপরায়ণ হয়ে উঠলেন। আধুনিক চিন্তাধারায় যুক্তির প্রাধান্যের স্বর তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করল। কিছুদিন ধরে তিনি ইংরেজী সাহিত্যের গভীরচিন্তাপূর্ণ বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে মনোনিবেশ করলেন। অন্তরে তিনি সত্যান্বেষী ছিলেন, কিন্তু শুধু বিশ্বাস ক'রে কোন কিছু গ্রহণ করার চিন্তামাত্রেই তাঁর প্রকৃতি বিদ্রোহী হয়ে উঠতো। আধ্যাত্মিক বা সাধারণ বিদ্যা-সংক্রান্ত বিষয়ে কোন বিবৃতির সত্যতা স্বীকার ক'রে নেবার আগে বিশ্বাসযোগ্য ও সন্দেহাতীত প্রমাণ সহায়ে নিজের যুক্তিকে পরিতৃপ্ত করতে না পারলে তিনি তৃপ্ত হতেন না। গভীর অভিনিবেশ নিয়ে তিনি রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করতেন, পণ্ডিত ও ধর্মাচার্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন, সৌখীন ও পেশাদার ধর্মবক্তাদের কাছে অতি সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে চলতেন, কিন্তু জীবন ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনের অকপট সন্দেহের অন্ধকার দূর করার মতো যথেষ্ট আলোর সন্ধান পেতেন না কোথাও। তিনি দেখলেন, তাঁর প্রবল সত্যানুসন্ধিৎসার তৃষ্ণা মেটাবার পক্ষে অজ্ঞেয়বাদ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষবাদ যথেষ্ট নয়; আদর্শবাদও তাই। সেজন্য, তৎকালে স্বমহিমায় সমাজের শীর্ষারূঢ় কেশবচন্দ্র কর্তৃক প্রচারিত ব্রাহ্মসমাজের জনপ্রিয়, মার্জিত ও যথেষ্ট পরিমাণে খৃষ্টান-ভাবাপন্ন মতবাদের কাছে তিনি কিছুদিনের জন্য আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সত্যান্বেষী মনের তীব্র আকুলতা এই জ্ঞানালোক-উদ্ভাসিত মতবাদেরও সবকিছুর সঙ্গে আপস করতে পারল না; সত্যসত্যই তিনি কিছুকাল হতাশার যন্ত্রণায় নিপীড়িত হয়েছিলেন। অস্থির হয়ে তিনি মহানগরীর সুযোগ্য ধার্মিক ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বেড়াতে লাগলেন; কিন্তু কারো কাছ থেকে এমন কিছু পেলেন না যাতে ভগবানের অস্তিত্বে ও মানুষের পূর্ণতা-লাভের সম্ভাবনায় তাঁর মন নিঃসংশয় হতে পারে।

এই প্রচেষ্টায় ব্যর্থমনোরথ হয়ে যখন বয়সের তুলনায় অতিমাত্রায় অগ্রসর, যুক্তিপরায়ণ এই সত্যান্বেষী যুবক সন্দেহবাদের প্রায় কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন, তখন হঠাৎ একদিন এক ব্রাহ্মভক্তের গৃহে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের ঘটনা এটি; নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন সবে আঠারো পার হয়েছে এবং প্রায় বছর দুই হবে তিনি কলেজে পড়তে সুরু করেছেন। নরেন্দ্রনাথের ভজন শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ মুগ্ধ হলেন এবং নিজ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিসহায়ে তাঁর মধুনিস্যন্দী সঙ্গীতলহরীর অন্তরালে এমন একটা কিছুর সন্ধান পেলেন যাতে তাঁর নিশ্চিত ধারণা জন্মাল যে, উল্কার মতো দুর্বারগতি এই যুবকটির অন্তরে বিপুল শক্তি বিকাশের সম্ভাবনায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে। একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার নিমন্ত্রণ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ তখনই তাঁকে নিজের গণ্ডীর ভেতর টেনে নিলেন। নরেন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনের সব কিছুর সম্ভাবনাই নিহিত ছিল এই দৈবঘটিত সাক্ষাৎকারটির মধ্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনথের এই সাক্ষাৎকার পরে তাঁদের আধ্যাত্মিক মিলনে পরিণত হয়। এই মিলনকে যেন প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক সংস্কৃতির, শাস্ত্রীয় বিশ্বাসের সঙ্গে গর্বোদ্ধত যুক্তির এবং রহস্যবাদের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষবাদের মিলনের প্রতীক বলে মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথ

উভয়েরই দেহ ভারতীয় হলেও সে দুটি দেহের অভ্যন্তরে ছিল দুটি বিভিন্ন ধাঁচের সংস্কৃতির প্রতিনিধিস্বরূপ দুটি বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। একজন সহজ বিশ্বাসে আঁকড়ে ছিলেন প্রাচীনকালের শাস্ত্রোক্ত আদর্শবাদকে, আর একজন উঠে পড়ে লেগেছিলেন সর্ববিধ শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। পরস্পরের সাক্ষাৎকারের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন প্রাচ্য ভাবের মূর্ত প্রতীক, আর নরেন্দ্রনাথ ছিলেন পাশ্চাত্যভাবে অতিমাত্রায় অনুপ্রাণিত। এ-দুটি আত্মার পরবর্তীকালীন মিলনের কথা ভাবলে 'কিপলিং'-এর রূঢ় অসম্ভাব্য ভবিষ্যৎ-বাণীর কথাই মনে জাগে, যদিও তা ভাবের দিক থেকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক সত্যদ্রষ্টা ছিলেন। শাস্ত্রসমূহের ও আচার্যগণের উক্তি যে সবই সত্য, তা তিনি সর্বান্তঃকরণে প্রমাণিত করেছেন। ইন্দ্রিয়- ও বুদ্ধি-সঞ্জাত জ্ঞানের চেয়ে সজ্ঞা-সঞ্জাত জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতেন তিনি বেশী। এই তিনটি বৃত্তিই নিজ নিজ যোগ্য অধিকারের সীমায় সক্রিয় থেকে সমপরিমাণ সাবলীলতা ও ত্রুটিহীনতা নিয়েই তাঁকে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ পর্যবেক্ষণ করতে সহায়তা করেছিল। এবং তাঁর অন্তর্দৃষ্টিপথে তুলে ধরেছিল রহস্যময় বিশ্বের একটি বৃহত্তর, সুসমঞ্জস, অখণ্ড, দিব্য আলেখ্য। এই দর্শনের ফলে তাঁর হৃদয়ে প্রেম, সাম্য ও মৈত্রীর অফুরন্ত নির্ঝরের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। গভীর ও বিপুলপ্রসারী জ্ঞানের আকর তাঁর শান্ত, প্রসন্ন, প্রেমময় চিত্ত বাস্তবিকই পূর্ণতালাভের পরাকাষ্ঠার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর প্রত্যয়ের কথা চিন্তা করলে উপনিষদের সেই দিব্যভাবাবিষ্ট ঋষির কথাই মনে পড়ে, যিনি অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন সমস্ত প্রাণীকে লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন, "বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রগণ এবং যত দিব্যধামবাসিগণ, তোমরা সকলেই শোন : মহা অজ্ঞানান্ধকারের পারে যে জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষ রয়েছেন, আমি তাঁকে জেনেছি ; একমাত্র তাঁকে জানলে তবে মৃত্যুকে জয় করা যায়, অমৃতত্বলাভের দ্বিতীয় আর কোন উপায় নাই।" সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজজীবনে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন ; তাঁর জীবন ভারতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার আদর্শেরই প্রতিমূর্তি।

অপর দিকে, শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শনকালে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন আধুনিক পাশ্চাত্যের অনুসন্ধিৎসা-সচেতন, বিশ্লেষণপরায়ণ, বিচারপ্রবণ, সত্যান্বেষী ও তেজস্বী ভাবের মূর্ত প্রতীক। যুক্তির পূজারী ছিলেন তিনি ; সম্প্রদায়গত ধর্মানুশাসন, ভাবাতিশয্য ও আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের ওপর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না তাঁর। ভাবাবেশে ঈশ্বরীয় রূপ-দর্শনকে বিকারগ্রস্ত লোকের ভুল দেখার চেয়ে বেশী কিছু ভাবতে পারতেন না তিনি। তিনি যে সত্যের সন্ধানী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নাই ; তবে আধ্যাত্মিকতালিপ্সু মুমুক্ষু কোন ভারতীয় সাধকের চেয়ে বরং কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের চিন্তা ও কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁর ভাব ও অনুসন্ধিৎসার সাদৃশ্য ছিল বেশী। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের একনিষ্ঠ চিন্তাধারা-প্রদর্শিত বুদ্ধিবৃত্তির পথে অশেষ প্রয়াসে অক্লান্তভাবে তিনি বহুদূর পর্যন্ত বিচরণ করেছিলেন, পাশ্চাত্যদর্শনের বিভিন্নশাখার জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেছিলেন ; এবিষয়ে সমালোচনাসম্ভূত একটা স্পষ্ট ধারণাও তাঁর হয়েছিল। এমনকি যুক্তিমূলক চিন্তাধারার বিখ্যাত প্রবর্তক হার্বার্ট স্পেনসারের নিকট তাঁর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিজের মৌলিক সমালোচনা পাঠাবার মতো অতিসাহসিকতাও তাঁর ছিল।

জন স্টুয়ার্ট মিলের লেখা পড়ে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অশুভ দিকটা তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠেছিল—যার ফলে ব্রাহ্ম আস্তিকাবাদের চাকচিক্যময় বাহ্যপ্রলেপটি তাঁর মন থেকে উঠে গিয়েছিল, আর তার জন্য অন্তরে আঘাতও লেগেছিল প্রচণ্ড। একটুখানি সান্ত্বনা দিতে পারে এমন কোন ভাব বা অনুপ্রেরণা লাভের আশায় পাশ্চাত্য-চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থগুলির ভেতর থেকে কিছু পাওয়া যায় কিনা তা খুঁজে দেখতে লাগলেন তিনি, শেলীর উগ্র ঈশ্বরবাদ এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের আধ্যাত্মিক ভাবোচ্ছ্বাস থেকেও কিছু পাবার চেষ্টা করেছিলেন। বেদান্তের শুদ্ধ অদ্বৈত ভাবের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ, হেগেলের বিষয়তান্ত্রিক আদর্শবাদ এবং স্বাধীনতা সাম্য ও মৈত্রীরূপ ফরাসী বিপ্লবের মূল আদর্শ নিয়েও কিছুকাল ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলেন তিনি। কিন্তু এসব ভাবের কোনটাতেই তিনি স্থায়ী তৃপ্তি পেলেন না; বরং জীবনের সত্যতা সম্বন্ধে সান্ত্বনাপ্রদ একটা চিন্তাধারার জন্য তাঁর অবিশ্রান্ত অনুসন্ধান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার ফলে তাঁর বিশুদ্ধ বিচারশক্তি তাঁকে টেনে এনেছিল স্থিরনাস্তিক্যবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির প্রায় সমপর্যায়ে। ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ এসেছিল তাঁর এবং প্রসিদ্ধ ঋষিমুনিদের দিব্যদর্শনাদির কথায় সহজে বিশ্বাস করার মতো মনোভাবও তাঁর ছিল না। এই তরুণ উৎসাহীটির হৃদয় যে প্রবল বন্যায় উত্তালতরঙ্গান্দোলিত হচ্ছিল, তা কোন হিন্দু সাধকের ঈশ্বরলাভার্থে আকুল আগ্রহের ঝড় নয়, তা হচ্ছে অসীম শান্তি ও অগাধ জ্ঞানলাভের উন্মত্ত ব্যাকুলতার ঝড়। প্রাচীন হিন্দু বিশ্বাস বলতে যা বোঝায় তার সবকিছুর তৎকালীন প্রতিভূস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের গণ্ডীর ভেতর নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ যখন এসে পড়লেন তখন তিনি ছিলেন সর্ববিধ আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত, পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী স্বাধীন চিন্তাধারার সর্ববিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত কৃষ্টিসম্পন্ন একজন খাঁটি আধুনিক বলতে যা বোঝায়, তাই। (ক্রমশঃ)

"তোমাদের জাতির কল্যাণের জন্য, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য আত্মবলিদানই শ্রেষ্ঠ কর্ম।"

"মহা উদ্যম, মহা সাহস, মহা বীর্য, এবং সকলের আগে মহতী আজ্ঞাবহতা— এই সকল গুণ ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির একমাত্র উপায়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সমালোচনা

নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি—সরলাবালা সরকার। প্রকাশিকা—প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল, কলিকাতা-৩. পৃষ্ঠা – ৫১ + ১২, মূল্য—১'৫০।

'নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি'—রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুলের সদ্যপ্রকাশিত একখানি ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থ। গ্রন্থখানির প্রকাশন সম্প্রতিকালের হলেও তার সঠিক জন্মলগ্নটি বহুদিন বিগত-অতীতের মধ্যে নিহিত। তখন আমাদের পাঠ্য জীবন। আজও মনে পড়ে, অন্যূন অর্ধশতাব্দী পূর্বে, এই গ্রন্থটি যখন প্রথম আত্মপ্রকাশ করে তখন নিরতিশয় আগ্রহে সেটি আমরা সংগ্রহ করেছিলাম, পাঠ করেছিলাম। কারণ, সেদিন নিবেদিতার জীবনকথা সর্ব-সাধারণে বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিল না। যেটুকু ছিল, সেটুকুও একান্ত আংশিক এবং অসম্পূর্ণ ছিল। নিবেদিতার বিশদ জীবনকাহিনী তখনও কেউ রচনাই করেননি। সাময়িক পত্র-পত্রিকাদিতে প্রকাশিত দু'চারটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা অথবা দু'একটি ছোট বড় প্রবন্ধের মধ্য দিয়েই তখন নিবেদিতার সামান্য কিছু পরিচয় আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হত।

অতএব, সরলাদেবীর ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থখানি সেদিন যে একটি অমূল্য সামগ্রীরূপে আমাদের হাতে এসেছিল এবং তার প্রতিটি ছত্র আমাদের কিশোর চিত্তকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল, সেকথা এখনও যেন সুস্পষ্ট মনে পড়ে।··

তারপর কত দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হল, কত অভাবিত পরিবর্তনে দেশের রূপ ও রুচি আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল। ফলে অন্যদিকে যাই হোক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অন্ততঃ এটুকু লাভ হয় যে, ভগিনী নিবেদিতার পুণ্য জীবনখানি ধীরে ধীরে ক্ষণিক-বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে আমাদের মনোভূমির সচেতনতার মধ্যে পুনঃ প্রতিভাসিত হল। আমরা যেন নূতন ক'রে সে মহনীয়া নারীর প্রতি আমাদের জাতীয় ঋণের কথা চিন্তা করতে আরম্ভ করলাম। ক্রমে, তাঁর ঘটনা-বহুল বিচিত্র জীবন এবং নানা সম্পদ সমৃদ্ধ রচনাবলী একাধিক লেখক-লেখিকার নিপুণ বিশ্লেষণ এবং আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠল। রচিত এবং প্রকাশিত হল ছোট-বড় নানা জীবনকথা। কিন্তু সেসব সত্ত্বেও আলোচ্য গ্রন্থখানি তার প্রথম আবির্ভাবকালে যেমন আকর্ষণীয় ও সুখপাঠ্য ছিল—আজও ঠিক তেমনি আছে। অতি অল্প পরিসরে ভগিনী নিবেদিতার মহতী চরিতকথা এমন সুন্দর এবং সার্থকভাবে আর কেউ এ পর্যন্ত চিত্রিত করতে পারেননি, স্বকীয় অভিজ্ঞতার স্পর্শপ্রদান তো অপরের পক্ষে সম্ভবই নয়। কাজেই, আজকের দিনের অতিব্যস্ত পাঠক-পাঠিকার জন্য এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উপযোগী এবং একান্ত উপাদেয়।

বহুদিন পূর্বে লেখা হলেও গ্রন্থটির ভাষা আধুনিক কালের ভাষা-রীতির সঙ্গে সর্বাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে ভাষা যেমনি বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল, তেমনি গতিশীল।

গভীর শ্রদ্ধায় অঙ্কিত একটি অনন্য জীবনালেখ্য বৃহদায়তন না হয়েও যে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হতে পারে, এ গ্রন্থটি যেন তারই সার্থক নিদর্শন। আমরা সর্বান্তঃকরণে এর বহুল প্রচার কামনা করি।

—তামসরঞ্জন রায়

জনশিক্ষা ও সংস্কৃত—অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী। পৃষ্ঠা-১০৪ ; প্রকাশিকা—শ্রীমতী উষাদেবী চক্রবর্তী এম্.এ., বি.টি.। ঋষিধাম, দত্তপুকুর পোঃ, জেলা—২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। মূল্য—৫·৫০।

বর্তমান ভারতবর্ষ রাষ্ট্রভাষা-সংক্রান্ত আলোড়নে যথেষ্ট বিপর্যস্ত। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা-রূপে নিরঙ্কুশ প্রাধান্যদানের দাবী হইতে নানাস্থানে অশান্তির আগুন জ্বলিতেছে। এই দুর্যোগের দিনে পণ্ডিত-অপণ্ডিত-নির্বিশেষে সকলেই এই সমস্যার সমাধানের জন্য চিন্তান্বিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে খ্যাতনামা সংস্কৃতভাষাবিদ্ পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী বিরচিত আলোচ্য পুস্তিকাটির একটি মূল্যবান্ ভূমিকা আছে। এই পুস্তিকাটিতে অধ্যাপক চক্রবর্তী তথ্য ও তত্ত্বের যুক্তিতে সংস্কৃতের সম্পদ ও আবশ্যকতা - এই দুইটি বিষয়কেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতের ভাষাসমস্যার সমাধান ত্রিভাষা-নীতি। এই নীতি অনুসারে প্রথম স্থান লাভ করিবে প্রতি অঞ্চলে আঞ্চলিক মাতৃভাষা। দ্বিতীয় স্থানে থাকিবে "সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক ভাষা" সংস্কৃত এবং তৃতীয় ভাষা হইবে সরকারী ভাষা হিন্দী অথবা ইংরেজী। ভারতীয় সংস্কৃতির ধাত্রী সংস্কৃতভাষা যে জাতীয়তাবোধ-সৃষ্টির ক্ষেত্রে অপরিহার্য, তাহা তিনি দক্ষতার সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সংস্কৃতভাষার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে উদ্ঘাটিত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্রতিটি ভারতীয়ের বিভিন্ন মাতৃভাষায় "পরিণত জ্ঞানলাভের" জন্য সংস্কৃতজ্ঞান একান্ত আবশ্যক। শিক্ষাকে সম্পূর্ণতাদানের ক্ষেত্রেও সংস্কৃত-ভাষার দান যে অশেষ মূল্যবান্ ইহা প্রতিপন্ন করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, জীবনধারণের বিষয়গুলি (informative) ও জীবনগঠনের (formative) বিষয়গুলির মধ্যে শেষোক্ত গঠনাত্মক বিষয়ের শিক্ষা সংস্কৃতভাষার সাহায্যেই সর্বাধিক সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে। পুস্তিকাটির রচনাকালে লেখক সাধারণ পাঠক ও বি. টি. পরীক্ষার শিক্ষার্থী উভয়ের দিকেই সমভাবে লক্ষ্য রাখিয়াছেন। ফলে সংস্কৃত-চর্চার প্রয়োজনীয়তা ও সংস্কৃতভাষার সাংস্কৃতিক মহিমা সম্বন্ধে সকলেই এই যথার্থ মূল্যবান্ পুস্তিকা হইতে বিশেষ সহায়তালাভের সুযোগ পাইবেন।

—**প্রেমবল্লভ সেন**

শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রকাশক: শ্রীপূর্ণচন্দ্র পাল, শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মণ্ডপ 'প্যারীকুঞ্জ'-ঠাকুরবাটী, ৭-এ, তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা ৪। পৃষ্ঠা ৫০, মূল্য পঞ্চাশ পয়সা।

কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য সান্নিধ্যে পবিত্রতীর্থে পরিণত। আলোচ্য গ্রন্থে 'শ্যামপুকুরের বিভিন্ন স্থানে', 'শ্যামপুকুর বাটীতে', 'বরাভয়মূর্তিধারণ'—এই তিনটি অধ্যায়ে মনোজ্ঞভাবে শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই লীলাকাহিনীগুলি ইতঃপূর্বে উদ্বোধন-পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিশেষে 'জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ'-শীর্ষক নিবন্ধটিতে সংক্ষেপে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন-পরিক্রমা হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের উৎসব

বেলুড় মঠঃ গত ৭ই পৌষ (২৩.১২.৬৭) শনিবার কৃষ্ণাসপ্তমীতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাদেবীর ১১৫তম শুভ-জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রত্যুষে মঙ্গলারতি, তৎপরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে বিশেষ পূজা, হোমাদি, ভজন, পাঠ ও কালীকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী বিজয়ানন্দজী সভাপতিত্ব করেন। স্বামী বিজয়ানন্দ দক্ষিণ আমেরিকার বুয়েনস এয়ারিস কেন্দ্রের অধ্যক্ষ; সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য ভারতে আসিয়াছেন। স্বামী ভূতেশানন্দজী, স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী এবং সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন ও বাণী অবলম্বনে অতি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

সারাদিন বহু ভক্ত নরনারী বেলুড় মঠে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রায় ৫,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। খাদ্যাভাব-জনিত বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্নপ্রসাদ দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

শ্রীশ্রীমায়ের বাটীঃ কলিকাতা বাগবাজার পল্লীর যে বাড়ীতে পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবী জীবনের শেষ একাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন, পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত সেই ভবনে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ ১১৫ তম জন্মোৎসব গত ৭ই পৌষ শনিবার কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে মহা উৎসাহে ও আনন্দে অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, ষোড়শোপচার পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'-পাঠ, ভজন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। প্রায় তিন সহস্র ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। প্রসাদ হাতে হাতে দেওয়া হয়। সারাদিন শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী আনন্দ-মুখরিত থাকে। সন্ধ্যারতির পরেও বহু ভক্তের সমাগম হয়। রাত্রে ভজন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কল্পতরু-উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে গত ১লা জানুআরি (১৯৬৮) 'কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে দিবসত্রয়ব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রথম দিন মঙ্গলারতি বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, সঙ্গীত সহযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা, দুইটি কীর্তন সম্প্রদায়ের কালীকীর্তন, শ্রীশ্রীঠাকুরের আদিলীলা পালাকীর্তন 'দান-লীলা' লীলাকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে স্বামী তীর্থানন্দজী কর্তৃক ভাগবত-ব্যাখ্যার পর স্বামী পুণ্যানন্দজীর সভাপতিত্বে স্বামী ভূতেশানন্দজী, স্বামী অমলানন্দজী এবং কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে যুগোপযোগী ভাষণ দেন। সভান্তে শ্রীদ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'অকাল-বোধন—শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব' রামায়ণ কীর্তন করেন।

দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গীতি-আলেখ্য-অনুষ্ঠানের পর জনসভায় সভা-সভাপতিত্ব করেন স্বামী সংস্বরূপানন্দজী; স্বামী অভজানন্দজী বাংলায়, স্বামী শাস্ত্রা-নন্দজী ইংরেজীতে এবং অধ্যাপক শ্রীহীরালাল চোপ্‌রা হিন্দীতে ভাষণ দেন। সকলের বক্তৃতাই সময়োপযোগী হইয়াছিল।

জনসভার পর সঙ্গীত ও কথকতার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি (শ্রীশ্রীঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথ) এবং রাত্রে সরোদ-অনুষ্ঠান মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

তৃতীয় দিন অপরাহ্নে স্বামী রুদ্রাত্মানন্দজী

কর্তৃক উপনিষদ্-ব্যাখ্যার পর ভক্তিমূলক সঙ্গীত হয়। রাত্রে 'সাধক-কবি রামপ্রসাদ' নাটক অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয় অতি সুন্দর হয়।

উৎসবের তিন দিনই কাশীপুর উদ্যানবাটীতে সহস্র সহস্র ভক্তের সমাগম হয়।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে প্রতি বৎসরের ন্যায় গত ১লা জানুআরি 'কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে যথারীতি আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পূজা, পাঠ ও ভজনাদি উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। প্রসাদ হাতে-হাতে দেওয়া হয়। বহু ভক্তের সমাগমে ও ভজন-কীর্তনে যোগোদ্যান আনন্দমুখর হইয়াছিল।

সারদানন্দ-জন্মোৎসব

উদ্বোধনে—শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে গত ২০শে পৌষ (৫.১.৬৮) শুক্রবার শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজ্যপাদ মহারাজের ঘরে ও পার্শ্ববর্তী কক্ষে তাঁহার প্রতিকৃতি সাজানো হইয়াছিল। বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, পূজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজের জীবনী-পাঠ, ভজন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। বহু সাধু ও ভক্তের সমাগমে উদ্বোধন ভবন আনন্দমুখর হইয়াছিল।

সেবাকার্য

গত নভেম্বর মাসে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত সেবাকার্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরিত হয়:

বন্যার্ত-সেবাকার্য

পশ্চিমবঙ্গে—মেদিনীপুর জেলায় বন্যার্ত-সেবাকার্যে পিংলা, পিচাবনী, আলাদারপুট, রাইপুর ও ছত্রধরা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে চাল ৭৪৯ কুইণ্ট্যাল, গম ২৬৬ কুইণ্ট্যাল এবং ১,৯০০ খানি ধুতি ও শাড়ী বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—২২,৪৭৩।

ঘূর্ণিবাত্যা-পীড়িতদের সেবা

ওড়িশায়—কটক জেলায় ঘূর্ণিবাত্যা-পীড়িতদের সেবাকার্যে পটমুন্দাই সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে চাল ৪২৬ কেজি, মটর ৩২ কেজি, গুঁড়া দুধ ৮ প্যাকেট, ধুতি ও শাড়ী ২৩১ খানি, শিশুদের পোশাক ৫৫টি এবং ৩৫ খানি কম্বল বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—২৩০।

ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সেবা

মহারাষ্ট্রে—রামকৃষ্ণ মিশনের বোম্বাই কেন্দ্রকর্তৃক কয়নানগরে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

ছাত্রগণের কৃতিত্ব

নরেন্দ্রপুর মহাবিদ্যালয়ের যে ৬৫ জন ছাত্র ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. এবং বি. এসসি. পরীক্ষা দিয়াছিল, আনন্দের বিষয়, তাহারা সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

রাঁচি—রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা হাসপাতালের বার্ষিক কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৬—মার্চ, ১৯৬৭) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে এই স্যানাটোরিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রতিষ্ঠা-কালে শয্যাসংখ্যা ছিল ৩২; বর্তমানে ২৪০টি শয্যা আছে, তন্মধ্যে ১৩টি কেবিন ও ১৩টি কুটির।

রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাকেন্দ্রটি একটি পূর্ণাঙ্গ টি বি. স্যানাটোরিয়ামে পরিণত হইয়াছে। এখানে সর্বপ্রকার যক্ষ্মারোগীর আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রোগনির্ণয়, চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা আছে। আরোগ্য-লাভের পর রোগীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়; রোগমুক্ত রোগীদিগকে ল্যাবরেটরি, এক্স রে, নার্সিং, স্টোর, অফিস, পাওয়ার-হাউস, ওয়াটার-ওয়ার্কস, টেলারিং প্রভৃতি স্যানাটোরিয়ামের বিভিন্ন বিভাগে বৃত্তিমূলক কর্ম শিক্ষা দেওয়া হয়।

আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫৪৮; তন্মধ্যে ৩৩৭ জন রোগী নূতন ভরতি হইয়াছে এবং ২১১ জন পূর্ববৎসরের। বৎসরের মধ্যে ৩৬০ জন রোগমুক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে; বৎসরের শেষে ১৮৮ জন রোগী চিকিৎসাধীন ছিল। ১০০ জন রোগীর অস্ত্রচিকিৎসা করা হয়। ৯১ জন রোগীকে সম্পূর্ণ বিনা-খরচে এবং

১৮ জন রোগীকে কম-খরচে চিকিৎসা করা হইয়াছে; কলিকাতা ও পাটনার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রদত্ত সম্পত্তির আয় হইতে এবং জনসাধারণের দানে বিনা-ব্যয়ে ও অল্প ব্যয়ে এতগুলি রোগী চিকিৎসালাভ করিয়াছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার বদান্যতায় ১৪৭টি ফ্রি-বেডের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে। স্থানীয় দরিদ্র রোগীদিগকে বিনা-খরচে চিকিৎসার অগ্রাধিকার লাভের সুযোগ দেওয়া হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে স্যানাটোরিয়ামের বহির্বিভাগস্থ চিকিৎসালয়ে ৪৯১ জন যক্ষ্মারোগী এবং অন্যান্য রোগাক্রান্ত ৯৩৫ ব্যক্তি বিনা ব্যয়ে চিকিৎসালাভ করিয়াছে।

৪০ জন রোগী আরোগ্যলাভের পর স্থানীয় আরোগ্যোত্তর উপনিবেশে স্থান পাইয়াছে; ইহাদের অধিকাংশকে স্যানাটোরিয়ামে নানা প্রকার বৃত্তিমূলক কর্ম শিক্ষা দেওয়ার পর বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত করিয়া জীবিকা-নির্বাহের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজনীয় এই জনহিতকর সেবাপ্রতিষ্ঠান যক্ষ্মা-স্যানাটোরিয়ামের বার্ষিক ব্যয় সম্পূর্ণ সঙ্কুলান হইতেছে না, আয় অপেক্ষা ব্যয় প্রতিবর্ষেই অধিক হইতেছে। এই বিষয়ে আমরা সহৃদয় সরকারের এবং বদান্য জনগণের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আমেরিকায় বেদান্ত

সেণ্ট লুই বেদান্ত-সোসাইটির বার্ষিক (এপ্রিল, ১৯৬৬ মার্চ ১৯৬৭) সংক্ষিপ্ত কার্য-বিবরণী: কেন্দ্রাধ্যক্ষ—স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ।

(১) রবিবারের ধর্মালোচনা: সোসাইটির উপাসনা-মন্দিরে গ্রীষ্মকালে দশ সপ্তাহ ব্যতীত প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন অবলম্বনে বক্তৃতা দেন। ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যথা—ইউনাইটেড হিব্রু টেম্পল, ফার্স্ট ইউনিটেরিয়ান চার্চ, সোসাইটি অব ফ্রেণ্ডস, ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়, সেণ্ট লুই বিশ্ববিদ্যালয়, লিনডেনউড কলেজ, ওয়েবস্টার কলেজ হইতে অনেকে যোগদান করেন। শহরের বাহিরের ভক্তবৃন্দও মাঝে মাঝে সভায় যোগ দেন। আলোচ্য বর্ষে ৪৫টি রবিবাসরীয় ভাষণ প্রদত্ত হইয়াছিল।

(২) ধ্যান ও কথোপকথন: প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় কেন্দ্রাধ্যক্ষ মহারাজ ধ্যান-শিক্ষা ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যার ক্লাস করেন। আলোচ্য বর্ষে 'নারদীয় ভক্তিসূত্র' এবং কঠ- ও কেনো-পনিষৎ আলোচিত হইয়াছিল। সভায় জিজ্ঞাসু শ্রোতাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহের উত্তর দেওয়া হয়। ছাত্রগণ এবং বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষায়তনের সভ্যগণ ক্লাসে যোগ দিয়াছিলেন।

গ্রীষ্মাবকাশের সময় যখন নির্দিষ্ট ধর্মালোচনা বন্ধ ছিল, তখন সোসাইটির বেদান্ত-ক্লাসের ছাত্রগণ রবিবার সকালে ও মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিয়মিত প্রার্থনা ও ধ্যানাভ্যাসে এবং স্বামী সৎপ্রকাশানন্দের 'টেপরেকর্ড-করা' বক্তৃতা শুনিয়া অতিবাহিত করিতেন।

সারা বৎসর ধ্যান ও নীরব উপাসনার জন্য ছুটির দিন ব্যতীত সপ্তাহের সব দিনে বেলা ১১টা হইতে ১২টা পর্যন্ত সোসাইটির উপাসনা-মন্দির খোলা রাখা হইয়াছিল।

(৩) মাসিক 'কথামৃত'-ক্লাস: প্রতি মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সোসাইটির সদস্যবৃন্দ ও বন্ধুগণের নিকট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত আলোচিত হইয়াছিল। এই সময় স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের নিকট শ্রুত ঘটনাবলী প্রসঙ্গক্রমে বিবৃত করেন।

(৪) অতিরিক্ত সভা: সোসাইটিতে হিন্দুধর্মের প্রধান মতবাদসমূহ আলোচনা করিবার জন্য অতিরিক্ত কয়েকটি সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। এই আলোচনা সভাগুলিতে বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, মহিলা-সমিতির সদস্যাগণ এবং বেদান্ত সোসাইটির সভ্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

(৫) নানাস্থানে বক্তৃতা: কনকরডিয়া থিয়োলজিক্যাল সেমিনারী এবং মেরীভিলে কলেজে আমন্ত্রিত হইয়া স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ যথাক্রমে 'ভগবদ্গীতার বাণী' ও 'ঈশ্বরসন্নিধানে অগ্রগতি' সম্বন্ধে ভাষণ দেন এবং জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহের উত্তর দেন।

(৬) **চিকাগো বেদান্ত-সোসাইটি পরিদর্শন :** চিকাগো শহরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিয়া স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ 'বিশ্ব-ঐক্য-বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ভবিষ্য দৃষ্টি' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। এই উৎসব-সভায় স্বামী প্রভবানন্দ প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন এবং উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। চিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটির নূতন ভবনের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ পূজা ও বক্তৃতাদিতে অংশ গ্রহণ করেন।

(৭) উৎসব : আলোচ্য বর্ষে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা ও আলোচনাদি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রসাদ-দানের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। একদিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন অবলম্বনে রচিত চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত গুডফ্রাইডে ও খৃষ্টজন্মদিবস সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় পূজাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

(৮) **সন্ন্যাসী পরিদর্শকবৃন্দ :** আলোচ্য বর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের যেসব সন্ন্যাসী সেণ্ট লুই বেদান্ত সোসাইটি পরিদর্শন করেন, তাঁহাদের নাম :

স্বামী প্রভবানন্দ, স্বামী বন্দনানন্দ, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী ভাস্থানন্দ, স্বামী শান্তানন্দ, স্বামী বিবিদিষানন্দ, স্বামী পবিত্রানন্দ, স্বামী সর্বগতানন্দ।

(৯) **'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'গ্রন্থ বিতরণ :** সোসাইটির ২৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত- (ইংরেজী সংস্করণ) বিতরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে। সর্বসমেত ৩০৪ খানি 'The Gospel of Sri Ramakrishna' (abridged de luxe edition) আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও সাধারণ গ্রন্থাগারে বিতরিত হয়।

(১০) **পুস্তক-উপহার :** স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ-প্রণীত জ্ঞানযোগের সাধন-প্রণালী (Methods of Knowledge) পুস্তকের ১১২ কপি সোসাইটির ভক্ত ও বন্ধুবর্গকে, গ্রন্থাগারসমূহে এবং সন্ন্যাসিবৃন্দকে উপহার দেওয়া হইয়াছে।

(১১) **উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কার্য :** আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ৪৭ জন বিশিষ্ট অতিথি সোসাইটি পরিদর্শনে আসেন এবং উপাসনাদিতে যোগদান করেন।

সোসাইটির সদস্যবৃন্দ গ্রন্থাগারের পুস্তক-সমূহের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ বহু আগ্রহশীল ব্যক্তিকে ধর্মবিষয়ে উপদেশ দেন।

প্রচারকার্য

গত এপ্রিল মাস হইতে ২০শে জুলাই পর্যন্ত স্বামী প্রণবাত্মানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—বোম্বে, রামকৃষ্ণ আশ্রম—রাজকোট, জুনাগড়, জামনগর, গোণ্ডা, ভেজাগ্রাম, হিংনা, বাড়োয়ারা, মোটিমারড্, পোরবন্দর, দেওড়ী, রামকৃষ্ণ সেবামন্দির—প্যাটেল বিদ্যানগর, সরদার প্যাটেল বিবেকানন্দ বিদ্যালয়—আমেদাবাদ, অঞ্জলি সোসাইটি—আমেদাবাদ, মডেল হাই স্কুল—আমেদাবাদ, সরস্বতী বিদ্যামন্দির হাই স্কুল—আমেদাবাদ, যোগাশ্রম আমেদাবাদ, বেঙ্গলী ক্লাব—আমেদাবাদ, মহিলামণ্ডল—পালানপুর, পালানপুর ঠাকুরবাড়ী, বিদ্যামন্দির পালানপুর, ডিসা, ডিসা হাই স্কুল, আদর্শ হাইস্কুল—ডিসা, মাউণ্ট আবু বালিকা বিদ্যালয়—মাউণ্ট আবু, টিচার্স ট্রেনিং স্কুল মাউণ্ট আবু, মধ্য ইংরেজী স্কুল—মাউণ্ট আবু, টিবেটিয়ান স্কুল—মাউণ্ট আবু, হাই স্কুল—আবু রোড, বালক মন্দির—আবু রোড ইত্যাদি স্থানে ছায়াচিত্র-সহযোগে 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ,' 'জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে মোট ৪৮টি বক্তৃতা দিয়াছেন, তন্মধ্যে ৪৬টি হিন্দীভাষায় ও ২টি বাংলা ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে।

স্বামী সর্বাত্মানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, স্বামী সর্বাত্মানন্দ (গঙ্গাধর মহারাজ) গত

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬৭, রাত্রি ২টা ৩৫ মিনিটের সময় কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ৬৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত ১২ই ডিসেম্বর তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে যথোপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষাদির ব্যবস্থা করা হয়। পরে দ্বিতীয় আক্রমণে তাঁহার জীবনাবসান ঘটে।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে স্বামী শিবানন্দজীর নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কর্ম করিলেও প্রধানতঃ তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও সেবাদির কার্যে নিরত থাকিতেন। প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠে এবং শাখা-কেন্দ্র করাচী, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, মাদ্রাজ, কামারপুকুর প্রভৃতি আশ্রমে তিনি পূজারীরূপে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাপূজার কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। গত ১৫ বৎসর যাবৎ তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি সরল, কর্মঠ এবং ধ্যানপরায়ণ সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগে সঙ্ঘের একজন উত্তম সাধুর অভাব ঘটিল।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ-সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

নব বারাকপুর: বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে পরিষদের মাসিক অধিবেশনে স্বামী অমৃতত্বানন্দ মহারাজ (বেলুড় মঠ) যে ধারাবাহিক বক্তৃতামালার সূচনা করিয়াছিলেন গত ১৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার স্থানীয় শক্তিসংঘে তাহার দ্বিতীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐদিন তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুধ্যানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

গত ১৯শে নভেম্বর শক্তি সংঘে তিনি তাঁহার তৃতীয় বক্তৃতায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশদভাবে আলোচনা করেন। উভয় সভায় পৌরোহিত্য করেন ডক্টর মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার।

মণিপুর: গত ১৪ই নভেম্বর হইতে ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলার মণিপুর গ্রামে শ্রীবিভূতিভূষণ মণ্ডলের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসত্রয়ব্যাপী উৎসব সুষ্ঠুভাবে ও সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিবস নামসংকীর্তনাদি, দ্বিতীয় দিবস শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজাদি ও প্রসাদবিতরণ এবং তৃতীয় দিবস ধর্ম-সভা ও 'দানবীর হরিশ্চন্দ্র' যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী বিশ্বদেবানন্দজী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন স্বামী সুশান্তানন্দজী। প্রায় তিন হাজার লোককে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়।

ভেলিয়া: গত ৭ই পৌষ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে তেলোভেলোর ডাকাতে-কালীর প্রান্তরে শ্রীশ্রীমায়ের নির্মীয়মাণ মন্দির-প্রাঙ্গণে বিশেষ পূজা, হোম, পাঠাদির আয়োজন হইয়াছিল। স্থানীয় ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা'র জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সহস্রাধিক ভক্তকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়।

কার্য-বিবরণী

শ্রীসারদা-সংঘ: শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী উৎসবের সময় শ্রীসারদা-সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে ভারতের নানা স্থানে নিখিলভারত সারদা-সংঘের ২৩টি শাখা হইয়াছে। প্রতি দেড় বৎসর, দুই বৎসর পর পর সংঘের সম্মিলনী হয়। শ্রীমতী সুভদ্রা হাক্‌সার সংঘের সাধারণ সম্পাদিকা।

সারদা-সংঘের কলিকাতা কেন্দ্রের অধিবেশন সাধারণতঃ প্রতি মাসের প্রথম সোমবারে হইয়া থাকে। অধিবেশনে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠের পর কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভাষণ দিয়া থাকেন। গত ২৪শে জুলাই সংঘের বার্ষিক অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া অনবদ্য ভাষায় শ্রীশ্রীমায়ের কথা বিবৃত করেন।

গত চার বৎসর যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব একটানা ১০১ ঘণ্টা ধরিয়া প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। অখণ্ড পাঠ ('কথামৃত', 'লীলা-প্রসঙ্গ', গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি), পূজা, আরতি, কীর্তন, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। অহোরাত্র ভগবৎনাম ও গানে মুখরিত হইয়া গৃহে একটি পবিত্র পরিমণ্ডল সৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীমায়ের ও স্বামীজীর উৎসব ১২ ঘণ্টা ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হয়।

কলিকাতা সংঘ চাকুরিজীবী মেয়েদের জন্য একটি হস্টেল পরিচালনা করেন। এই আবাসিক ভবনে নানা কর্মে রত ১৫২ জন মহিলা আছেন।

জনকল্যাণকর কাজে সংঘ সাধ্যমত সাহায্য করেন। এবার জওয়ানদের পরিবারের জন্য ২২০৲, বিহার খরাত্রাণের জন্য বেলুড় মঠে ২৫০৲, এবং বাঁকুড়া খরাত্রাণের জন্যও কিছু টাকা পাঠানো হইয়াছে। প্রতিমাসে কামার-পুকুরে ৺রঘুবীরের সেবার জন্য ১১৲ ও কোয়াল-পাড়া মাতৃমন্দিরের জন্য ১১৲ পাঠানো হয়। ৺জগদ্ধাত্রীপূজায় জয়রামবাটীতে দুর্গত গ্রাম-বাসীদের জন্য ধুতি, শাড়ী, জামা ইত্যাদি পাঠানো হয়। ছাত্রীদেরও অর্থসাহায্য করা হইয়া থাকে যথাসাধ্য।

আমাদের অন্যান্য শাখায়ও নানাবিধ জন-সেবামূলক কাজ হয়। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অমরাবতীর শাখা; সংঘ কর্তৃক সেখানে একটি কুষ্ঠাশ্রম পরিচালিত হয়।

স্কুলে আবশ্যিক সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

গত ২৫শে ডিসেম্বর শ্রীঅনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার পাটনায় অনুষ্ঠিত একটি সভায় বলেন, "মাট্রি-কুলেশন স্ট্যাণ্ডার্ড পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে সংস্কৃত-শিক্ষা আবশ্যিক হওয়া প্রয়োজন। ভারতে ইংরেজী ভাষা যে জাতীয় সংহতির সহায়তা করিতেছিল, সে সংহতিসাধন সংস্কৃতই করিতে পারে।"

তিনি বলেন, "সমগ্র ভারতে জাতীয় চিন্ত-সায়রে দোলা দিয়া জাতিকে একসূত্রে গাঁথিতে পারিবে সংস্কৃত-শিক্ষাই। সংস্কৃতের প্রভাব সারা ভারত জুড়িয়া; তামিল ভাষার শতকরা ৫০ ভাগ শব্দ, তেলেগুর শতকরা ৭৫ ভাগ শব্দ এবং মালয়ালমের শতকরা ৯০ ভাগ শব্দই মূলতঃ সংস্কৃত হইতে গৃহীত। ভারতের মহাকাব্য ও পুরাণগুলিও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। কাজেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রবেশ-দ্বারই হইল সংস্কৃত।"

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৭ই ফাল্গুন (১. ৩. ৬৮), শুক্রবার, শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে ও অন্যত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৩তম পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা, পাঠ ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে এবং পরবর্তী রবিবার ১৯শে ফাল্গুন (৩. ৩. ৬৮) এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইবে।

উদ্বোধন

দিব্য বাণী

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো ব নাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥

—কঠোপনিষদ্ ,২।২।১৩

(বিপুল বিশ্বে সকল কিছুই বিনশ্বর ;
যাহা হতে তারা হয়েছে সৃষ্ট
অবিনাশী তাহা—ভগবান, ঈশ্বর।
ব্রহ্মা হইতে তৃণাবধি সবই ভিন্ন ভিন্ন চেতন জীবের প্রায়
প্রতিভাত হয় ; আসলে সবারই চেতন সত্তা একটিই—ভগবান।
তাঁহারি শক্তি, তাঁরি ইচ্ছাই নিয়মরূপেতে জগতের সব ঠাঁই
ঘটায় সকল ঘটনাই, তাই কর্মেতে মোরা যথাকাম ফল পাই।)

অনিত্য সব বস্তুর মূলে নিত্য সত্তা যিনি,
চেতানারূপেতে বিরাজিত যিনি চেতন জীবের মাঝে,
এক হইয়াও বিধান করেন বহুর কর্মফল,
জগৎকারণ, জগদীশ্বর সেই পরমেশ্বরে
আপনারি মাঝে, চিত্তকমলে যারা দরশন করে,
আর কেহ নয়, কেবল তারাই শাশ্বত শান্তির
অধিকারী হয় ; (চিরপ্রশান্ত শান্তিসায়র তিনি।)

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাস্তবতা

আমরা যাহা কিছু করি, কল্পনা করি, বাস্তব জীবন বলিতে যাহা বুঝি তাহাতে তাহার উপযোগিতা যদি না থাকে তাহা হইলে তাহার মূল্য কিছু আছে কি? আমাদের সকলেরই মতো শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলিয়াছেন—না। কোন কল্পনা, এমন কি সত্যও, তা সে যত উচ্চাঙ্গেরই হউক না কেন, তাহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়া যদি জীবনের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে না পারা গেল, তবে তাহা দ্বারা আমাদের লাভ কি হইবে? সিদ্ধি খাইলে নেশা হয়, ইহা জানিলে বা মুখে আওড়াইলে কোন লাভ নাই, আমাদের নেশা তাহাতে হইবে না। নেশা করিতে হইলে সিদ্ধি কিছুটা যোগাড় করিয়া খাইতে হইবে; যোগাড় করিয়া হাতে ধরিয়া রাখিলেও নেশা হইবে না, বাঁটিয়া খাইতে হইবে।

এই বাস্তবতাবোধ সম্বন্ধে তিনি অন্যান্য সত্য-দ্রষ্টাগণের মতো সজাগ ছিলেন বলিয়াই শাস্ত্র-জ্ঞান-অর্জন অপেক্ষা অধ্যাত্মজগতের সত্যগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার প্রয়াসের উপরই জোর দিতেন বেশী। অবশ্য কিভাবে তাহা করিতে হইবে জানার জন্য, নির্দেশলাভের জন্য যেটুকু প্রয়োজন তাহা তো জানিতেই হইবে, আর মনকে তদভিমুখী করিবার জন্যও। কিন্তু সে আর কতটুকু? শ্রীরামকৃষ্ণের বাস্তবতা-নিষ্ঠার অবিসংবাদিত পরিচয় অধিকারিভেদে, শক্তিভেদে বিভিন্ন ব্যক্তিকে তাহার ধারণা ও সাধনা করার শক্তির সীমা পর্যন্তই তাঁহার উপদেশদান, ছোট বড় সকলকেই উৎসাহদান। সাধারণ মানুষের সীমিত উপলব্ধি-শক্তির নিকট যাহা বাস্তব বলিয়া বোধ হয়—আমাদের প্রতিদিনের দেখা এই বৈচিত্র্যময় স্থূল জগৎ—বাস্তবতার সেই সর্বনিম্ন স্তর হইতে শুরু করিয়া "ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু"-রূপ বাস্তবতার চরম স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত অস্তিত্বকেই তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যেগুলি বস্তুর আপেক্ষিক স্তর, সেগুলিকেও যথোচিত মূল্য দিয়াছেন। যাহারা সত্যের নিম্নতম ভূমিকেও বাস্তব বলিয়া বোধ করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহার ঊর্ধ্বে তাকাইবার শক্তি যাহাদের নাই, তাহাদেরও তিনি উপেক্ষা করেন নাই কখনও, অসীম সহানুভূতি লইয়া সাহায্য করিয়াছেন তাহার বাস্তবতাবোধকে সাধ্যমত অধিকতর উন্নত করিতে, তাহার বোধশক্তিকে বর্ধিত করিতে। তাই অদ্বৈততত্ত্বের উপলব্ধির পরও কেশবচন্দ্র সেনের রোগমুক্তির জন্য 'সুবচনী'-র নিকট ডাব-চিনি মানা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল, তাই সম্ভব হইয়াছিল সমান আন্তরিকতা লইয়া গৃহস্থভক্তগণকে এবং নরেন্দ্রনাথকে পৃথকভাবে আপাতবিরোধী উপদেশদান—'সংসারে থেকেও তাঁকে পাওয়া যায়', 'সত্যি বলছি, তোমরা সংসার করছো এতে দোষ নেই', 'গৃহস্থগণের পক্ষে শাস্ত্রের অবিরোধী সামান্য ভোগ তত দোষের নয়', এবং 'বাবা, দ্বাদশ বৎসর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করলে তবেই মনবুদ্ধি শুদ্ধ হয়, ভগবান সেরূপ মনবুদ্ধিরই গোচর।'

তবে বারংবার তিনি একথা বলিয়াছেন যে, আমাদের দৃষ্টিতে যাহা বাস্তব বলিয়া প্রতিভাত তাহাকেই একমাত্র বাস্তব বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহারই মধ্যে যদি নিজেদের উপলব্ধি-শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিই, তাহার ঊর্ধ্বে উঠিবার চেষ্টা না করি, তাহা হইলে হাজার চেষ্টা করিলেও যাহা আমরা সকলেই চাই, যাহার জন্য আমাদের জীবনের সকল প্রচেষ্টাই

নিয়োজিত সেই দুঃখকষ্টকে ও মৃত্যুকে এড়াইয়া যাওয়া এই বাস্তবতার সীমার মধ্যে থাকিয়া কখনই সম্ভব হইবে না। উহা লাভ করিতে হইলে উচ্চতর স্তরে বোধশক্তিকে উন্নীত করিয়া উচ্চতর বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করিতেই হইবে। যেমন, আমরা নিজেদের যতদিন দেহ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিব ততদিন বুদ্ধিতে 'আমি দেহ নই' প্রভৃতি যতকিছু তত্ত্বকথাই স্তূপাকার করি না কেন, যতই পড়ি বা শুনি না কেন 'দেহের সুখ-দুঃখ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না. দেহের বিনাশে আমার বিনাশ নাই,' বাস্তবক্ষেত্রে তাহাতে আমরা দুঃখ ভয়ের হাত হইতে রেহাই পাইব না; পায়ে কাঁটা ফুটিলেই 'আমার যন্ত্রণা হইতেছে' বোধ হইবে। মনের বেলাও তাই। দেহাত্ম-বোধের যে স্তরকে আমরা বাস্তব বলিয়া অনুভব করিতেছি, সে স্তরে সুখের সঙ্গে দুঃখ, জন্মের সঙ্গে মৃত্যু থাকিবেই। সে স্তরে থাকিয়া এসবকে এড়ানো অসম্ভব। প্রাচীনকাল হইতে চেষ্টা করিয়া আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সব দেশের মানুষ নানাভাবে ইহার জন্য চেষ্টা করিতেছে নূতন নূতন বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যের প্রয়োগ, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির মাধ্যমে। কিন্তু ফল বিশেষ কিছু হয় নাই। দুঃখের একটি পথ রুদ্ধ হইয়াছে তো আর একটি প্রশস্ততর বা নূতন একটি পথ সৃষ্ট হইয়াছে মাত্র; শারীরিক দুঃখ কমিয়াছে তো মানসিক দুঃখ বাড়িয়াছে। যে জগৎকে আমরা বাস্তব বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি, যাহার মধ্যে নিজেকে দেহ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার অস্তিত্বের মূলেই রহিয়াছে সুখ দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত, তাহারই মধ্যে থাকিয়া দুঃখকে মৃত্যুকে এড়াইবার কোন উপায়ই নাই। এড়াইবার একমাত্র উপায় এই স্তর হইতে নিজেকে উঠাইয়া লওয়া। যদি কোনওরূপে নিজের প্রত্যক্ষ করিবার শক্তিকে বাড়াইয়া নিজেকে দেহ হইতে, পরে মন হইতেও পৃথক অমর সত্তারূপে প্রত্যক্ষ করা যায়, তবে আর সেই সব স্তরে সীমিত দুঃখ-মৃত্যু প্রভৃতি আমাদের স্পর্শও করিতে পারে না। পূর্বগ অসংখ্য সত্যদ্রষ্টার মতো শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আমরা যে দেহমন হইতে পৃথক "শুদ্ধবোধস্বরূপ"—ইহা কল্পনা নয়, বাস্তব। এই "শুদ্ধবোধস্বরূপ"-কেই, "আমাদের সকলেরই স্বরূপ"-কেই ভগবান বলা হয়; ইহার বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করার (বুদ্ধিগত করা মাত্র নয়) নামই ভগবানলাভ। ইহার বাস্তবতা-উপলব্ধির সঙ্গেসঙ্গেই যে দুঃখকষ্টাদি আর আমাদের স্পর্শ করিতে পারে না, তাহাও তিনি বলিয়াছেন নিজ প্রত্যক্ষের ভিত্তিতেই দাঁড়াইয়া—"ভগবানলাভ হলে খোরো নারকেলের মতো হয়ে যায়—দেহের সুখ-দুঃখ তাকে আর স্পর্শ করতে পারে না।" খোরো নারকেল—ঝুনা নারিকেল, যাহা খুব শুকাইয়া গেলে শাঁস খোল হইতে আলাদা হইয়া যায়, নাড়িলে ভিতরে 'খর্ খর্' করিয়া নড়ে। নিজের স্বরূপের বাস্তবতা উপলব্ধি হইলে সেইরূপ দেহ হইতে যে আমরা পৃথক, তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। কাঁচা অবস্থায় নারিকেলে শাঁস, খোল, ছোবড়া সব একসঙ্গে জড়াইয়া থাকে; সাধারণ অবস্থায় আমরাও তেমনি দেহ-মন প্রভৃতি সব কিছুকেই 'আমি' বলিয়া বোধ করি, এসব হইতে নিজেদের পৃথক বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। এটি না করিতে পারিলে কিন্তু 'সিদ্ধি খাওয়া'ই হইল না। সিদ্ধি পাইয়াও হাতে রাখিয়া "নাড়া-চাড়া" করিলে—গুরুকৃপা ও স্বরূপ-উপলব্ধির পথের সন্ধান পাইয়াও কাজে না লাগাইলে—নেশা হইবে না, দুঃখ-ভয়ের হাত এড়াইয়া সদানন্দময়, বিগত-ভয় হওয়া যাইবে না।

এই বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করিবার উপায় কি? একমাত্র উপায় মনবুদ্ধিকে শুদ্ধ করা, সূক্ষ্ম বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করিবার মতো যোগ্যতা অর্জন করা; পবিত্রতা ও একাগ্রতার সাধনাই ইহার সহায়ক। একাগ্রতাই জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ, শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞান নয়, সর্ববিধ জাগতিক জ্ঞানলাভেরও। আর পবিত্রতা বা সংযম ছাড়া মনকে সম্পূর্ণ একাগ্র করাও সম্ভব নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মে ভগবান-লাভের উপায় বলিয়া ঘোষিত আরাধনা, জপ, ধ্যান, অনুষ্ঠানাদি যত প্রকার ধর্মাচরণ আছে তাহার সবগুলিরই একমাত্র লক্ষ্য, যে-জগৎকে আমরা বাস্তব বলিয়া ভাবি সেখান হইতে মনকে সরাইয়া আনিয়া ভগবানে বা নিজের স্বরূপে বা উচ্চতম সত্যে একাগ্র করার সহায়তা করা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বারবার আমাদের এই উপদেশই দিয়াছেন—যে যেখানে যে অবস্থায় আছ সেখান হইতেই, যাহার যতটুকু শক্তি আছে সংযম-অভ্যাস এবং মনকে ভগবানে একাগ্র করার চেষ্টা কর, যথাসাধ্য চেষ্টা কর মনের উপর তাঁহার চিন্তার ছাপ দিয়া চলিবার। অধিকারিভেদে বিভিন্ন প্রকারে ইহা করিবার উপদেশ দিয়াছেন তিনি; যাহার যাহা করিবার মতো শক্তি নাই, তাহাকে সেরূপ নির্দেশ কখনো দেন নাই; তবে নিজের সাধ্যমত মনকে যে সত্যের দিকে নিবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিতেই হইবে, তাহা সকলকেই বলিয়াছেন। যেমন, কোন সুরাসক্ত ব্যক্তিকে মদ্যপান ত্যাগ করিতে বলেন নাই, কিন্তু খাইবার পূর্বে মা-কে নিবেদন করিয়া খাইতে বলিয়াছিলেন। যেমন, যে গৃহস্থ তাহাকে সংসারত্যাগ করিতে বলেন নাই, সংসারে থাকিয়াই ভগবানের দিকে মন রাখিতে বলিয়াছেন, যাহার ফলে মন ক্রমশঃ নিম্নতর বাস্তব হইতে উচ্চতর বাস্তবকে উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে—"তোমরা সংসার করছো, এতে দোষ নেই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হলে হবে না। এক হাতে কাজ করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো।" আবার সর্বত্যাগের উপদেশও দিয়াছেন নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে; কিন্তু সকলকে নয়। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছেন, সংসারে থাকিয়া কিভাবে ভগবানলাভ করা যায় সেই প্রসঙ্গ হইতেছে। হঠাৎ কেশববাবু হাসিয়া বলিলেন: 'ইনি এখন বলছেন সংসারে থেকেই হয়, একটু পরেই কুটুস্ ক'রে কামড়াবেন—সব ত্যাগ না করলে হবে না।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন, 'না, না, তোমাদের কামড়াবো কেন?'

সত্যবস্তুতে মন একাগ্র করাই উদ্দেশ্য, যাহার পক্ষে যে পথে তাহা করা সম্ভব। ইহারই নাম সাধনা—সত্যবস্তুকে প্রত্যক্ষ করিবার মতো যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা। ধর্ম বলিতে এইটিই বুঝায়, কোন মতবাদে বিশ্বাসমাত্র নয়। সত্য যদি শাস্ত্রের বা সত্যদ্রষ্টাগণের কথামাত্রই থাকে আমার কাছে, তাহাতে লাভ কি হইল? চেষ্টা করিতে হইবে উহার বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করিতে। সিদ্ধি খাইলে কেন নেশা হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ জানিবার জন্য বা সত্যই নেশা হয় কিনা তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কেবল বৃথা তর্ক করিয়া লাভ নাই—"যো-সো করিয়া" কিছুটা সিদ্ধি যোগাড় করিয়া খাও—আসল কাজ করা হইবে, সব সংশয়ের অবসানও হইবে। পুরীতে জগন্নাথদর্শন যদি লক্ষ্য হয়, কেবল টাইম-টেবল পড়িয়া সময় না কাটাইয়া যতটুকু সে পথে আগাইয়া যাওয়া যায়, ততটুকুই লাভ। বহু সত্যান্বেষীর জীবনব্যাপী সাধনার ফলে যে-সব রোগমুক্তির ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে,

কেন, কিভাবে তাহা রোগমুক্তি ঘটায় তাহার বিস্তারিত বিবরণ না জানিয়াও বৈদ্যের নির্দেশমত উহা সেবন করিলে রোগমুক্তি ঘটবেই। আমাদের প্রায় সকলকে তাহাই করিতে হয় এবং করিয়া ফলও আমরা পাই।

বাস্তবতানিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ তাই ভগবৎ-প্রসঙ্গকালে যুক্তি তর্কের তুফান তুলেন নাই, নিজের উপলব্ধির কথা আর বিভিন্ন 'ভবরোগ' হইতে মুক্তির বিভিন্ন ঔষধের কথাই বলিয়া গিয়াছেন প্রায় সর্বক্ষেত্রেই।

*

সত্যদ্রষ্টাগণ জগৎ ও জীবনের মূল সত্যকে বাস্তবরূপে প্রত্যক্ষ করিবার পথগুলি অতন্দ্র সাধনায় আবিষ্কার করিয়া নিজ উপলব্ধির উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সে-পথে দূরের সব খবর না জানিয়াও চলিলে লক্ষ্যলাভ হইবেই। আর তখন সব শুধু জানা নয়, প্রত্যক্ষও করা যাইবে।

আসল কাজটি হইল তাঁহাদের নির্দেশিত পথে চলা—ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার যোগ্যতা অর্জন করা। এইটি আমরা ভুলিয়া যাই—যোগ্যতা-অর্জন ছাড়াই তাঁহাকে লাভ করিতে চাই, অথবা তাঁহার অস্তিত্বকে 'অবাস্তব' বলিয়া মতামত দিই জোর গলায়। (ভগবান তো দূরের কথা, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, মনকে প্রত্যক্ষ না করিয়াই অনুমান-সহায়ে মনস্তত্ত্বের বই লিখিয়া ছাড়িয়া দিই—বিভ্রান্ত মানুষকে আরো বিভ্রান্ত করিবার জন্য।)

শাস্ত্রাদিতে ঈশ্বর প্রভৃতি যেসব কথা লিপিবদ্ধ আছে, সত্যদ্রষ্টাগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা অবাস্তব, কল্পনামাত্র বা (চার্বাক যাহা বলিয়াছিলেন) লোক ঠকাইয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য 'ধূর্ত, ভণ্ড ও প্রতারকগণ' এই সব ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রভৃতি ধর্মের অবাস্তব কথাগুলির প্রচার করিয়াছিলেন—ইহাই তথকথিত বিজ্ঞাননিষ্ঠ বহু ব্যষ্টি-মনে এখনও ক্রিয়াশীল। ইহার মূল কারণ দুইটি। একটি হইল, বিজ্ঞান যে-সত্যের কথা বলে তাহা পরীক্ষাসহায়ে 'যাচাইয়া-বাজাইয়া' লইয়া তবে বলে এবং সকলকে আহ্বান করে, যে-ধারায় পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা সে-সত্যের বাস্তবতায় নিঃসংশয় হইয়াছেন, সে-ধারায় উহা নিজে পরীক্ষা করিয়া লইতে। অপরটি হইল, সেভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা সর্বাবস্থায় সকলের পক্ষে সম্ভবপর না হইলেও, উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত, কোন ব্যক্তিবিশেষের ধারণা বা কথামাত্রই উহার প্রমাণ নহে।

বিজ্ঞানেরই এই মূল সূত্রটিকে ভুলিয়া যখন আমরা জড়-বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্যকেই একমাত্র বাস্তব বলিয়া এবং ধর্মগুরুদের কথাকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিই, তখন উহা আমাদেরই ভাষায় এক ধরনের 'কুসংস্কারের' পর্যায়েই পড়ে, যুক্তির পর্যায়ে নহে। কারণ, আধ্যাত্মিক জগতের সত্যদ্রষ্টাগণও বৈজ্ঞানিকদের মতোই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরিয়া চলিয়া সত্যকে যাচাই করিয়া লইয়াছেন কি না, বৈজ্ঞানিকদের মতোই সকলকে একটি বিশেষ ধারা অবলম্বনে উহার বাস্তবতা নিজে পরীক্ষা করিয়া লইতে বলিয়াছেন কিনা, তাহা আমরা ভাবিয়াও দেখি না, সে-ধারা অবলম্বনে উহার সত্যতা পরীক্ষা করিবার পর কোন মতামত দেওয়া তো দূরের কথা। তাছাড়া, একথাও ভুলিয়া যাই যে, 'বাস্তব' 'বাস্তব' বলিয়া হট্টগোল করিলেও নিজ প্রত্যক্ষ দ্বারা আমরা সকলেই তাহার সবগুলিকেই যাচাইয়া লইতে পারি না। বিজ্ঞানের অধিকাংশ উচ্চ সত্যকেই নিজে পরীক্ষা করিয়া বাস্তব বলিয়া দেখিয়া লইবার মতো প্রকৃতি আমাদের কয়জনেরই বা থাকে?

বৈজ্ঞানিকদের কথা আমাদের বিশ্বাস করিয়াই লইতে হয়।

আর ধর্মের বেলা সমভাবে বা উচ্চতরভাবে পরীক্ষিত—বাস্তবতা-পরীক্ষার সবচেয়ে বড় কষ্টিপাথর প্রত্যক্ষের দ্বারা পরীক্ষিত—সত্য-দ্রষ্টাদের কথাগুলি গ্রহণ করিবার সময় বিনা পরীক্ষায় উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠি—'ইহা অবাস্তব!'

যাঁহাদের যোগ্যতা আছে, তাঁহাদের পক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের মতো নিজে পরীক্ষা করিয়া তবে উহা গ্রহণ করার পথই প্রশস্ত। কিন্তু অধ্যাত্মজগতের কেন, জড়বিজ্ঞানেরও উচ্চতম তত্ত্বগুলির বাস্তবতা যাচাই করিয়া লইবার মতো যোগ্যতা অর্জন করিতে পারি বা করিতে চাই কয়জন? প্রসঙ্গক্রমে এক দিনের একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের ঘটনা—ঘটনাটি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা ও তাঁহার সহপাঠী রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী নির্বেদানন্দজীকে লইয়া। তাঁহার নিকট সেদিন ডক্টর সাহা ছাড়া তাঁহার আরো কয়েকজন বিদগ্ধ সহপাঠী দেখা করিতে গিয়াছিলেন। স্বামী নির্বেদানন্দ তখন শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ 'Cultural Heritage of India' গ্রন্থটির জন্য 'Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance'-শীর্ষক প্রবন্ধটি রচনা করিতেছিলেন। উহার ভিতর একটি অধ্যায়ে তিনি প্রসঙ্গক্রমে আধুনিক বিজ্ঞানের কয়েকটি তথ্যসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এতগুলি খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক সহপাঠীকে একত্র পাইয়া তিনি তাঁহাদের নিকট উহা পড়িয়া শুনাইলেন, ঠিকমত সব লেখা হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। ডঃ সাহা বলিলেন: "ঠিক আছে।" স্বামী নির্বেদানন্দ পরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-প্রসঙ্গে বলিলেন, "আমাদের প্রাচীন মুনিঋষিরা সত্য সম্বন্ধে এই কথাই ব'লে থাকেন যে, তাঁরা যে-পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে ঐ সত্য প্রত্যক্ষ করেছেন, তা অবলম্বন ক'রে আমরাও সফলকাম হতে পারি। এখন, হয় তাঁদের কথা মেনে নিতে হয়, নয়তো নিজেরা পরীক্ষা ক'রে দেখতে হয়। তোমরা বৈজ্ঞানিক-রাও তো ঐ কথাই ব'লে থাকো।" ডক্টর সাহা শুনিয়া বলিলেন, "কিন্তু স্বামীজী, তোমার কথায় একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। আমাদের কথা না মানলে তোমায় ল্যাবোরেটারিতে নিয়ে গিয়ে ডিমনস্ট্রেশন দিয়ে দেবো। তোমরা (অধ্যাত্ম-বাদীরা) তা পার না।" নির্বেদানন্দজী বলিলেন, "তোমরাও তা পার না।" শুনিয়া অবাক হইয়া ডক্টর সাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার মানে?" সামনের মাঠে একজন নিরক্ষর চাষী চাষ করিতেছিল। তাহাকে দেখাইয়া নির্বেদানন্দজী বলিলেন, "আচ্ছা, ঐ চাষীটিকে ল্যাবোরেটারিতে নিয়ে গিয়ে তোমার অ্যাস্ট্রো-ফিজিক্সের লেটেস্ট থিওরীটা বুঝিয়ে দিতে পার?" কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ডক্টর সাহা বলিলেন, "তা তো পারি না, স্বামীজী, ট্রেনিং দরকার।" নির্বেদানন্দজী বলিলেন, "ধর্মের ক্ষেত্রেও তাই, ট্রেনিং—মেন্টাল ডিসিপ্লিন দরকার।"

প্রস্তুতি যে প্রয়োজন, যোগ্যতা-অর্জন যে প্রয়োজন—এই কথাটিই আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আজ জগতে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অবাস্তব বলিয়া তাঁহার বা ধর্মের বিরুদ্ধে যত কথা সোচ্চার হইতেছে, তাহা সবই উঠিতেছে প্রস্তুতিহীন, পরীক্ষাহীন ভিত্তিভূমি হইতে, তাহা সবই শূন্যগর্ভ, অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক উক্তি। যাঁহারা এইসব কথা বলেন, তাঁহারা বুদ্ধিবৃত্তিতে যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহাদের ভিতর একজনও কি আধ্যাত্মিক সত্যগুলির সত্যতা নিজে যথাযোগ্যভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সত্যদ্রষ্টাদের প্রদর্শিত পথে চলিয়া পরীক্ষা

করিবার মতো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করিবার পর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সেগুলিকে অসত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন? একজনও নহে। যুক্তির পূজারী কেহ কি বলিতে পারেন, কী অধিকার আছে তাঁহাদের একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া অপরের প্রত্যক্ষ করা সত্যকে, শুধু একজনের নয়, অসংখ্য সত্যদ্রষ্টার একই পদ্ধতি-অবলম্বনে উপলব্ধ একইরূপ সত্যকে পরীক্ষা না করিয়া মিথ্যা বা অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিবার? আজিকার দিনে যদি কেহ বলে, 'লোহাকে সোনায় রূপান্তরিত করার সম্ভাবনা অলীক, কারণ দুটির উপাদান দুটি পৃথক অবিভাজ্য বস্তু', অথবা হাত দিয়া রসগোল্লা টিপিয়া দেখিয়া বলে, 'ইহা মিষ্ট নহে', বা অন্ধকারে গোলাপফুল শুঁকিয়া বলে, 'ইহার কোন বর্ণ নাই'—তাহার কথাগুলি যতখানি হাস্যকর, কেবল সাধারণ অবস্থার অশুদ্ধ মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া যিনি বলেন, 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবাস্তব, কল্পনামাত্র', তাঁহার কথাগুলিও সমভাবে হাস্যকর ছাড়া আর কি? ভগবান 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'—সাধারণ মনবুদ্ধি দিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "তিনি শুদ্ধ মনবুদ্ধির গোচর" "তাঁকে দেখা যায়।" ভগবানের অস্তিত্ব, আমাদেরই পরমানন্দময় অবিনাশী সর্বগত স্বরূপ বাস্তব কি না, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে তাহার যোগ্যতা অর্জন করিতেই হইবে।

*

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই নিজে এ সত্যের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করিয়া নিজের মন্বন্তরের প্রত্যক্ষের কথাই নানাভাবে বারবার বলিয়াছেন, আর বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষ করিবার যোগ্যতা-অর্জনের পথ কাহার পক্ষে কোন্‌টি প্রশস্ত।

আর ছোট বড় সকল 'মনমুখ এক'-করা সত্যান্বেষীকেই এ পথে চলিতে সহায়তা করিয়াছেন তিনি সর্বান্তঃকরণে।

ইহারই জন্য তিনি আসিয়াছিলেন। এখনও সূক্ষ্মশরীরে তিনি সেই অপার সহানুভূতি লইয়া রহিয়াছেন অস্তিত্বের উচ্চ হইতে উচ্চতর বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করিবার পথে আমাদের সহায়তা করিবার জন্য, ইহাও বহুজনের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বেলুড় মঠের জনৈক সন্ন্যাসী একদিন প্রশ্ন করেন, "মহারাজ, আপনারা ঠাকুরকে কি দেখতে পান?" উত্তরে প্রথমে তিনি বলিলেন "স্বামীজী দেখতে পেতেন, শুনেছি।" একটু পরে বলিলেন, "আমরাও কখনো কখনো দেখতে পাই।" আরও একটু পরে বলিলেন, "দেখ্, তোরা যখন ভজন করিস, ভজন যেদিন খুব জমে ওঠে, দেখি ঠাকুর বসে শুনছেন।"

আন্তরিকভাবে চাহিলে, ডাকিলে তিনি সাড়া দিবেনই। জীবনে প্রতিদিন কর্তব্য করা ছাড়াও কত সময় তো কত বৃথা কাজে আমরা ব্যয় করি; তাহারই ভিতর হইতে একটু লইয়া তাঁহার কথামত চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি? চরম অনুভূতিলাভ সময়সাপেক্ষ হইতে পারে, কিন্তু এপথে সামান্য অগ্রসর হইলেও যে ফল পাওয়া যাইবে, পরিশ্রমের তুলনায় লাভ তাহাতে অনেক বেশী—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" (গীতা)। সর্বধর্মের সর্বভাবের লোকের উপযোগী নির্দেশ তাঁহার কথায় রহিয়াছে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস একটি বিশেষ পরিমাণে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মিলিত করিতে পারিলে দুটি মিশিয়া জলে পরিণত হয়—ইহা যতখানি সত্য, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্ম-বিষয়ক কোন নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করিলে তাহার নির্দিষ্ট ফললাভও যে হইবে, ইহাও ততখানি সত্য—সমভাবে বাস্তবতা-ভিত্তিক।

স্বামী প্রেমানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখিত]

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

মঠ

২৪।৩।১৯১০

ভাই শশী,

তোমার বহুমূত্রের অসুখ শুনিয়া মহারাজ প্রভৃতি সকলেই চিন্তিত আছেন। কোন রোগকে আশ্রয় দেওয়া ভাল নয়। খুব সাবধানে থাকিবে ও উত্তম চিকিৎসক দ্বারা মূত্র examine করিয়া তাঁহার ব্যবস্থামত পথ্যাদির বন্দোবস্ত করা তোমার একান্ত আবশ্যক। অসুখ অবজ্ঞা করা উচিত নয়। আর একটু একটু ভ্রমণ করা দরকার। প্রভুর কৃপায় মঠের সকলে এখন ভাল আছে।

এবার উৎসবে আশাতীত জনতা হয়েছিল। প্রায় ৫০।৬০ হাজার আন্দাজ। কোন স্থানে পা বাড়াবার স্থান ছিল না। প্রায় তিন-চার শত উদ্‌যোগী ও কর্মক্ষম ভক্ত উৎসবের সকল কার্য অতি শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করেছিল। প্রসাদবিতরণ, জল ও সরবৎ পানের বন্দোবস্ত প্রভৃতি সকল কার্য অতি সুন্দররূপে হয়েছে। লোকে দেখে অবাক। শতাধিক সংকীর্তন-সম্প্রদায় অতি উৎসাহের সহিত সারাদিন প্রভুর নামগান করেছে। লোকে বলে, শহরের প্রায় তিনভাগ হিন্দু ভদ্রলোক উৎসবে এসেছিল। এবার অনেক রাজা, রায়বাহাদুর ভক্তির সহিত প্রসাদধারণ করেছিল। গত শিবরাত্রির দিন Lady Minto মঠ দর্শন করিতে গোপনে এসেছিলেন। দর্শন করিয়া অতি আনন্দিত হয়ে গেছেন—একথা বড় বড় ইংরেজী খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা শ্রীশ্রীপ্রভুর কয়েকখানি চরিত তাঁহাকে উপহার দিয়েছি। তিনি সেজন্য ধন্যবাদ পাঠাইয়াছেন। শুনিতেছি শীঘ্র বড়লাটও নাকি আসিবেন। ...প্রভুর ইচ্ছা, তাঁর কার্য তিনিই করেন। এখানে আসিবার পূর্ব দিন Lady Minto নিবেদিতা ও কৃষ্টিনের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। তথায় মা-কালী ও শ্রীশ্রীপ্রভুর শয্যাদি এবং পঞ্চবটী দর্শন ক'রে অতিশয় আনন্দিত হন। তুমি বিশ্বরঞ্জন ও প্রকাশের জন্য ভাড়া পাঠাইলে তাহারা যাইবার জন্য প্রস্তুত আছে। তবে মহারাজের নিকট উহাদের পাঠাইবার জন্য লিখিও। মহারাজের অনুমতি না পেলে তারা কেমন করেই বা যায়। মহারাজ জিজ্ঞাসা কচ্ছেন বিশ্বরঞ্জন গেলে তাহাকে কি কাজ দিবে। Nature of work জানিতে চান ; সে গিয়া কি করিবে, কি প্রয়োজন।

তুলসী কেমন আছে ? তুমি আমাদের ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

ইতি

দাস

বাবুরাম

চির-পরীক্ষার্থী শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীগোরাচাঁদ কুণ্ডু

শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার কি না এ বিষয়ে যে যেমনটি ভাবিতে চায় ভাবুক,—যাহার যতখানি মেধা সে তদনুযায়ী প্রশ্নটি সমাধান করুক বা নাই করুক—আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই অনুপম চরিত্রের একটি বিশিষ্ট দিক লইয়া কিছু আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

আমরা যাহাকে বিদ্যাশিক্ষা বলি শ্রীরামকৃষ্ণের তাহা কিছুই ছিল না। স্কুল কলেজ ইউনিভার-সিটি বা রিসার্চ লেবোরেটরীর সু-উচ্চ সোপান-শ্রেণী ভাঙ্গিয়া ওঠানামা করা বা কোনো ছোটবড়ো গ্রন্থাগার মন্থন করা তো দূরের কথা, তিনি সামান্য নিম্নপ্রাইমারীর খোড়ো চালাঘরের পাঠও শেষ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, না পড়িলেও তাঁহাকে পরীক্ষা দিতে হইয়াছে প্রচুর; বিদগ্ধ প্রশ্নকর্তার দুরূহ প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে বহুবার। আশ্চর্যের কথা এই যে, তিনি কখনও কোনো পরীক্ষকের সম্মুখীন হইতে অনিচ্ছুক বা বিরক্ত হইতেন না। বরং নিজের উপলব্ধ সত্যকে যাচাই করিয়া দেখিবার জন্য সাগ্রহে যোগ্য ব্যক্তিকে খোঁজ করিয়া বেড়াইতেন।

এখানে প্রথমেই একটা কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বে আধ্যাত্মিক জগতের আর কোনো মহাপুরুষকে এমন কঠোর জিজ্ঞাসা এবং নির্মম সন্দেহের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তারাজ্যে এক মহা ওলটপালট ঘটিতে থাকে। অবিশ্বাস, সন্দেহ, জিজ্ঞাসা এবং উপহাস নানান শাণিত অস্ত্র লইয়া ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক জগতের দ্বারপ্রান্তে কঠোর আঘাত হানিতে শুরু করে; যুক্তির সহিত যাহা মিলিবে না, পরীক্ষায় যাহা টিকিবে না তাহাকে এক কোপে কাটিয়া ফেল। সেই ঘনঘটায় বহু আবর্জনা উড়িয়া গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টান পড়িল ধর্মবিশ্বাসের মূল ভিত্তিকে লইয়া। এই মহা দুর্যোগের দিনে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধদেব, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য সকলেই ছিলেন, কিন্তু কুজ্ঝটিকা এমনই প্রবল হইয়া উঠিল এবং চারিদিক হইতে এমন কলরব আর হুঙ্কার উঠিতে লাগিল যে, এ দেশের জ্ঞানী, গুণী, শিক্ষিতেরা উঁহাদের সহিত সম্পর্ক অস্বীকার করিতে উদ্যত হইলেন। যাঁহারা একেবারে অস্বীকার করিতে পারিলেন না তাঁহারা ভয়ে ভয়ে আমতা আমতা করিয়া সেই সম্পর্ক গোপন করিতে লাগিলেন। এমনি সময়ে সেই প্রবল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ কালের প্রান্তরে আসিয়া দাঁড়াইলেন এই নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণ। তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা জীবন দিয়া সত্যকে যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে। ইন্দ্রিয়াতীত সত্য যদি থাকে তবে তাহাকে প্রত্যক্ষ জানিব, বুঝিব, স্পর্শ করিব। স্বর্গ এবং পৃথিবীর ভোগসুখকে তুচ্ছ করিয়া, শরীরমনের অস্তিত্বকে ভুলিয়া, অসীম অকল্পনীয় সাহসে ভর করিয়া দীর্ঘ বারোটি বছর তিনি পরীক্ষানিরীক্ষা এবং গবেষণা চালাইলেন। তারপর সকলের হইয়া তিনি যুক্তি এবং মার্জিত বুদ্ধির কাছে পরীক্ষা দিতে অগ্রসর হইলেন। সত্যই তো বুদ্ধিতে যাহা বোঝা যায় না, যুক্তিতে যাহা মানা যায় না, পরীক্ষা করিয়া যাহার সত্যতা প্রতিপন্ন হয় না, শিক্ষিত

মানুষ তাহা লইবে কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ তাই আধুনিক যুক্তিবিচারের পরীক্ষাগারে সত্যকে যাচাই করিয়া লইবার জন্য উপযুক্ত মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার কথাই ছিল—বই পড়িয়া কি হইবে, করিয়া দেখাইতে হইবে। যাঁহারা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইতেন, তিনিও তাঁহাদের আসল উদ্দেশ্য ও বুদ্ধির দৌড় পরীক্ষা করিয়া লইতেন। উপযুক্ত মানুষটি পাইলে তাঁহার কতই না আনন্দ!

নানা স্তরের লোক আসিয়াছেন তাঁহার সংস্পর্শে—বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন প্রশ্ন লইয়া, বিভিন্ন সন্দেহের বশবর্তী হইয়া। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন—প্রতাপশালী জমিদার, ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং আচার্য, প্রবলব্যক্তিত্বসম্পন্ন খ্যাতিমান মনীষী, এডভোকেট এবং ম্যাজিষ্ট্রেটগণ, ব্রিটিশ সওদাগরী অফিসের মুৎসুদ্দি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং তীক্ষ্ণধী ছাত্রগণ এবং তৎকালীন ভারতের অগ্রগণ্য বিজ্ঞানসাধক। সাধারণ লোক শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় পরম শান্তি লাভ করিয়া অতি সহজেই গলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আধুনিক যুগের এই সমস্ত কৃতবিদ্য প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে সহজে ছাড়েন নাই।

দীর্ঘদীন ধরিয়া ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন রানী রাসমণির জামাতা সুপ্রসিদ্ধ মথুরবাবু, যিনি ছিলেন রানীর বিশাল জমিদারীর পরিচালক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী এই জমিদার ছিলেন কলিকাতায় শীর্ষস্থানীয় অভিজাতবর্গের অন্যতম। উন্মাদ বলিয়া উপহসিত শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর আত্মনিবেদন এবং আচরণের সরলতা তাঁহার নিকট আকর্ষণীয় হইয়া উঠে। তখন হইতে তিনি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঠাকুরকে লক্ষ্য করিতে থাকেন। এই দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণকে তিনি বিপুল অর্থের লোভ দেখাইয়াছেন। সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মোহজালে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন কি মথুরবাবুর সামনেই মোহিনী বারবনিতার সমীপেও শ্রীরামকৃষ্ণের দেহমনের দেবদুর্লভ পবিত্রতা পরীক্ষিত হইয়াছে। শেষে নিজেই তাল সামলাইতে না পারিয়া বিমূঢ় বিস্ময়ে তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়াছেন।

আর এক পরীক্ষা। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহের অসহ্য জ্বালা, অঙ্গবিকৃতি এবং অন্যান্য বহির্লক্ষণ যে তাঁহার অন্তরে অনুভূত ভগবৎ-বিরহ যন্ত্রণার বাহ্য প্রকাশ, যাহা একদা শ্রীমতী রাধা এবং শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনে ঘটিয়াছিল এবং দীর্ঘদিবস-অন্তে এই ধরণীর ধূলিতে নরদেহে আবার সেই শ্রেষ্ঠ ভগবৎ-ভাব বিকসিত হইয়া উঠিতেছে—তন্ত্রসাধিকা ভৈরবী ব্রাহ্মণী ইহা জেদের সঙ্গে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ইহা যথার্থ কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য মথুরবাবু পণ্ডিতাগ্রগণ্য বৈষ্ণবচরণসহ সুপ্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্রবেত্তাগণকে দক্ষিণেশ্বরে আহ্বান করিলেন। সেদিন গঙ্গার পূর্ব উপকূলে ভাবী কালকে সম্মুখে রাখিয়া ইতিহাসের একপ্রান্তে এক অভূতপূর্ব সম্মেলন বসিয়া গেল। শাস্ত্রের নির্দেশ প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া এবং আধ্যাত্মিক জীবনের পরীক্ষিত সত্যের সঙ্গে মিলাইয়া নানা তর্কবিচার অনুষ্ঠিত হইল।

আশ্চর্য এই যে, যাঁহাকে লইয়া এতো কাণ্ড তিনি তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তির মতো সত্যই ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। নৈর্ব্যক্তিক সত্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে অহংলেশশূন্য এই নির্বিকার পুরুষ আনন্দময় শিশুর মতো সকলের সামনে উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র দেহ শাস্ত্রের জীবন্ত ভাষ্যরূপে উদ্ভাসিত হইয়া সেদিন বিদগ্ধমণ্ডলীকে স্তম্ভিত করিয়া দিল।

আর একদিনের কাহিনী। সেদিন শ্রীরাম-

কৃষ্ণের ভক্ত অধর সেনের গৃহে উৎসব। অধর নিজে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, একজন নামকরা স্কলার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব আর্টসের সদস্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার-মনোনীত অন্যতম ফেলো। সেদিন অধরের গৃহে ভারী জনসমাগম। অধর তাঁহার কয়েকটি বন্ধু ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা নিজে ঠাকুরকে দেখিবেন এবং বলিবেন যথার্থ মহাপুরুষ কিনা। এই কৌতূহলী ম্যাজিস্ট্রেটগণের পুরোভাগে ছিলেন বাংলার স্বনামধন্য সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এই সম্মেলন যে কত তাৎপর্যপূর্ণ তাহা সহজেই অনুমেয়। সম্মেলনের দৃশ্যটিও কতই না চমকপ্রদ! একদিকে বালকস্বভাব আনন্দমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ, অন্যদিকে তাঁহার সম্মুখে সমাসীন শিক্ষিত-শ্রেষ্ঠ বঙ্কিম। মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে "উদ্যত খড়্গের ন্যায় যে উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ প্রবলতা" স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মনে চিরমুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল তাহা শ্রীরামকৃষ্ণকে কিছুমাত্র স্পর্শ করিতে পারিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো?" তারপর বঙ্কিমপ্রমুখ ম্যাজিস্ট্রেট-গণ নানা প্রশ্ন করিয়াছেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া ঠাকুরের কথা শুনিয়াছেন। ঈশ্বরের কথা বলিতে বলিতে এবং কীর্তন শুনিতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া বাহ্যশূন্য এবং সমাধিস্থ হইয়া পড়েন।

বঙ্কিমচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া ভিড় ঠেলিয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। ইংরেজীপড়া লোকেরা সকলেই অবাক। বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই বুঝিয়া-ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিধনের ভাণ্ডারী আর তাঁহার অশ্রুতপূর্ব বাণী জগৎকে বিলাইবার মতো, কেননা, তিনি নিজেই প্রশ্ন করিয়াছেন, "মহাশয়, ভক্তি কেমন ক'রে হয়?" আর "আপনি প্রচার করেন না কেন?" ম্যাজিস্ট্রেটগণের রায় সহজেই অনুমেয়, কেননা বিদায়ের কালে ম্যাজিস্ট্রেট-দলপতি বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কুটীরে "পায়ের ধুলা" দেওয়ার অনুগ্রহ ভিক্ষা করেন। উৎসবগৃহত্যাগের সময় তিনি এমনই চিন্তামগ্ন ছিলেন যে, গায়ের চাদর ভুলিয়া বাহির হইয়া পড়েন। পরে একজন ছুটিয়া আসিয়া চাদরখানা তাঁহার হস্তে দিলেন।

তারপর ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার। ডক্টর সরকার ছিলেন এ্যালোপাথী চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত—তৎকালীন কলিকাতার দিক্‌পাল চিকিৎসক। পরে তিনি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা শুরু করেন। কিন্তু তাঁহার সবচেয়ে বড়ো পরিচয়—তিনিই ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞানানু-শীলনের পুরোধা এবং পথিকৃৎ। নোবেল-লরিয়েট স্যার সি. ভি. রমন যে প্রতিষ্ঠানে প্রথম গবেষণাকার্য শুরু করেন, সেই ভারতবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান Indian Association for the Cultivation of Science ডক্টর সরকারের-ই অক্ষয়কীর্তি।

একদা সেই সত্যসন্ধানী বৈজ্ঞানিক ক্যান্সার-রোগ-চিকিৎসার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা করিতে আসিয়া ডাক্তার নিজেই প্রবলভাবে চিকিৎসিত হইতে থাকেন। 'কথামৃতে' প্রত্যক্ষদ্রষ্টার যে বিবরণ রহিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই প্রথিতযশা বিজ্ঞান-তাপস শ্রীরামকৃষ্ণকে নানা-ভাবে দেখিয়াছেন, পরখ করিয়াছেন, একবারটি আসিয়া প্রত্যহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়াছেন, রাত্রি তিনটা হইতে জাগিয়া বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ভাবিয়াছেন, সকাল আটটায় যখন তাঁহার গৃহে বন্ধু বা রোগীর সমাগম হইয়াছে তখন নিজমুখে বলিয়াছেন, "এখনো পরমহংস

চলছে।" বন্ধুদের বলিয়াছেন, "As man I have the greatest respect for him." তারপর একদিন শ্রীরামকৃষ্ণসকাশে একযোগে ভাবস্থ, বাহ্যচেতনাশূন্য, স্থির, স্পন্দনহীন, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির আনন্দে উজ্জ্বল একদল ভক্তকে দেখিয়া বৈজ্ঞানিক নিজেই আবিষ্ট হইয়া পড়েন। শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেন "ডাক্তার, তোমার সায়েন্স কি বলে?" সায়েন্সের থিয়োরী যেন হোঁচট খাইতে লাগিল। বৈজ্ঞানিক বলিলেন, "এ তো ঢং মনে হয় না।" এমনি করিয়া দিনের পর দিন দেখিতে, পরখ করিতে করিতে ডক্টর সরকারের মনে হইয়াছিল বস্তুজগতে গবেষণানিরত স্যার মাইকেল ফ্যারাডের মতো অন্তর্জগতের সত্য-উৎঘাটনকারী আর এক মহাবৈজ্ঞানিক এই শ্রীরামকৃষ্ণ। বন্ধুদের কাছে সেকথা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন। পরীক্ষার শেষে বৈজ্ঞানিকের মুগ্ধহৃদয় প্রেমে বিগলিত হইয়াছে। রোগের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরীয় কথা বলা তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বলিয়াছিলেন, "তবে আমি যখন আসব কেবল আমার সঙ্গে কথা কইবে।"

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে যিনি সবচেয়ে কঠোর-ভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহারই শ্রেষ্ঠ সন্তান নরেন্দ্রনাথ। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মেধাবী, তত্ত্বজ্ঞ, ভূয়োদর্শী বিদ্বজ্জনের অভাব ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিকতা, তাঁহার সরল পবিত্র আনন্দ-পরিপূরিত জীবন, তাঁহার সুধাক্ষরা বাণী এবং অবারিত অনাবিল স্নেহপ্রবাহ বহুজনকেই অনায়াসে অভিভূত করিয়াছে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সুকঠোর—'খাপখোলা তলোয়ার'। তিনি কাহারো কাছে মাথা নত করিবার পাত্র নন—সহজে ছাড়িবার ছেলে নন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিয়া বা পড়িয়া আজো যাঁহারা বলেন যে, ওসব বিশ্বাস করি না, নরেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহাদের সকলের চেয়ে বেশী অবিশ্বাসী! যুবক নরেন্দ্রনাথ যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রথম আসেন তখন তিনি দেহে মনে দুর্বার, অকুতোভয়, উল্কার মতো আবেগপরায়ণ, অথচ বিদ্যাবত্তায় অদ্বিতীয়। এই সময়েই Principal William Hastie সাহেব বলিয়াছিলেন, "In all the German and English Universities there is not one student as brilliant as he is." তার কয়েক বৎসর পরেই Harvard Universityর প্রফেসর John Henry Wright বলিয়াছিলেন, "Here is a man who is more learned than all our learned professors put together." এহেন নরেন্দ্রনাথ একদিন নয়, দুদিন নয়, দুচার মাস নয়,—দীর্ঘ পাঁচ বৎসর বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন প্রশ্নের বিচারে, বিভিন্ন সন্দেহের নিরসনে নির্মম বিচারকের মতো শ্রীরামকৃষ্ণকে বিচার করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তি এবং অতলস্পর্শ ভাবরাশি তাঁহাকে যতই প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, ততই তিনি মনে মনে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হইয়াছেন—কিছুতেই নয়, নিজে অনুভব না করিয়া, নিজে প্রত্যক্ষ না করিয়া, নিজে পরীক্ষা না করিয়া তাঁহার কোনো কথা গ্রহণ করিবেন না। প্রবল সন্দেহ এবং যুক্তিবিচারের শাণিত প্রহরণ উদ্যত করিয়া আধুনিক যুগ নরেন্দ্রনাথরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন নরেন্দ্রনাথকে বিবেকানন্দ হইতে হইবে। এই পৃথিবীর অগণিত মানুষের সামনে তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইবে—জগতের কল্যাণে তাঁহাকে কাজ করিতে হইবে। তাই তো তাঁহার পক্ষে সকল সন্দেহ কাটাইয়া খাটি সত্যকে জানা দরকার। সুদৃঢ় ভিত্তির উপর

তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইবে—অমোঘ অস্ত্রে সুসজ্জিত হইতে হইবে; তাই সত্যানুসন্ধানের জন্য নরেন [বা অন্য কোনো ব্যক্তি] তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছে জানিলে অসন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, তিনি আনন্দে ফাটিয়া পড়িতেন।

তিনি নিজেই চাহিতেন সকলে সত্যকে "বাজিয়ে" নিক। তাই অহংলেশশূন্য শ্রীরামকৃষ্ণ অনায়াসে অসঙ্কোচে অপরের পরীক্ষার বিষয়বস্তু হইতে রাজী হইয়া যাইতেন। সত্যানুসন্ধিৎসু আগ্রহশীল ব্যক্তির সহিত তাঁহার সহযোগীর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিত। এ যেন Laboratory-তে অধ্যাপক ও ছাত্রের একত্র বসিয়া গবেষণা। উপযুক্ত ছাত্রের মতামতকে অভিজ্ঞ অধ্যাপক কখনো উড়াইয়া দেন না। তাই একদা নরেন্দ্রনাথ আধুনিক বিজ্ঞানে Physiology-র তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া যখন বলিলেন, "ও সব আপনার মাথার খেয়াল", তখন সাধারণ ভাবভূমিতে অবস্থিত সরলপ্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তিত হইলেন—'তাই তো, মাথার খেয়াল যে নয় তার প্রমাণ কি ? আর যে-সে তো বলছে না। অথণ্ড ব্রহ্মচারী, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, সত্যসন্ধ নরেন যেকালে বলছে তখন'— শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের নিকট ছুটিয়া চলিলেন। কিছুক্ষণ বাদে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "দূর···! মা বলেছেন তুই ছেলেমানুষ, পরে সব মানবি।"

দেখা যায় তিনটি প্রধান প্রশ্নের উপর নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে দীর্ঘদিন ধরিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম প্রশ্ন ছিল, "ঈশ্বর কি সত্যই আছেন ?" শ্রীরামকৃষ্ণ শুধুই 'আছেন' বলেন নাই, মহা বৈজ্ঞানিকের মতো আরো বলিয়াছিলেন, "তুই যদি চাস তো তোকেও দেখিয়ে দিতে পারি।" পরীক্ষার পর তবেই নরেন্দ্রনাথের সন্দেহ ঘুচিয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, তিনি সাকার না নিরাকার। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের সন্দেহ মোচন করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি সাকার আবার নিরাকারও। নরেনের তৃতীয় সন্দেহ, ঈশ্বর কি আমাদের মতো মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আসেন ?—শ্রীরামকৃষ্ণ কি সত্যই অবতার ? দীর্ঘদিন এবিষয়ে তিনি কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছান নাই। অধ্যাত্মজ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতার মূর্ত বিগ্রহরূপে স্বীকার করিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ যে ঈশ্বরের অবতার একথা স্বীকার করিতে তাঁহার কোথায় যেন বাধিয়াছে। ঠাকুরের দেহাবসানের কয়েক মাস পূর্বে ১৮৮৫ সালের অক্টোবর মাসে একদা গিরিশ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ এবং ডাঃ সরকারের মধ্যে এই বিষয়েই আলোচনা হইতেছিল। ডাক্তার গিরিশ ঘোষকে বলিলেন, "আর সব কর, but do not worship him as God." গিরিশ ঘোষ নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলিলেন, "কি করি, মহাশয় ? যিনি এই সংসারসমুদ্র এবং সন্দেহসাগর পার করলেন, তাঁকে আর কি করবো বলুন ?"

এই সময়েই নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন "এঁকে আমরা ঈশ্বরের মতো মনে করি। কি রকম জানেন ? যেমন vegetable-creation আর animal-creation—এদের মাঝামাঝি এমন একটা point আছে, যেখানে এটা উদ্ভিদ্ কি প্রাণী স্থির করা ভারী কঠিন। সেইরূপ Man-world ও God-world—এই দুয়ের মধ্যে একটা স্থান আছে, যেখানে বলা কঠিন এ ব্যক্তি মানুষ না ঈশ্বর।"

ডাক্তার—ওহে, ঈশ্বরের কথায় উপমা চলে না।

নরেন্দ্র—আমি ঈশ্বর বলছি না—God-like Man বলছি।

ডাক্তার—ওসব নিজের নিজের ভাব চাপতে হয়। প্রকাশ করা ভাল নয়—আমার ভাব কেউ বুঝলে না।

আমরা জানি না বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী গম্ভীর-প্রকৃতি ডঃ সরকার সেদিন গিরিশ এবং নরেন্দ্রনাথের নিকটেও নিজের আসল ভাবটি চাপিয়া রাখিয়াছিলেন কিনা। নরেন্দ্রনাথ কিন্তু চাপাচাপি করেন নাই। সোজা বলিয়াছিলেন, "God বলছি না, God-like Man বলছি।" Man-world এবং God-world-এর মাঝামাঝি স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণকে স্থাপন করিয়া আরও পরীক্ষা-সাপেক্ষ সত্যের জন্য নরেন্দ্রনাথ সন্দেহের মধ্যে দুলিতে দুলিতে চলিতেছিলেন। কিন্তু আর বেশী দিন নয়। যে পরীক্ষা সিদ্ধ হইলে নরেন্দ্রনাথের মনের সন্দেহ একেবারে ঘুচিতে পারে চির-পরীক্ষার্থী রামকৃষ্ণ একদিন অকস্মাৎ নরেন্দ্রনাথকে সেই পরীক্ষা দিয়া বসিলেন।

গৃহমধ্যে বজ্রপাত হইলেও দুর্ধর্ষ নরেন্দ্রনাথ এত কম্পিত হইতেন না; অতলস্পর্শী মহা-সাগরের মতো তাঁর বিশাল হৃদয় এবার একেবারে উথলিয়া উঠিল। এতদিন ধরিয়া কাহাকে তিনি এমনভাবে সন্দেহ করিয়া আসিয়াছেন, একথা মনে হওয়াতে তিনি অনু-শোচনায় অঝোরে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ইহারও নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল। যে বিশ্বাস, যে দর্প, যে গর্ব্ব পৃথিবীর বুকে পা ঠুকিয়া বলিতে পারে, 'শ্রীরামকৃষ্ণের দাস আমি, তারকা চর্বণ করিতে পারি, আপনার বলে গ্রহকে উৎপাটন করিতে পারি,' সেই বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিমুখে অসীম ধৈর্যে, অনন্ত কৃপা-পরবশ হইয়া কতই না পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছেন!

যুগসারথি

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

শাশ্বত ভারতবর্ষ! মর্মবাণী তার
আসে কানেঃ ভূমাতেই আনন্দ আত্মার!
দেশে, কালে, বস্তুতে যা সীমিত, খণ্ডিত
—সে অল্পে হবে না তুমি কভু আনন্দিত!
পরিবর্তনের স্রোতে যাহা ভেসে যায়—
সেই অধ্রুবের পিছে বালকেরা ধায়,—
মৃগ-তৃষ্ণিকার পিছে হরিণ যেমতি!
কুড়ায় হতাশা আর অশেষ দুর্গতি!

"ধনে মানে রূপসীতে কদিনের সুখ?
মৃত্যুর রহস্য আমি জানিতে উৎসুক।
আর কিছু কাম্য নয়।" এ দিব্য পিপাসা
যুগসারথির কণ্ঠে পেলো নব ভাষা:
"টাকা মাটি, মাটি টাকা!" কিছু নাহি চাই
—সত্য যদি না পাই তো জীবন বৃথাই!

ব্যাকরণ-কথা

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীকালীজীবন চক্রবর্তী

পাণিনির ব্যাকরণ বিদ্বজ্জগতের এক পরম বিস্ময়। ব্যাকরণ-ক্ষেত্রে তিনি চিরস্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এক দিকে প্রাচীন এবং অপর দিকে নবীন—এই দুই বৈয়াকরণ-মণ্ডলীর মধ্যস্থ মানদণ্ডরূপে তিনি প্রাচীনদিগকে করিয়াছেন নিষ্প্রভ এবং নবীনদিগের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন কঠোর নিয়ন্ত্রণের এক অলঙ্ঘ্য শাসন-ব্যবস্থা। বস্তুতঃ তাঁহার ব্যাকরণের পরে উহার প্রভাব-মুক্ত আর কোনও মৌলিক ব্যাকরণই অদ্যাপি রচিত হয় নাই—হওয়া বোধ হয় সম্ভবও নয়।

পূর্বসূরি-রূপে পাণিনি দশজন বৈয়াকরণের উল্লেখ করিয়াছেন—শাকল্য, সেনক, স্ফোটায়ন, কাশ্যপ, আপিশলি, শাকটায়ন, ভারদ্বাজ, চাক্রবর্মণ, গার্গ্য ও গালব। ইঁহাদের কাহারও রচিত ব্যাকরণ-গ্রন্থাদি প্রায় কিছুই বর্তমানে পাওয়া যায় না। পরবর্তী গ্রন্থাদিতে ইঁহাদের নামে প্রচারিত উদ্ধৃতি-জাতীয় উপাদানেই কেবল ইঁহারা টিকিয়া আছেন। ইঁহাদের শব্দ-শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি, এককথায় বলিতে গেলে, পাণিনি-তন্ত্রে আসিয়া প্রায় নিঃশেষে মিশিয়া গিয়াছে।

ঐ দশজন বৈয়াকরণের মধ্যে আপিশলিকে পাণিনির অব্যবহিত পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হয়। তাঁহার নামে এক শিক্ষা-গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায়। ভারদ্বাজই বোধ হয় ঐ দশজনের মধ্যে প্রাচীনতম। শাকটায়ন ছিলেন ইঁহাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিভাধর বৈয়াকরণ। শব্দ-বিদ্যায় তাঁহার বা তদ্‌বংশীয়দের অবদান ছিল অসামান্য। তাই পাণিনি-ব্যাকরণের কাশিকা-বৃত্তিতে বলা হইয়াছে, 'অনুশাকটায়নং বৈয়াকরণাঃ' (১।৪।৮৬) এবং 'উপশাকটায়নং বৈয়াকরণাঃ' (১।৪।৮৭)। ইহার অর্থ 'শাকটায়নমপেক্ষ্যান্যে বৈয়াকরণা হীনা ইতি' জিনেন্দ্র-ন্যাস (১।৪।৮৬)—শাকটায়নের তুলনায় অন্য বৈয়াকরণগণ নিম্ন-স্তরের। তাঁহার মতে সমস্ত শব্দই ধাতুজ অর্থাৎ কোনও না কোনও ধাতু হইতে উৎপন্ন। এই মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অব্যুৎপন্ন বলিয়া কথিত শব্দসমূহেরও ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিতে গিয়া উণাদি-প্রত্যয়-বিষয়ক এক উৎকৃষ্ট সূত্রাত্মক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার আর একটি মত—উপসর্গগুলি অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া নব নব অর্থের প্রকাশক হইলেও তাহাদের নিজস্ব বা স্বতন্ত্র কোনও অর্থ নাই। বৈয়াকরণ গার্গ্য অবশ্য শাকটায়নের এই সব মত সর্বাংশে স্বীকার করেন নাই। যাস্কীয় নিরুক্তে (১।৩, ১।১২) এবং মহাভাষ্যে (৩।৩।১) এই কথা বর্ণিত আছে।

প্রায় ৪০০০ সূত্রাত্মক এবং ৮ অধ্যায়ে বিভক্ত পাণিনির ব্যাকরণের নাম অষ্টক বা অষ্টাধ্যায়ী। ইহার বার্তিকরচয়িতা বররুচি কাত্যায়ন এবং ভাষ্যকার পতঞ্জলি। এই তিন জনের কৃতিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যাকরণের অপর সার্থক নাম 'ত্রিমুনি-ব্যাকরণ'। ইহার পূর্ববর্তী আর এক ব্যাকরণও এই আখ্যা লাভ করিয়াছিল। তাহা ছিল শকটি-শাকটি-শাকটায়ন-প্রোক্ত ব্যাকরণ। এই শাকটায়নই পূর্বোক্ত শাকটায়ন। এই প্রাথমিক ত্রিমুনি-ব্যাকরণের সংবাদটি দিয়াছেন শ্রীপতিদত্ত-রচিত কাতন্ত্র-পরিশিষ্টের (১।৪০) টীকাকার গোপীনাথ তর্কাচার্য।

বর্তমান ত্রিমুনি-ব্যাকরণের প্রথম মুনি সূত্রকার পাণিনির বাড়ী ছিল 'শলাতুর' নামক গ্রামে। এই জন্য তিনি শালাতুরীয় নামে অভিহিত। এই শলাতুরের বর্তমান নাম দাঁড়াইয়াছে লাহুর (Lahor, Lahore নয়)। পশ্চিম-পাকিস্তানের অন্তর্গত উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশের পেশোয়ার জেলায় ওহিন্দ-এর প্রায় ৪ মাইল পূর্বোত্তরে ইহার অবস্থিতি। তাঁহার পিতামহের নাম দেবলমুনি, মাতামহ দক্ষমুনি, পিতার নাম শলঙ্কমুনি (ভবিষ্যপুরাণের মতে পাণিনির পিতার নাম সমান বা সামন), মাতার নাম দাক্ষী, মাতুল দাক্ষিমুনি এবং মাতুল-পুত্র দাক্ষায়ণ-ব্যাড়ি। শ্লোক-বার্তিক-প্রণেতা বৈয়াকরণ ব্যাঘ্রভূতি এবং বৈয়াকরণ কৌৎস ছিলেন পাণিনির বিখ্যাত ছাত্র। 'পাণিনি' তাঁহার গোত্র-নাম, প্রকৃত নাম আহিক। পিতা ও মাতার নামানুসারে তিনি শালঙ্কি, দাক্ষেয় এবং দাক্ষী-পুত্র নামেও প্রসিদ্ধ। তাঁহার আবির্ভাবকাল লইয়া পণ্ডিত-মহলে বহু বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছে এবং এই বিষয়ে খুব কম-সংখ্যক ব্যক্তিই একমত হইতে পারিয়াছেন। সে যাহাই হউক, খুব সম্ভব খৃঃ পূর্ব ৫ম ও ৪র্থ শতকের সন্ধিস্থলে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অষ্টাধ্যায়ীর একটি সূত্রে (৬।১।১৫৪) বলা হইয়াছে—"মস্কর-মস্করিণৌ বেণু-পরিব্রাজকয়োঃ"। ভাষ্যকার পতঞ্জলির ব্যাখ্যানুসারে সূত্র-কথিত মস্করীই যে বুদ্ধদেবের (খৃঃ পূঃ ৫৬৪-৪৮৪) সমসাময়িক আজীবিক সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান পুরুষ মখ্খলী বা মখ্খলী-পুত্র গোসাল, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। মস্করী শব্দের প্রাকৃত রূপ মখ্খলী। তাঁহার সম্প্রদায়ের পরিব্রাজকগণ দণ্ডধারণ করিতেন। ৫১২ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে মখ্খলী গোসালের দেহত্যাগ ঘটে। কাজেই পাণিনি কোনমতেই তৎপূর্ববর্তী হইতে পারেন না। আবার খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর মগধের নন্দরাজ-মন্ত্রী বররুচি কাত্যায়ন অষ্টাধ্যায়ীর বার্তিক-রচয়িতা। কাজেই পাণিনি তাঁহার পরবর্তীও হইতে পারেন না। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারসিক আধিপত্য চলিয়াছিল। ইহার ফলে ঐ অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতির দুর্দশা ঘটিবার খুবই সম্ভাবনা। এই কারণে ঐ অঞ্চলের প্রতিভাধর গুণীদের পক্ষে উপযুক্ত মর্যাদা-লাভের জন্য পূর্ব-ভারতের প্রবল-পরাক্রান্ত অথচ বিদ্যোৎসাহী মগধ-রাজগণের আশ্রয় অবলম্বন করা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। বাস্তবিকপক্ষে যে ঐরূপই ঘটিয়াছিল তাহার আভাস আখ্যান-গ্রন্থাদিতে বর্তমান। কনৌজের রাজা মহেন্দ্র পালের (৮৯০—৯১০ খৃঃ অব্দ) গুরু রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা'-গ্রন্থের ১০ম অধ্যায়ে ইহার এক চমৎকার প্রমাণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

'শ্রূয়তে চ পাটলিপুত্রে শাস্ত্রকার-পরীক্ষা। অত্রোপবর্ষবর্ষাবিহ পাণিনি-পিঙ্গলাবিহ ব্যাড়িঃ। বররুচি-পতঞ্জলী ইহ পরীক্ষিতাঃ খ্যাতিমুপজগ্মুঃ।' অর্থাৎ পাটলিপুত্রে শাস্ত্রকারদের গুণাগুণ-বিচারের যে প্রথা প্রচলিত ছিল তদনুসারে সেখানে উপবর্ষ, বর্ষ, পাণিনি, পিঙ্গল, ব্যাড়ি, বররুচি এবং পতঞ্জলি পরীক্ষিত হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ইঁহাদের এই উল্লেখ-পারম্পর্য কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ঐতিহাসিক কালানুক্রমিক। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় এই যে, হর্যঙ্ক-কুলোদ্ভব রাজা অজাতশত্রুর পুত্র উদায়িন্ (বা উদয়াশ্ব বা উদয়ভদ্র)-এর রাজত্বকালে (খৃঃ পূর্ব ৪৬১—৪৪৫ অব্দ) খৃঃ পূঃ ৪৫৭ অব্দ নাগাদ কুসুমপুর বা পাটলিপুত্রনগরের প্রতিষ্ঠা এবং ঐ সময়েই উদায়িন্ কর্তৃক গিরি-

ব্রজপুর বা রাজগৃহ হইতে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত হয়।

'বৃত্তি'-শব্দ হইতে 'বার্ত্তিক'-শব্দের উৎপত্তি। বৃত্তির অর্থ ব্যাখ্যা, বার্ত্তিক অর্থে ব্যাখ্যামূলক সূত্রবিশেষ। মূল সূত্রে 'উক্ত, অনুক্ত ও দুরুক্ত' বিষয়ের চিন্তনই বার্ত্তিকের কাজ। ত্রিমুনি-ব্যাকরণের দ্বিতীয় মুনি বররুচি কাত্যায়ন (সাধারণতঃ 'কাত্যায়ন' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ) অষ্টাধ্যায়ী-সূত্রের বার্ত্তিক-কার বা বাক্য-কার বলিয়া অভিহিত। বার্ত্তিকের কোনও স্বতন্ত্র প্রাচীন গ্রন্থ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে ব্যাখ্যা-বা আলোচনা-প্রসঙ্গে যে সব বার্ত্তিক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাই এ ক্ষেত্রে একমাত্র অবলম্বন। ইহা হইতে দেখা যায় যে, কাত্যায়ন পাণিনির বহু সূত্রের উপরে কোনও বার্ত্তিক রচনা করেন নাই বা রচনার প্রয়োজন বোধ করেন নাই, আবার কোনও সূত্রের উপরে একাধিক এমনকি ৫৯টি (১।২।৬৪ সূত্রের উপর) পর্যন্ত বার্ত্তিক যোজনা করিয়াছেন। এই বার্ত্তিক ভিন্ন বিভিন্ন শাস্ত্রীয় প্রচুর গ্রন্থের কর্তৃত্ব তাঁহাতে আরোপিত। কলাপব্যাকরণের বৃত্তিকার দুর্গসিংহ কাত্যায়নকে ঐ ব্যাকরণের কৃদংশের রচয়িতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, যদিও কলাপের রচনার প্রায় ৩০০।৩৫০ বৎসর পূর্বে কাত্যায়নের আবির্ভাব।

পূর্বোক্ত কথাসরিৎসাগরাদি গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, সোমদত্তের ঔরসে বসুদত্তার গর্ভে কৌশাম্বী নগরীতে (বর্তমান Kosam—ইহা প্রয়াগক্ষেত্রের উপরিভাগে যমুনাতীর হইতে ৩০ মাইল দূরে) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন 'সকৃচ্ছ্রুত' অর্থাৎ একবার মাত্র শুনিয়াই তিনি যে-কোনও বিষয় মনে রাখিতে পারিতেন। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় মাতা বসুদত্তাকর্তৃক তিনি ব্যাড়ি ও ইন্দ্রমিত্র নামক অপর দুই বিদ্যার্থীর সহিত পাটলিপুত্র নগরে বর্ষ-উপাধ্যায়ের নিকটে প্রেরিত হইয়া ঐন্দ্র ব্যাকরণ সহ নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধি-বলে তিনি ক্রমে মগধের নন্দবংশীয় রাজাদের মন্ত্রিপদে বৃত হন এবং অতি বৃদ্ধবয়সে অবসর-গ্রহণপূর্বক তপোবনবাসী হইয়া বদরিকাশ্রমে দেহত্যাগ করেন। আখ্যান-বর্ণিত পাণিনির সহিত তাঁহার সাক্ষাতাদির কথা একেবারেই অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না, কারণ 'নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ'। কাত্যায়ন একটি বার্ত্তিকে 'যথা লোকে বেদে চ' এইরূপ না বলিয়া 'যথা লৌকিক-বৈদিকেষু' বলায় পতঞ্জলি মহাভাষ্যের পস্পশাহ্নিকে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া 'প্রিয়-তদ্ধিতা দাক্ষিণাত্যাঃ' (অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য-বাসীরা তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত শব্দের ব্যবহার পছন্দ করেন) এই উক্তি করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কাত্যায়ন দাক্ষিণাত্যের লোক ছিলেন। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষায় ইহাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বার্ত্তিকাংশে তিনি তিন জন প্রাচীন বৈয়াকরণের নাম করিয়াছেন—(১) পৌষ্করসাদি (৮।৪।৪৮—৩), (২) বাজপ্যায়ন (১।২।৬৪—৩৫) এবং ব্যাড়ি (১।২।৬৪—৪৫)। ৩।২।৩ সূত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি তাঁহাকে 'ভগবান্ কাত্য' বলিয়া যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

তৃতীয় মুনি পতঞ্জলি সবার্ত্তিক অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্য-রচয়িতা। তিনি ছিলেন শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মগধ-রাজ পুষ্যমিত্রের (১৮৫—১৪৯ খৃঃ পূর্বাব্দ) পুরোহিত। ইহা তিনি নিজেই ভাষ্যমধ্যে (৩।২।১২৩) ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সেখানে অবশ্য পুষ্যমিত্রকে 'পুষ্পমিত্র' বলা হইয়াছে। গোনর্দ-দেশীয় (অযোধ্যার ফয়জাবাদ বিভাগের গোণ্ডা জেলা?) এবং গোণিকা-

দেবীর পুত্র বলিয়া তাঁহাকে 'গোনর্দীয়' এবং 'গোণিকা-পুত্র' বলা হইত। 'কায়, বাক্ এবং বুদ্ধি (বা মনের)-মল' অপনোদনের জন্য তিনি যথাক্রমে আয়ুর্বেদে চরক-সংহিতার বার্ত্তিক, ব্যাকরণে অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্য এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রে যোগসূত্র রচনা করেন। কাত্যায়নের বার্ত্তিক-সমূহের তাৎপর্যবিচার-মুখে সূত্রার্থের বিশদীকরণ এবং ন্যূনার্থের পরিপূরণ ভাষ্যরচনার প্রাধনতম উদ্দেশ্য। ভাবের গাম্ভীর্যে, বিচারের সূক্ষ্মতায়, সিদ্ধান্তের দৃঢ়তায় এবং রচনাশৈলীর স্বচ্ছতায় একাধারে এমন সর্বতোভদ্র গ্রন্থ—যাহাকে মহাগ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—কেবল ব্যাকরণেই নয়, প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্রের অন্য কোন বিভাগেই আর রচিত হয় নাই। এই গুণগরিমাবশতঃ ইহাকে 'মহাভাষ্য' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আবার মহাভাষ্য বলিতে যে একমাত্র ব্যাকরণ-মহাভাষ্যকেই বুঝায়, ইহা অবশ্য চির-অপ্রিয় ব্যাকরণ-শাস্ত্রের পক্ষে খুবই গৌরবের কথা। কথিত আছে, 'মহাভাষ্যং বা পাঠনীয়ং মহারাজ্যং বা পালনীয়ম্'—অর্থাৎ মহাভাষ্যের অধ্যাপনা এবং মহারাজ্যের পরিচালনা সমান গুরুত্বপূর্ণ। পতঞ্জলিকে শেষনাগের অবতার কল্পনা করিয়া মহাভাষ্যকে 'ফণিভাষ্য'ও বলা হইয়া থাকে। ইহার অপর নাম চূর্ণী। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ।৭ম শতাব্দীর ভর্তৃহরি-রচিত 'বাক্যপদীয়' (২।৪৮৪—৪৯০) হইতে জানা যায়, দাক্ষায়ণ-ব্যাড়ি-রচিত লক্ষ-শ্লোকাত্মক 'সংগ্রহ'নামক বিশাল ব্যাকরণ-গ্রন্থের সার-সংগ্রহপূর্বক পতঞ্জলি এই মহাভাষ্য রচনা করেন।

সমগ্র মহাভাষ্য মোট ৮৫ আহ্নিকে বিভক্ত। এক এক দিনে যতটা পড়ানো হইত অথবা রচিত হইত তাহাই এক এক আহ্নিকরূপে চিহ্নিত হইয়া আছে। ইহাতে অষ্টাধ্যায়ীর অর্ধেকেরও কম-সংখ্যক (মোট ১৬৮৯) সূত্রে আচরিত হইয়াছে। মহাভাষ্যের সাক্ষ্যানুসারে কাত্যায়ন মোট ১২৫৪টি সূত্রের বার্ত্তিক রচনা করেন। এই ১২৫৪টি সূত্রের অন্তর্গত ২৬টির উপর আবার পতঞ্জলিও বার্ত্তিক প্রণয়ন করিয়াছেন। ৭০৯টি সূত্রের বার্ত্তিক ব্যাখ্যামূলক, ৫৩৭ টি সূত্রের বার্ত্তিক সংস্কার-মূলক এবং বাকী ৮টি সূত্র কাত্যায়নের বিবেচনায় অনাবশ্যক। এই ১২৫৪ টি সূত্র ভিন্ন আরও ৪৩৫টি সূত্রের উপরে পাতঞ্জল ভাষ্য বর্তমান। ভাষ্যকারের বিবেচনায় অষ্টাধ্যায়ীর ১৬টি সূত্র অনাবশ্যক। মাত্র ৩৬টি সূত্রের ক্ষেত্রে তিনি সূত্রকারকে বার্ত্তিককারের আক্রমণ বা বিরূপ সমালোচনা হইতে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এই সব বিরোধ বা সমস্যার ক্ষেত্রে তিন মুনির মধ্যে পূর্ব ব্যক্তি অপেক্ষা পরব্যক্তির মত অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার্য—'যথোত্তরং মুনিত্রয়স্য প্রামাণ্যম্'—(মহাভাষ্য-প্রদীপ ১।১।২৯)।

মহাভাষ্য (২।৩।৬৬, ৪।১।১, ৬।১।৯১) হইতেই আমরা সর্বপ্রথম 'সংগ্রহ'কার দাক্ষায়ণের কথা জানিতে পারি। আর জানিতে পারি চারিটি সুনির্দিষ্ট ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ের কথা—'আপিশল-পাণিনীয়-ব্যাড়ীয়-গৌতমীয়াঃ' (৬।২।৩৬)। এই উক্তির আচার্য-পরম্পরা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে কালানুক্রমিক বলিয়া মনে হয়। এই ব্যাড়িই পাণিনির মাতুলপুত্র সংগ্রহ-কার দাক্ষায়ণব্যাড়ি। বৈয়াকরণ গৌতমের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি নূতন শাব্দিক এবং ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ের নাম মহাভাষ্যে উল্লিখিত হইয়াছে—কাশকৃৎস্ন (১।১।১ আহ্নিক), সৌনাগ (২।২।১৮, ৩।২।৫৬…), সৌর্যভগবত (৮।২।১০৬), বাড়ব (৮।২।১০৬), কুণর-বাড়ব (৩।২।১৪, ৭।৩।১), ক্রোষ্ট্রীয় (১।১।৩) এবং বার্ষ্যায়ণি (১।৩।১, ৪।১।১৫৫, নিরুক্তেও ইহার

উল্লেখ আছে—১।২)।

অষ্টাধ্যায়ীতে একাধারে বৈদিক এবং লৌকিক এই দ্বিবিধ সংস্কৃতভাষাই উপলক্ষিত হইয়াছে। অষ্টাধ্যায়ী এই দুই ভাষারই শব্দানুশাসন। ত্রিমুনির কেহই অবশ্য ভাষার নাম হিসাবে 'সংস্কৃত' শব্দের ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা এই প্রসঙ্গে 'লোক', 'লৌকিক' এবং 'ভাষা' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, আর বৈদিক ভাষাকে বলিয়াছেন 'বেদ', 'বৈদিক', 'ছন্দঃ', 'ছান্দস', 'মন্ত্র' এবং 'নিগম'। ভাষার বৈদিক এবং লৌকিক এই দুই বিভাগ ব্যতীত অন্য কোন দিকের নির্দেশ তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না। তবে মহাভাষ্যে ম্লেচ্ছভাষা এবং শব্দের ভ্রষ্ট উচ্চারণের কথা আছে। কেবল পাণিনীয় শিক্ষাতেই ভাষার 'প্রাকৃত' এবং 'সংস্কৃত' নাম দুইটির সন্ধান মিলে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, পাণিন্যাদির সময়ে সংস্কৃতভাষাই সমাজের অন্ততঃ এক শ্রেণীর জনগণের কথ্য ভাষা ছিল। মহাভাষ্যকার ইহাদিগকেই আর্যাবর্তবাসী 'শিষ্ট' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (৬।৩।১০৯)। আচার এবং নিবাসই ছিল ইহাদের শিষ্টত্বের নিয়ামক। পূর্বে কালকবন (অর্থাৎ রাজমহলের পাহাড়), পশ্চিমে আদর্শ (আরাবল্লী পর্বত), উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে পারিযাত্র (বিন্ধ্য-পর্বতের পশ্চিমাংশ)—এই চতুঃসীমা-বিশিষ্ট আর্যাবর্তে বাস করিয়া যে ব্রাহ্মণগণ নির্লোভ, বিনাকারণেই সদাচারী, ছয়মাস বা এক বৎসরের জীবিকা-নির্বাহোপযোগী ধান্য সঞ্চয়কারী এবং অন্য কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকেই যে-কোন বিদ্যায় পারগ—তাঁহারাই ছিলেন পতঞ্জলির মতে শিষ্ট। ইঁহারা দৈবানুগ্রহবশতই হউক বা স্বভাবতই হউক ঐ ভাষায় অভ্যস্ত ছিলেন অর্থাৎ অষ্টাধ্যায়ী অধ্যয়ন না করিয়াও অষ্টাধ্যায়ী-বিহিত শব্দাদির যথাযথ প্রয়োগ করিতেন। এই শিষ্টদের ব্যবহৃত শব্দরাশির স্বরূপ এবং গতি-প্রকৃতি জানিবার উপায় নির্ধারণের জন্যই অষ্টাধ্যায়ীর অবতারণা। তাই পতঞ্জলি এই আলোচনার শেষে বলিয়াছেন—'শিষ্টপরিজ্ঞানার্থাষ্টাধ্যায়ী' (৬।৩।১০৯)। এই পরিজ্ঞানের ব্যাপারে পাণিনি আর্যাবর্তের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে শিষ্ট ভাষার যে পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা তিনি 'উদীচাম্' এবং 'প্রাচাম্' এই দুই বিভাগের দ্বারা সূচিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে এই দুই অঞ্চলের মধ্যবর্তী ভূ-ভাগে, অর্থাৎ আর্যাবর্তের মধ্যে পবিত্রতম বলিয়া পরিগণিত ব্রহ্মাবর্তে বসবাসকারী শিষ্টদের কথ্য ভাষাকেই যে পাণিনি আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। ভাষা-তাত্ত্বিক পরিসংখ্যান হইতে জানা যায়, মধ্যদেশীয় শিষ্টদের এই আদর্শ-ভাষা ছিল বৈদিক মন্ত্রযুগের পরবর্তী ব্রাহ্মণ যুগের লক্ষণাক্রান্ত। বৈদিক ব্রাহ্মণ-যুগের শেষ অবস্থায় আবির্ভূত হইয়া পাণিনি ঐ যুগের ভাষাকেই অষ্টাধ্যায়ীর মধ্য দিয়া সর্বোত্তম ভাষা-রূপে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। অষ্টাধ্যায়ীর বিধিগুলি যে ঐ ভাষার ক্ষেত্রেই সর্বাধিক প্রযোজ্য, বিশেষ পরিসংখ্যানের দ্বারা তাহা জানিতে পারা গিয়াছে।

কার্যকারণ-সম্বন্ধের নিয়মানুসারে পাণিনির এই মহতী কীর্তির কারণ-রূপে যে বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা সর্বাগ্রে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে তাহা হইতেছে বৈদিক-ঐতিহ্য-বিরোধী বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিপ্লবাত্মক অভ্যুদয়। বৈদিকোত্তর ব্রাহ্মণ যুগের শেষে পৌরাণিক হিন্দু-যুগের প্রারম্ভ-মুখে এতকালের বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির কঠোরতার পরিপন্থী সরল-স্বাভাবিক এবং গণ-মুখী এই সব মতবাদ জনগণেরই মুখের ভাষাকে আশ্রয় করিয়া প্রচারিত হইতে থাকায় সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে প্রকাশোন্মুখ

প্রাকৃত ভাষার জীবনীশক্তিতে সহসা যে প্রবল গতি-বেগের সঞ্চার হয় তাহার ফলে ক্রমে পূর্বোক্ত শিষ্ট ভাষা কেবল সঙ্কুচিতই নয়, পরন্তু নানাভাবে বিকৃত ও বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই ঘোরতর বিপর্যয়ের মুখে শিষ্ট ভাষার অবিমিশ্র রূপটিকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিবার জন্যই ত্রিমুনি ব্যাকরণের সৃষ্টি। কথায় বলে, 'যত বড় মুস্কিল তত বড় আসান'। পাণিনির পূর্বে এত বড় বিপদ আর দেখা দেয় নাই—তাই ভাষার ক্ষেত্রে তৎপূর্বে এত বড় ব্যাকরণও আর রচিত হয় নাই। অষ্টাধ্যায়ীর ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববর্তী অন্য সমস্ত ব্যাকরণের ক্রমাবলুপ্তিই ইহার প্রমাণ। তাই পতঞ্জলিকে ইহার সমগ্রতার প্রশংসায় বলিতে হয়—'সর্ববেদ-পারিষদং হীদং শাস্ত্রং তত্র নৈকঃ পন্থাঃ শক্য আস্থাতুম্' (৬।৩।১৪)—অর্থাৎ সর্ববেদ-সাধারণ বলিয়া অষ্টাধ্যায়ীতে এককভাবে কোন বেদ বা বৈদিক শাখামূলক বিধি নির্দেশ করা সম্ভবপর হয় নাই। তাই 'পাণিনীয়ং মহৎ সুবিহিতম্' (মহাভাষ্য ৪।৩।৬৬) এবং ইহার বিধায়ক পাণিনি কাত্যায়নের নিকটে ভগবান বলিয়া প্রতিভাত (৮।৪।৬৮—৪)।

কৃৎস্ন বা সমগ্র বা স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাকরণ বুঝাইতে বৈয়াকরণদের মধ্যে 'সম্প্রদায়-নিষ্পত্তি' বলিয়া একটা বিশেষ কথার প্রচলন আছে। ইহার তাৎপর্য—কোন ব্যাকরণকে কেন্দ্র করিয়া তৎসংক্রান্ত সমস্ত বিভাগে গ্রন্থাদির সংরচন। ব্যাকরণের সূত্রপাঠকে মূল বা কেন্দ্রবিন্দু ধরিয়া আনুষঙ্গিক এই বিভাগগুলি হইতেছে—ধাতুপাঠ, গণপাঠ, (বার্ত্তিকপাঠ), উণাদি-পাঠ, লিঙ্গানুশাসন, পরিভাষা-পাঠ এবং শিক্ষা। এইগুলিকে মূল ব্যাকরণের পরিশিষ্ট- বা খিল-পাঠও বলা হইয়া থাকে। একমাত্র পাণিনীয় সম্প্রদায়েই ইহাদের প্রত্যেক বিভাগে অপেক্ষাকৃত মৌলিক গ্রন্থের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। ব্যাকরণক্ষেত্রে পাণিনিই সম্প্রদায়-নিষ্পত্তির প্রথম পথ-প্রদর্শক।

অনেকের মতে পাণিনীয় ব্যাকরণের কঠোর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াই সংস্কৃতভাষা ক্রমে স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। ভাষা-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু এই মত ক্রটিহীন নয়। কারণ ব্যাকরণ কখনও কোন গতিশীল ভাষার স্বাভাবিক বিকাশকে অবরুদ্ধ করিতে পারে না, স্থলবিশেষে উহাকে কথঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে মাত্র। আসলে সাহিত্যের তথা ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের (অর্থাৎ 'শিষ্ট'দের) ভাষা-রূপে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়ার জন্যই এই ভাষায় ঐরূপ সর্বাতিশায়ী শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ-রচনা সম্ভবপর হইয়াছিল। ভাষা যত সুস্থির, উহার ব্যাকরণ তত উন্নত। এই পরিপ্রেক্ষায় মৃত ব্যক্তির জীবনীরচনার মতো ভাষার অন্তিম দশায়ই কেবল উহার পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচিত হইতে পারে। এই অবস্থায় ভাষার অস্তিত্ব উহার ব্যাকরণের উপর নির্ভর করে বলিয়া ব্যাকরণই হয় ভাষাশিক্ষার একমাত্র উপায়। ব্যাকরণ তখন ভাষাকে অনুসরণ করে না, ভাষাই ব্যাকরণের আনুগত্য করিয়া থাকে। ইহা এই ভাষার মৃত্যুরই লক্ষণ, যাহার ফল-শ্রুতি—গত দুই হাজার বৎসরের ব্যাকরণাশ্রয়ী সংস্কৃতের কৃত্রিমতার ইতিহাস।

(ক্রমশঃ)

ভক্তের জন্য ভগবানের ব্যাকুলতা

শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়

ভক্তই শুধু ভগবানের জন্যে কাঁদেন না, ভগবানও কাঁদেন ভক্তের জন্য। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাজীবনী একটু আলোচনা করলেই আমরা দেখতে পাব যে, ভক্তের জন্যে তাঁর কি গভীর ভালবাসা, কি ভীষণ আকুলতা!

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর কেঁদেছেন অনেক দিন এই ব'লে, 'ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস আয়রে, আমি যে আর থাকতে পারছি না।' ভক্তই শুধু ডাকে না তাহলে—ভগবানও ডাকেন ভক্তকে! নরেন্দ্রনাথকে (স্বামী বিবেকানন্দ) দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, "এত দিন পরে আসতে হয়? আমি তোমার জন্যে কিরূপ প্রতীক্ষা করছি তা একবার ভাবতে নাই?"

নরেন্দ্রকে কিছুদিন না দেখে একদিন নিজের মনের অবস্থার কথা বলছেন ঠাকুর, "দেখ, নরেন্দ্রর জন্য প্রাণের ভেতরটা যেন গামছা নিঙড়াবার মতো জোরে মোচড় দিচ্ছে, তাকে একবার দেখা ক'রে যেতে বলো।" শুধু অতন্দ্র প্রতীক্ষাই নয়, অদর্শনের জন্য বেদনার কি আকুতিময় প্রকাশ!

ঠাকুর অনেক সময় মাড়োয়ারী ভক্তদের প্রদত্ত খাবার ইত্যাদি নরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে তাঁর অন্য ভক্তদের দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। যে-দিন অন্য কাউকে পেতেন না সেদিন ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে পাঠাতেন। প্রায়ই এ রকম হোত; রোজ রোজ ঐ রকম নিয়ে যেতে পাছে রামলাল বিরক্ত হয় তাই একদিন মধ্যাহ্নভোজনের পর রামলালকে জিজ্ঞেস করছেন, "কিরে, কোলকাতায় কোন দরকার নেই?"

রামলাল: আজ্ঞে, আমার কোলকাতায় কি দরকার? তবে আপনি বলেন তো যাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ: না, তাই বলছিলাম; বলি, অনেকদিন বেড়াতে-টেড়াতে যাস্‌নি, তাই যদি বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছে হয়ে থাকে। তা একবার যা না। যাস তো ঐ টিনের বাক্সে পয়সা আছে, নিয়ে বরানগর থেকে শেয়ারের গাড়ীতে করে যাস। তা না হলে রোদ লেগে অসুখ করবে। আর ঐ মিছরি বাদামগুলো নরেন্দ্রকে দিয়ে আসবি ও তার খবরটা নিয়ে আসবি—সে অনেকদিন আসেনি; তার খবরের জন্যে মনটা 'আটু-পাটু' কচ্চে।

ভগবানের পক্ষেই বোধ হয় এই ধরনের ভালবাসা সম্ভব। সাধারণ মানুষের জীবনে ঠিক এই রকম দেখা যায় কি?

রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) যখন প্রথম প্রথম ঠাকুরের কাছে আসতেন, ওঁর বাবা আনন্দ-মোহন অত্যন্ত বিরক্ত হতেন এবং রাখালকে দক্ষিণেশ্বরে যেতে নিষেধ করতেন। ঐ নিষেধ না শুনলে জোর ক'রেও আটকে রাখতেন কখনো কখনো। রাখালকে দীর্ঘদিন দেখতে না পেয়ে ঠাকুর একদিন উন্মত্তের মতো ভবতারিণীর মন্দিরে কেঁদে বলেছিলেন,—"মা, রাখালকে না দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আমার রাখালকে এনে দে।"

রাখাল একবার বৃন্দাবনে গেলেন। ঠাকুরই বললেন যেতে, আবার যাবার পর তাঁকে না দেখেও ঠাকুর অস্থির। রাখালের বৃন্দাবনে জ্বর হয়েছিল। ব্রজের রাখালের ব্রজে যদি পূর্বস্মৃতি ফিরে আসে এবং তার শরীর যায়, এই ভয় ঠাকুরের! তাই ঠনঠনে মা-কালীর কাছে ডাব-চিনি মানত করলেন। অধর সেন মাষ্টারকে দিয়ে রেজেষ্টি চিঠি লেখালেন, সময়ে খবর না

পেয়ে ঠাকুর আকুল প্রার্থনা করলেন ৺ভবতারিণীর কাছে—"মা, রাখাল সুস্থদেহে ফিরে আসুক।" ভক্তের জন্যে ভগবানের কি অমৃতময়ী মমতা।

কেশববাবুর (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের) দেহরক্ষার পর ওঁর একটি ছেলে একবার গিয়েছিলো ঠাকুরের কাছে। কেশববাবুর ছেলে —একথা শুনে তিনি তাঁকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। গায়ে হাত বুলুচ্ছেন। তখন অসুস্থ তিনি কাশীপুর বাগানে। ছেলেকে দেখে কেশববাবুর কথা মনে হয়েছে। কত গভীরভাবে ভালবাসতেন তাঁকে।

একবার বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দের) ইচ্ছা হয় যে তাঁর ভাবসমাধি হয়। ঠাকুরকে বিশেষ কান্নাকাটি ক'রে ধরলেন। ঠাকুর তাঁকে শান্ত ক'রে বললেন, "আচ্ছা, মাকে বলব; আমার ইচ্ছেতে কি হয় রে?" কিন্তু ঠাকুরের সে কথা কে শোনে! বাবুরামের ঐ এক কথা, "আপনি ক'রে দিন।" এইরূপ আবদারের কয়েকদিন পরে বাবুরাম নিজের বাড়ী আঁটপুরে গেলেন। এদিকে ঠাকুর ভেবে আকুল কি ক'রে বাবুরামের ভাবসমাধি হবে। একে বলেন, ওকে বলেন, "বাবুরাম ঢের ক'রে কাঁদাকাঁটা ক'রে গেছে যেন তার ভাব হয়—কি হবে?"

তারপর মাকে বললেন, "মা, বাবুরামের যাতে একটু ভাবটাব হয়, তাই করে দে।" মা বললেন, "ওর ভাব হবে না, ওর জ্ঞান হবে।"

ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার ঐ বাণী শুনে অন্যান্য ভক্তদের বললেন, "তাইতো বাবুরামের কথা মাকে বললাম, তা মা বল্লেন, ওর ভাব হবেনি, ওর জ্ঞান হবে; তা যাই হোক একটা কিছু হয়ে তার মনে শান্তি হলেই হোল। তার জন্যে মনটা কেমন কচ্চে, অনেক কাঁদাকাটা ক'রে গেছে" ইত্যাদি।

নিজেই বলতেন অনেক সময় ঠাকুর, "আচ্ছা বল্ দেখি, এই সব এদের জন্যে এত ভাবি কেন? এর কি হল, ওর কি হল না, এত সব ভাবনা হয় কেন? এরা ত সব ইস্কুল-বয়—কিছুই নেই —এক পয়সার বাতাসা দিয়ে আমার খবরটা নেবে সে শক্তি নেই; তবু এদের জন্যে এত ভাবনা কেন? কেউ যদি দুদিন না আসে তো অমনি তার জন্যে প্রাণ আঁচোড়-পাঁচোড় করে; তার খবরটা জানতে ইচ্ছে হয়—এ কেন?"

এর উত্তরে আমরা বলব —এই কেনটুকু না হলে আমাদেরই আশ্রয় কি ক'রে হোত? সংসারের শুকনো মরুতে ঘুরতে ঘুরতে একবিন্দু সত্যিকারের স্নেহ-ভালবাসার অভাবে যখন মৃতপ্রায় হয়ে উঠব, তখনই হয়তো শুনতে পাব, "ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস্ আয়—আমি যে আর থাকতে পারছি না। আমি যে তোদের প্রতীক্ষায় কতদিন থেকে অপেক্ষা করছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কাপ্তেন

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ

'কাপ্তেন' ব'লে ডাকতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। নাম—বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। নিষ্ঠাবান কনৌজী ব্রাহ্মণ। বিশ্বনাথের পিতা ছিলেন ইংরেজের সৈন্যবাহিনীতে একজন হাবিলদার—তেজস্বী বীর্যবান ব্যক্তি। কাশী-বিশ্বনাথের আরাধনা ক'রে পুত্র লাভ করেছিলেন ব'লে পুত্রের নাম রেখেছিলেন—বিশ্বনাথ। পরম শিবভক্ত ছিলেন তিনি। শিবপূজা না ক'রে জলগ্রহণ করতেন না। এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রেও এক হাতে তরবারি, অপর হাতে শিবলিঙ্গ।

যেমন পিতা—পুত্রও তদনুরূপ। সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত। বেদান্ত, গীতা, ভাগবত—সব কণ্ঠস্থ। আবার এদিকে মনটিও ছিল ভক্তিরাগে অনুরঞ্জিত। পট্টবস্ত্র প'রে, কর্পূরের প্রদীপ জ্বালিয়ে, কাপ্তেন যখন তার ইষ্টদেবতার পূজা করতেন তখন তাঁর মুখশ্রী অপূর্বভাব ধারণ করত, ভক্তির অরুণিমা উজ্জ্বল হয়ে উঠতো মুখে চোখে। পত্নীও ছিলেন অতি ভক্তিমতী। তার ছিল একটি আলাদা ঠাকুর—গোপাল। পরম স্নেহে ও অনুরাগে গোপালের পূজা করতেন তিনি। বাৎসল্যরস-সিক্ত এই মনটি নিয়ে কাপ্তেন-গৃহিণী শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক সেবা করেছিলেন। কলিকাতার সন্নিকটে গঙ্গাতীরে নেপাল সরকারের বৃহৎ একটি কাঠের আড়ত ছিল। বিশ্বনাথ ছিলেন সেই আড়তের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

বিশ্বনাথ একদিন অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলেন—যেন এক দিব্যদর্শন পুরুষ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে, মমতা-মধুর কণ্ঠে তাঁকে বারবার আহ্বান করছেন। সৌম্য মুখমণ্ডলে অপূর্ব দেবভাবের দীপ্তি! মুগ্ধ বিশ্বনাথ নিষ্পলকনেত্রে চেয়ে রইলেন সেই জ্যোতির্ময় মূর্তির দিকে। মৃদু হেসে অদৃশ্য হয়ে গেল মূর্তি। নিদ্রাভঙ্গে বিশ্বনাথ ভাবতে লাগলেন—কে ইনি, কোথায় গেলে এঁর দেখা পাব? অপূর্ব আনন্দে উদ্বেলিত হল বিশ্বনাথের হৃদয়। স্বপ্নে-দেখা করুণামাখা মুখখানির চিন্তা করতে লাগলেন অনুক্ষণ। মানসপটে জ্বলজ্বল করছে সেই স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তি। দৈবযোগে একদিন দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির বাগানে এসে পড়লেন। দেবীদর্শনান্তে গৃহে ফিরবেন, এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণকে হঠাৎ গঙ্গা-তীরে, পঞ্চবটীতলে দেখতে পেলেন। মন বললো—এই সে মূর্তি! ভক্তিভরে শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হলেন বিশ্বনাথ। শ্রীরামকৃষ্ণ মৃদু হেসে নিজ কক্ষে নিয়ে গেলেন বিশ্বনাথকে। তারপর কত কথা—যেন অনেককালের পরিচয়!

প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হলেন বিশ্বনাথ। তাঁর সারা জীবনের শাস্ত্রানুশীলন ও ঈশ্বরারাধনা মূর্তি গ্রহণ ক'রে যেন আজ তার সম্মুখে আবির্ভূত! অদ্ভুত ভালবাসা এই দেবমানবের, দুর্নিবার তাঁর আকর্ষণ! বিশ্বনাথের মন সেদিন আর গৃহে ফিরতে চাইলো না। দক্ষিণেশ্বরেই থেকে গেলেন সে রাত্রি। তারপর প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে বসে থাকেন, তাঁর কথামৃত পান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময়ী বাণী শুনতে শুনতে কোথা দিয়ে সময় কেটে যায়! বেদজ্ঞ বিশ্বনাথ দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলি বেদ-বচনেরই প্রতিধ্বনি। তাঁর প্রতিটি কথা তীক্ষ্ণ তীরের মতো মনের মধ্যে গেঁথে যায়, চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। তাঁর

ভালবাসায় বাঁধা পড়লেন বিশ্বনাথ। কিন্তু এখনও ঠিকমত বুঝতে পারলেন না—কে তিনি। মনে হল—ইনি যথার্থ একজন ত্যাগী সাধক, খাঁটি ঈশ্বরোপাসক।

অচিন্তনীয় এক ঘটনায়[১] বিশ্বনাথের বিশ্বাস শতগুণ বেড়ে গেল। তিনি হঠাৎ এক সঙ্কটে পড়লেন। তার কাঠের আড়ত থেকে বহু মূল্যবান কাঠ গঙ্গার বানে ভেসে গেল। বহু টাকা লোকসান। এই বিপুল ক্ষতি পূরণ করবার মতো সামর্থ্য ছিল না বিশ্বনাথের। বাধ্য হয়ে ক্ষতির সংবাদ পাঠালেন নেপাল-রাজের কাছে। এই সুযোগে কোন দুষ্ট লোক নেপালরাজকে জানালো—বিশ্বনাথ গোপনে কাঠ বিক্রি ক'রে ধনবান হয়েছে। নেপালরাজের ক্রোধপূর্ণ চিঠি এসে পৌছালো বিশ্বনাথের কাছে। অবিলম্বে রাজদরবারে তলব পড়লো। কঠোর-মানস স্বাধীন নেপালরাজকে তিনি চিনতেন। চাকরি তো যাবেই, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত যেতে পারে।

এই মহা সঙ্কটে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বিশ্বনাথের হঠাৎ মনে পড়লো শ্রীরামকৃষ্ণকে। তাঁর কাছে এসে সাশ্রুনয়নে বিপদের কথা সব নিবেদন করলেন। ভক্তের বিপদের কথা শুনলেন বিপদভঞ্জন ঠাকুর, দৃঢ়কণ্ঠে অভয় দিলেন, শান্ত করলেন বিশ্বনাথের ভীতি-বিহ্বল মন, সানন্দে নেপাল যাবার অনুমতি দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বচনে উৎসাহিত বিশ্বনাথ নিশ্চিন্তমনে নেপাল যাত্রা করলেন।

নেপালরাজের নিকটে নির্ভয়ে সত্যবৃত্তান্ত অকপটে বিবৃত করলেন। বিশ্বনাথের কথায় রাজা এতই সন্তুষ্ট হলেন যে, তাঁর মাসিক বেতন বাড়িয়ে দিলেন চতুর্গুণ। 'ক্যাপ্‌টেন' উপাধিতে ভূষিত ক'রে নেপালরাজের প্রতিনিধিরূপে পাঠিয়ে দিলেন বাংলাদেশে। অচিন্তনীয় ব্যাপার। কাপ্তেন বুঝতে পারলেন, ইহা একমাত্র করুণাময় ঠাকুরের কৃপা-কটাক্ষের ফল। শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ যূপ-কাষ্ঠের পরিবর্তে গৌরবের বিজয়-মাল্য পরিয়ে দিয়েছে তাঁর কণ্ঠে। কলিকাতায় এসেই সর্বাগ্রে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে লুটিয়ে পড়লেন বিশ্বনাথ। ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার অশ্রুজলে সিক্ত করলেন তাঁর চরণকমল।

কাপ্তেনের চোখের ঠুলি খুলে গেল। মর্মে মর্মে বুঝলেন শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু সাধক নন। এমন একজন তিনি যাঁর শ্রীচরণস্পর্শে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই সুলভ হয়।

এখন কাপ্তেন অসংকোচে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে মন প্রাণ সর্বস্ব সমর্পণ করলেন। চিত্ত-কমল ফুটে উঠলো পরিতৃপ্তির আনন্দালোকে। ঘন ঘন যাতায়াত শুরু হল দক্ষিণেশ্বরে। পরমাদরে শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি নিয়ে যেতেন নিজ গৃহে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সেবাযত্ন করতেন শ্রীশ্রীঠাকুরের —যেমনটি করতেন মা যশোদা গোপালের। নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্য রান্না ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাওয়াতেন কাপ্তেন-গৃহিণী। স্বামী-স্ত্রী দুজনে দুদিকে বসে পাখা করতেন। কাপ্তেনের স্ত্রীর হাতের রান্না খেতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভালবাসতেন।

কাপ্তেন এখন কেউকেটা নন। বাংলায় মহামান্য নেপালরাজের প্রতিনিধি। নেপাল-নৃপতির যাবতীয় কাজের ভার এখন তাঁর উপরে। প্রায়ই ইংরেজ বড়লাটের সহিত দরবার করতে হয়। এহেন কাপ্তেন রাজপথে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে পেলেই তাঁর চরণতলে লুটিয়ে পড়েন।

ভক্তবর রামচন্দ্র দত্ত একদিন কাপ্তেনকে

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পৃঃ ২৮০-৮৩

জিজ্ঞাসা করলেন—"শ্রীরামকৃষ্ণকে আপনার কিরূপ মনে হয় ?"[২] হঠাৎ এইরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে কাপ্তেনের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। দুহাত তুলে সদর্পে বললেন—এই দুনিয়ায় তিনিই একমাত্র দিব্যপুরুষ, বাকী যে যেখানে আছে সবাই পাগল। কাপ্তেন বলতেন—বাঙ্গালীরা নির্বোধ; কাছে মানিক রয়েছে, চিনতে পারলে না।[৩]

*

তারপর সেই বেদনাময় অন্তিম দিনের কথা।[৪] ১২৯৩ সালের ৩১ শে শ্রাবণ। রাত্রি ১টার কাছাকাছি শ্রীরামকৃষ্ণ শেষ সমাধিতে মগ্ন হলেন। সে সমাধি আর ভাঙলো না। পরদিন প্রভাতে কাশীপুর উদ্যানে যথাপূর্ব অরুণোদয় হল, কিন্তু সমস্ত বাড়িটি বিষাদমগ্ন। ভগ্নহৃদয় ভক্তের দল নিস্তব্ধ, বিষণ্ণ—শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহে প্রাণ আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহাকুল। বেলা ৮টায় কাপ্তেন এসে উপস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ স্পর্শ ক'রে বললেন—ইনি এখনও সমাধিস্থ, দেহে প্রাণ আছে; এ দেহ আমি কিছুতেই ছাড়বো না। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ আগলে বসে রইলেন। বেলা ১ টার পর এলেন ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার। বিশেষরূপে পরীক্ষা ক'রে বললেন—মাত্র আধ ঘণ্টা আগে দেহত্যাগ হয়েছে। এই নিদারুণ সংবাদে ভক্তবৃন্দের মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো গভীর বিষাদে। মহাভক্ত কাপ্তেন অশ্রুসজল নয়নে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পৃঃ ৮২
৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৯০
৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পৃঃ ৬২৮-৩০

শ্রীরামকৃষ্ণ-শরণে

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস

ভকতশরণ, প্রণমি তোমার পায়,
নমি যুগ-অবতার !
(তুমি) পতিতপাবন, জগৎ-কারণ
শক্তির মূলাধার।

তোমার দেউলে মিলিত হইল
ধর্মের যত পথ;
খৃষ্টে-কৃষ্ণে রহিল না ভেদ—
ভেদের ওপারে যেথায় অভেদ
(সেথা) পরম নিত্য সত্তায় সব
হ'ল একাকার, লয়—
অসীমের পথে অভিযানে সেথা
থামিল সকল রথ।

নিত্যে লীলায় তুমি সব ঠাঁই
তুমি ছাড়া আর কোথা কিছু নাই
যেবা জানে, সেই ছাড়া কেবা তোমা
চিনিতে পারিবে আর ?
নমি যুগ-অবতার !

মানবাত্মার উজ্জীবক স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

[অনুবাদক : শ্রীশৈলেশকুমার সেন]

আধুনিক ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা সুপরিজ্ঞাত। আমাদের জন্মভূমির ইতিহাসে এটি প্রোজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে। বিগত শতকের অন্তিম পর্যায়ে আমাদের পুণ্য ভারতভূমিতে তাঁর মহৎ জীবন ও চিত্তোন্মাদিনী বাণী যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তাই-ই বর্তমান শতকে জাতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে উন্মেষের কারণ।

তিনি বলেছেন, "আমি আমার বাণী প্রচার করব নির্ভয়ে। কাকেই বা ভয় করবো? স্বয়ং ভগবান আমার সঙ্গে রয়েছেন।" কোন্ বাণী তিনি প্রচার করেছিলেন? তাঁর নিজেরই ভাষায় বাণীটির মর্মমূলে আছে—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' (নিজের মোক্ষলাভ ও জগতের হিতের জন্য)। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়, তাঁরই নিজের ভাবোদ্দীপ্ত কথায়—'মানুষ হও, মানুষ তৈরি কর।' এর ভাষ্য তিনি নিজেই দিয়েছেন, 'মানুষের সর্বপ্রধান কাম্য শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার পথে নিজকে এগিয়ে দেওয়া এবং অপরকেও তা করতে সাহায্য করা।'

উনিশ শতকের শেষের দিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার চটকে মুহ্যমান ভারত তার অতীত সম্পদ ভুলে য়ুরোপীয় আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির অন্ধ অনুকরণ শুরু করেছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার সাংস্কৃতিক বিজয় যেন আসন্ন হয়ে উঠেছিল। এই সময়েই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভূত হয়ে ভারতীয় যুবজনের চিত্তে প্রেরণার সঞ্চার করলেন। ভারতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নেতৃবর্গের অভ্যুদয় হল, যাঁদের অনির্বাণ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ—এই দুই মহামানবের জীবনী ও শিক্ষা হতে যে প্রেরণা আমাদের স্বাধীনতাকামী নেতৃবর্গ পেয়েছিলেন তা তাঁরা কখনো স্বীকার করতে ভোলেননি। তাই একটুও অত্যুক্তি না করে বলতে হয়, ভারতের মাটিতে এই দুই দ্যুতিমান পুরুষের আবির্ভাবে ভারত-ইতিহাস একটি সু-উচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পেরেছিল। স্বামীজীর নিজের কথাই এর সাক্ষ্য দিচ্ছে—'যে দিন শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম নিলেন সেই দিন হতে সূচিত হলো আধুনিক ভারত ও সত্যযুগ।'

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার অব্যবহিত পরেই স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজকরূপে ভারতের পূর্বতম প্রান্ত হতে পশ্চিমতম প্রান্ত ও উত্তুঙ্গ হিমালয়শিখর হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিশাল ভারত পর্যটন করেন। এই-ভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়, সংস্থা ও সমাজ—তথা সমগ্র ভারত—সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা জন্মাল বিপুল। পর্যটক সন্ন্যাসিরূপে তাঁর এই অভিজ্ঞতা অর্জিত হলো যে, অতিকায় দেশটি সুষুপ্ত। তাঁর অভিমতে, সর্বপ্রধান কর্তব্য হলো সমগ্র দেশটিকে স্বাদেশিকতায় উজ্জীবিত করা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দেশের যে জনগণ কেরানী ও দাসরূপে নিজেদের ভেবে আসছে তাদের জাগাতে হবে জাতীয় অতীত ঋক্থের দিকে, আর তিলার্ধ বিলম্ব না ক'রে। তাই স্বামী

বিবেকানন্দ উপযুক্ত উপায়স্বরূপ বেদবেদান্তের প্রাণময় বাণী তাদের কর্ণকুহরে ক্রমাগত ঢেলে দিতে লাগলেন, তাদের অনুপ্রাণিত ক'রে তুললেন। এই বাণীর মর্ম হচ্ছে—"প্রতিটি আত্মায় প্রচ্ছন্ন আছে ঐশী শক্তি; দেবভাব প্রতি আত্মার জন্মগত অধিকার; লক্ষ্য রাখতে হবে এই দেবভাবকে বিচ্ছুরিত করতে কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান—এগুলির মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায়ের দ্বারা। ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মতবাদ, অনুষ্ঠানপদ্ধতি, শাস্ত্র ইত্যাদি আর সবই গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।" কম্বুকণ্ঠে স্বামীজী ডাক দিলেন: 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—'ওঠো, জাগো, অভীষ্টলাভ না হওয়া পর্যন্ত থেমো না।' তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি বাক্য যে তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চার করেছিল, তার সাহায্যে তিনি অচিরে আমাদের দেশ ও জাতির মৃত শরীরে জীবনীশক্তি প্রবাহিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই সমগ্র দেশ মহামানব স্বামী বিবেকানন্দের তূর্য-আহ্বানে সাড়া দিল। তাঁর স্বদেশবাসীরা এতকাল ক্ষীণকণ্ঠের ধ্বনিতে অভ্যস্ত ছিল। নরসিংহ বিবেকানন্দ তাদের শেখালেন সিংহের মতো গর্জন করতে। যুগ যুগ ধরে তারা কেবল মোহ-অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আর তিনি তাদের শেখালেন তা বিদীর্ণ করতে। প্রতিটি মানবাত্মাকে আহ্বান ক'রে, কর্মচঞ্চল ক'রে তাকে জাগিয়ে তুললেন দীর্ঘসঞ্চারী জাড্যমগ্নতা হতে। কেটে গেল সেই আলস্য ও অবসাদ যাতে তারা নিমজ্জিত ছিল এতকাল। সূর্যপ্রতিম স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা সমূলে বিদূরিত হল সেই তিমির যা আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল ভারতীয় আবহমণ্ডল।

এই নব জীবনী-শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে, আর স্বামীজীকর্তৃক প্রায়শঃ উদ্গীত বেদবেদান্তের বলিষ্ঠ বাণীতে শক্তিমান হয়ে দেশ আবার জেগে দাঁড়াল, আর তার তৎকালে আশু-প্রয়োজনীয় নবজীবনের পথ রচনা করতে বদ্ধপরিকর হলো। সকল নীচতা, সঙ্কীর্ণতা ও প্রচলিত সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের উর্ধ্বে উঠতে জাতিকে আগ্রহশীল ক'রে তুললেন স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে তিনি চেয়েছিলেন সুসমঞ্জস ঐক্য, আর তারই জন্য বার বার তাদের আহ্বান জানালেন প্রিয় জন্মভূমির নিঃস্বার্থ সেবার জন্য 'একপ্রাণ—একতা'য় বদ্ধ হতে। তাঁর নিম্নোক্ত আবেগময়ী উক্তির মতো আর কিছুই তাঁর সংবেদনশীলতা ব্যক্ত করে না—"আমার স্বদেশবাসিগণ, আমার বন্ধুগণ, আমার সন্তানগণ! এই জাতীয়-তরী জীবন-সাগর বেয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে পারাপার করেছে, শত শত গৌরবোজ্জ্বল শতাব্দী ধরে জলধিবক্ষে যাতায়াত করছে; আর এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানব নীত হচ্ছে পারাপারে—পরম শান্তিধামে। তোমাদের নিজেদের দোষেই আজ হয়তো এ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এতে ছিদ্র দেখা দিয়েছে। তাতেই কি তোমরা একে গালি পাড়বে? যে নাকি পৃথিবীর অপর যে-কোন বস্তুর চেয়ে বেশী কিছু করেছে, তোমাদের কি উচিত রেগে তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করা? যদি কোন ছিদ্র হয়েই থাকে আমাদের এই জাতীয় তরীতে—আমাদের এই সমাজে, আমরা তো এরই সন্তান, আমরাই এগিয়ে এসে এই ছিদ্র পূরণ করি না কেন? হৃদয়ের রক্ত দিয়ে সানন্দে এ কাজটি করি না কেন? যদি বিফলই হই তবে মৃত্যুই বরণীয়। যদি ছিদ্র হয়েই থাকে তবে আমরা চেষ্টা ক'রে সেই ছিদ্র পূরণ করবো, কিন্তু কখনো নিন্দা করবো না, সমাজের বিরুদ্ধে একটিও রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করবো না। এর অতীত মহত্ত্বের জন্যই একে

আমি ভালোবাসি। আমি তোমাদের সকলকে ভালোবাসি, কেননা তোমরা যে দেব-শিশু, আমাদের মহিমময় পূর্বপুরুষদের সন্তান। তবে কেন আমি তোমাদের তিরস্কার করবো?—তা তো কখনো পারবো না। রাশি রাশি আশীর্বাদ তোমাদের উপর বর্ষিত হোক! বৎসগণ! আমি এসেছি তোমাদের কাছে আমার পরিকল্পনাগুলি নিয়ে। যদি তোমরা ঐগুলি শোন, তবে তোমাদের সঙ্গে কাজ করতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু তোমরা যদি এসব না শোন, এমনকি আমাকে ভারত হতে বিতাড়িত কর, আমি আবার ফিরে এসে বলব—'আমরা ডুবছি! আমি এখন তোমাদের মধ্যে এসেছি। যদি আমাদের ডুবতেই হয়, তবে এসো, একসঙ্গেই ডুবি। কিন্তু কখনো আমাদের রসনায় অভিশাপ যেন আশ্রয় না নেয়'।"

আমাদের দেশের বিচিত্র ধর্মমতের ঐক্যে যেমন স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাসী ছিলেন, তেমনি বিশ্বাসী ছিলেন প্রধান প্রয়োজনবিধায় ভারতীয় নারীসমাজের উন্নয়নে। পুরুষ ও নারী মানবজাতির দু'টি পক্ষ। তুল্যরূপে বর্ধিত ও বলবান পক্ষ ব্যতিরেকে জাতি-পক্ষী বায়ুমণ্ডলে উড়তে পারে না। সুতরাং এতকাল অবহেলিত আমাদের নারীগণের উত্থান ও উন্নয়নের সার্বিক সুযোগ ক'রে দিতে হবে। স্বামীজীর অনসুকরণীয় ভাষায়—"মা জগদম্বার জীবন্ত প্রতিমূর্তি হচ্ছে নারীগণ; জগদম্বার ইন্দ্রিয়াকর্ষক বহিঃপ্রকাশ পুরুষকে করে উন্মত্ত কিন্তু তাঁর অন্তঃপ্রকাশ পুরুষকে করে সর্বজ্ঞ, অব্যার্থকাম ও ব্রহ্মজ্ঞ। তুষ্ট হলে তিনি হন অভীষ্টদায়িনী ও পুরুষের বন্ধনমুক্তির কারণ (শ্রীশ্রীচণ্ডী)। মা জগদম্বাকে পূজা-আরাধনায় পরিতৃপ্ত করতে না পারলে ব্রহ্মা-বিষ্ণুও তাঁর মোহ-পাশ হতে মুক্ত হতে পারেন না। তাই জগন্মাতার মূর্তি নারীজাতির পূজার জন্য, তাদের মধ্যে ব্রহ্মকে স্ফুটতর করতে আমি স্ত্রী-মঠ প্রতিষ্ঠা করতে চাই।"

প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশর, অ্যাসিরিয়, গ্রীস ও রোম হতে য়ুরোপ ও আমেরিকার সীমান্ত পর্যন্ত প্রবহমান ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা ভারতবাসীকে আবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে জাতিবর্ণনির্বিশেষে তাদের আহ্বান করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ—'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'।

মৃত্যুর অমৃতলোকে

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী

জীবনের প্রান্তে রচে যে নিশীথ অনন্ত শয়ন,
যে নিশীথ আনে মুক্তি অনন্তের অন্তিম বেলায়,
সে রাত্রি এসেছে ঐ বাদুড়-ডানায় অশরণ,
অনন্ত জ্যোতির দ্বার খুলি' শূন্য কোটি তারকায়।

মালিকা গড়িয়া গেছে কখন সে বলাকা চঞ্চল,
গগনে মুছিয়া গেছে দিবসের আলোকসম্পাত,
সন্ধ্যার প্রশান্ত বুকে মহাশান্তি বিস্তারের ফল
ভোলায় রে চিত্ত মোর—ধীর-স্থির করে আঁখিপাত।

বিহঙ্গ ফিরেছে নীড়ে বনে বনে থামায়ে কূজন,
পথিকের পথচলা দূরে দূরে হয়েছে নিঃশেষ,
মৃত্যুর অমৃতলোকে চেয়ে আছে আমার নয়ন,
মর্ত্যের সে মৃতবক্ষে সমাসীন চাহি নির্নিমেষ।

জাগি আর ভাবি— চোখে অমর্ত্যের উদগ্র আগ্রহ,
মোহাচ্ছন্ন পৃথিবীর সেথা কত তুচ্ছ ভালবাসা,
তুচ্ছ মায়া জীবনের—আত্মার আত্মীয় কারে কহ ?
তার তরে ব্যর্থ হয় জীবনের এই কাঁদা-হাসা।

যত ভাবি তত যেন ঘুচে যায় আমিত্ব আমার,
অস্তিত্বের অবলুপ্তি এ রাত্রির পক্ষেই সম্ভব,
ভালো লাগে ধরিত্রীর মৃত্যুরূপা এই অন্ধকার,
হতবাক করে তার মুহুর্মুহুঃ মহিমা দুর্লভ।

অনন্ত দেবতা কোথা ! কোথা হায় অনাদি-অশেষ !
দিকচক্রবালে শুধু তমিস্রার অন্ধ অন্ধকারা !।
বাহিরের লুপ্তি নয়, চিত্তের সকল বৃত্তি না হলে নিঃশেষ,
মনপ্রাণ ভাসাইয়া নামে না সেঃঅমৃতের ধারা।

দেশপ্রেম ও স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী জীবানন্দ

দেশপ্রেম মানে দেশকে প্রাণের সহিত ভালোবাসা। মানুষ দেশকে কেন ভালোবাসবে? যে দেশে সে জন্মেছে, জন্মগ্রহণ ক'রে প্রথম আলো দেখেছে, যে দেশের মাটিতে খেলা করেছে, তৃষ্ণায় জল পেয়েছে, ক্ষুধায় অন্ন পেয়েছে, ভাষায় কথা বলেছে, শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছে, জ্ঞানভাণ্ডার পুষ্ট করেছে, সেই দেশের মৃত্তিকা আকাশ বাতাস আলো নদনদী পাহাড় পর্বত বন উপবন মানুষ পশুপক্ষী ভাষা সংস্কৃতি ভাবধারা সব কিছুর সঙ্গে তার মনের গোপন কোণে এমন অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে যে, তার জন্যে সে একটি অব্যক্ত আকর্ষণ অনুভব করে, ফলে জন্মভূমিকে সে ভালো না বেসে থাকতে পারে না।

জননীর সঙ্গে সন্তানের যেমন সম্বন্ধ, ঠিক সেইরকম সম্বন্ধ দেশজননীর সঙ্গে দেশপ্রেমিকের। 'Mother country' বা দেশমাতৃকার কল্যাণ-চিন্তা সকল দেশের মানুষই ক'রে থাকে। স্বদেশের ক্ষতি হোক, তার ঐতিহ্য সংস্কৃতি ধর্ম ভাবধারা ও আদর্শের বিলুপ্তি ঘটুক—এ চিন্তা কোন দেশপ্রেমিকই করতে পারে না। আদর্শ-বিচ্যুতি তাকে পীড়া দেয়, কারণ সে অন্তরে অন্তরে চায় দেশের সর্ববিধ উন্নতি। যারা তার বড় হবার পথে—'মানুষ' হয়ে গড়ে ওঠার পথে—সহায়ক হয়, তাদের কারও প্রতি সে শ্রদ্ধাহীন হতে পারে না, সকলের প্রতি যেন একটি কর্তব্য ও 'দায়িত্ব' আছে ব'লে মনে করে। মাতাপিতা, অভিভাবক, শিক্ষক, গ্রামবাসী, নগরবাসী, কৃষক, শ্রমিক সকলের প্রতি তার যথোচিত শ্রদ্ধার ভাব বর্তমান থাকে। প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বর্তমান অগ্রগতিকে সে বরণ করে নেয়। তার কাছে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'।

যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের দেশপ্রেম দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে আজও দেশ-প্রেমিকের অন্তরে দেদীপ্যমান। তাঁর দেশপ্রেমের অগ্নিময়ী বাণীগুলি হাজার হাজার যুবকের অন্তরে দেশপ্রেমের আগুন জ্বালিয়েছিল; তাঁরা জীবন তুচ্ছ ক'রে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ হ'তে নেতাজী সুভাষ পর্যন্ত প্রায় সকল দেশপ্রাণ মহাপুরুষের চিত্তে যুগাচার্য স্বামীজীর দেশপ্রেমের বাণী যে কী গভীর রেখাপাত করেছিল, তা তাঁদের জীবন-চরিত পাঠ করলেই জানা যায়। স্বামীজী কিভাবে বিদেশিনী সুশিক্ষিতা মহিলা মার্গারেট নোবলকে ভারতমাতার সেবায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তা সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করে। মার্গারেট নোবল 'ভগিনী নিবেদিতা'য় পরিণত হয়ে যথার্থ ভারতনন্দিনী হয়েছিলেন। ভারতের জাগরণযজ্ঞে অবিস্মরণীয় তাঁর দান। স্বামীজীর বাণীগুলি আজও সমভাবে শক্তিপ্রদ এবং বর্তমান সঙ্কটমুহূর্তে অমোঘ পথপ্রদর্শক। স্বামীজীর দেশপ্রেমের যে পথনির্দেশ তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন:

আমিও স্বদেশহিতৈষিতায় বিশ্বাসী। স্বদেশ-হিতৈষিতা সম্বন্ধে বিশ্বাসী আমারও একটা আদর্শ আছে। মহৎ কার্য করতে হলে তিনটি জিনিসের আবশ্যক হয়। প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা, আন্তরিকতা আবশ্যক। বুদ্ধি, বিচারশক্তি আমাদের কতটুকু সাহায্য করতে পারে? এরা

আমাদের কয়েক পা এগিয়ে দেয় মাত্র, কিন্তু হৃদয়ের দ্বার দিয়েই মহাশক্তির প্রেরণা আসে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে—জগতের সকল রহস্যই প্রেমের নিকট উন্মুক্ত।

হে ভাবী সংস্কারকগণ, হে ভাবী স্বদেশ-হিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বান্ হও, প্রেমিক হও, তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝছ যে দেব ও ঋষিদের কোটি কোটি বংশধর পশুপ্রায় হয়ে দাঁড়িয়েছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করছ যে, কোটি কোটি লোক অনাহারে মরছে এবং কোটি কোটি ব্যক্তি শত শত শতাব্দী ধরে অর্ধাশনে কাটাচ্ছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝছ যে, অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারত-গগনকে আচ্ছন্ন করেছে? তোমরা কি এই সব ভেবে অস্থির হয়েছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদের পরিত্যাগ করেছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়েছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশে গেছে? এই ভাবনা কি তোমাদের পাগল ক'রে তুলেছে? দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হয়েছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হয়ে তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়সম্পত্তি, এমন-কি শরীর পর্যন্ত ভুলেছ? তোমাদের এরূপ হয়েছে কি? যদি হয়ে থাকে তবে বুঝিও তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশহিতৈষী হবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করেছ।

মানলাম, তোমরা দেশের দুর্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝছ—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্দশাপ্রতিকারের কোন উপায় স্থির করেছ কি? কেবল বৃথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না ক'রে কোন কার্যকর পথ বের করেছ কি? লোককে গালি না দিয়ে তাদের কোন যথার্থ সাহায্য করতে পার কি? স্বদেশবাসীর এই জীবন্মৃত অবস্থা দূর করবার জন্যে তাদের এই ঘোর দুঃখে কিছু সান্ত্বনাবাক্য শোনাতে পার কি?—কিন্তু এতেও হ'ল না।

তোমরা কি পর্বতপ্রায় বিঘ্নবাধাকে তুচ্ছ ক'রে কাজ করতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারিহস্তে তোমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়-মান হয়, তথাপি তোমরা যা সত্য ব'লে ভেবেছ তাই ক'রে যেতে পার? যদি তোমাদের স্ত্রী-পুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যদি তোমাদের ধন মান সব যায়, তবু কি তোমরা তা ধরে থাকতে পার? নিজ পথ হ'তে বিচলিত না হয়ে তোমরা কি তোমাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পার? তোমাদের কি এরূপ দৃঢ়তা আছে?

যদি এই তিনটি জিনিস তোমাদের থাকে তবে তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কার্য সাধন করতে পার। তোমাদের সংবাদপত্রে লেখার অথবা বক্তৃতা দিয়ে বেড়াবার প্রয়োজন হবে না। তোমাদের মুখমণ্ডল এক অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

এ তো হ'ল দেশপ্রেমের কথা। এ হ'ল দেশপ্রেমিকদের চলার পথে সুষ্ঠু পথনির্দেশ। স্বামীজী কাদের দেশদ্রোহী বলছেন তাও বিশেষভাবে চিন্তনীয়। স্বামীজীর বজ্রবাণী :

যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী মনে করি। যতদিন ভারতের বিশকোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর মতো থাকবে, ততদিন যেসব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার ক'রে জাঁক ক'রে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্য কিছু করছে না, আমি তাদের হতভাগা পামর বলি।

যারা রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তির অন্ন উৎপাদন করে, যারা গলদ্‌ঘর্ম পরিশ্রম ক'রে মানুষের লজ্জানিবারণের বস্ত্র উৎপাদন করে, সেই কৃষককুল ও শ্রমিক-সম্প্রদায়ের উপর স্বামীজীর অসীম দরদ ও অনন্ত সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বাণীতে ; যাঁরা দেশপ্রেমিক হ'তে চান, শ্রমজীবীদের প্রতি তাঁদের কিরূপ মনোভাব হওয়া উচিত এর থেকে তাঁরা যথাযথ নির্দেশ পাবেন। স্বামীজী বলছেন :

লোকজয়ী ধর্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য ; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা ; আমাদের গরীবরা ঘরদুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে কর্তব্য ক'রে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নেই? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তে যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সে তোমরা ভারতের শ্রমজীবি!—তোমাদের প্রণাম করি।

সর্বোপরি চিন্তনীয়—যারা দেশপ্রেমের মুখোস প'রে ধর্ম সংস্কৃতি ও আদর্শের বিচ্যুতি ঘটায়, শিক্ষা ও প্রচারের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক তরুণদলকে বিভ্রান্ত করে, শিক্ষা শিক্ষায়তন ও শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি অনাদর ও অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতে শেখায়, তারা কি দেশপ্রেমিক আখ্যা লাভের যোগ্য?

স্বামীজী চেয়েছেন, পৃথিবীর যে-কোন দেশের যা কিছু ভাল তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু আমাদের ধর্ম আদর্শ ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে নয় ; পায়ের তলার মাটি ছেড়ে শূন্যে কেউ দাঁড়াতে সমর্থ হয় না। পাশ্চাত্য শিল্প-বিজ্ঞানের সম্পদ আমাদের চাই। ভারতের আধ্যাত্মিকতায় পাশ্চাত্যকে প্লাবিত করতে হবে, বিনিময়ে নিতে হবে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্প-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ। তা হলেই ভারতের প্রকৃত উন্নতি হবে, যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের স্বদেশপ্রেমিকগণ এই দৃষ্টি দিয়ে কাজ করলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ করতে পারবেন।

স্বামীজীর যে দেশপ্রেম তা প্রকৃত দেশাত্মবোধ—তিনি ছিলেন দেশের সুখে সুখী, দেশের দুঃখে দুঃখী। দেশ ও দেশবাসীর সহিত ছিল তাঁর তাদাত্ম্যভাব। ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা স্বামীজীর চোখে পরম পবিত্র ছিল। ভারতের যে শাশ্বত মহিমময় রূপ স্বামীজীর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল, তা তিনি ভারতবাসীর সম্মুখে তুলে ধরেছেন। ভারতের সেই রূপটিকে হৃদয়ে চিরজাগ্রত রেখে কর্মে ঝাঁপ দিলে যথার্থ দেশপ্রেমের উদ্বোধন হবে।

নিবেদিতার সমাজ-চিন্তা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

আধুনিক যুগ

অতীতের সঙ্গে বর্তমানের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক হতেই ভবিষ্যতের পথ সুনিয়ন্ত্রিত হয়। অন্ততঃপক্ষে ইতিহাসের তাই-ই শিক্ষা। যে-কোন জাতির ইতিহাসই তার প্রমাণ। অতীত কি ক'রে বর্তমানের রূপ নিল, ইতিহাস তারই আখ্যান এবং ব্যাখ্যান। আর সেই ব্যাখ্যা-বিস্তারের উদ্দেশ্য হল বর্তমান কিরূপে ভবিষ্যতে উত্তীর্ণ হবে তাই দেখানো। এ বিষয়ে রাজনীতিশাস্ত্রের প্রখ্যাত ভাষ্যকার Burns (বার্নস) ইতিহাস-চর্চার উদ্দেশ্য নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন: "It (history) must show us how to change the present into a better future by showing how the past became the present"[১] ভগিনী নিবেদিতাও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন ভারতে ইতিহাস-চর্চার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করতে গিয়ে: "We shall become great historians, great singers of the song of a people's evolution, not merely in proportion as we are competent to adjudicate correctly the date of king or battle, but rather as we are able to reveal the essential features of the past and gather from them the prophecy of the future."[২] ইতিহাস কেবল রাজকাহিনী নয়, দেশবিজয় বা যুদ্ধযাত্রার কাহিনী নয়, ইতিহাস একটি জাতির ক্রম-বিকাশের আখ্যান। অতীত হতে বর্তমান, আর বর্তমান হতে ভবিষৎ রূপ নিয়েছে, রূপ নিচ্ছে—সেই কাহিনীর মূল লক্ষ্য অতীত নয়, আমাদের ভবিষ্যৎ, যাকে আমরা বর্তমানে বসে গড়ছি। সেজন্য এ বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতার দৃঢ় অভিমত এই যে, শুধু অতীতকে জানলেই তার চলবে না। বর্তমান থেকে, ভবিষ্যতের দিক থেকে যে-জাতি মুখ ফিরিয়ে থাকে, সে-জাতি কখনও বাঁচতে পারে না। যেমন তার অতীত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে একটি জাতির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তেমনি কেবল অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলেও সে জাতির মৃত্যু অবধারিত। জাতির পক্ষে, মানবসমাজের পক্ষে, মানবজীবনের পক্ষে চলাই তো জীবন—শুধু চলাই নয়, এগিয়ে চলাই জীবন। সেজন্য প্রাচীনকেও আধুনিক হয়ে উঠতে হয়, তবেই তা টিকে থাকে। অবশ্য সবকিছুকে টিকিয়ে রাখার প্রশ্ন এ নয়। বহু সাময়িক বস্তু, কেবল তাৎক্ষণিক গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় কালের নিয়মে চিরতরে লুপ্ত হয়। এই লুপ্ত হওয়াটা যে শুধু স্বাভাবিক তাই নয়, প্রয়োজনও। বর্তমানের তাতে মুক্তি, অতীতের গুরুভার হতে মুক্তি। এভাবে ভারমুক্ত বর্তমান তখন পূর্ণবেগে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলতে পারে। কিন্তু যা সর্বকালীন তা টিকে থাকে এবং তাকে টিকিয়ে রাখার দায় একটি জাতির পবিত্র নৈতিক দায়। এ দায় একমাত্র মানবসমাজের; পশুর সমাজের ইতিহাস নেই। মানুষের সঙ্গে পশুর এখানেই পার্থক্য। মানুষের ইতিহাস আছে, ঐতিহ্য আছে, পশুর নেই। ঐতিহ্যবিহীন মানবসমাজ পশুসমাজের নামান্তর।

---

১ Burns—Political Ideals—P. 11

২ Civic And National Ideals—P. 24

কারণ অতীতের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, সুকঠিন জীবন-সাধনায় যা লাভ হয়েছে, আজও তাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি; পশু পারে না। সেজন্য পশুর সমাজের কোন অগ্রগতি নেই, মানব-সমাজের আছে। সেজন্য অতীত জীবন-সাধনায় প্রাপ্ত ফল নিশ্চিহ্ন হতে দেওয়া চলে না। তা যদি নিশ্চিহ্ন হয় তো মানুষকে বারবার একই স্থান থেকে আরম্ভ করতে হয়। অর্থাৎ তাকে একই জায়গায় আটকে থাকতে হচ্ছে। এরূপ অবস্থায় অগ্রগতি কোনকালেই সম্ভব নয়। "Cultural revolution" বা সংস্কৃতি-বিপ্লব তাই কেবলমাত্র অতীতকে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলবার প্রক্রিয়া নয়। অতীতকে বলপূর্বক ধ্বংস ক'রে ফেললে তার উদ্দেশ্য তো সাধিত হবেই না, বরঞ্চ বিফল হবে। তার উদ্দেশ্য, আমরা নির্দিষ্ট ক্রমবিকাশের পথে যতদূর এগিয়েছি তাকে অতিক্রম ক'রে নূতনতর সংপ্রাপ্তির পথে এগিয়ে যাওয়া, অতীতের milestone বা দূরত্বজ্ঞাপক সীমানা ছাড়িয়ে নূতন milestone বা দূরত্বজ্ঞাপক সীমানায় উপনীত হওয়া। তবেই 'অগ্রগতি' সম্পন্ন হয়, নতুবা লক্ষ্যহীন পুনরাবর্তন মাত্র ঘ'টে থাকে। তাতে মানব-জীবনের সর্বাঙ্গীণ অবনতি ও সাংস্কৃতিক অপকর্ষতা-লাভের সম্ভাবনা।

কিন্তু অতীতকে ধ'রে রাখবার প্রয়োজন এগিয়ে চলবার জন্যই, অতীতের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবার জন্যই নয়। অতীতকে অতিক্রম ক'রে যাওয়া, পুরাতনের জীর্ণতামুক্ত হয়ে নূতন জীবনলাভই মানব-সমাজের লক্ষ্য—এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য। এ বিষয়ে নিবেদিতার মনোভাব কঠোর ছিল। তখনকার ভারতে যাঁরা কেবলমাত্র অতীতকে আঁকড়ে ধ'রে রাখতে চাইছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে তাই বেশ কঠোরভাবেই নিবেদিতা বলেছিলেন—"Change there must be. Shall India alone, in the streaming destinies of the Jagat, refuse to flow on form to form?…Change it is that there must be, or India goes down in the ship-wreck of her past achievements."* এ জগৎ চিরপ্রবহমান, পরিবর্তন তার ধর্ম। ভারত সেখানে কি ক'রে পরিবর্তন-বিমুখ হয়ে থাকতে পারে? যে পরিবর্তন হবেই, তাকে হতে দেওয়াই ভাল। নতুবা পূর্ব-সংপ্রাপ্তির ভারে ভারতের ভরাডুবি ঘটবে। বরঞ্চ যে পরিবর্তন হবেই তাকে স্বেচ্ছাকল্পিত উপায়ে ঘটালে তা বাঞ্ছনীয় রূপ ধারণ করবে। ভারতের প্রাচীন সৌম্য জ্ঞান, প্রাচীন পুণ্যময় জীবনধারা অক্ষুণ্ণ রেখে যদি সুপরিকল্পিত উপায়ে বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন ঘটানো যায়, তাহলে ভবিষ্যতে আমরা যে মহিমায় উন্নীত হবো তার কাছে অতীতের সকল মহিমা ম্লান হয়ে যাবে। অগ্রগতির অর্থ তাই অতীত মহিমাকে মুছে ফেলা নয়, অতীত মহিমাকে ছাড়িয়ে যাওয়া।

এবিষয়ে ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন কঠোর প্রগতিবাদিনী। আজ কোন কোন মহলে ধারণা দেখা যায় যে, নিবেদিতা ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া সনাতনপন্থী, তাঁর দৃষ্টি ছিল একমাত্র বিগতদিন ভারতবর্ষের প্রতি, আধুনিক প্রগতিশীল জগতের দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন ইত্যাদি। এর চেয়ে ভ্রান্ত ধারণা আর হতে পারে না। অবশ্য নিবেদিতার রচনাবলীর সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় না থাকার জন্যই এই ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি ঘটেছে। বস্তুতঃ নিবেদিতা কায়মনোবাক্যে আধুনিকতাকে বরণ করেছেন, কিন্তু তিনি তা করেছেন অতীতের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে সমগ্র অতীতকে সঙ্গে নিয়েই। এখানে তাঁর অসামান্য

* Civic and National Ideals—P. 63

মনীষার পরিচয় মেলে। অতীত থেকে বর্তমানের পথটি সুস্পষ্টরূপে তুলে ধ'রে ভবিষ্যতের পথনির্দেশ তিনি করেছিলেন। এই অর্থে তিনি আমাদের দেশে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এবং এই অর্থে তিনি এক নূতন ভবিষ্যতের বাণীদূত।

আধুনিককে আজ আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে, আমাদের মর্মে স্থাপন করতে হবে এই হল ভগিনী নিবেদিতার প্রকৃত অভিমত। ভারতের ইতিহাস-গবেষণাপদ্ধতি-সম্পর্কিত এক আলোচনায় এই আধুনিক যুগের ভাবসত্তাকে (modern spirit) গ্রহণ করতে হলে আমাদের কি কি করণীয় তাও তিনি সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করেছেন—"India's assimilation of the modern spirit may be divided into three elements which she has not only to grasp but also to democratise. These are: Modern Science: Indian History: and the World-sense or Geography—Synthetic Geography"[৪] ভারত যদি আধুনিক ভাবসত্তাকে মর্মে স্থাপন করতে চায়, তাহলে তাকে শুধুমাত্র বিদ্বৎসমাজের মধ্যে আবদ্ধ রাখলে চলবে না, তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে গণ-মানসের মধ্যে। ভারতে আধুনিক বিদ্বৎসমাজের লক্ষ্য হবে বিজ্ঞান-সাধনাকে গ্রহণ করা, ঐতিহাসিকের কর্ম হবে নূতন যুগের উদ্বোধন করা ইতিহাস-চর্চার মধ্য দিয়ে। আর শিল্পী, সাহিত্যিক প্রভৃতিকে এই যুগের ভেতর রক্ত-মাংস-মজ্জা সঞ্চার ক'রে তাকে জীবন্ত ক'রে তুলতে হবে তাদের সৃষ্টি-কর্মের মধ্য দিয়ে। যে-কোন নবযুগের সূচনাকালে এইরূপই ঘ'টে থাকে—"The historical epoch, for instance, that is opened up by the scholar is immediately appropriated and clothed with flesh by the novelist, the poet and the dramatist"[৫] ভগিনী নিবেদিতার আরও মত যে, আধুনিক জ্ঞানে-বিজ্ঞানে যে-অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে তা আমাদের পূর্বপুরুষদের অনায়ত্ত ছিল। সবই তাঁদের জানা ছিল—অনন্ত জ্ঞানরাজ্যে তাঁদের অনাবিষ্কৃত কোন কিছুই ছিল না—এ কথনই সম্ভব নয়; আজ যে জ্ঞান আমাদের নূতনতর সাধনায় আমরা লাভ করছি তা-ও সত্যেরই প্রকাশ। তাকে তাই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে হবে। সত্যের নবতম প্রকাশ বলেই তা অধিকতর সত্য, এক অর্থে পূর্ণতর সত্য—"Believe that, in a sense, it alone,—this modern form of knowledge, young though it be—is true."[৬] প্রাচীন যা তাই অধিক সত্য তা ঠিক কথা নয়। এক অর্থে নবীন যা তাই অধিক সত্য। সেজন্য এই নবীনকে বরণ করতে হবে সকল কর্মে, সব কিছুর মধ্যে—"Whatever you do, plunge into it heart and soul"—এ সম্পর্কে নিবেদিতার এই হল সুস্পষ্ট নির্দেশ।

উপরি উক্ত আলোচনায় একথা নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত যে, নিবেদিতা আদৌ প্রাচীনপন্থী ছিলেন না। প্রাচীনপন্থী তো ছিলেনই না, বরঞ্চ তাঁর গুরুর মতোই তাঁর একটি আশ্চর্য আধুনিক মন ছিল, যার কাছে বৈজ্ঞানিক সত্য ভিন্ন অন্য কোন কিছুই গ্রহণীয় ছিল না। যে-কোন আদর্শকে বাস্তব হতে হবে, মানুষের জীবনে তা কার্যকর হতে হবে, জীবন্ত হতে হবে, তবেই তা গ্রহণযোগ্য। এ বিষয়ে বিবেকানন্দের সুদৃঢ় অভিমত—"An ounce of practice is much

৪ Hints on National Education in India—p. 98

(৫) Hints on National Education in India—p. 98

৬ Hints on National Education in India—p. 99

more important than tons of theories." নিবেদিতারও সুদৃঢ় অভিমত, কোন বস্তুকে মানসক্ষেত্রে কেবলমাত্র মননের বস্তু হিসেবে লাভ করলেই চলবে না, তাকে সর্বতোভাবে কার্যে পরিণত করা চাই—"Never rest content, therefore, with a realisation which is purely mental"[৭] এ বিষয়ে নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গী অনমনীয় ও মনোভাব আপসহীন। এরূপ আধুনিক মনোভাব নিয়ে নিবেদিতা যে শুধু প্রচলিত অর্থে প্রগতিবাদী তা নয়, তিনি ছিলেন প্রকৃত বিপ্লববাদী। পুরাতনকে নূতন ক'রে তুলতে হবে। এরূপ রূপান্তরের সাধক বড় বেশী দেখা যায় না। প্রাচীন ভারত নিয়ে তিনি অনেক গবেষণা করেছেন, তার সমগ্র রূপটি চিনে নিতে তিনি অনেক আয়াস করেছেন। কিন্তু তাঁর ধ্যানের বস্তু প্রাচীন ভারত নয়, এক নূতন ভারত—ধর্মে জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে, কর্মে শিল্পে ঐশ্বর্যে, ধনে জনে এক অতি সমৃদ্ধ এবং আরও অনেকগুণ মহিমময় এক মহাভারতবর্ষ। এর মহিমার কাছে তাঁর মতে "অতীতের মহিমা-কল্পনার দীপশিখাকে অতি মৃদু বলে মনে হবে।" আবার কেবল রূপান্তর চেয়েই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, শুধু নূতনের স্বপ্ন দেখেই তিনি কাল কাটাননি। আপসহীন কঠোর বাস্তববাদী নিবেদিতার ধর্ম কোনকালেই নির্বেদের ধর্ম ছিল না, তিনি কোনকালেই স্বপ্নবিলাসী নন। সেজন্য তাঁর অনুক্ষণের প্রয়াস ছিল দক্ষ রূপকারের মতো সে স্বপ্নকে সত্য ক'রে তোলা, তাঁর ধ্যানের ভারতকে একটু একটু ক'রে গড়ে তোলা। তাঁর অসামান্য মননশক্তি, তাঁর অসাধারণ জ্ঞান-বিদ্যা, তাঁর অতুলনীয় কর্মশক্তি, তাঁর অন্তরের সকল নিষ্ঠা এই কর্মসাধনেই নিয়োজিত হয়েছিল।

এরূপ প্রখর বাস্তববাদী বলেই নিবেদিতা আধুনিক যুগকেও কোন মোহগ্রস্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখেননি। যেমন কোন মোহগ্রস্ত দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখেননি অতীত ইতিহাসের কোন যুগকেই। এক অতি দুর্লভ নির্মোহ দৃষ্টি ও কঠোর নিরপেক্ষতা তিনি এ বিষয়ে অবলম্বন করেছেন। এজন্য তাঁর আলোচনা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠতে পেরেছে এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। আধুনিক যুগের এরূপ বৈজ্ঞানিক আলোচনা খুব বেশী নেই। কারণ কাজটি অত্যন্ত কঠিন। সমসাময়িক কাল আমাদের এত কাছে যে, এই অতিনৈকট্য দৃষ্টিপথে একরূপ বাধার সৃষ্টি করে, তার দোষগুণ সবই অতিরঞ্জিত হয়ে দেখা দেয়। সমসাময়িক কালকে সেজন্য ঠিক ঠিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় না। যে কালের ঘটনাস্রোতে নিজেরা ভেসে চলেছি, তার অবিরাম তরঙ্গভঙ্গে আমাদের চিত্তে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে, তা থেকে নিজেকে বিযুক্ত ক'রে তাকে নিজের নিরপেক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড় করানো অতি কঠিন কাজ। এ বিষয়ে নিবেদিতার কৃতিত্ব অসাধারণ। তাঁর অসাধারণ নিরপেক্ষ দৃষ্টি আমাদের অভিভূত করে। এদিক দিয়ে নিবেদিতা আধুনিক কালের একজন শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। কিন্তু এ যাবৎ তাঁকে কেবল বিচার করা হয়েছে 'প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-আদর্শের' একজন দক্ষ ভাষ্যকাররূপে। আধুনিক কালেরও এই সুদক্ষ ভাষ্যকার একেবারেই উপেক্ষিত হয়ে এসেছেন। এর ফলে যে তাঁর সম্বন্ধে নানা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে শুধু তাই নয়, সমাজ-বিজ্ঞানী নিবেদিতার বিশেষ পরিচয় আমরা পাইনি, আর তাঁর সামগ্রিক চিন্তাধারার রূপটিও আমাদের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গিয়েছে।

(ক্রমশঃ)

---

৭ Ibid—p. 97

স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন গোস্বামী

আধ্যাত্মিক মুক্তিই বিশেষভাবে ভারতের আদর্শ, যেমন সামাজিক মুক্তি পশ্চিমের। গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে নবভারতের সর্বপ্রথম নেতা রাজা রামমোহন রায় আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উভয় প্রকার মুক্তিই চাইলেন দেশের জন্যে এবং উভয়ের সমন্বয়-বিধানেরও চেষ্টা করলেন। আধ্যাত্মিক মুক্তি হল পরতত্ত্ব-জ্ঞান তথা মোক্ষলাভ। সামাজিক মুক্তি হল ব্যক্তির স্বাধীনতা ও আত্মপ্রকাশের সুযোগ এবং এর মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির মনবুদ্ধির বিকাশ, অপরদিকে সমাজের পুষ্টি ও সমৃদ্ধি।

পূর্ব ও পশ্চিমকে মেলাবার যে নীতি রাম-মোহন দিয়ে গেলেন তার সমর্থন ও অনুবর্তন করলেন উত্তরসূরীরা সবাই, যদিও সকলের সমন্বয়ের আদর্শ ও চেষ্টা এক পথ নেয়নি। এই সমন্বয়-প্রচেষ্টা অদ্যাবধি চলেছে অব্যাহতভাবে। স্বামী বিবেকানন্দও চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়।...আর একদিক থেকে অবশ্য এরই জন্য বোধ হয় তিনিই সর্বপ্রথম নেতা যিনি উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সংস্কারপন্থী ও গোঁড়া সকলকে একসঙ্গে আলিঙ্গন করতে পেরেছিলেন।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' নামে যে পুস্তকখানি আজ আমাদের আলোচ্য তাতে ভারত ও ইউরোপের তুলনাও রয়েছে, দু'টি ভূখণ্ডের সভ্যতা-সংস্কৃতির মর্মগত সত্যটি কি তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন গ্রন্থকার এবং ভারত কিভাবে কতটা নিতে পারে পশ্চিম থেকে, সে-কথাও স্পষ্ট ক'রে বলেছেন।

স্বামীজী প্রথমেই বলতে চেয়েছেন যে, বাইরের দৃষ্টিতে কোন দেশকে কেউ বুঝতে পারে না। সহানুভূতি-বলে সেই দেশের একজন হয়ে তবে সে-দেশকে উপলব্ধি করতে হবে—"তাদের চোখে তাদের দেখতে হবে।" স্পষ্টতঃ লেখক তাই-ই করেছেন, তাই তাঁর কথায় এত আত্মপ্রত্যয়। তিনি বলেন, "প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে। এই ভাব জগতের কার্য করছে—সংসারের স্থিতির জন্য আবশ্যক।" যখন কোন জাতি তার নিজস্ব ভাব বা প্রতিভাকে হারিয়ে বসে তখন তার মৃত্যু আসন্ন হয়, কারণ জগৎকে দেবার আর কিছু থাকে না তার। এভাবেই অনেক প্রাচীন সভ্যতা ফুরিয়ে গিয়ে হারিয়ে গেছে। এত বৈদেশিক আক্রমণ অত্যাচার লুণ্ঠন শোষণ ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও যে ভারত বেঁচে আছে তাতেই প্রমাণ যে তার নিজস্ব ভাবটি অটুট আছে, এটিই হবে বিশ্ব-জীবনে তার দান—"আমাদের এখনও জগতের সভ্যতাভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।"

ভারতের এই নিজস্ব ভাবটি কি? স্বধর্ম ও মুক্তি। স্বধর্ম করার মধ্যে দিয়ে মুক্তির পথ রচনা। "রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা—বেশ কথা, কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে পার-মার্থিক স্বাধীনতা—'মুক্তি'। এইটিই জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য।" স্বামীজী ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করে দেখিয়েছেন যে, যখনই এই মূল উদ্দেশ্যে—রূপকথার 'রাক্ষসীর প্রাণপাখী'তে ঘা পড়েছে তখনই বিপদ ঘটেছে। এটিকে ঠিক রেখে তবে অন্য সব। রাজনৈতিক মুক্তি, অর্থনৈতিক উন্নতি, সমাজসংস্কার, শিক্ষা সব কিছুই এই

মূলভাবের অনুগত হবে, তা নইলে ভারত তার স্বধর্ম হারাবে। "এ দেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম ;—আর তোমার রাজনীতি, সমাজ-নীতি, রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষ-গ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় তো হবে ; নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার, রামচন্দ্র!" মুক্তি কিন্তু গোড়া থেকেই সকলের সাধ্য হতে পারে না। প্রথমে স্বধর্ম ও স্বপ্রকৃতি বা জাতি অনুসারে কর্ম, পরে মুক্তি। এবিষয়ে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। হিন্দুধর্ম অন্য ধর্মের ন্যায় সকলের জন্যে অভিন্ন পন্থা নির্দেশ করে না। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেছেন, বৌদ্ধধর্ম যখন সকলের জন্যে মুক্তির আদর্শ তুলে ধরলে তখনই দেশটা নিঃশক্তি হয়ে পড়ল—"বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্বনাশ, যীশু করলেন গ্রীস রোমের সর্বনাশ!!" অহিংসা, মুমুক্ষা এসব সর্বসাধারণের স্বভাবগত হতে পারে না গোড়া থেকেই।

জাতির জীবনের মূল ভাবটি ঠিক থাকলে অন্য সব ব্যাপারে ইতরবিশেষে কিছু আসে যায় না। বাইরের জীবনে কালানুযায়ী পরিবর্তন তো আসবেই, কিন্তু সেটা যেন মূলভাবানুগ ও সে ভাবেরই প্রকাশমাধ্যম হয়। তা ছাড়া স্বামীজী একথাও বলেছেন যে, ভারতের মতো সুপ্রাচীন জাতির পক্ষে বহু সহস্র বৎসরে দৃঢ়ীভূত যে মূলভাব সেটাকে বর্জন করার চেষ্টা অসার্থক ও আত্মহত্যাতুল্য হতে বাধ্য। "যদি এ দশ হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে তো আর এখন উপায় নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বই তো নয়।"

পশ্চিমের জীবনাদর্শটি কি? প্রাচ্য বলতে স্বামীজী ভারতকেই বুঝিয়েছেন, পশ্চিম বলতে ইউরোপকে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও স্বামীজী মনে করেন সমগ্র ইউরোপ তথা আমেরিকার মধ্যে মূলভাবগত একটা ঐক্য আছে এবং সেটার জনক আধুনিক কালে ফরাসী দেশ। তাই ফরাসী জাতি ও ফরাসীর রাজধানী পারী নগরীর কথা তিনি সবিস্তার বলেছেন,—"এই পারি নগরী সে ইউরোপী সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখ।" ইউরোপ মূলতঃ শক্তিসাধক। সমাজকে সুষ্ঠুভাবে গঠন ক'রে সে জীবনকে শক্ত সমর্থ ও উপভোগ্য ক'রে তুলতে চায়। সামাজিক স্বাধীনতা ও সাম্য এযুগের পাশ্চাত্য সমাজের প্রধান প্রেরণা। এ আদর্শ নিয়ে ইউরোপের এক একটি জাতি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, গোটা পৃথিবীতে তাদের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ভারতের অনেক কিছু শিখতে হবে বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও সামাজিক অগ্রগতির জন্যে। "তবে দেখ, জিনিসটে আমাদের ঢঙে ফেলে নিতে হবে, এইমাত্র। আর আসলটা সর্বদা বাঁচিয়ে বাকি জিনিস শিখতে হবে।" আজ আমরা পশ্চিমী গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের গোঁড়া ভক্ত হয়ে উঠেছি। স্বামীজী কিন্তু ওসব দেশে গণতন্ত্রের আসল রূপটি প্রত্যক্ষ করেছেন। তার মধ্যে বস্তু বিশেষ তিনি পাননি। আসলে সব ব্যবস্থায়ই গোটাকতক শক্তিমান লোকই সমাজকে চালায়, "বাকিগুলো ভেড়ার দল।" তাছাড়া আইন আর ব্যবস্থাপনাকে একান্ত ক'রে দেখাটা তিনি অযৌক্তিক মনে করেছেন, আসল জিনিস মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্বের বিকাশের পথ করতে হবে, এটাই ভারতীয় ধারা। এদেশে তাঁরাই সমাজের নেতৃত্ব করেছেন যাঁরা যথার্থ ধর্মবীর। "মানুষ হও, রামচন্দ্র! অমনি দেখবে ও-সব বাকি (অর্থ প্রভাব প্রভৃতি) আপনা-আপনি গড়গড়িয়ে আসছে।"

এভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রসঙ্গে প্রাচ্যের ধর্মাদর্শ ও তার চিরন্তন মূল্য সম্পর্কে স্বামীজী সুগভীর আস্থা প্রকাশ করেছেন। ভবিষ্যৎ ভারতকে তিনি পশ্চিমের প্রতিরূপ হিসেবে নয় অধ্যাত্ম-পন্থী রূপেই দেখেছেন, "ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন—এ দেশে চিরকাল।"

মোটামুটিভাবে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইখানির বিষয়বস্তু এই। এখন দেখা যাক রচনা হিসেবে এটির উৎকর্ষ কতখানি।

প্রথমেই দেখা দরকার এটি কোন্ শ্রেণীর রচনা। এটিকে তত্ত্বতথ্যপূর্ণ গাঢ়বদ্ধ গম্ভীর রচনার (serious essay) পর্যায়ে ফেলা যায় না, কারণ এর বাঁধুনি বড় শিথিল। লেখক অনায়াসে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছেন, আলোচ্য বিষয়ে তোলার মতো সব প্রশ্ন তুলছেন না, উত্থিত প্রশ্নের জবাব সব সময় দিচ্ছেন না, সিদ্ধান্ত করছেন অনেক সময় যথাযোগ্য বিচার ছাড়াই, আবার তথ্য দিয়ে যাচ্ছেন তথ্য দেবারই আনন্দে; যেমন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের আহার পোশাক আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির বর্ণনা, কিন্তু তা থেকে কোন সিদ্ধান্ত করছেন না, অনেক বিষয়ের আলোচনা থেকে যাচ্ছে ভাসা ভাসা, যেমন অভিব্যক্তিবাদ-প্রসঙ্গ। এসব দিক থেকে লেখাটি রম্যরচনার ধর্মাক্রান্ত। কিন্তু রম্যরচনা যতটা মন্ময় (subjective) হয়ে থাকে এটি ততটা নয়। এখানে উত্তমপুরুষ একবচনই লেখার কেন্দ্রবিন্দু নয়, যদিও লেখকের ব্যক্তিত্ব সমস্ত রচনাটিকেই সঞ্জীবিত করেছে, বিশিষ্টতা দিয়েছে ও প্রকাশকে জোরালো করেছে। রম্যরচনা একটা সচেতন শিল্পপ্রয়াস, কিন্তু 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' এই সচেতনতা নেই, যদিও লেখাটি শিল্পগুণবর্জিত আদৌ নয়। তাছাড়া হাস্যকৌতুক রম্যরচনার অনিবার্য অনুষঙ্গ, তাও এ বইয়ে বিরল। তবে রম্যরচনার বৈঠকী ভাবটি এখানে আছে। লেখক যেন ঘরোয়া পরিবেশে সাগ্রহ শ্রোতাদের কাছে নিজের অভিজ্ঞতার কথা ব'লে যাচ্ছেন, ভাষা ও ভঙ্গি তদনুরূপ;—চলতি রীতি, মুখের কথা, পুনরুক্তি, হাত নেড়ে টেবিলে চাপড় দিয়ে যেন নিজের কথাটিকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। কিন্তু সত্যিই তো বৈঠকে বসে বলা হয়নি, এটি লেখা হয়েছিল 'উদ্বোধন' কাগজের জন্যে, অনুপস্থিত অথচ শ্রদ্ধাশীল পাঠকের জন্যে। এতে ক'রে পত্র-সাহিত্যের ভাবও খানিকটা এসেছে। লেখাটার মধ্যে একটা অন্তরঙ্গতা আছে, আপন জনের কাছে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছেন, গল্প করছেন, কল্পনার ছবি আঁকছেন (যেমন বৈদিক যুগের চিত্র)। তাঁর বলার মতো কিছু আছে, কিছু দিয়ে যাবার দায়িত্ব রয়েছে—এই বোধটিও পেছনে কাজ করছে। মাঝে মাঝে কেমন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছেন, অনুপস্থিত ব্যক্তিকে সম্বোধন ক'রে দু'কথা শুনিয়ে দিচ্ছেন, যেমন, "তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাবো, ওটা কল্পনা। ভারতেও বল আছে, বস্তু আছে—এইটি প্রথম বোঝ।"

গদ্যসাহিত্যের বিশেষ কোন শ্রেণীতে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'কে ফেলতে না পারলেও সাহিত্যের অঙ্গনে এটিকে স্থান দিতেই হয়। রচনাটি প্রায় আগাগোড়া সুখপাঠ্য এবং যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশে লেখা সাহিত্য হয়ে উঠে সে ব্যক্তিত্ব অবিচ্ছেদে প্রকাশ পেয়েছে প্রতিটি কথায়। গোটা পৃথিবীর সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে এসেছে, কিন্তু কোথাও নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নয়, সমস্তটাই এসেছে বিশেষ একটি মনের ছাপ নিয়ে।

সে-মন যে সব সময় নিরপেক্ষ তা নয়, তবে উদার; দৃষ্টি তার অন্তর্মুখী, গভীর আগ্রহে সে বুঝতে চেষ্টা করছে, জানতে চেয়েছে, তাই তার পর্যবেক্ষণ নিখুঁত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ। এ মন নিবিড় স্বদেশপ্রেমিক হয়েও আবার বিবিক্ত; বিবিক্ততার ফলেই দেখার সঠিক প্রিরিপ্রেক্ষিতটি (perspective) সে পেয়েছে, কারও প্রতি তাই তার অবিচার করতে হয়নি।

এখন আমরা শিল্পের দিক থেকে রচনাটির আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেব। আরম্ভ-অংশটি খুবই গভীর, সমগ্র ভারতবর্ষের বাহ্যরূপটি সংহতভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, প্রথম পাঁচটি অনুচ্ছেদে ক্রিয়াপদ মাত্র একটি, সন্ধিসমাসবদ্ধ দীর্ঘপদের ব্যবহার নিরঙ্কুশ, ফলে বর্ণনাটি খুব একটা গাঢ়তা ও তীক্ষ্ণতা লাভ করেছে, নমুনাস্বরূপ, "অট্টালিকাবক্ষে জীর্ণ কুটীর, দেবালয়ক্রোড়ে আবর্জনাস্তূপ, পট্টশাটাবৃতের পার্শ্বচর কৌপীনধারী, বহ্বন্নতৃপ্তের চতুর্দিকে ক্ষুৎক্ষাম জ্যোতিঃহীন চক্ষুর কাতর দৃষ্টি—আমাদের জন্মভূমি।" খানিক পরেই কিন্তু ভাষা সহজ হয়ে গিয়েছে, সুর নেমে এসেছে, বাক্যবিন্যাসে কথাবার্তার ছন্দ দেখা দিয়েছে।

একথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, স্বামীজী এই বইখানা লিখেছেন চলতি রীতিতে। তখনও এ রীতি সাহিত্যে তেমন চলেনি এবং পরিচ্ছন্ন আকার নেয়নি। চলতি চালাবার জন্যে 'সবুজপত্রের' মাধ্যমে যে প্রমথ চৌধুরী আন্দোলন শুরু করেন ১৯২১ সালে, তার প্রায় দুই যুগ পূর্বে লেখা স্বামীজীর এই চলতি বাংলা। এর শক্তি বিস্ময়কর। তিনি যে চলতি রীতির পক্ষপাতী ছিলেন তার সপক্ষে নিজের এই লেখাকে তিনি স্বচ্ছন্দে তুলে ধরতে পারতেন। স্বাভাবিক ভাবেই সত্তর বছর আগেকার এই চলতি রীতির লেখায় ভাষাগত বিশুদ্ধির কিছু কিছু ত্রুটি নজরে পড়ে। অত্যন্ত ঘরোয়া শব্দের ব্যবহার করতে তিনি দ্বিধা করেননি এবং কথনো কথনো গম্ভীর কথার পাশে; যথা, "যীশু এসে ভারতে বসেছেন ব'লে **হাঁসেন হোঁসেন** ক'রছ।" "আমাদের জল ঢাললেই হ'ল, তা তেলই বেড় বেড় করুক আর ময়লাই লেগে থাকুক।" "ইংরেজ ওলবাটা-মুখ, অন্ধকার দেশে বাস করে, সদা নিরানন্দ।" "আমাদের পণ্ডিতরাও দেখছি সে গোঁয়ে গোঁ—আবার ঐ সব বিরূপ মিথ্যা ছেলেপুলেদের শেখানো হচ্ছে।" কিন্তু এই সব উক্তিতে যে বিশিষ্ট ভাবটি প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পাচ্ছে তা শিষ্ট শব্দের ব্যবহারে হয়ত সম্ভব হত না। এখানটায়ই চলতি কথার জোর। কথায় জোর অবশ্য আছে মুখ্যতঃ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে। স্বামীজীর উক্তিতে প্রায় সর্বত্রই একটা জোর দেখা যায়। বইখানার যে-কোন জায়গা থেকে দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। যেমন, "ধন [ধনী] হওয়া, আর কুড়ের বাদশা হওয়া—দেশে এক কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাকে ধ'রে হাঁটাতে হয়, খাওয়াতে হয়, সেটা তো জীবন্ত রোগী, সেটা তো হতভাগা। যেটা লুচির ফুলকো ছিঁড়ে খাচ্ছে, সেটা তো মরে আছে। যে একদমে দশক্রোশ হাঁটতে পারে না, সেটা মানুষ, না কেঁচো?"

বলার এই সজোর ভঙ্গিটির অনিবার্য অনুষঙ্গ অতিরঞ্জন। লেখক যা কিছু বলেন বাড়িয়ে বলেন, যেমন, "নানান্ দেশ দেখছি, নানান্ রকমের খাওয়াও দেখছি। তবে আমাদের ভাত-ডাল ঝোল-চচ্চড়ি, শুক্তো মোচার ঘণ্টের জন্য পুনর্জন্ম নেওয়াও বড় বেশী কথা মনে হয় না।" এই বাড়িয়ে বলার সূত্রেই এসে যায় সামান্য কটাক্ষ, যথা, "ডাক্তার-ফাক্তার কাছে আসতে দিও না, ওরা অধিকাংশ—'ভাল ক'রতে পারব না, মন্দ ক'রব, কি দিবি তা

বল্।" এভাবে অনেক প্রবচন ও বিভিন্ন ভাষার কাব্যাংশ তাঁর লেখায় অনায়াসে এসে রচনাটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে।

পূর্বে বলেছি হাস্যকৌতুক বিশেষ নেই রচনাটিতে। তবে অনেক স্থানেই কৌতুকের আভাস মেলে, স্মিত হাসি ফুটে উঠে ঠোঁটে, যেমন, "ময়লায় আমাদের এত ঘৃণা যে ছুঁলে নাইতে হয়, সেই ভয়ে স্তূপাকৃতি ময়লা দোরের পাশে পচতে দিই।" শ্রেষ্ঠ গদ্য লিখিয়েদের অনেক উক্তি সুষম বাক্যের আকারে (antithesis) বিন্যস্ত হয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' এজাতীয় অনেক উক্তি দেখা যায়, যথা, "হিঁদু—ছেঁড়া ন্যাতা মুড়ে কোহিনুর রাখে; বিলাতি—সোনার বাক্সয় মাটির ডেলা রাখে।" "হিঁদু করছেন ভেতর সাফ। বিলাতি করছেন বাইরে সাফ।" "গরীবরা খাবার জোটে না ব'লে অনাহারে মরে, ধনীরা অখাদ্য খেয়ে অনাহারে মরে।"

পরিশেষে এই বলব যে, ভাব চিন্তা ভাষা ও ভঙ্গিতে, সর্বোপরি অসাধারণ একটি ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ উপস্থিতিতে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' একখানি অনন্যসদৃশ পুস্তক। বাংলা সাহিত্যে এর তুলনা বিরল।

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত 'বেদান্তকেশরী'

[অনুবাদ: পূর্বপ্রকাশিতের পর]

অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য

দুরে এক সঙ্গহীন, অপর-আশ্রিত,
অজ্ঞান-সাগরে ইহা রহে নিমগন,
আভাস-সমান এই বিচিত্র জগৎ,
ভুলিয়া স্বরূপ নিজ, করে নিরীক্ষণ,
ছাড়ে যে অনাদি মায়া, ত্যজে মায়া সেও,
বিচারে নিশ্চয়-বুদ্ধি অন্তরে যখন।
সে অবধি বেদজ্ঞানী তত্ত্ব সেই এক,
নানা বলি নিজ বাক্যে দেয় বিবরণ ॥ ২৭

জনম-সময় জীব-আত্মা নাহি আসে,
নাহি চলি যায় কিংবা দেহপাত হলে,
যেহেতু অখণ্ড ইহা; মনোময় লিঙ্গদেহ
পশে কায়, অধঃ-উর্ধ্বলোকে যায় চলে,
কায়ের কৃশতা ইথে স্থূলতা স্পর্শে না,
ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম অংশ ইহা আসে ল'য়ে,
সংস্কার-নিচয়-সহ, তারি সাথে ইহা
আসে যায় ভাসে সদা সংসারপ্রবাহে ॥২৮

পুরাকালে জানি বিপ্র সুবন্ধু আখ্যাত,
নরপতি সনাতির ছিল পুরোহিত ;
ব্রাহ্মণের কূট-অভিচারে হলে মৃত,
তার মন যমলোকে হইল প্রস্থিত।
ভ্রাতা তার শ্রুতিমন্ত্র-বলে সেই মন
ফিরাইল—বেদসূক্তে হয়েছে বর্ণিত—
ইহাতে প্রমাণ—নাহি করে যাতায়াত
অন্তরাত্মা, কিন্তু মন চিদাভাসযুত ॥ ২৯

এক স্থির আত্মা ক্ষিপ্র মনের সহায়ে
করে চলাচল, তাহে অবস্থিত
অগ্রে বা পশ্চাতে রহি। ইন্দ্রিয়সকল
নাহি জানে সে আত্মারে সাগরে যেমত
বায়ুক্ষুব্ধ ধাবমান তরঙ্গের সাথে
মনে হয় সচঞ্চল, ছুটে ইতস্ততঃ।
সম্মুখে পশ্চাতে মাঝে থাকি, সিন্ধু তবু
তরঙ্গের তলে থাকে প্রশান্ত সতত ॥ ৩০

একাকী প্রথমে ছিল অন্তরাত্মা এই,
একে একে অন্বেষিল বিষয়-নিচয়,
জায়া-পুত্র হোক ধন, যতেক সম্বল,
তারি তরে রহে যেন সদা কর্মময়,
প্রাণান্তক সহে ক্লেশ এরি তরে, ভাবে
অন্য কিছু নাহি ইহা হতে গুরুতর ;
একটি না পেলে কিম্বা হারাইলে হেরে
শূন্য সব, হয়ে পড়ে কর্মেতে কাতর ॥ ৩১

পূর্বে নাহি ছিল, পরে নাহি রবে তবু
তুচ্ছ জলধর ঢাকে বিরাট ভাস্করে ;
মাঝে শুধু দৃশ্য-মেঘ দৃষ্টি রোধ করে
দর্শকের, সূর্যবিম্বে নারে আচ্ছাদিতে।
না রহিলে দিনকর দৃষ্ট কভু হয়
মেঘমালা ? নেত্রপথে ভাসে কার তরে ?
সেই মতো বিশ্ব করে আচ্ছন্ন বুদ্ধিকে,
প্রেরক ও প্রকাশক আত্মারে না পারে
আবরিতে ॥ ৩২

স্বপ্নরাজ্য করি ভোগ সকল বিভব
সাথে, জাগরিত হলে জীব পুনরায়
'রাজাহারা হনু' বলি খেদ কভু করে ?
অলীক বলিয়া জানে স্বপ্ন সমুদয়।
নিষিদ্ধ-রমণী-সঙ্গ আদি পাপ করি
স্বপ্নে, তাহে কভু নাহি লভে প্রত্যবায়,
সেই মতো জাগ্রতের যত ব্যবহার,
বিস্মরণ যদি ঘটে, হয় স্বপ্নপ্রায় ॥ ৩৩

সুপ্তিকালে অনুভূত শুভ বা অশুভ
সমুদয় মিথ্যা হয় হইলে জাগ্রত,
জাগরণে স্থূলদেহে যত ব্যবহার,
সে সকল মিথ্যা হয় হলে নিদ্রাগত,
এই ভাবে নিরন্তর মিথ্যা অনুভবি'
উভয়ে আসক্ত তবু রহে মূঢ় জনে ;
কিন্তু নাহি বুঝি মোরা, উভ-প্রকাশক
সত্যবস্তু থাকিতেও কেন নাহি মানে ॥ ৩৪

স্বপনে স্বজন মৃত, আবার জাগ্রতে
হেরিয়া তাহারে যেন হয়েছে জীবিত,
অকস্মাৎ মৃত জানি বিষাদে কাতর,
পুনঃ হৃষ্ট হয় তারে জানি নহে মৃত,
স্মরিয়াও সে জীবের মরণ-বাঁচন
আলাপ তাহার সাথে করে নিজ জন।
তাই অল্প সময়ের তরে বস্তু একই
সত্য মিথ্যা দুই রূপে লয় এই মন ॥ ৩৫

স্বপ্নে দৃষ্ট ভোগাচয় একান্ত অলীক,
তবু তার সঙ্গসুখ জাগ্রতেরই মতো ;
সে-ও দৃশ্য ; সেইমতো, হলেও অসৎ
এ জগৎ সত্য-প্রায় হয় প্রতিভাত।
স্বপ্নে নর সত্য কিন্তু রমণী অসৎ,
অসৎ মিলন ; তবু তাহার কারণ
দেহে প্রতিক্রিয়া হয় ; জাগিয়া সে বোঝে।
কল্পনাই এ-জগৎ করেছে সৃজন ॥ ৩৬

নিদ্রাকালে প্রতিদিন সর্বজীব হেরে—
আত্মা করে মায়াবলে লীলা চমৎকার,
ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিনা কিন্তু কেহ নাহি
দেখে নিত্য-ক্রীড়াময় শুদ্ধ সত্তা তার,
বিষয়সমূহ তথা শরীরী জীবের
প্রকাশক প্রেরয়িতা জাগরণে যেবা—
সেই আত্মা সুষুপ্তিতে পরম সুখদ—
নাহি জানে, ইহা হতে অত্যাশ্চর্য কিবা ? ॥৩৭

নিদ্রায় মন্ত্রের যদি হয় উপদেশ —
কর্ণে শ্রুত, উহা সত্য হয় জাগরণে,
স্বপ্নে লব্ধ কৃপাবলে ইষ্ট-ফল পায়
প্রকৃতই দেখা যায় নিশি অবসানে ,
অসত্য হইতে যদি সত্য লাভ হয়—
কি আশ্চর্য সব কিছু উদ্ভাসিত যাতে,
স্বপ্রকাশ সেই বস্তু হন প্রতিভাত
অসত্য-বিদিত বিশ্বচরাচর হতে ? ॥৩৮

অগ্নি সূর্য আদি যত ইন্দ্রিয়ের প্রভু
লয় পায় সুষুপ্তিতে প্রাণে স্বকারণে,
বাক-আদি ইন্দ্রিয়ও তথা প্রাণে মিশে,
প্রাণবায়ু লীন নহে হেন বিসর্জনে ;
শুক্তিতে রজত সম বিশ্ব সমুদয়
ইন্দ্রিয়ে প্রত্যক্ষ ভ্রম ভাসিছে সতত,
একারণ শ্রুতিশিরে আত্মলাভ-তরে
হয়েছে স্বীকৃত এক প্রাণায়াম-ব্রত ॥ ৩৯

সহসা অনল আর্দ্র ইন্ধনে না করে
স্পর্শ, দগ্ধ করে যবে উহা রৌদ্রেতে শুকায় ;
শাস্ত্রবিধি পালিলেও সেইরূপ যদি
অন্তর আসক্ত রহে বহু কামনায়,
সহসা জ্ঞানাগ্নি নাহি স্পর্শ করে তারে,
কিন্তু করে বৈরাগ্যের তাপে শুষ্ক হলে ;
তাই আবশ্যক শুদ্ধ বিরাগ প্রথম,
পরিণামে বিজ্ঞান-ও তাহা হতে মিলে ॥৪০

নামরূপে পরিচিত যা কিছু জগতে—
সে সকল মিথ্যা বলি' হয়েছে প্রতীত,
যাঁর প্রেরণায় সব করে ব্যবহার
নানা মত, জেনো তাহা ঈশ-আবরিত,
যেরূপ বিশদ জ্ঞান হলে ভ্রান্তিময়-
ভুজঙ্গ রজ্জুতে হয় পরে পরিণত।
পরধনে লোভ ত্যজি প্রপঞ্চ পাশরি
আত্মানন্দে নিরন্তর হইবে নিরত। ॥৪১

প্রথমে জীবন্তে মোক্ষ মুক্তিকামী চায়,
পরে দেহত্যাগে পায় একান্ত নির্বাণ,
দুইটিই গুরু-কৃপা-কটাক্ষের ফল,
উপায় অভ্যাস এক, অন্য হয় জ্ঞান—
শারীরিক আর মানসিক আশ্রয়ের
ভেদ অনুসারে হয় দ্বিবিধ প্রকার,
আসনাদি কায়িক অভ্যাস, মানসিক
নিবৃত্তি বিহিত—নাম জ্ঞান-যোগ তার। ॥৪২

হৃদয়ে নিরূঢ় যত কামনানিচয়
ভূপ্রোথিত শঙ্কুপ্রায় করি উৎপাটন,
দেহ-অভিমান দীর্ণ করি, অবহিত
আত্মা মাত্রে, চপলতা করি বিসর্জন,
আত্মান্বেষী মুক্তিকামী বহুপুণ্যফলে
ধরি শ্বেত নাল অরুণাভ নাড়ী পথ
নিঃসৃত অমৃত তাহে আত্মানন্দ রূপ
আস্বাদিয়া, ঊর্ধ্বস্থান হন অধিগত ॥৪৩

এহেন পুরুষশ্রেষ্ঠ হেরেন নিখিল
আত্মসম, হয়ে শোক-মোহের অতীত ;
সর্বতত্ত্ববেত্তা তিনি, সর্বসিদ্ধিপ্রদ
শুদ্ধব্রহ্মপদে হন অন্তে অধিষ্ঠিত ;
স্থূল-সূক্ষ্ম আদি দেহে হয়ে বিস্মরণ
সকল-সঙ্কল্প-শূন্য মনে একতান,
জীবন্তে বিমুক্ত হয়ে পুণ্যপাপহীন,
প্রাপ্ত হন পরিশেষে তুরীয় নিধান ॥৪৪

"বন্দি তোমায়"

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

নরেন্দ্র প্রতি সপ্তাহে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিতেছেন, কাছে বসিতেছেন, কিন্তু ঠাকুর একটিও কথা বলেন না, বড়জোর একবার চাহিয়া দেখেন—তারপর চুপ। কখনও বা পিছন ফিরিয়া খাটে শুইয়া পড়েন। নরেন্দ্র ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেন, কিন্তু ঠাকুরের ঔদাসীন ভাব কাটে না। একদিন নয় দুদিন নয়—প্রায় একমাস এইরূপ চলিল। নরেন্দ্র কিন্তু একটুও দুঃখিত নন। অবশেষে একদিন ঠাকুর মুখ খুলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর সঙ্গে একটিও কথা বলি না, তবুও তুই আসিস কেন বল্ তো?"

আশ্চর্য উত্তর। "আমি কি আপনার কথা শুনতে আসি? আপনাকে ভালবাসি তাই আপনাকে দেখতে আসি।" ভালবাসি তাই আসি। কেন ভালবাসিস? ঠাকুর আর তাহা জিজ্ঞাসা করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন ছিল না। অহেতুক ভালবাসার হেতু খুঁজিতে যাওয়া চলে না। অহেতুক ভালবাসার হেতু নাই, থাকিলেও তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

পরবর্তীকালে স্বামীজী ঠাকুরের প্রতি তাঁহার অহেতুক ভালবাসার ইঙ্গিত তাঁহার "গাই গীত শুনাতে তোমায়" কবিতায় এই ভাবে দিয়াছেন :

"তব গতি নাহি জানি,
মম গতি—তাহাও না জানি।...
আছে মাত্র জানাজানি আশ,
তাও প্রভু কর পার।"

ভক্তির পরাকাষ্ঠা অহেতুক ভালবাসায়। তোমার কি মহিমা সে-খোঁজে আমার কাজ নাই। তুমি ঈশ্বর কি নশ্বর তাহাও জানিতে চাই না। তোমার কাছে চাহিবার কিছু নাই, বলিবারও বেশী কিছু নাই। তোমার নিকট আমার কোনও ভয় নাই, সঙ্কোচও নাই। তুমি তুষ্ট হইলে কি রুষ্ট হইলে তাহাও ভাবি না। শুধু এইমাত্র জানি, তোমার সহিত আমি চির-সংযুক্ত। যদি স্বর্গে যাইতে হয় সেখানেও তুমি, যদি নরকেই গতি থাকে সেখানেও তুমি। সুখে তুমি, দুঃখে তুমি; বন্ধনে তুমি, মুক্তিতে তুমি, জীবনে তুমি, মরণেও তুমি। এপারে তুমি, ওপারেও তুমি। বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বোত্তম ভক্ত। বিবেকানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তি বাক্যে পরিমাপ্য নয়। জীবনের শেষাশেষি বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ নাম শুনিতে পারিতেন না, শুনিলে হৃদয় এমন গভীর ভাবে আপ্লুত হইত যে জীবনধারণই অসম্ভবপ্রায়।

এমন ভক্তকে যদি হৃদয়ের গভীর হইতে পরম প্রেমাস্পদ দেবতাকে বাহিরে আনিয়া লোকসমক্ষে প্রচার করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে উহা যে কত বড় কঠিন কাজ তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। স্বামীজী ঠাকুরের কথা বলিতে চাহিতেন না, পারিতেন না। আমেরিকায় বেদান্তের কথা, ঋষিদের কথা, রামসীতা শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধের কথা অনেক বলিয়াছেন, কিন্তু অন্তর্গূঢ় অভীষ্টতম বস্তুটির কথা এড়াইয়া গিয়াছেন। কচিৎ কখনো দু'চারটি কথা উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। একবার জনৈক বন্ধু তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী লিখিবার অনুরোধ করিলে স্বামীজী

বলিয়াছিলেন, "সর্বনাশ, শিব গড়িতে কি বানর গড়িয়া বসিব ?"

তবুও একেবারে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় কি ? মায়ার ঊর্ধ্বে দেশকালের তোয়াক্কা না রাখিয়া ধ্যানে কেমন আত্মস্থ হইয়াছিলেন, হঠাৎ হামাগুড়ি দিয়া এক বালকের আবির্ভাব, ধ্যান ভাঙ্গানো, নীচে নামানো এবং তারপর ঝঞ্ঝাটের পর ঝঞ্ঝাট। নির্বিকল্প সমাধিতে বুঁদ হইয়া থাকিবার ইচ্ছা একবার প্রকাশ করিতে গিয়া সে কী তিরস্কার সহ্য করিতে হইল! না, নির্মায়িক নিত্যমুক্ত ঋষিপ্রবর সিমলার কায়স্থগৃহে জন্মিয়া, দক্ষিণেশ্বরে নটুয়ার পাল্লায় পড়িয়া বহু রক্তমোক্ষণ, নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার, বিবিধ বিচিত্র সংগ্রাম হইতে পার পান নাই। অবশেষে কঠিনতম কাজটিও করিতে হইল—শ্রীরামকৃষ্ণকে বাক্যে প্রকাশ।

পুষ্পদন্ত মহিম্নঃস্তোত্র লিখিবার নজির দিয়াছিলেন—

"মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ
পুনামীত্যর্থেঽস্মিন্ পুরমথন বুদ্ধির্ব্যবসিতা॥"

তোমার গুণ গাহিয়া আমার বাক্যকে পবিত্র করিব বলিয়াই, হে মহাদেব, এই স্তোত্র লিখিবার বুদ্ধি হইয়াছে।

বিবেকানন্দের এই নজিরের প্রয়োজন ছিল না। তাহার শ্রীরামকৃষ্ণকে শব্দের মাধ্যমে তুলিয়া ধরিতে হইয়াছিল মঠবাসীদের, তথা উত্তরকালীন ভক্তদের অনুধ্যানের সৌকর্যের জন্য। ভারতবর্ষে ঠাকুর-দেবতার অভাব নাই, তাঁহাদের মূর্তি-কল্পনার এবং ধ্যানমালারও অন্ত নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ-ঠাকুরের মূর্তি ধ্যানে কয়টি মাথা বসাইব? তাঁহার কোন্ অঙ্গে কোন্ অলঙ্কার পরাইব, কোন্ হাতে কোন্ আয়ুধ দিব? এই প্রশ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের মনে একদিন না একদিন উঠিবেই। যিনি নিজের হাতে নরেন্দ্রকে তামাক খাওয়াইছিলেন, নরেন্দ্রের মাথায় চড়িয়া সে যেখানে রাখিবে সেখানেই থাকিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন তিনি অঘা-গোসাই বঘা-গোসাইএর 'আহা, কিবা রূপ, কিবা গুণ' ইত্যাকার স্তুতি শুনিতে ভালবাসিবেন কি? অতএব নরেন্দ্রকেই কলম ধরিতে হইয়াছিল। যাহা বাহির হইল তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান—তাঁহার জীবনাদর্শের মহত্তম প্রতিচ্ছবি।

বন্দি তোমায়—

অবশ্যই তুমি জগদ্-বন্দ্য, কেননা জগতের মহত্তম উপকার সাধন করিতে তুমি আসিয়াছ। মানুষের সংসারবন্ধন-খণ্ডনই তো তাহার শ্রেষ্ঠ কল্যাণ। সেই কল্যাণসাধন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো তোমার স্বাভাবিক। তাই তোমায় বন্দনা করি।

যদিও তুমি নিরঞ্জন, তবুও মনুষ্যদেহ-ধারণের গঞ্জনা হাসিমুখে স্বীকার করিয়া লইয়াছ। যদিও তুমি ত্রিগুণাতীত তথাপি গুণময়ী প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে স্বেচ্ছায় নাচিয়া গাহিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া কত খেলা করিয়া গেলে। মা মা বলিয়া কাঁদিলে, তোরা কে কোথায় আছিস বলিয়া কাঁদিলে, বৈষ্ণবদের সঙ্গে নাচিলে, শাক্তদের সহিত নাচিলে, ব্রাহ্মদের সঙ্গে, কর্তাভজাদের সঙ্গে নাচিলে; খ্রীষ্টানদের নমস্কার করিলে, মুসলমানদের সেলাম করিলে, অনাগতদের জন্যও মাথা নোয়াইলে। এ কি ঢং না বিনয়? যে বিনয় সর্বপ্রসারী আত্মানুভূতির পরাকাষ্ঠায় উপস্থিত হয় সেই বিনয়।

তোমায় বন্দনা করি, আহা কি শুভ্র তোমার চরিত্র! নির্ধূম বহ্নি। নাই, নাই, কোনও কলঙ্ক নাই—কোনও দাগ নাই। এমন শুচিস্নিগ্ধ মূর্তি সত্যই জগতের অপূর্ব ভূষণ। রক্তমাংসের দেহে চৈতন্যের এমন পরিস্ফূর্তি সত্যই অদ্ভুত।

দাও প্রভু, জ্ঞানাঞ্জন দিয়া আমাদের নয়ন খুলিয়া। আমাদের দৃষ্টি যদি পরিষ্কার হয় তো তোমার এই অপাপবিদ্ধ মূর্তি হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইবে। আমাদের সকল মোহ সূর্যোদয়ে অন্ধকারের মতো নিমেষে বিদূরিত হইবে।

কী উজ্জ্বল ভাবরাশি তোমার জীবনের মধ্য দিয়া এই পৃথিবীতে বিকীর্ণ করিয়াছ! আধ্যাত্মিক অনুভূতিসমূহ পুঞ্জীভূত হইয়া মহাসমুদ্রের রূপ লইয়াছে। সেই মহাসমুদ্র আবার প্রেমসিন্ধুও বটে—মানুষের প্রতি উদ্বেল প্রেমের অন্তহীন অভিব্যক্তি। এই ভাস্বর ভাব-সাগর এবং উন্মদপ্রেমপাথারের পটভূমিকায় তোমার শ্রীমূর্তি পরিশোভমান। ঐ মূর্তির পায়ে আমার ভক্তহৃদয় চিরবিক্রীত। দুস্পার সংসার পার হইবার জন্য আর কোনও চিন্তা নাই।

যুগে যুগে জগদীশ্বর কত মূর্তি লইয়া ধরাধামে মানবের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছেন। এবার শ্রীরামকৃষ্ণমূর্তি হইল যোগমূর্তি। মানুষের বিক্ষিপ্ত মনকে জ্ঞান ভক্তির স্পর্শ দিয়া সমাহিত করিবার আশ্চর্য মুক্তি এই মূর্তিতে অভিব্যঞ্জিত।

নাই, নাই, আর কোনও দুঃখ নাই। অপার্থিব করুণায় সকল ক্লেশ সকল গ্লানি তুমি ভঞ্জন করিয়াছ, কঠোর কর্মপাশকে শিথিল করিয়া দিয়াছ। শরণাগতকে পরিত্রাণের পন্থা নির্ণয় করিয়াছ। কলির কঠিন বন্ধন তোমার লোকোত্তর আধ্যাত্মিক শক্তিতে আজ পরিচ্ছিন্ন।

হে কাম-কাঞ্চনজয়ী জিতেন্দ্রিয় মহাযোগিন্, সর্বত্যাগের যে উন্নত আদর্শ তোমার জীবনে পরিস্ফুট ঐ আদর্শের প্রতি আমাদের অনুরাগ দৃঢ় কর। 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ'—ভারতের এই সনাতন বাণী আমরা যেন কখনো বিস্মৃত না হই। সারা পৃথিবীতে আজ চলিয়াছে এবং চলিবে কামকাঞ্চনের উন্মত্ত প্রসার। তোমার ত্যাগদীপ্ত শান্ত মূর্তিই মানুষকে আজ কেন্দ্রস্থ করিবে, শান্তির সন্ধান দিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণমূর্তি। যে মূর্তিতে ভয়ের কোনও চিহ্ন নাই, সংশয়ের সকল চিহ্ন তিরোহিত, ব্রহ্মোপলব্ধির দৃঢ় নিশ্চয় যে মুখকমলে ফুটিয়া উঠিয়াছে—আবার আধ্যাত্মিক শ্রেয়োলাভে ব্যগ্র ভক্তগণকে জাতি কুল মানের অপেক্ষা না রাখিয়া আশ্রয় দিবার ব্যাকুল আগ্রহ যে মূর্তিতে প্রকট।

সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পুণ্যভূমি ভারতে যে আধ্যাত্মসাধনা বিকাশলাভ করিয়াছে তাহারই জীবন্ত মূর্তি তুমি হে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ।

তোমার শ্রীচরণ আমাদের জীবনে পরম সম্পদ। দুস্তর ভবসাগর আজ আর কোনও বিভিষীকা আনিতেছে না। উহা আজ গোষ্পদ-বারির ন্যায় তুচ্ছ। তোমার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া আমরা অনায়াসে উহা উত্তীর্ণ হইব।

তোমার বিশ্বতঃস্পর্শী প্রেম এবং সমদর্শিতা পৃথিবীর অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানুষের বিপুল দুঃখ দূর করিয়া দিবে।

প্রণাম প্রভু, তোমায় প্রণাম। হে বাক্য-মনের অতীত সত্যস্য সত্যম্, তোমার স্বকীয় মহিমাকে তো স্পর্শ করিবার উপায় নাই; অতএব আমাদের বাক্যমনের আধার হইয়া আমাদের সীমাবদ্ধ ধারণার গম্য হইয়া আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হও। আমাদের জড়তা, আলস্য ও মোহকে বিদীর্ণ কর, আমাদের সকল বিক্ষেপকে শান্ত কর।

গাই, গাই, গীতছন্দে তোমার বন্দনাগীতি গাই। জয়, জয়, তোমার জয়। হে সর্বমালিন্য-হর শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমার জয়। হে সর্বকল্যাণকর শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমার জয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি*

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী নির্বেদানন্দ

(দুর্ভেদ্য পাষাণ)

এর অল্প কিছুদিন পরে নরেন্দ্রনাথ এই ঋষির আবাসস্থলের পবিত্র পরিবেশে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন এবং আধুনিক চিন্তার শাণে ঘ'সে ঘ'সে তিনি অতি যত্নে যে বিচারের ছুরিকাখানি শাণিত ক'রে রেখেছিলেন, তা দিয়ে তাঁকে চিরে চিরে দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন। সমালোচনার সব বৃত্তিগুলিকে সজাগ রেখে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে লক্ষ্য ক'রে চললেন তিনি, তাঁর কথা ও চিন্তা অতি সাবধানে ওজন ক'রে দেখতে লাগলেন, এবং যথাসাধ্য তন্ন তন্ন ক'রে খতিয়ে নিতে লাগলেন তাঁর প্রতিটি আচরণ। শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে তিনি তাঁর আন্তরিক ও চরম প্রশ্ন খোলাখুলিভাবে উত্থাপন করলেন— "ভগবানকে আপনি দেখেছেন কি?" এতদিন ধরে সত্যদ্রষ্টা ব'লে পরিচিত লোকের কাছে এই প্রশ্ন ক'রে তিনি যে নেতিসূচক, সংশয়যুক্ত বা বাঁকা উত্তর পেয়েছিলেন, বোধ হয় সেরূপ উত্তরই আশা করেছিলেন এখানেও। এবার কিন্তু এই যুক্তিবাদীকে স্তম্ভিত হতে হল অপ্রত্যাশিত, অতি স্পষ্ট, নিশ্চয়াত্মক, ক্ষিপ্র-প্রদত্ত উত্তর শুনে— "হাঁ, দেখেছি, তোকে যেমন দেখছি তেমনি ভাবে, আরো অনেক বেশী স্পষ্ট-ভাবে দেখি তাঁকে।" অবাক হয়ে নরেন্দ্রনাথ শুনে চললেন, "ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায়; তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়— যেমন তোকে দেখছি, তোর সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু কে তা করতে চায় বল্? লোকে স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পদের জন্য কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ভগবানলাভের জন্য কজন সেভাবে কাঁদে? ভগবানের জন্য আন্তরিক ভাবে যদি কেউ কাঁদে, নিশ্চয়ই তিনি তাকে দেখা দেবেন।" শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়-নিঃসৃত এই সহজ স্পষ্ট, স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর শুনে নরেন্দ্রনাথের বদ্ধমূল ধারণা জন্মাল যে অকপট দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ এসব কথা বলছেন। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সব কথা মেনে নিতে তখনো তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এই সময় তাঁর যে ধারণা জন্মেছিল, সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "এই সর্বপ্রথম একজন মানুষকে দেখলাম যিনি বুকফুলিয়ে বললেন যে, তিনি ভগবানকে দেখেছেন, বললেন যে, জগৎকে যেভাবে আমরা প্রত্যক্ষ ক'রে থাকি তার চেয়ে আরো অনন্তগুণ বেশী নিবিড় ক'রে ধর্মের সত্যতা প্রত্যক্ষ করা যায়, অনুভব করা যায়। তাঁর মুখে একথা শুনে আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলাম যে তিনি সাধারণ ধর্মপ্রচারকের মতো কথা বলছেন না, নিজ অনুভূতির গভীরতা থেকেই বলছেন।"

এই ঋষির আধ্যাত্মিক দৃঢ়প্রত্যয়ের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত গভীর শ্রদ্ধার ভাব উদিত হওয়া সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন তাঁকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে অপ্রত্যাশিত বিপুল ভালবাসায় প্লাবিত করলেন, বহুদিনের পরিচিত একান্ত প্রিয়জনের মতো অতি পরিচিতকণ্ঠে আপ্যায়িত করলেন, এবং নরেন্দ্রনাথের বর্তমান পার্থিব জীবনের সঙ্গে পূর্ব-সংশ্লিষ্ট ব'লে উল্লেখ ক'রে কতকগুলো দুর্বোধ্য, অবিশ্বাস্য ও

* লেখকের মূল গ্রন্থ 'Sri Ramakrishna & Spiritual Renaissance' হইতে অনূদিত—সঃ

রহস্যময় কথা সারাক্ষণ ধরে ব'লে চললেন, সেদিন নরেন্দ্রনাথের বাস্তববাদের ছাঁচে গড়া মনে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লেগেছিল। সে সব কথাগুলো তাঁর কাছে অর্ধোন্মাদের প্রলাপ ব'লেই মনে হয়েছিল। অবশ্য এই ঋষিকে একজন অতি পবিত্র, অটলবিশ্বাসী, প্রেমার্দ্রচিত্ত খাঁটি মানুষ ব'লে ধারণা করতে তাঁর বিলম্ব হয়নি, কিন্তু সেই সঙ্গে এ ধারণাও হয়েছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণের মাথায় কোথাও একটা 'স্ক্রু' ঢিলে আছে। এই শুদ্ধসত্ত্ব যোগীর অতুলনীয় পবিত্রতার জন্য তৎপ্রতি অসীম শ্রদ্ধার ভাব এসেছিল তাঁর মনে, আবার সেইসঙ্গে তাঁর মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ সুস্থতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহের ভাবেরও উদয় হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই দুই ভাবের মিশ্রণ-সম্ভূত একটা ধারণা হৃদয়ে পোষণ ক'রে নরেন্দ্রনাথ সেদিন বাড়ী ফিরলেন। এই সাধুটির সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম সাক্ষাতের সময় যে অভিনব ও পরস্পরবিরোধী অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন, তাতে স্বভাবতই তাঁর পর্যবেক্ষণ-পরায়ণ মনে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল, এবং সত্যান্বেষণের পথে তাঁকে সাহায্য করার মতো যোগ্যতা ও সামর্থ্য শ্রীরামকৃষ্ণের কতখানি আছে, সে বিষয়ে চিন্তা ক'রে কোন স্থির নিশ্চয়তায় তিনি আসতে পারেননি।

তবু একটা অকারণ দুর্বার ইচ্ছার প্রেরণায় মাসখানেকের মধ্যেই আবার তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এবারে শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শের অদ্ভুত শক্তি প্রত্যক্ষ করার একটা সুযোগ এল তাঁর, ভয়ে অতিমাত্রায় বিহ্বল হয়ে দেখলেন, এই স্পর্শের ফলে চারিদিকের সব কিছুই তাঁর চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে, ঘুরতে ঘুরতে এক মহাশূন্যের গর্ভে লীন হতে চলেছে। তাঁর মনে হল মৃত্যু সম্মুখে, তাই ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন, "তুমি আমার একি করলে! বাড়ীতে আমার মা-বাপ আছেন যে!" দক্ষিণেশ্বরের যাদুকর একথা শুনে মৃদু হেসে নরেন্দ্রনাথের বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "আচ্ছা, এখন তবে থাক।" সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ চারিদিকের সব কিছু আবার পূর্বের মতোই দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন, আশ্চর্যও হলেন অতিমাত্রায়। এ ঘটনাটি ছাড়া সেদিন তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহারে আর কোন অস্বাভাবিকতা ছিল না। নরেন্দ্রনাথের সমালোচনা-প্রবণ মন এই অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতাকে শ্রীরামকৃষ্ণের কোন সম্মোহনশক্তির প্রভাবসঞ্জাত সাময়িক সম্মোহন-জাতীয় একটা কিছু ব'লেই সিদ্ধান্ত করল। নিজের সুদৃঢ় দেহ ও দুর্দমনীয় মনের কথা চিন্তা ক'রে নরেন্দ্রনাথ আশ্চর্য হয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তির বিপুলতার কথা ভেবে কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ তখনো কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছাননি।

এ ঘটনার অতি অল্পদিন পরেই আবার তিনি এসে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এবারে শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিময় স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হয়ে যান। এই অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের মনের গভীর প্রদেশ হতে অনেক তথ্য আহরণ ক'রে নিলেন—তিনি আগে কোথায় ছিলেন, কোন্ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শরীরধারণ ক'রে এসেছেন, কতদিনই বা স্থূলদেহে অবস্থান করবেন, ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণ আগে এবিষয়ে যা জানতেন, আর এখন এভাবে যা জানলেন, তা সবই মিলে গেল। এই ঘটনা-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরে নিজ শিষ্যদের বলেছিলেন "এ অবস্থায় আমি তাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আত্ম-সমাহিত হয়ে সে এই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছিল। এতে তার সম্বন্ধে পূর্বে যা দেখেছিলাম ও অনুমান করেছিলাম, সে সবই মিলে গিয়েছিল। সেসব কথা এখন গোপন থাকবে। আমি জানতে পেরেছি যে, সে একজন সিদ্ধ ঋষি, পূর্ব হইতেই ধ্যানসিদ্ধ, যখনই সে নিজে তা টের পাবে, তখনই দৃঢ় সঙ্কল্প সহায়ে যোগমার্গে দেহত্যাগ করবে।" বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসতে নরেন্দ্রনাথ দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। বাহ্যসংজ্ঞাহীন হয়ে থাকাকালীন যা সব ঘ'টে গেল, তার কিছুই টের পেলেন না তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণের অচিন্ত্য বিস্ময়কর শক্তি নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করল। এই ঋষির প্রতি একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব

করলেন তিনি। কিন্তু হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হলেও তাঁর বুদ্ধি দৃঢ়ভাবে নিজ স্বাধীনতা রক্ষা ক'রে চলল, সম্ভাব্য কোন আজগুবি ঘটনায় বোকা বনে যাবার অনুমতি তাকে দিল না। নরেন্দ্রনাথ স্থির করলেন, নিজ সমালোচনা-মূলক অনুসন্ধানের চালুনিতে খুব ভালভাবে ছেঁকে না নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কোন কথাই তিনি মেনে নেবেন না। মা কালী ও অন্যান্য দেব-দেবী এমনকি বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধেও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাণখুলে অনেক কথাই বলেন; নরেন্দ্রনাথ স্থির করলেন, এঁদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিজ যুক্তিকে তৃপ্ত করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পূর্বে এসব বিষয় নিয়েও তিনি মাথা ঘামাবেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের যেসব বিশ্বস্ত অনুরক্ত ভক্ত তাঁর প্রতিটি কথা বিনাদ্বিধায় বেদ-বাক্যের মতো সত্য ব'লে মেনে নিতেন, তাঁদের যুক্তিনিরপেক্ষ বিশ্বাস ও ভাবের উচ্ছ্বাসকে বিষম ঘৃণার চোখে দেখতেন নরেন্দ্রনাথ। হিন্দুদের বহু আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শকে স্থূল কুসংস্কার ও বর্বর গোঁড়ামি ব'লে নির্মমভাবে নিন্দা করতেন তিনি, এমনকি হিন্দুশাস্ত্রকে পর্যন্ত বিদ্রূপের তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ করতে কোন সঙ্কোচ হ'ত না তার। ভাবাবস্থায় দর্শনের সময় শ্রীরামকৃষ্ণের মাথা ঠিক থাকে কি না, সে বিষয়ে পর্যন্ত প্রশ্ন করার দুঃসাহস তাঁর হ'ত—প্রকাশ্যে খোঁচা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করতেন, "কি ক'রে আপনি বুঝলেন যে আপনার অনুভূতিগুলো দুর্বলমস্তিষ্ক-কল্পিত নয়?" তীক্ষ্ণ, সূচীমুখ প্রশ্নের বাণে শ্রীরামকৃষ্ণের সরল মন বিদ্ধ ক'রে যন্ত্রণা দিতে মোটেই দ্বিধা হ'ত না তাঁর—"আমাকে এত ভালবাসেন কেন আপনি? দেখে তো মনে হয় মায়ায় আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন: এতে উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা থেকে আপনার পতনও তো ঘটতে পারে?" শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের নিকট মস্তক অবনত করার পূর্বে তাঁর গর্বোদ্ধত বুদ্ধি একাধারে 'ভলটেয়ার' ও 'হিউম'-এর মতো তীক্ষ্ণ, প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যাত্মা ঋষির দিকে দুর্দান্ত অচিন্তনীয় শক্তিতে হৃদয় তাঁকে টেনে নিয়ে চলেছিল; হৃদয়ের এই গতিবেগ থামাবার জন্যই বোধ হয় বিপুল, অসীম-সাহস উৎসাহ নিয়ে তাঁর বুদ্ধি সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল। এইকালে প্রবল বুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিকতা-প্রবণ হৃদয়ের অবিরাম অপ্রশাম্য সংঘর্ষের ফলে নরেন্দ্রনাথের অন্তর্জীবন বিক্ষোভের লীলাভূমি হয়ে উঠেছিল। এই হৃদয়ই একদিন মেনে নিতে না পারার জন্য অতৃপ্তিভরে আধুনিক পাশ্চাত্য-সভ্যতার ভাবধারার দিকে তাঁর বুদ্ধির অবাধ গতিপথে বাধা দিয়েছিল; এখন আবার তাঁর বুদ্ধিই বাধা হয়ে দাঁড়াল ভারতের সুপ্রাচীন আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্রতি আনুগত্য স্বীকার ক'রে নেবার জন্য তাঁর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস-প্রকাশের পথরোধ ক'রে।

অবশ্য প্রত্যক্ষবাদের প্রতি নরেন্দ্রনাথের পূর্বসঞ্জাত অনুরাগ শ্রীরামকৃষ্ণের মানসিক স্থৈর্যের ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। যথাকালে নরেন্দ্রনাথের হৃদয় যে যথার্থ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে সেকথা জগদম্বার কৃপায় শ্রীরামকৃষ্ণ বহু পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন ব'লে পূর্বের মতোই তিনি তাঁর সঙ্গে সাদর ও সস্নেহ আচরণ ক'রে যেতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ খুব ভালভাবেই জানতেন যে নরেন্দ্রনাথের মধ্যে ভগবানকে দেখতে পান ব'লেই নরেন্দ্রনাথকে এত ভালবাসেন তিনি। জানতেন, নরেন্দ্রনাথের এই সব সূচীমুখ তর্কের মূল উৎস হচ্ছে তাঁর বুদ্ধিজ অকপটতা; আর জানতেন বলেই সেগুলিকে যোগ্য মর্যাদাদান ও উপভোগ করতে পারতেন। বরং, নিজের অন্যান্য শিষ্যদের কাছে যে-কথা তিনি বলতেন, এক্ষেত্রেও সেই একই কথা ব'লে এই যুক্তিপরায়ণ তরুণটির সমালোচনা-প্রবৃত্তিকে আরো সজীব ক'রে তুলতেন—"আমি বলছি বলেই কোন কিছু মেনে নিস না। প্রত্যেকটি বিষয় নিজে যাচাই ক'রে নিবি।" শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আরো যেসব ভক্তেরা আসতেন, তাঁদের চোখে নরেন্দ্রনাথের এরূপ আচরণ যতই উদ্ধত, নিন্দাত্মক ও 'কালাপাহাড়ী' ভাবের প্রতীক বলেই মনে হোক না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু অসীম স্নেহ ও ধৈর্য নিয়ে এভাবে নরেন্দ্রনাথকে অকপট স্বাধীন চিন্তার অভিব্যক্তির পথে বহুদূর পর্যন্ত প্রশ্রয় দিয়ে যেতেন। (ক্রমশঃ)

'বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল'—যুবশিক্ষণ-শিবির

সকল জাতির ভবিষ্যৎ তাহার যুবসম্প্রদায়ের চরিত্রবল ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর নির্ভর করে। বর্তমান কালে আমাদের দেশের যুবসম্প্রদায়ের জীবনে উদ্দেশ্য- ও লক্ষ্য-হীনতা যে-কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই ক্ষুব্ধ করে। আজ যে সঙ্কট তাহাদের সম্মুখে দেখা দিয়াছে তাহাকে 'আদর্শের সঙ্কট' বলা যাইতে পারে—যে সঙ্কট তাহাদের মনে একটি আদর্শগত শূন্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। আর ইহারই ফলে দেখা দিয়াছে যুবজীবনে বিস্মৃতি ও অস্থৈর্য। এ অবস্থা-পরিবর্তনের একমাত্র উপায় হইল যুবসম্প্রদায়ের সম্মুখে এমন চিরন্তন মূল্যবোধকে তুলিয়া ধরা—যাহা একদিকে ভারতের সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বহন করে আর অন্যদিকে এমন কালোপযোগী যে, তাহা যুবসম্প্রদায়কে সমাজের উন্নতির জন্য স্বার্থহীন কর্মের প্রেরণা দেয়।

স্বামী বিবেকানন্দ মনুষ্যত্ব-কামী যুবসম্প্রদায়ের একটি মহান আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন—অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের বিকাশকল্পে বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সংযম ও একাগ্রতার সাধনা এবং ঈশ্বরের পূজাজ্ঞানে মানুষের সেবা। 'নিজে মানুষ হও ও অপরকে মনুষ্যত্বলাভে সহায়তা কর'—স্বামীজীর এই মহতী বাণীকে স্মরণ করিয়া ব্যক্তিগত চরিত্রগঠনের সহায়ক স্বার্থহীন সমাজসেবায় যুবশক্তিকে সংহত করিবার উদ্দেশ্যেই সম্প্রতি কলিকাতায় 'বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল' গঠিত হইয়াছে (৫৭।১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২)। অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার ইহার সভাপতি। এই মহামণ্ডলের কর্মক্ষেত্র সমগ্র ভারতবর্ষ; ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায়গত কোন বিভেদকে সে স্বীকার করে না।

ইহারই প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে আড়িয়াদহ গ্রামে গত ২৩শে হইতে ২৫শে জানুআরি পর্যন্ত একটি যুবশিক্ষণ-শিবির অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন জেলা হইতে প্রধানতঃ কলেজ ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের ১৪৬ জন ছাত্র এই শিবিরে যোগ দিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রায় ১০০ জন শিক্ষার্থী ও শুভানুধ্যায়ী এবং বহু দর্শক ও শ্রোতা শিবিরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৫০০ কিশোর-কিশোরীও তাহাদের বিশেষ সূচীতে অংশ গ্রহণ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ মহামণ্ডলের প্রথম পদক্ষেপ উপলক্ষে একটি আশীর্বাণী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। শিবিরের সূচীতে ছিল, মনঃ-সংযোগ, ব্যায়াম, কুচকাওয়াজ, প্রাথমিক চিকিৎসা-শিক্ষা, খেলাধুলা, ব্রতচারী, স্কাউটিং, চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী, প্রার্থনা ও বিভিন্ন শিক্ষার আসর। ভারতীয় কৃষ্টি, সমাজ ও নৈতিক চেতনা, স্বাস্থ্য, সমাজতন্ত্র, ধর্ম, কর্মবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তিনদিনের ২১টি আলোচনায় যোগ দেন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী অজজানন্দ, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, ডঃ প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য, অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্‌গণ।

মহামণ্ডলের উদ্যোগে গত ২৭ জানুআরি কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি হলে স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদারের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ডঃ রমা চৌধুরী, অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত এবং স্বামী স্মরণানন্দ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

সমালোচনা

শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ (প্রথম খণ্ড)—স্বামী অপূর্বানন্দ সংকলিত। প্রকাশক: রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, বারাসত (২৪ পরগণা)। ৩৮৯ পৃষ্ঠা; মূল্য ৬·৫০ টাকা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দজীর (মহাপুরুষ মহারাজ) সঙ্গলাভ করিয়াছেন এমন ২২ জন সন্ন্যাসী এবং ৬ জন গৃহস্থ ভক্তের ঘনিষ্ঠ স্মৃতিকথা এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। এই স্মৃতিকথাগুলির মাধ্যমে লোকোত্তর মহাপুরুষের ভক্তি-প্রেম-বৈরাগ্য-জ্ঞানদীপ্ত মহৎ আধ্যাত্মিক জীবনের একটি সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার দিব্য সান্নিধ্যলাভ করিতেছি! মহাপুরুষজীর মুখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিলে ঠাকুরের মহিমা জীবন্তভাবে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। মহাপুরুষজী-কথিত এই গ্রন্থের নানা প্রসঙ্গের মধ্যে শুধু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নন, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামীজী এবং ঠাকুরের অন্যান্য সন্তানগণের বহু কথা আমরা জানিতে পারি। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণের সাধনজীবনের অনেক স্মৃতিও মহাপুরুষজীর এই কথোপকথনগুলির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। বিভিন্ন ধর্মপিপাসুকে স্বামী শিবানন্দজী কিভাবে ভক্তি-বিশ্বাস-জ্ঞান-বৈরাগ্যে উদ্বুদ্ধ করিতেন তাহারও প্রত্যক্ষ পরিচয় এই স্মৃতিসংগ্রহে বিকীর্ণ। সর্বোপরি আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলের প্রতি মহাপুরুষজী কী গভীর উদার ভালবাসা পোষণ করিতেন তাহারও নানা কাহিনী লিপিকারবৃন্দ তাঁহাদের এই স্মৃতিকথায় সংগ্রথিত করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণ এই গ্রন্থটি পড়িয়া বিশেষ অনুপ্রাণিত হইবেন, সন্দেহ নাই। সংকলক স্বামী অপূর্বানন্দকে আমরা এই গ্রন্থপ্রকাশের জন্য অভিনন্দিত করি।

—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

Vivekananda—Bhupendranath Roy, Headmaster, Golamara High School. Published by Sraban Mahato, Golamara High School, P. O. Golamara, Dist. Purulia. Pp. 34; price 37p.

আলোচ্য পুস্তকটি স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থের 'The flame he kindled'—যে আগুন তিনি জ্বালিয়াছিলেন—শিরোনামে চতুর্থ পরিচ্ছেদ। স্বামীজীর অগ্নিময়ী বাণী পাশ্চাত্যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, মূলতঃ তাহাই এখানে সুধী লেখক মনোজ্ঞভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

প্রসাদ-প্রসঙ্গ (দয়ালচন্দ্র ঘোষ বিরচিত)—প্রমথনাথ চৌধুরী সম্পাদিত। প্রকাশক: শ্রীকালিকানাথ চৌধুরী, ৮বি মহেশ চৌধুরী লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫। পৃষ্ঠা ১৪৪; মূল্য তিন টাকা।

সিদ্ধ সাধক-কবি রামপ্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সহ তাঁহার সঙ্গীতগুলির সুন্দর সংকলন। প্রসাদ-প্রসঙ্গ ভক্ত ও বিদ্বজ্জনের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে। অনেকগুলি গানের তাল ও রাগিণীর নাম দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে কবি রামপ্রসাদের চিত্র এবং তাঁহার পরিচিতি গ্রন্থখানির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। গবেষণামূলক তথ্যপূর্ণ ভূমিকাটি পাঠ করিলে রামপ্রসাদী সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা হয়।

অন্য কোথা—শ্রীদাশরথি বিশ্বাস। পরিবেশক: আদ্যাকালী পুস্তকালয়, এ ৫৯, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা—৮০; মূল্য দুই টাকা।

'অন্য কোথা'—একখানি কবিতা-গ্রন্থ। কবির নিজস্ব ভাবগুলি গ্রন্থটিতে ছন্দোবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাগুলির বিষয়-বৈচিত্র্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের দিব্য জীবন অবলম্বনে রচিত 'ত্রয়ী' কবিতায় সভ্যতা ও দর্শন আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থে কুড়িটি সুন্দর কবিতা স্থান পাইয়াছে।

ত্রিধারা—প্রকাশক: স্বামী সন্তোষানন্দ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ, বেলঘরিয়া, কলিকাতা ৫৬। পৃষ্ঠা ৮০।

রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ পত্রিকা বর্তমানে 'ত্রিধারা'—এই তাৎপর্যপূর্ণ নূতন নাম লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শিল্পপীঠ অর্থাৎ লাইসেনসিয়েট ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সিভিল মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল—এই তিনটি বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ ও ছাত্রগণের সমবেত প্রচেষ্টায় পত্রিকাটি প্রকাশিত বলিয়া ত্রিধারা নামকরণ সার্থক হইয়াছে। বর্তমান সংখ্যাটি ইংরেজী ও বাংলায় লিখিত সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী দ্বারা সমৃদ্ধ।

স্মরণী (১৯৬৭): **প্রকাশক**—কর্মসচিব, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, ২৪ পরগণা।

রহড়া বালকাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মজয়ন্তী উৎসব গত ৩রা হইতে ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত মনোজ্ঞ ভাবে সুসম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে 'স্মরণী' প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকাটি সুমুদ্রিত এবং অনেকগুলি চিত্র দ্বারা সমলঙ্কৃত। বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী বিভাগের মোট ৩০টি লেখার মধ্যে বাংলায় লেখা ২২টি। 'Our Home, At A Glance'—সচিত্র এই প্রবন্ধে বালকাশ্রম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সুন্দরভাবে বিবৃত। কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের লিখিত কবিতা ও প্রবন্ধগুলি সুন্দর।

স্মারক গ্রন্থ (১৯৬৭): প্রকাশক—সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, বরাহনগর, কলিকাতা ৩৬। পৃষ্ঠা ১৩৮।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরের সচিত্র স্মারক গ্রন্থখানি সুন্দর; ইহা পূর্ব মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। স্বামী অভেদানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার শততমবর্ষপূর্তি উপলক্ষে কয়েকটি বিশেষ রচনা সংখ্যাটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই সঙ্গে আশ্রম-বিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক পত্রিকাটি ও সংযুক্ত হওয়ায় স্মারক গ্রন্থের আকার বৃদ্ধি পাইয়াছে। তরুণ ছাত্রদের লেখায় কল্পনা ও রচনাশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। নন্দলাল বসুর অঙ্কিত 'নিবেদিতার ঘরে নন্দলাল' চিত্রখানি পত্রিকাটিকে আকর্ষণীয় করিয়াছে।

ভগিনী নিবেদিতা-স্মরণে (১৯৬৬-৬৭): প্রকাশক—ভগিনী নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী উৎসব কমিটি, ১ ডালিমতলা লেন, কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা ৫২ + ২২।

স্মরণিকাটি ভগিনী নিবেদিতার জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে লোকমাতার প্রতি সার্থক শ্রদ্ধাঞ্জলি। বাংলা ও ইংরেজীতে কয়েকটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ দ্বারা পত্রিকাখানি সমলঙ্কৃত। শ্রীতামসরঞ্জন রায় লিখিত 'কালী-মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে নিবেদিতা' প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের 'মৃত্যুরূপা কালী' হইতে উদ্ধৃতিটিতে ভুল-সংশোধন বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ৮ই মাঘ (২২.১.৬৮) সোমবার দিন যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ১০৬তম জন্মতিথি-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এইদিন স্বামীজীর মন্দিরে মঙ্গলারতি, বেদ-আবৃত্তি, কঠোপনিষদ্-পাঠ, বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ ও কালীকীর্তন করা হয়। স্বামীজীর ঘরে ভজনের ব্যবস্থা ছিল। দ্বিপ্রহরে সমাগত প্রায় ছয় হাজার ব্যক্তিকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

কয়েক সহস্র নরনারী এই দিন স্বামীজীর চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে বেলুড় মঠে সমাগত হন; বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এই উদ্দেশ্যে এই দিন বিকালে বেলুড় মঠে আসিয়াছিলেন।

বিকাল সাড়ে তিনটার সময় স্বামী চিদাত্মানন্দজীর সভাপতিত্বে মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতি মহারাজ এবং ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী বাংলায়, অধ্যাপক হীরালাল চোপরা হিন্দীতে এবং ডক্টর শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায় ইংরেজীতে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। তাঁহারা বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ, তিনি একটি বিশেষ কার্য-সাধনের জন্য, ভারত ও জগৎকে নবযুগের চলার পথ নির্দেশ করার জন্য আসিয়াছিলেন। চিন্তার সু-উচ্চতা ও মানবের জন্য সমবেদনার অতলস্পর্শী গভীরতা—এই উভয়ই, শঙ্করের জ্ঞান ও বুদ্ধের হৃদয় দুই-ই—সমন্বিত হইয়াছিল তাঁহার মধ্যে। ভারতীয় জাতির মধ্যে তিনিই আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া আনিয়াছেন, বনের বেদান্তকে ঘরে টানিয়া আনিয়াছেন শিবজ্ঞানে জীব-সেবার মাধ্যমে; ইহারই মাধ্যমে কিভাবে সংসারত্যাগ না করিয়াও গৃহ, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি সর্ব ক্ষেত্রেই কর্মরত থাকিয়াও আমরা ভগবানলাভ করিতে পারি তাহা স্পষ্টভাবে তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। ব্যষ্টির অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশের প্রচেষ্টাই যে সমষ্টির সর্ববিধ উন্নতি ও কল্যাণের সহায়ক, এ বিষয়ে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন বারবার। তাঁহার বাণী শুধু ভারতের নয় সারা বিশ্বের কল্যাণপথের উপর বিমল আলোকবর্ষী।

সেবাকার্য

উড়িষ্যা: গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৬৭) উড়িষ্যার কটক জেলার পট্টমুণ্ডাই কেন্দ্র হইতে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ৪,৮৩৯ জন বাত্যাবিপর্যস্ত জনগণের মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বিতরিত হইয়াছে:

চাউল ৪,৫৩৭ কেজি, গুঁড়া দুগ্ধ ৩০ প্যাকেট, মটরদানা ৮৮ কেজি, ধুতি ও শাড়ী ৬৬৮ খানা, ছেলেদের পোশাক ৮২০টি, পশমী কম্বল ৪৯ খানি এবং তুলার কম্বল ৬০০ খানি।

মহারাষ্ট্র: গত ১৩ই জানুআরি (১৯৬৮) হইতে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মহারাষ্ট্রের কয়নায় ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত জনগণের সেবাকার্য আরব্ধ হইয়াছে।

অন্যান্য সংবাদ

মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৬৭) স্বামী গম্ভীরানন্দজী আশ্রমের ডিসপেন্সারী-ভবনের প্রসারণের উদ্দেশ্যে পরি-কল্পিত গৃহটির ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন।

মহীশূর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২১শে জানুআরি (১৯৬৮) 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত কলেজ'-এর (নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন এবং স্বামী গম্ভীরানন্দজী সমাগত অতিথিদের সাদর সম্ভাষণ জানান।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২২শে জানুআরি (১৯৬৮) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ আশ্রমের 'বিবেকানন্দ সেন্টিনারী হল'-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। হলটি একসঙ্গে দেড় হাজার লোক বসিবার মতো প্রশস্ত।

বাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৮শে জানুআরি তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বারোদ্ঘাটন-সভায় স্বামী গম্ভীরানন্দজী ঘোষণার মাধ্যমে আশ্রমের বিবেকানন্দ সেন্টিনারী মেমোরিয়্যাল বিল্ডিং-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

কার্যবিবরণী

সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের বাহিরে সুদূরবর্তী স্থানে মিশনের এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে। এই কেন্দ্রের প্রধান কার্য আধ্যাত্মিক ও সাধারণ শিক্ষাবিস্তার। প্রতি সপ্তাহে ক্লাস ও বক্তৃতা এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়। কেন্দ্রাধ্যক্ষ আশ্রমের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে আহূত হইয়াও ধর্মবিষয়ে ভাষণ দেন।

বিদ্যালয় : 'বিবেকানন্দ তামিল বিদ্যালয়' এবং 'সারদাদেবী তামিল বিদ্যালয়'—সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত এই বিদ্যালয় দুইটিতে আলোচ্য বর্ষে ২৬৪ জন ছাত্রছাত্রী (ছাত্রী—১৩৩) অধ্যয়ন করিয়াছে। তামিলভাষা শিক্ষার মাধ্যম হইলেও ছাত্রছাত্রীদিগকে জাতীয় ভাষা (মালয়) এবং ইংরেজীও শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য নৈশবিদ্যালয়ে তামিল ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৫৪ জন বয়স্ক ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

ছাত্রাবাস : মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ছাত্রাবাসে আলোচ্য বর্ষে ৫৫টি ছাত্র ছিল। বিদ্যার্থীরা নিয়মিত প্রার্থনা ও ভজনাদির মাধ্যমে মানুষ হইয়া উঠিতেছে। ৮ হইতে ১৭ বৎসরের আশ্রম-বালকবৃন্দ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। ছাত্রাবাসের বিদ্যার্থীদের মধ্যে একজন মহাবিদ্যালয়ের এবং একজন পলিটেকনিকের ছাত্র। আলোচ্য বর্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ছাত্রাবাস পরিদর্শন করেন। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর ডক্টর জাকির হোসেন ছাত্রাবাসটি পরিদর্শন করিয়া বিশেষ প্রীত হন।

গ্রন্থাগার : ইংরেজী, তামিল, মালয়ালম, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় ধর্ম দর্শন সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ৫,১০৮ খানি সুনির্বাচিত পুস্তক রাখা হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে ২০টি নূতন পুস্তক সংযোজিত হয়। পাঠাগারে ৬টি দৈনিক ও ৫৮টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। গ্রন্থাগার এবং পাঠাগার উভয়েরই যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার হইতেছে।

শিশুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার করা হইয়াছে; এই গ্রন্থাগারে শিশুদের উপযোগী পুস্তকাবলী রাখা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পূজা পাঠ ও বক্তৃতাদির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে

কৃষ্ণজয়ন্তী, নবরাত্রি, দুর্গাপূজা, খৃষ্টজন্মদিন এবং অন্যান্য পুণ্যতিথিও আশ্রমে উদ্‌যাপিত হয়।

উৎসব-সংবাদ

ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি-উৎসব গত ২২শে জানুআরি যথারীতি পালিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, ভজন-কীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় পাঁচ শতাধিক ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকাল ৪টায় বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসের উদ্যোগে মঠ-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভায় ছাত্রগণ প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতাদির মাধ্যমে স্বামীজীর জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে। সভাপতি শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র পাণ্ডে তাঁহার ভাষণে ছাত্রজীবনে স্বামীজীর আদর্শ ও ভাবধারা অনুসরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা সুন্দরভাবে বিবৃত করেন।

ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কার্য-নির্বাহক সমিতির ও স্থানীয় ভক্তগণের উদ্যোগে গত ১০ই নভেম্বর শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

দুপুরে আশ্রমে উপস্থিত সর্বশ্রেণীর প্রায় ৫০০ পাঁচশত নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাষণ প্রদান করেন। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে উপস্থিত আনুমানিক সাত শতাধিক লোক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রগণের কৃতিত্ব

নরেন্দ্রপুর : এই বৎসর ভারত সরকারের মেধা-বৃত্তি পরীক্ষায় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ের ১১জন ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এবার মোট ২৪ জন ছাত্রকে এই বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে।

বিবিধ-সংবাদ

সভা- ও উৎসব-সংবাদ

শ্রীসারদা-সংঘ : নিখিল ভারত সারদা-সংঘের অষ্টম সম্মিলনী এবার গত ২০শে হইতে ২৩শে অক্টোবর (১৯৬৭) পর্যন্ত চারদিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইল। শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ এবার নিখিল ভারত সংঘের সভানেত্রী হইয়াছেন। ২০শে অক্টোবর বিকালে Cotton College Union Hall-এ একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধন করেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা। প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্যপাল-পত্নী শ্রীমতী বিষ্ণুসহায়। শ্রীমতী পুষ্পলতা দাস সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানান। ২২শে অক্টোবর বিকালে পাণ্ডু সারদা-সংঘের উদ্যোগে নিবেদিতা শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা সভার উদ্বোধন করেন। সভান্তে নিবেদিতার জীবনীমূলক একটি একাঙ্ক নাটিকা অভিনীত হয়।

২৩শে অক্টোবর বিকালে গৌহাটি রামকৃষ্ণ সেবা-সমিতিতে নিবেদিতা শত-বার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা। সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী সুভদ্রা হাক্‌সার। পরে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ মহারাজ ম্যাজিক-লণ্ঠন সহযোগে ভগিনী নিবেদিতার জীবন আলোচনা করেন।

বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে গত ২৭শে ডিসেম্বর হইতে ৩১ ডিসেম্বর (১৯৬৭) পর্যন্ত

পাঁচদিন স্বামী শিবানন্দজীর ১১২তম জন্মোৎসব পূজা, কীর্তন, প্রসাদবিতরণাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দিনে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় মহাপুরুষ শিবানন্দজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী বিজয়ানন্দজী, স্বামী সমুদ্ধানন্দজী, স্বামী চিদাত্মানন্দজী, স্বামী ভূতেশানন্দজী, স্বামী অজজানন্দজী ও স্বামী জয়ানন্দজী, শ্রীবিনয় সেনগুপ্ত এবং শ্রীহেরম্ব ভট্টাচার্য। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' ও 'শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ' পাঠ করেন শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, শ্রীকিরণ ঘোষাল, শ্রীধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসুরেশ দাশ। কথকতায় ও গীতি-আলেখ্য-পরিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন স্বামী পুণ্যানন্দজী, স্বামী করুণানন্দজী, শ্রীঅনন্ত চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক প্রহ্লাদ ও কুশধ্বজ নাটকদ্বয় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনীত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীসারদা-দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের চারখানি সুসজ্জিত বৃহৎ প্রতিকৃতি ও বিভিন্ন সংকীর্তনদলের ভজনসঙ্গীতসহ কয়েক হাজার বালক-বালিকা ও নরনারীর এক বিরাট শোভা-যাত্রা বারাসত শহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিক্রমা করেন।

চাকুলিয়া (সিংভূম): গত ২রা জানুআরি এখানে মনোহরলাল বিদ্যাপীঠে বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠা দিবসটি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়।

পূর্বাহ্ণে স্বামী অপ্রমেয়ানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের পূজার্চনা করেন। মধ্যাহ্নে ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতে 'গ্রাম্য জীবনে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ' কিভাবে হইতে পারে তাহার বিভিন্ন মডেল প্রদর্শিত হয়।

বৈকালে জনাকীর্ণ সভায় প্রধান শিক্ষক শ্রীদেবানন্দ ঝা কর্তৃক বিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ এবং বিহারের ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যেন্দ্র-নারায়ণ সিংহ কর্তৃক ছাত্র-ছাত্রীগণকে পারি-তোষিক বিতরণের পর স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, স্বামী বিশোকাত্মানন্দ ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত যুগোপযোগী শিক্ষার উপর মনোজ্ঞ ও যুক্তিপূর্ণ ভাষণ দেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীকিশোরীমোহন উপাধ্যায়।

নবব্যারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে গত ১৪ই জানুআরি শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ১১৫তম শুভ জন্মোৎসব সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সন্ধ্যায় এক আলোচনা-সভায় প্রধান অতিথি অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক ভারতীয় নারীত্ব ও সর্বজনীন মাতৃত্বের আদর্শের পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন পরিষদের সভাপতি ডক্টর মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার।

সুরবিতান: ৮নং মনসাতলা লেন, খিদিরপুর, 'সুরবিতানে' গত ২৮শে অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতার জন্মশতবার্ষিকী উৎসব এবং গত ৭ই পৌষ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব প্রতিপালিত হইয়াছে।

খেপুত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৭ই পৌষ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি-উৎসব পূজাপাঠ-কীর্তনাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

উদ্বোধন

দিব্য বাণী

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৬।৫
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥৬

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(অসীম আত্মবিশ্বাস লয়ে)
নিজেই নিজেরে উদ্ধার ক'রো,
ভাঙ্গিয়া প'ড়োনা কভু অবসাদভরে—
মনে যেন থাকে উৎসাহ আর বল,
নিজেই আমরা বন্ধু মোদের, নিজেই শত্রু ঘোর—
(সবল মানসই সদাই মোদের বন্ধুর কাজ করে,
শত্রু হয় সে যবে হয় দুর্বল) ॥

নিজের বন্ধু সেই
নিজেরে যেজন জিনিয়াছে—যেই ইন্দ্রিয়গণে করিয়াছে সংযত।
আপনার বশে মন নাই যার—ছোটে ইন্দ্রিয়বশে,
সদা উচ্ছৃঙ্খল—
শত্রুরই মতো নিজ অনিষ্ট-সাধনে সে থাকে রত ॥

(নিজ শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে মনের সঙ্গে লড়িতে যেজন নামে,
জীবনযুদ্ধে বিজয়তোরণে তারই রথ আসি থামে।)

কথাপ্রসঙ্গে

সংযম ও শক্তি

জগৎ ও জীবন শক্তিরই খেলা

যখন কোন কাজ করা হয়, আমরা জানি, বিজ্ঞানই বলে, তাহার জন্য শক্তির প্রয়োজন। জড়পদার্থ শক্তিরই ঘনীভূত রূপ হইলেও কোন মুক্ত শক্তি তাহার উপর প্রযুক্ত না হইলে, সে বাহির হইতেই হউক বা তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশসাধন করিয়াই হউক, সে নিজে নিজে কোন কাজ করিতে পারে না। যখন কোন বস্তুকে আমরা ঠেলিয়া সরাইয়া দিই, তখন কাজ হয় বাহির হইতে শক্তিপ্রয়োগ দ্বারা। আবার যখন এ্যাটম বোমা ফাটানো হয়, তখন বাহির হইতে সামান্য শক্তি প্রয়োগ করা হয় বটে, তবে আসল কাজ হয় জড়বস্তু ইউরেনিয়ামের অন্তর্নিহিত প্রচণ্ড শক্তির বিকাশ ঘটাইয়া। বস্তুতঃ বিশ্বের সব কিছু ঘটনাই শক্তিরই খেলা। বস্তুকে গড়ে শক্তি, তাহাকে ধরিয়া রাখে শক্তি—তাহাতে রূপ, রস, গন্ধ, লঘুত্ব, গুরুত্ব প্রভৃতি সর্ববিধ গুণই সংযোগ করে শক্তি, আবার তাহাকে ভাঙেও শক্তি।

মানস জগতেও তাই। বাহিরে কি আছে, কি ঘটিতেছে, সে সম্বন্ধে কোন অচেতন পদার্থের মধ্যে কোন সজাগতা থাকে না। যেখানে মনের বিকাশ—অনুভূতির, চিন্তার বিকাশ (মনকেই চেতন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল, যদিও মূলতঃ উহাও সূক্ষ্ম অচেতন পদার্থ এবং সূক্ষ্মতম সত্তা চেতনার সংস্পর্শে চৈতন্যময় বলিয়া উহাকে মনে হয়)—সেখানেই সজাগতা আসে বহির্জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে। যে কোন প্রাণীর ভিতরই এই সজাগতা বিদ্যমান। এই সজাগতা জাগানোর ব্যাপারেও দেখা যায় শক্তিরই খেলা। রূপ-রস প্রভৃতির মাধ্যমে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন বস্তু-বিষয়ে বা ঘটনা-বিষয়ে যে বোধ আমাদের জাগে তাহা জাগাইতে চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাহার যে সংযোগ ঘটে, তাহা আলো প্রভৃতি রূপে শক্তিই ঘটায়। সেখান হইতে স্নায়ুর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সঞ্চালিত হয়, তাহাও ঘটায় শক্তি। দেহতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এই শক্তি বিদ্যুৎ-শক্তির মতো। যদি মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়াকেই মনের সব কিছু বলিয়া আমরা ধরিয়া লই, তাহা হইলেও বলিতে হইবে মনের সব প্রতিক্রিয়াই শক্তির খেলা। সত্যদ্রষ্টাগণ কিন্তু নিজ প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া বলেন, মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়াই সব নয়, মস্তিষ্ক হইতে সূক্ষ্মতর শক্তির মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া বাহিত হইয়া আর একটি সূক্ষ্মতর কেন্দ্রে প্রতিক্রিয়া ঘটায়। সেই প্রতিক্রিয়ার ফলেই আমরা দেখি, শুনি, অনুভব করি—এককথায় আমাদের বিষয়-বোধ জাগে। এই সূক্ষ্মতর কেন্দ্রটিই মন, আর মস্তিষ্ক হইতে সেখানে প্রতিক্রিয়া বহিয়া আনিবার মাধ্যমগুলি অন্তরিন্দ্রিয়। এখানে যে শক্তির খেলা ঘটে তাহা জড়বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত শক্তি অপেক্ষা সূক্ষ্মতর শক্তি। চিন্তাশক্তি বোধশক্তি প্রভৃতি বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়ামাত্র নয়, আরো সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া। বিষয়বোধ-ব্যাপারে চক্ষুর ভিতরের পর্দায় বস্তুর প্রতিবিম্বজনিত প্রতিক্রিয়াদি যেমন মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়ার কারণ মাত্র, মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়াও তেমনি মনে এইসব প্রতিক্রিয়াকে বিবিধ বোধ-রূপে রূপান্তরিত করিবার কারণ মাত্র। মস্তিষ্কের সহিত স্নায়ুর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন চক্ষুর ভিতরের পর্দায় বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়িলেও আমরা উহা দেখিতে পাই না, মনের সঙ্গে মস্তিষ্কের

সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইলেও তেমনি মস্তিষ্কে দেখা বা শোনার কেন্দ্রে প্রতিক্রিয়া ঘটা সত্ত্বেও আমরা উহা দেখিতে বা শুনিতে পাই না। গভীরভাবে কোন কিছু চিন্তা করিবার সময় সম্মুখ দিয়া কেহ চলিয়া গেলেও আমাদের তাহাকে না দেখার, বা কোন আলোচনাকালে অন্যমনস্ক হওয়ায় তাহা না শুনিতে পাওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে বিরল নহে। মস্তিষ্ক-কেন্দ্রগুলির সহিত মনের যোগাযোগকারী শক্তির উপর যাঁহাদের পূর্ণ আধিপত্য আসে, তাঁহারা ইচ্ছামত কেবল একটিমাত্র কেন্দ্রের সহিত মনকে যতক্ষণ খুশি সংযুক্ত রাখিতে পারেন, আবার ইচ্ছামত সব মস্তিষ্ককেন্দ্র হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্তও রাখিতে পারেন। জার্মানীতে দার্শনিক পল ডয়সনের গৃহে অবস্থানকালে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন সদ্যপ্রকাশিত একখানি পুস্তক পড়িতেছিলেন। ডয়সন সেই সময় ঘরে ঢুকিয়া কোন প্রয়োজনে স্বামীজীকে ডাকিলেন। কয়েকবার ডাকিয়াও কোন সাড়া না পাইয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন। একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন—এত ডাকিলাম, স্বামীজী কোন উত্তর দিলেন না! কিছুক্ষণ পরে আবার আসিয়া দেখেন স্বামীজী বইটি রাখিয়া দিয়াছেন। তখন বলিলেন, 'আপনাকে একটু আগে এত ডাকিলাম, কোন উত্তরই দিলেন না!' স্বামীজী বলিলেন, 'কিছু মনে করিবেন না, আমি মনোযোগসহকারে বইটি পড়িতেছিলাম, তাই শুনিতে পাই নাই।' কথাটি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া ডয়সনের মনে হইল না; কী এমন মনোযোগ যে কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিলেও মানুষ শুনিতে পাইবে না! কিন্তু পরে স্বামীজীর কথামত সেই বইটির বিভিন্ন স্থান হইতে প্রশ্ন করিয়া ডয়সন যখন বুঝিলেন যে, স্বামীজী সত্যই অবিশ্বাস্য মনোযোগসহায়ে অতি অল্পসময়ে বইটি পড়িয়াছেন, এবং সত্যই তাঁহার কথা স্বামীজী শুনিতে পান নাই, তখন অবাক-বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'স্বামীজী, ইহা সম্ভব হয় কিভাবে?' স্বামীজী উত্তর দিয়াছিলেন, 'ইহা ভারতীয় একাগ্রতা।'

শক্তিবর্ধনের উপায়—সংযম

বাহিরের বিষয়বোধকালে যেমন প্রাথমিক ধাপ হিসাবে আমাদের দেহে বাহির হইতে শক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন, ভিতরের প্রতিক্রিয়াকালে তেমনি দৈহিক ও মানসিক উভয় শক্তিই ক্রিয়াশীল হয়। ইচ্ছাশক্তিকে বাড়াইয়া এই উভয় শক্তিকেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়; আবার মনে প্রচ্ছন্ন শক্তির দ্বারও উদ্ঘাটিত করা যায়। মনে যে শক্তি প্রকাশিত অবস্থায় থাকে, তাহা অপেক্ষা বহু বহু গুণ অধিক শক্তি বিপুল শক্তি থাকে তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে।

দৈহিক ও মানসিক এই উভয়বিধ শক্তির অপচয় যদি রোধ করা যায়, তবে সে শক্তি ভিতরে সঞ্চিত হইয়া দেহ ও মনকে বলবত্তর করিয়া তোলে। ইহাতে ইচ্ছাশক্তি এবং তাহার ফলে আত্মবিশ্বাসও বাড়িয়া যাওয়ায় মানুষহিসাবে তাহার বিকাশ অধিকতর মহিমামণ্ডিত হয়। শক্তির সর্ববিধ অপচয় রোধ করিয়া যাঁহারা উহাকে কেবল সুচিন্তিত বাঞ্ছিত কর্মে প্রয়োগ করিতে পারেন, তাঁহারাই বিপুল শক্তির আধার হইয়া উঠেন, অনন্যসাধারণ কর্ম করিতে পারেন।

একটি শক্তি আর একটি শক্তিতে রূপান্তরিত হয় ইহা যেমন জড়জগতের একটি সত্য, সূক্ষ্মতর মানসজগতেরও তাই। দৈহিক-ও মানসিক-অপচয়রোধ-জনিত শক্তি উচ্চতর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, ইহা শক্তির পূজারীরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; আমরাও প্রতিদিনের জীবনে ইহা সহজেই প্রত্যক্ষ করিতে পারি। যেমন আমাদের

জীবনের একটি প্রচণ্ড শক্তি যৌনশক্তির সংযম প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, কায়-মনোবাক্যে এই শক্তির অপচয় রোধ করিতে পারিলে উহাতে স্নায়ু ও মস্তিষ্কের শক্তিই যে শুধু বর্ধিত হয় তাহা নহে, উহাতে মনোবলও বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া যায় এবং এই শক্তি উচ্চতর শক্তিতে, ওজঃশক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া মস্তিষ্কে সঞ্চিত হইতে থাকে। মানবমনের উপর প্রচণ্ড ও স্থায়ী প্রভাববিস্তারকারী বিপুল ব্যক্তিত্বের মূল উৎস এই ওজঃশক্তি।

তাছাড়া মন প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থগুলিকে এবং আরো সূক্ষ্মতর সত্তাকে প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি-অর্জনেরও পথ এই সংযম।

চিন্তা, কথোপকথন প্রভৃতি সর্ববিধ কর্মেই আমরা প্রতিনিয়ত শক্তি ব্যয় করিতেছি, কারণ শক্তি ছাড়া কোন কর্মই হয় না। শক্তির অনাবশ্যক প্রয়োগগুলিকে আমরা যত কমাইয়া আনিতে পারিব, দেহমনে শক্তিমান হইব তত বেশী; অধ্যয়ন, গবেষণা, শিল্প, জনসেবা, রাজনীতি প্রভৃতি যে-কোন বাঞ্ছিত কর্মে প্রয়োজনানুরূপ প্রয়োগ করিবার মতো উন্নত ধরনের শক্তি আমাদের ভাণ্ডারে তত অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইতে থাকিবে, প্রচ্ছন্ন শক্তির দ্বারও ক্রমশঃ অধিকতর উন্মুক্ত হইতে থাকিবে।

শিক্ষায় সংযমের স্থান

সংযম-অভ্যাস তাই জীবনকে উন্নততর করিবার রাজপথ। জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়োজনে দৈহিক, বৌদ্ধিক ও মানসিক শক্তিবর্ধন করিবার কালে—শিক্ষাকালে—সর্ববিষয়ে সংযম-অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা তাই খুবই বেশী। প্রাচীন ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ইহা অচ্ছেদ্য ছিল; শিক্ষায়তনের পরিবেশ, শিক্ষক, চিন্তা-পরিবেশন—সবই ইহার অনুকূল করিয়া করা হইত।

আধুনিককালে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাধিক অবহেলিত হইতেছে এই দিকটি। আধ্যাত্মিকতার কথা, মন নামক মস্তিষ্ককেন্দ্র-অতিরিক্ত কোন সত্তার অস্তিত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও, জড়বাদীর দৃষ্টি লইয়াই প্রাত্যহিক জীবনে আমরা চেষ্টা করিলে সকলেই অনুভব করিতে পারি যে, চিন্তা বাক্য ও কর্মে সংযম-অভ্যাসের ফলে মন-বুদ্ধি সবই সবলতর হয়, ইচ্ছাশক্তি ও মানসিক স্থৈর্য বাড়িয়া যায়; তখন ফলাফল চিন্তা না করিয়াই উচ্ছ্বাসের ক্রীতদাস হইয়া জীবনপথে চলিবার প্রয়োজন হয় না—বেগবান অশ্বের পৃষ্ঠে বসিয়া সে নিজ ইচ্ছায় যেদিকে চলে অসহায়ভাবে সেদিকে চলার প্রয়োজন হয় না, লাগাম টানিয়া তাহাকে রুখিয়া নিজের বাঞ্ছিত পথে ফিরাইয়া তাহাকে নিজের ইচ্ছামত চালানো যায়। সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টি এত অস্বচ্ছ থাকে যে ঘোড়ার বশে চলাকেই, উচ্ছ্বাস হুজুক ও রিপুর বশে চলাকেই আমরা ব্যক্তি-স্বাধীনতার পথে চলা ভাবি, বীরত্বের, শক্তির পরিচায়ক বলিয়া ভাবি। কিন্তু আসলে ইহা দুর্বলতারই পরিচায়ক। মহাভারতে দেবযানীর উপাখ্যানে শুক্রাচার্য স্পষ্টাক্ষরে ইহা বলিয়াছেন। দেবযানী শুক্রাচার্যের কন্যা। শুক্রাচার্যের অসুর-গৃহে বাসকালে একদিন দেবযানীর সহিত তাঁহার সমবয়স্কা অসুররাজকন্যার বচসা বাধে। ক্রমে উহা ভীষণ গালাগালি ও হাতাহাতিতে পরিণত হয় এবং অসুররাজকন্যা দেবযানীকে ধরিয়া তুলিয়া একটি কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া যান। দৈবক্রমে রাজা যযাতি দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করেন। কিন্তু অসুররাজকন্যার অন্যায় আচরণে দারুণ অপমানে দেবযানীর হৃদয় ক্রোধে ও দুঃখে জ্বলিতে থাকায় তিনি বাড়ী না ফিরিয়া সেখানেই বসিয়া থাকেন। সন্ধ্যায় সংবাদ

পাইয়া শুক্রাচার্য সেখানে আসিয়া সব শুনিলেন এবং কন্যার ক্রোধ ও প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির প্রাবল্য লক্ষ্য করিয়া এই কথাই প্রথমে বলিলেন, "মা, যে ঘোড়াকে থামাইতে না পারিয়া তাহার বশে চলে, তাহাকে শক্তিমান বলিবে, না যে ঘোড়াকে সংযত রাখিবার শক্তি রাখে, তাহাকেই যথার্থ শক্তিমান বলিবে? যে কামক্রোধাদির বশে চলে সে তো দুর্বল; যে সেগুলিকে সংযত রাখিতে পারে সেই-ই বীর।" দেবযানী সে-কথা গ্রাহ্য করেন নাই; শুক্রাচার্যের কন্যা হইলেও শুক্রাচার্যের সহিত তাঁহার ব্যক্তিত্বের বিপুল ব্যবধান এইখানেই। অন্যায়ের প্রতিকার যাহার কর্তব্য, তাহাকে তাহা করিতেই হইবে। কিন্তু শক্তির পরিচয় কোন উচ্ছ্বাস-চালিত কর্মের মধ্যে নয়, ধীরস্থির মনে কৃত সুচিন্তিত কর্মের মধ্যে। যৌবনে, ছাত্রজীবনে বিপুল শক্তির বিকাশ স্বাভাবিকভাবেই ঘটিতে থাকে। সাময়িক উচ্ছ্বাসের প্রেরণায় সে শক্তিকে এলোমেলোভাবে ব্যয়িত করিয়া, শক্তির বিকাশের পথের সন্ধানও না পাইয়া কর্মজীবনে প্রবেশের সময়, যখন শক্তির বিশেষ প্রয়োজন, যদি নিঃশেষিতপ্রায় শক্তির ভাণ্ডার লইয়া এবং হয়ত যথাযথভাবে বিদ্যাভ্যাসও না করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে তাহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য, কর্তব্যের অবহেলা কি আর হইতে পারে?

বহু পথ দিয়া বহুভাবে আজ ছাত্রজীবনে চিন্তা- ও কর্ম-শক্তি এলোমেলোভাবে ব্যয়িত হইতেছে; যথাযথরূপে জীবনগঠনপূর্বক সে শক্তিকে সঞ্চয় করিয়া প্রয়োজনের সময় কাজে লাগাইতে পারিলে ব্যক্তিগত ও জাতিগত অশেষ কল্যাণ সাধিত হইত। সেই পথগুলি সবই রোধ করা অবিলম্বে প্রয়োজন। ইঞ্জিনের বয়লারে এক বা একাধিক ছিদ্র থাকিলে সেখানে বাষ্প প্রস্তুত হইলেও সঞ্চিত হইতে পারে না, সুনিয়ন্ত্রিত পথে উহাকে প্রয়োগ করাও যায় না। কিন্তু করিতে পারিলেই যে লাভ, তাহাতে দ্বিমত নাই। আধুনিক সিনেমা, গল্পসাহিত্য, রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ—সবই যুবমনের শক্তির অপচয়ের এক একটি ছিদ্রপথ। নীতির নবমূল্যায়ন নামধেয় জড়বাদ-ভিত্তিক চিন্তাধারা নূতন ছিদ্রপথও প্রস্তুত করিতেছে। আমাদের জীবনপরিকল্পনা যাহাই হউক, সমাজ- ও রাষ্ট্র-সৌধের স্তম্ভরূপ ব্যক্তি-জীবনকে কেবল শারীরিক ও বৌদ্ধিক নয়, উন্নত মানসিক শক্তিতেও শক্তিমান করিয়া তুলিতে পারিলে সে সৌধটি দৃঢ়তর ও দীর্ঘস্থায়ী হইবে। আমরা যেন না ভুলি, এই স্তম্ভরূপ জীবনগুলিরও ভিত্তি হইল ব্যক্তি-চিন্তা, ব্যক্তি-মন—সৌধের নিরাপত্তার জন্য যাহা শক্তিমান, স্থির হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তিমন দুর্বল ও অশান্ত হইলে, ভিত্তি অশক্ত হইলে বা নড়িয়া উঠিলে সুনির্মিত সুসজ্জিত সমাজ-বা রাষ্ট্র-সৌধও যে কোন মুহূর্তে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

সংযম অভ্যাস ব্যক্তিকে, তাহার দেহ মন বুদ্ধি সব কিছুকেই অধিকতর সবল করে বলিয়া, শক্তির নূতন উৎসেরও সন্ধান দেয় বলিয়া ব্যক্তি এবং জাতি উভয়েরই কল্যাণের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার স্থান সর্বাগ্রে হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষায়তন, শিক্ষক, শিক্ষা-চিন্তা সবই ইহার অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। সাময়িক উচ্ছ্বাস-চালিত নয়, ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ের সংযত চিন্তা এবং আচরণই শিক্ষায়তনকে পবিত্র রাখে, ছাত্রজীবনকে পবিত্র করে, কৃতবিদ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণের দেবদুর্লভ চরিত্রের অধিকারী হইবার পথও খুলিয়া দেয়।

স্বামী প্রেমানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(স্বামী বিরজানন্দজীকে লিখিত)

RAMAKRISHNA MATH
BELUR P. O., HOWRAH DIST..
23. 6 1914

পরমস্নেহাস্পদেষু—

কালীকৃষ্ণ, বহুকাল তোমায় পত্রাদি লিখি নাই। সেদিন খোকার মুখে তোমার সুস্থতা-সংবাদ পেয়ে আনন্দিত হলাম। আমরা এক সময় অনৈশ্বর্যের লীলাভূমি মধুর শ্রীব্রজধামে কেমন আনন্দে কাটাতাম, মনে পড়ে কি? অনৈশ্বর্যেই পূর্ণ সুখ শান্তি ও আনন্দ। আমাদের প্রভু প্রথম হ'তে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ অনৈশ্বর্যভাবে লীলা ক'রে গিয়েছেন। "ষড়ৈশ্বর্য ত্যাজ্য ক'রে এ-কি ভাব রে কানাই!" পূর্ণ ও ছোকরা ভক্তদের দেখবেন ব'লে বাগবাজারের গলিতে গলিতে ফিরছেন! এমন অনৈশ্বর্যের ভাব জগৎ কি আর দেখবে? যখন আমরা এসে জুটলাম প্রভু বল্লেন, "হ্যাঁরে, এ-কি আমার হ'ল বল্ দেখি, তোদের না দেখলে থাকতে পারি না! তোদের তো একটা ছেঁড়া মাদুর নেই যে বসতে দিবি, এক পয়সার বাতাসা এনে জল খেতে দিবি তার শক্তি নেই। তবু না দেখলে নয়—এ কি বল্ দেখি! আর তোরা বড় মানুষের ছেলে নয় যে মানলে দশ জন মানবে, তবু তোদের না দেখলে থাকতে পারি না। আমার এ কি ভাব?" ঠাকুরের লীলা আগাগোড়া কেবল মাধুর্য, কেবল মাধুর্যময়। একবারও সিদ্ধাই দেখান নাই, 'ষড়্ভুজ' দেখান নাই।

ভাগ্যিস্ বিদ্বান পণ্ডিত হয়ে আসেন নি! নতুবা আমরা কি স্থান পেতুম? কেবল কৃপা, কৃপা, অহেতুকী কৃপা। এমন কি সংসারে আর হয়েছে?

শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রচার জন্য ঐশ্বর্যভাব থাকলেও আমাদের কাছে তিনি কেবল মাধুর্যময় ছিলেন। আহা, কি সুন্দর! এখন কেবল স্মৃতিমাত্র। তোমরা এ লীলার সহায়ক।

কালীকৃষ্ণ চলো, চলো, এগিয়ে চলো। আমাদের পৌঁছাতে হবে প্রভুর কাছে। তুমিই তো বরানগরের মঠে ঠাকুরের অদর্শনের পর প্রথম ত্যাগী ভক্ত। দেখতে দেখতে কত দিন কেটে গেল বল দেখি! তোমার ধ্যানজপ কিরূপ হচ্ছে? পূজা তো ওখানে হবার জো নাই। তবে মানসপূজায় বাধা দেবার সাধ্য কাহারো নাই।

ত্যাগের আদর্শ ভুল হয়ে যাচ্ছে না তো? সাবধান, সাধু—সাবধান, খুব সাবধান! মনে আছে তো—ত্যাগই আমাদের উপায়, আশ্রয়। ত্যাগই আমাদের তন্ত্র, মন্ত্র, বল ঐশ্বর্য, সম্পদ ও

সহায়। ত্যাগই কর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান। সকল অবস্থায় উহাই আমাদের একমাত্র সম্বল। আমার সর্বদা ভয় হয় পাছে নাম-যশের ইচ্ছা এসে পড়ে। তাই কেবল প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি—রক্ষ মাং, ত্রাহি মাম্! আমায় সম্প্রতি ঢাকা ও মালদহ অঞ্চলে যেতে হয়েছিল। কেবল ঠাকুরকে ডাকতাম—প্রভু, লোকমান্য না আসে। উহা এলেই মৃত্যু! উহা হজম করবার শক্তি আমার নাই। দয়াময়, রক্ষা কর। আর কৃপা ক'রে প্রভু নাগ মহাশয়ের আশ্রম দর্শন করিয়ে বাঁচালেন। তুমি উহা দর্শন করেছ নিশ্চয়। আহা, কি শান্তিময় স্থান! আজকাল উহা তীর্থে পরিণত। অনেক ভক্ত নিত্য দর্শন জন্য আসেন। কি লোকই ছিলেন! এমন লোক কি পৃথিবী আর দেখেছে? প্রভুর লীলা অপূর্ব, নাগ মহাশয় এক অপূর্ব! কি ত্যাগ, কি বৈরাগ্য! সব অমানুষী ভাব।

আবার আমাদের mother ঐ Mrs. Savier. ইনিও অপূর্ব ত্যাগের আদর্শ। আর উঁহার ভক্ত পতিও ছিলেন তদনুরূপ। আর আমাদের ব্যাসদেবের গণেশ Goodwin এবং নিবেদিতা কী অসীম ত্যাগের আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন! বলতে কি, কালীকৃষ্ণ, আমি নিত্য এঁদের উদ্দেশে ফুল দি যেদিন পূজা করি; আমি জানি—আমি স্বামীজীর এই সব ভক্তদের দাসানুদাস, গোলামের গোলাম। রাজার জাত হয়ে গোলামদের সেবায় ধন, জন, জীবন অর্পণ। একি অসামান্য অনৈসর্গিক ব্যাপার নয়? এ-যুগে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য ব্যাপার আর কি হ'তে পারে? এই সকল মহাত্মার নিকট হ'তে আদর্শ ত্যাগধর্ম আমাদের শিখতে হবে। আমাদের আছে কি যে ত্যাগ করব? একখানা ভাঙ্গা বাড়ি ছেড়ে তোফা অট্টালিকায় বাস হচ্ছে। উদরান্নের জন্য কোথায় যেতে হ'ত, কত খোসামোদ ক'রে চাকরি করতে হ'ত, বুঝতে পারছ তো? আমাদের কি এ ত্যাগ হচ্ছে, না ভোগ? আসল ত্যাগী হচ্ছেন ঐ ইংরেজ ভক্ত কটি বিশেষ ক'রে।

খোকার মুখে শুনলাম তুমি নিজের জন্য আশ্রম করছ। সত্য, না মিথ্যা? আমার বিশ্বাস হয় না—শ্রীশ্রীমা'র ত্যাগী ছেলে আপনার জন্য আশ্রম করবে। কারণ ঠাকুর কহিতেন, সাপ ও সাধু পরের গর্তে প'ড়ো বাড়িতে থাকে। নিজের জন্য ঘর করতে যেও না—ও মহা নটখটি। কেবল দুঃখ অশান্তি কষ্ট, কালীকৃষ্ণ। ও অসমানে মনে মনে মন্দ নয়। যদি সুখ চাও, আনন্দ চাও, আরাম চাও, ভগবানের শরণ নাও। আমাদের সামান্য যা অভিজ্ঞতা জন্মেছে তাতে বুঝেছি, 'আমি আমার'-জ্ঞান যত দুঃখের অশান্তির আকর। ঠাকুরের উপদেশ পড় নাই—সুখ-শান্তি ভোগে, না ত্যাগে? উপদেশ কাজে দেখাতে হবে তাঁর কৃপায়। ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা'র ভক্তদের আদর্শ ত্যাগী ভক্ত হ'তে হবে। আমরা কি নিজেদের ভোগের জন্য জন্মেছি? আমরা কি চাই দেহ-সুখ? আমাদের আপনার বলতে কী থাকবে পৃথিবীতে? শ্রীশ্রীপ্রভু এসেছিলেন পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ ভক্তি ও ত্যাগের আদর্শ দেখাতে। আমাদেরও এই সব ঐশ্বর্যের পূর্ণ অধিকারী হ'তে হবে। জগৎ তোমার আশ্রম হ'ক। আমার প্রভুর আশ্রম পাঁচ-সাত বিঘা জমির ভিতর হবে? একটা জাতি, কি একটা দেশের মধ্যে হবে? না, না, ছোটখাট স্থানে আমার ঠাকুরের স্থান হবে না। প্রভু আমাদের মহা উদার, অতি বিশাল বিস্তীর্ণ। সংকীর্ণ স্থানে গণ্ডির মধ্যে তিনি কেমন ক'রে

থাকবেন ? 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' করতে হবে। দেখছ না স্বামীজীর লীলাখেলা ? 'নাল্পে সুখমস্তি', হৃদয়টা বিশাল হ'তে অতি বিশাল করতে হবে, তবে আমাদের প্রভুর হবে সেখানে আগমন। যদি আমাদের প্রভু কিছু ঘৃণা ক'রে থাকেন তবে সে একঘেয়ে দলাদলি। ছি! দল কিনা আমরা বাঁধব ? 'ও সে সর্বদলের দলপতি সহস্রদলে স্থিতি,' আমাদের আত্মারাম হ'তে হবে, জীবন্মুক্ত হ'তে হবেই হবে ; নতুবা আমাদের জাতির ও ধর্মের মৃত্যু নিশ্চিত।

বিরলে একান্তে বসে ঠাকুর ও স্বামীজীকে প্রাণভরে ডাকবে। তিনি ঠিক রাস্তায় নিয়ে যাবেন তাঁর আশ্রিত সন্তানকে। অনন্ত কৃপার আধার প্রভু আমাদের।

আমার ইচ্ছা হয় তোমায় দেখতে। এদেশে কি তোমার আসবার সুবিধা এখন হবে না ? চেষ্টা করবে শ্রীশ্রীমা'র চরণদর্শন করতে। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করলে সব মোহ মায়া কেটে যাবে, অবিদ্যা দূর হয়ে যাবে। মনে করো না, কেবল লাল কাপড় পরলেই সাধু হয়ে গেল। সর্বদা অকর্তা হয়ে থাকতে পারলেই সুখ ও শান্তি। আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি অল্প সময়ের জন্যও শ্রীশ্রীমা'র চরণদর্শন ক'রে যাও।

আমার ভালবাসা ও স্নেহাশীর্বাদ জানবে, motherকে আমার নমস্কার ও শ্রদ্ধা জানাবে। ওখানকার সকল ভক্তদের ভালবাসা জানাবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
প্রেমানন্দ

"মার ছেলে তোমরা—ঠিক ঠিক মার ছেলে হ'তে হবে, তবে তো। নৈলে কেবল মাকে দর্শন ক'রে এলুম, কি একটু প্রসাদ খেলুম—এতে কি আর হবে ? 'তদ্ভাবভাবিত'—এ যদি না হ'লে, কি আর তবে হ'ল ?"

—স্বামী প্রেমানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে ঃ ধনী কামারণী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পূর্বাভাষ

'অতি ভাগ্যবতী এই কামারের মেয়ে।
থাকিলে নিতাম তাঁর পদরজঃ গিয়ে॥
প্রভুতে বাৎসল্য বড় আছিল তাঁহার।
কত ভাগ্য এ-সৌভাগ্য ঘটয়ে কাহার॥
ভুবনপাবন যিনি বাঞ্ছাকল্পতরু।
অনাথের নাথ যিনি জগতের গুরু॥
সম্বোধন করিতেন তাঁহারে 'মা' বলি।
এ-অভাগা মাগে হেন জন-পদধূলি॥'—পুঁথি

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদ্যলীলা-বৃত্তান্তে পরম পুণ্যশীলা শ্রীমতী ধনী কামারণীর নাম বহুল কীর্তিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে এই মহীয়সীর আবির্ভাব চিরস্মরণীয়। এই যুগাবতারের বাল্য লীলারঙ্গমঞ্চে যে-সকল মহা-ভাগ্যবতী নারী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছিলেন, শ্রীমতী ধনী কামারণী তাঁদেরই অগ্রগণ্যা। উক্ত রঙ্গমঞ্চে এই মহীয়সীর ভূমিকা অতিশয় ব্যাপক ও বহুমুখী। তিনি ছিলেন শ্রীমান্ গদাধরের 'ধাত্রী' এবং 'ভিক্ষামাতা'। তাঁর লালন-পালনে এবং রক্ষণাবেক্ষণে তিনি বিশেষ সক্রিয় ও সপ্রেম অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ঐ কার্যে তিনি শ্রীমতী চন্দ্রমণিদেবীকেও নানাভাবে সহযোগিতা দান করেছিলেন। চন্দ্রমণিদেবীর একান্ত বিশ্বস্তা বয়স্যা এবং ঘনিষ্ঠা সহচরীরূপেও তিনি সুপ্রসিদ্ধা। এতদ্‌ব্যতীত তিনি তাঁর নিত্য গৃহকর্মাদিরও বিশিষ্টা সহায়িকা ছিলেন।

ইহা সুবিদিত যে, 'ধাই'-মারূপে তিনিই সূতিকাগারে সদ্য-আবির্ভূত পরমপুরুষকে তথা দিব্যশিশু গদাধরকে সর্বাগ্রে দর্শন, স্পর্শন ও তাঁর পরিচর্যাদি করার পরম সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। আবার শুভ উপনয়নকালে নবীন ব্রহ্মচারী দ্বিজ গদাধরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে ভিক্ষা প্রদান ক'রে তিনিই তাঁর 'ভিক্ষামাতা' হয়েছিলেন।

শ্রীমতী ধনী কামারণী শিশু গদাধরের মধ্যে দিব্য বিভূতি এবং ঐশ্বর্যাদির প্রকাশ কি পরিমাণে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সে-সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তাঁকে তিনি স্বীয় হৃদয়ের একান্তই অকৃত্রিম ও স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ-বাৎসল্য-ধারায় নিরন্তর অভিষিক্ত করতেন। পক্ষান্তরে শ্রীমান্ গদাধরও শৈশবাবধি তাঁকে স্বীয় গর্ভধারিণীর অভিন্ন মূর্তিজ্ঞানে সুমধুর 'মা' সম্ভাষণে চরিতার্থ করতেন এবং তাঁর সঙ্গে সর্বদা সেইরূপ মধুর আবদার ও নিঃসঙ্কোচ আচরণ করতেন। সুতরাং এই মহাভাগ্যবতী কামারণীর সৌভাগ্য ও গৌরবের পরিসীমা নির্ধারণ করা একান্তই অসম্ভব।

'কার অবতার তুমি কিছু শুনি নাই।
বৎস-হারা গাভী যেবা বিহনে গদাই॥
কি সাধ্য মহিমা গাই কি আছে শকতি।
এতেক বাৎসল্য যাঁর ঘটে বলবতী॥' - পুঁথি

ধনী মা'র ভিটা

কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাবির্ভাব-পীঠের স্বল্প দূরেই শ্রীমতী ধনী কামারণীর বসতভিটা এখনও বর্তমান। সুখের বিষয়, ঐ স্থানে পুণ্যশ্লোকা কামারণীর পবিত্র স্মৃতি-রক্ষাকল্পে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরও নির্মিত হয়েছে।

ঐ স্মৃতিমন্দিরে ধনী মা'র একখানি কল্পিত তৈলচিত্র দেখা যায়। চিত্রখানির অঙ্কনশৈলী ও ভাবব্যঞ্জনা উভয়ই অতি মনোমুগ্ধকর। অগাধ মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণিতহৃদয়া শ্রীমতী ধনী মা অপার স্নেহ-বাৎসল্যভরে সদ্য-আবির্ভূত পরমপুরুষ গদাধরকে স্বীয় অঙ্কে ধারণ ক'রে একান্ত তদ্‌গতচিত্তে উপবিষ্টা রয়েছেন।—যেন নন্দ-আলয়ে মাতা যশোদার ক্রোড়ে নয়নাভিরাম বালগোপাল। ধনী মা'র দেহখানি শীর্ণ ও আভরণশূন্য। তাঁর বেশ-বিন্যাসে বৈধব্য ও কৃচ্ছ্রতার প্রকাশ। অথচ তাঁর মুখশ্রী ও নয়নযুগলে কমনীয় কান্তি ও অনাবিল প্রশান্তি বিরাজিত। তাঁর স্নেহ-অঙ্কে শায়িত দিব্যশিশুর দীর্ঘকায় সুঠাম দেহখানি নগ্ন, অথচ এক অপরূপ স্বর্গীয় লাবণ্য-সুষমায় ও স্নিগ্ধ মধুর কান্তিচ্ছটায় সমুজ্জ্বল। নন্দরাণী যশোমতী-সমা শ্রীমতী ধনী মা নির্নিমেষ নয়নে একান্ত সমাহিত চিত্তে গদাধরের সুমনোহর মুখকমল-খানি নিরীক্ষণ করছেন। বস্তুতঃ চিত্রটি দর্শক-মাত্রেরই হৃদয়ে অতীতের দিব্যলী[illegible] এক অবিস্মরণীয় মুহূর্তের অমিয় স্মৃ[illegible] তোলে। চিত্রখানি সাধক শিল্পীর অনবদ্য অঙ্কন-নৈপুণ্য ও গভীর মননশীলতার প্রত্যক্ষ পরিচায়ক।

যা হোক, শ্রীমতী ধনী মা'র পুণ্য ভিটা-খানি শ্রীধাম কামারপুকুরের দর্শনীয় বিশিষ্ট স্থানসমূহের অন্যতম। দেশ-দেশান্তর হ'তে প্রতিনিয়ত যে-সকল ভক্ত নর-নারী ও অনুরাগী দর্শকবৃন্দ তথায় আগমন করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই উক্ত স্মৃতিমন্দিরদর্শনে ধন্য হন।

সেখানে উপস্থিত হলে দেখা যায়, সমাগত সাধু-সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব, ভক্ত-দর্শক নির্বিশেষে সকলেই কামারণীর ভিটায় আনত শিরে প্রণাম নিবেদন করছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ঐ স্মৃতিমন্দিরে প্রত্যহ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজার্চনাদি অনুষ্ঠিত হয়।

জীবন-কথা

'মহাভাগাবতী ধরাতলে বিদ্যমান।
বুঝি না জানি না কেবা তোমার সমান॥'—পুথি

শ্রীমতী ধনী মা ছিলেন কামারপুকুরের অধিবাসিনী। তথাকার এক মধ্যবিত্ত কামারকুলে তাঁর জন্ম হয়। এই জন্যই তিনি ধনী 'কামারণী' নামে সমধিক প্রসিদ্ধা। তিনি ছিলেন বালবিধবা এবং নিঃসন্তানা। সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি কামারপুকুরে স্বীয় পিত্রালয়ে বসবাস করতেন কোথায় এবং কার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল—এ-সকল বৃত্তান্ত কিছুই জানা যায় না। তাঁর মাতা-পিতা প্রভৃতির পরিচয়ও অবিদিত। তবে, তাঁর 'শঙ্করী' নাম্নী এক কনিষ্ঠা ভগিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনিও বিশেষ ভক্তিমতী ছিলেন এবং গদাধরকে পুত্রবৎ স্নেহ-আদর করতেন। তিনিও কামারপুকুরের অধিবাসিনী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ কামারপুকুরেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল।

শ্রীমতী ধনী মা সম্ভবতঃ চন্দ্রমণিদেবীর সমবয়স্কা ছিলেন। তিনি উপদেব[illegible] প্রভৃতির উপদ্রব-নিবারণ এবং তজ্জনিত পীড়াদির প্রশমনের মন্ত্র-তন্ত্র ও ঝাড়-ফুক প্রভৃতিও জানতেন। 'ধাই'-এর কার্যে তিনি বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁর দেহখানি ছিল ক্ষীণ ও শীর্ণ, কিন্তু তাঁর কর্মশক্তি ছিল অদম্য ও অনন্যসাধারণ। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে নিজ সংসারের দৈনন্দিন কর্মসকল অল্প সময়ের মধ্যে সম্পাদন ক'রে প্রত্যহ নিজেকে অকাতরে প্রতিবেশিনীদের সংসারের বিবিধ কর্মে নিযুক্তা রাখতেন। তিনি মিষ্টভাষিণী ছিলেন এবং

কখনও কারও সাত-পাঁচ চর্চা করতেন না। তাঁর ন্যায় বুদ্ধিমতী, বিচক্ষণা এবং ধৈর্যশীলা নারীও খুব কম দেখা যায়। তিনি অতিশয় নিষ্ঠাবতী এবং ধর্মপরায়ণা ছিলেন। দেব দ্বিজে তাঁর ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল অগাধ ও অবিচল। এই সকল বিবিধ সদ্‌গুণের জন্য তিনি প্রতিবেশিগণের একান্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন।

চন্দ্রমণির বয়স্যা

পরমভাগবত মহাত্মা শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়ে 'দেরে' গ্রাম হ'তে সপরিবারে কামারপুকুরে আগমন করলে, এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের সঙ্গে অচিরে ধনী মার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। অতঃপর তিনি এই ধর্মপ্রাণ পরিবারের সেবায়ও নিজেকে নানাভাবে নিয়োজিত করেন। তাঁর স্বার্থশূন্য অতন্দ্র কর্মশক্তি ও সরল মধুর ব্যবহার পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ-দম্পতিকে পরম আকৃষ্ট করে। স্বীয় সরল ও নির্মল চরিত্র-মাধুর্যে স্বল্পকাল মধ্যেই তিনি শ্রীমতী চন্দ্রমণিদেবীর একান্ত প্রিয় ও বিশ্বস্তা বয়স্যা হয়ে ওঠেন। অতঃপর তিনি প্রয়োজন অনুসারে তাঁকে বিবিধ বিষয়ে সুপরামর্শ দান এবং তাঁর সংসারের প্রাত্যহিক নানা কার্যে আরও অধিক পরিমাণে সহায়তা করতে থাকেন। এর ফলে, চন্দ্রমণিও তখন হতে তাঁর উপর নানা বিষয়ে একান্ত নির্ভরশীলা হয়ে পড়েন। এইরূপে অল্পকাল মধ্যে তিনি শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামেরও বিশেষ প্রিয়পাত্রী হয়ে ওঠেন। মহাত্মা ক্ষুদিরামকে তিনি দেবতুল্য জ্ঞান করতেন এবং অশেষ মান্য ভক্তি করতেন। ক্ষুদিরামও তাঁকে বিশেষ সম্প্রীতির চক্ষে দেখতেন এবং তাঁকে নিজেদের পরিবারেরই একজন মনে করতেন।

শ্রীমতী চন্দ্রমণি ছিলেন অত্যন্ত পূতস্বভাবা এবং সরলতা ও দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রতিমূর্তি। তিনি সাত-পাঁচ বুঝতেন না এবং স্বীয় অন্তরের কোন কথাই গোপন রাখতে জানতেন না। ভাল-মন্দ সকল কথাই তিনি প্রাতিবেশিনীদের নিকট নিতান্তই অকপটে ব্যক্ত ক'রে ফেলতেন।

শ্রীমতী ধনী কামারণী কিন্তু শ্রীযুক্তা চন্দ্রমণির স্বভাব-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর অকপট কথাবার্তা ও সরল আচার-ব্যবহারের নিগূঢ় মর্ম সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন। এই কারণে তিনি তাঁর নিতান্ত ছেলেমানুষী ব্যবহার ও কথাবার্তার জন্য প্রয়োজনবোধে, কখন কখন তাঁকে মৃদু তিরস্কার এবং তাঁর সঙ্গে কিঞ্চিৎ রঙ্গ-রহস্য করলেও কদাচ তাঁকে রূঢ় উপহাস পরিহাস করতেন না। এই অদ্ভুত পূতস্বভাবা ব্রাহ্মণীকে তিনি সর্বদাই গভীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন। বস্তুতঃ তিনি চন্দ্রমণির বাহির এবং অভ্যন্তর উভয়েরই নিবিড় পরিচয় পেয়েছিলেন। তাঁকে তিনি প্রায়ই সতর্ক ক'রে দিতেন। ঘোর সংসারী লোকেদের সঙ্গে কিরূপ সংযমপূর্ণ আচরণ ও আলাপনাদি করা কর্তব্য, সে-বিষয়েও তাঁকে বিভিন্ন সময়ে নানা উপদেশ-শিক্ষাদি দিতেন।

*

সন ১২৪১ সাল, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম তখন গয়াধামে। একদা রাত্রিকালে চন্দ্রমণি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দর্শন ক'রে অতিশয় ভীতা ও বিস্মিতা হন। তিনি স্বপ্নে দেখেন, এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁর শয্যাধিকার ক'রে তাঁর পার্শ্বে শায়িত রয়েছেন। প্রথমে তাঁর মনে হয়, ঐ পুরুষপ্রবর তাঁর স্বামী। কিন্তু পরক্ষণে তিনি বুঝতে পারেন যে, কোনও মানবের এরূপ জ্যোতির্ময় দেহ হওয়া সম্ভবপর নয়। তখন তিনি নিদারুণ শঙ্কিতা ও বিচলিতা হন। সহসা তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হয়। কিন্তু তাঁর

মানসপটে সেই দৃশ্য তখনও সমভাবে বিরাজিত। অতঃপর তাঁর মনে হয়, "মানুষের নিকট আবার দেবতা আসেন কোন্ কালে?" তখন তিনি ভাবেন, তবে বুঝি কোন দুষ্ট লোক মন্দ অভিসন্ধিতে তাঁর ঘরে ঢুকেছে।—তারই পায়ের শব্দ ও উপস্থিতির জন্য তিনি ঐরূপ আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন।

অন্তরে এইরূপ দুর্ভাবনা উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে বিষম ভয় উপস্থিত হয়। তখন তিনি তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ ক'রে প্রদীপ জ্বালেন এবং দেখেন, ঘরের মধ্যে বহিরাগত কেউ নেই, ঘরের দ্বার যেমন অর্গলবদ্ধ ছিল, তেমনই রয়েছে। তথাপি তিনি চিন্তামুক্ত হ'তে পারেন না। তিনি অতঃপর ভাবেন, তবে বুঝি কেউ বাহির হ'তে কৌশলে দরজার খিল খুলে ঘরে ঢুকেছিল এবং তাঁকে জাগরিতা হ'তে দেখে, তাড়াতাড়ি সে ঘর হ'তে বেরিয়ে গিয়ে আবার কৌশলে খিল লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছে। যা হোক, এইরূপ নানা দুর্ভাবনায় ও বিষম উদ্বেগে সে-রাত্রে তিনি আর নিদ্রা যেতে পারেননি।

সকাল হ'তে না হ'তেই, তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বয়স্যা শ্রীমতী ধনী কামারণী ও প্রসন্নময়ীকে তাড়াতাড়ি ডাকান এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা ও সন্দেহসকল তাঁদের নিকট বিষম শঙ্কাতুরচিত্তে ব্যক্ত করেন। তাঁর মুখে অদ্ভুত কথাসকল শুনে তাঁরা নির্বাক্ হয়ে থাকেন। তখন তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা কি বোঝ বল দেখি, সত্য সত্যই কি আমার ঘরে কেউ ঢুকেছিল? আমার সঙ্গে তো পাড়ার কারও বিরোধ নেই। কেবল সে-দিন মধুযুগীর সঙ্গে সামান্য কথা নিয়ে একটু বচসা হয়েছিল। তা হলে সে-ই কি আড়ি ক'রে ঐভাবে ঘরে ঢুকেছিল?"

তাঁর ছেলেমানুষী কথা শুনে অবশেষে ধনী ও প্রসন্নময়ী হাসতে হাসতে মৃদু তিরস্কারের সুরে তাঁকে বলেন, "বুড়ো হয়ে তুমি পাগল হলে নাকি যে, স্বপ্ন দেখে এইভাবে চলাচ্ছ? অপর কেউ এ-সব কথা শুনলে কি বলবে বল দেখি? তোমার নামে অযথা নিন্দা রটিয়ে দিবে! সাবধান, আর কারও নিকট এ-সব কথা বলবে না।" যা হোক, শ্রীমতী ধনী ও প্রসন্নময়ী তাঁকে এইভাবে মৃদু তিরস্কার ও হিত-পরামর্শ দান করলে তিনি ক্রমশঃ আশ্বস্তা হন এবং ভাবেন, "তা হলে আমি হয়ত স্বপ্নেই ওরূপ দেখেছিলাম।"

*

ঐ সময়ের আর এক দিনের একটি ঘটনা। চন্দ্রমণিদেবী তাঁদের গৃহসন্নিকটস্থ যোগীদের শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী ধনী কামারণী ও প্রসন্নময়ী প্রমুখ বয়স্যাদের সঙ্গে আলাপনাদি করছিলেন। এমন সময় তিনি সহসা দেখেন, ৺মহাদেবের জ্যোতিতে উক্ত মন্দিরের অভ্যন্তর-ভাগ পরিপূর্ণ। পরক্ষণে ঐ জ্যোতিঃপুঞ্জ বায়ুর ন্যায় তরঙ্গাকারে প্রবাহিত হয়ে তাঁর দিকে আসছে। তিনি তখন পরম আশ্চর্যান্বিতা ও ভয়ার্তা হয়ে সেই কথা বয়স্যা ধনীকে বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অচিরে ঐ তুষার-শুভ্র জ্যোতির উদ্বেলিত তরঙ্গরাশি তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে এবং প্রবল বেগে তাঁর উদরে প্রবেশ করে। অতঃপর বিষম ভয়ে ও বিস্ময়ে তিনি স্তম্ভিতা হন এবং তৎক্ষণাৎ বাহ্য-সংজ্ঞা হারিয়ে ভূতলে পতিত হন।

শ্রীমতী ধনী কামারণী তখন সময়োচিত শুশ্রূষাদি দানে তাঁকে ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থা ক'রে তোলেন। অতঃপর তিনি তাঁর ঐ আশ্চর্য দর্শন ও অনুভূতির বৃত্তান্ত ধনীপ্রমুখ উপস্থিত বয়স্যাদের নিকট আদ্যোপান্ত বিবৃত করেন।

ঐ অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ ক'রে শ্রীমতী ধনী প্রথমে পরম বিস্মিতা হন। কিন্তু পরক্ষণে তিনি চন্দ্রাকে বুঝিয়ে বলেন, 'তোমার বায়ুরোগ হয়েছে।'

কিন্তু তদবধি তাঁর সুস্পষ্ট অনুভব হ'তে থাকে, ঐ জ্যোতি যেন তাঁর উদরে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে এবং তাঁর গর্ভসঞ্চারের উপক্রম হয়েছে। তাঁর এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথাও তিনি প্রসঙ্গতঃ ব্যক্ত করেন—'দেখ ধনী, আমার মনে হচ্ছে আমার উদরে কে যেন ঢুকে রয়েছে এবং উদর ভারি ভারি বোধ হচ্ছে।' এই কথা শুনে ধনী ও প্রসন্নময়ী তাঁকে নির্বোধ, পাগল এবং আরও কত কি ব'লে মৃদু তিরস্কার করেন। অতঃপর তাঁরা তাঁকে নানাভাবে বোঝান এবং বলেন যে, মনের ভ্রম হ'তে অথবা বায়ুরোগের ফলে তাঁর ঐরূপ অদ্ভুত অনুভব হচ্ছে। তাঁরা তাঁকে তাঁর ঐসকল অনুভবের কথা অপর কাউকে বলতে বারংবার নিষেধ করেন। কিন্তু এই ঘটনার তিন চার-মাস পরে তাঁরা তাঁর দেহ ও মনের পরিবর্তন দেখে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারেন যে, তিনি সত্য সত্যই গর্ভবতী হয়েছেন।

শ্রীমতী চন্দ্রার বয়স তখন প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর। তথাপি গর্ভধারণের ফলে তাঁর দেহে আশ্চর্য লাবণ্য-সুষমা প্রকাশিত হল। শ্রীমতী ধনীপ্রমুখ বয়স্যাগণ বললেন, এবার গর্ভধারণ ক'রে তিনি অন্যবার অপেক্ষা অনেক বেশী রূপ-লাবণ্যশালিনী হয়েছেন।

লীলাবার্তা

সন ১২৪২ সাল, ফাল্গুন মাস। চন্দ্রমণি-দেবীর প্রসবকাল ক্রমশঃ আসন্নপ্রায় হল। ক্ষুদ্র একচালা ঢেঁকিশালখানি সূতিকাগৃহরূপে নির্ধারিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ব্যবস্থাপনায় ধনী কামারণী রাত্রিকালে চাটুয্যে-কুটিরে উপস্থিত হলেন। তিনি চন্দ্রার সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র ঘরে শয়ন ক'রে রইলেন। রাত্রি-অবসান হ'তে প্রায় অর্ধদণ্ড বাকী আছে, এমন সময় চন্দ্রার প্রসবপীড়া উপস্থিত হল। তখন ধনী তাঁকে সযত্নে ধরাধরি ক'রে ঢেঁকিশালে নিয়ে এলেন। তিনি অনতিবিলম্বে এক পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। ধনী তখন তাড়াতাড়ি নবজাতককে নিরাপদ স্থানে রাখলেন এবং প্রথমে প্রসূতির শুশ্রূষায় নিযুক্তা হলেন। তাঁর সেই কালোপযোগী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসকল তিনি দ্রুত সম্পাদন করলেন। অতঃপর নবজাতককে শুশ্রূষাদান করতে গিয়ে তিনি দেখেন, তাকে যে-স্থানে রাখা হয়েছিল, এখন সে সেখানে নেই —কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে!

'জন্মমাত্র রঙ্গের আরম্ভ হৈল তাঁর।

তাজ্জব অদ্ভুত কথা বিস্ময় ব্যাপার।'—পুঁথি

ধনী মা তখন এক অব্যক্ত আশঙ্কায় ভীষণ বিচলিত হলেন এবং তাড়াতাড়ি প্রদীপের পলতে উঁচু ক'রে ঘরময় শিশুকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। অবশেষে দেখলেন, শিশু ধানসিদ্ধ করার উনানের ভিতরে রয়েছে। রক্ত-ক্লেদময় পিচ্ছিল ভূমিতে হড়কিয়ে গিয়ে সেখানে পড়েছে। অথচ তার কোন সাড়া-শব্দ বা স্পন্দন-ধ্বনি নেই।

যাহোক, বিভূতিভূষিত শিশুকে তিনি অবিলম্বে সেখান হ'তে তুলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন। অতঃপর প্রদীপের আলোতে দেখেন, শিশু অদ্ভুত প্রিয়দর্শন, সুঠাম সুপুষ্ট ও দীর্ঘকায় —'যেন ছয় মাসের ছেলের মতো বড়।' এই নয়নাভিরাম শিশুই গদাধর – অবতারবরিষ্ঠ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব। পরম পুলকিত অঙ্গে ধনী মা এই দেবশিশুকে স্বীয় ক্রোড়ে ধারণপূর্বক নিরীক্ষণ, স্পর্শন ও পরিচর্যাদি ক'রে অপার আহ্লাদিতা হলেন।

শ্রীমতী চন্দ্রা এই অবসরে কতকটা সুস্থ হয়েছেন দেখে, ধনী শিশুকে তাঁর কোলে তুলে দিলেন। অতঃপর তিনি এই নবজাত দেবশিশুর শ্রীমুখকমল দর্শন করার জন্য পরম হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে মহাত্মা ক্ষুদিরামকে আহ্বান করলেন। তখন শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত। ক্ষুদিরাম মহানন্দে তথায় উপনীত হলেন এবং নবজাতককে দর্শন ক'রে বিমোহিত হন। সে-দিন ৬ই ফাল্গুন, শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি, বুধবার—ইংরেজী ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ।

*

শিশু গদাধরের প্রতি অচিরে ধনীর প্রগাঢ় অপত্যস্নেহ জন্মায়। তার নিত্য পরিচর্যাদির ভার তিনি পরম আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করলেন। তাকে তিনি যতই দেখেন, তাঁর নয়নের পিপাসা ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার প্রতি সর্বদাই তিনি অদ্ভুত প্রেমাকর্ষণ অনুভব করিতে থাকেন। এখন হতে চাটুয্যে পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় হয়। গদাধরের লালন-পালনে এবং রক্ষণাবেক্ষণে তিনি চন্দ্রমণিকে একান্তভাবে সাহায্য করতে থাকেন।

*

গদাধরের বয়স তখন দুই-তিন মাস। একদা চন্দ্রাদেবী তাকে তার শয্যায় ঘুম পাড়িয়ে গৃহকর্মে ব্যাপৃতা হন। তার শয্যার অনতিদূরে একটি উনান ছিল—'আগুন না ছিল তায় ছিল মাত্র পাশ।' শিশু বিছানা হতে সরে সেই ছাইপূর্ণ উনানে প্রবেশ করে। 'অর্ধেক উনান মধ্যে অর্ধেক বাহিরে।' গৃহকর্ম সম্পন্ন ক'রে এসে চন্দ্রমণি দেখেন, শিশু তার শয্যায় নেই—উনানের মধ্যে ছাইমাখা হয়ে নীরবে খেলা করছে। তিনি আরও দেখেন, শিশুর দেহ অস্বাভাবিক—আকারে অনেকখানি বড়। ঐরূপ দেখে তিনি নিদারুণ আশঙ্কায় চীৎকার করে ওঠেন এবং ক্রন্দন শুরু করেন। অতঃপর তিনি তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নেন। তার দেহের অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে তিনি অত্যন্ত ভীতা ও বিচলিতা হন এবং শিশুর অমঙ্গল-আশঙ্কায় আরও অধিক ক্রন্দন করিতে থাকেন। তাঁর ক্রন্দনধ্বনি শুনে শ্রীমতী ধনী তৎক্ষণাৎ ছুটে আসেন।

'গরজিয়া কামারিণী বলিল বচন।
মা হইয়া অমঙ্গল কহ কি কারণ॥
দাও দাও ছেলে মোরে গা ঝাড়িয়া দিব।
যদি কিছু হয়ে থাকে মন্তরে মারিব॥'

—পুঁথি

তিনি চন্দ্রাকে প্রবোধ দিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর কোল হ'তে শিশুকে নিজ কোলে গ্রহণ করেন। অতঃপর মন্ত্র পড়ে তিনি তাকে ঝেড়ে দেন। কি আশ্চর্য! সে তক্ষুণি পূর্ববৎ হয়ে গেল। তাকে স্বাভাবিক হ'তে দেখে চন্দ্রাদেবী পরম আশ্বস্তা হলেন।

*

গদাধর ধীরে ধীরে শৈশব-অবস্থা অতিক্রম করল। শ্রীমতী ধনী তার জন্য মিষ্টান্ন, নাড়ু প্রভৃতি সযত্নে প্রস্তুত ক'রে প্রায় প্রত্যহই তাকে উপহার দেন। সে ঐগুলির কতক অংশ প্রিয় সখা গয়াবিষ্ণু প্রভৃতিকে প্রদান না ক'রে কখনও ভোজন করে না।

*

গদাধরকে ধনী নিজপুত্রবৎ দেখেন এবং সেইরূপ স্নেহও করেন। তথাপি তাকে আরও আপন ক'রে কিরূপে পাওয়া যায়, তা নিরন্তর ভাবেন। ক্রমশঃ তাঁর অন্তরে এক অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা জন্মায়—উপনয়নকালে গদাধরকে যদি তিনি ভিক্ষাপ্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন, তাহ'লে তার সঙ্গে তাঁর 'ধর্মসম্বন্ধ' স্থাপিত হবে, তিনি তার 'ভিক্ষামাতা' হবেন।

কিন্তু এ যে তাঁর নিতান্তই দুরাশা। এই ব্রাহ্মণ-পরিবার যে অত্যন্ত নৈষ্ঠিক এবং কুলাচাররক্ষার জন্য সর্বদা সচেতন। চিরাগত কুলপ্রথা লঙ্ঘন ক'রে সে কি তাঁর ভিক্ষা গ্রহণ করবে? এইরূপ সাত-পাঁচ নানা কথা তাঁর মনে উদিত হয়। কিন্তু তবুও তিনি তাঁর ঐকান্তিকী আকাঙ্ক্ষাটি গদাধরের নিকট ব্যক্ত না ক'রে পারলেন না। একদা গোপনে তিনি স্বীয় অভিলাষ তাকে সস্নেহে জানালেন। তাঁর অকৃত্রিম স্নেহে মুগ্ধ হয়ে গদাধর তাঁর ঐ অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য তাঁকে প্রতিশ্রুতি দান করলেন। সত্যনিষ্ঠ বালকের কথায় দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন ক'রে তিনি সাগ্রহে শুভদিনের প্রতীক্ষায় রইলেন এবং ঐ বিহিত অনুষ্ঠানের জন্য নিজ সাধ্যানুসারে অর্থাদি সঞ্চয় করতে লাগলেন।

*

গদাধরের নবম বর্ষ উত্তীর্ণপ্রায় হ'তে চলেছে। এখন তার অগ্রজেরা শুভদিন ধার্য ক'রে তার উপনয়নের বন্দোবস্ত করলেন। সে তখন তাঁদের নিকট ধনী কামারণীর ঐ আকাঙ্ক্ষা এবং ঐ বিষয়ে নিজ অঙ্গীকারের কথা অকপটে নিবেদন করে। তাঁরা সে-বিষয়ে প্রবল আপত্তি জানালেন এবং তাকে নানাভাবে বুঝালেন। সে কিন্তু তার সত্যপালনে কৃতসঙ্কল্প।

'কথন লব না ভিক্ষা অপরের হাতে।
না হয় না হবে পৈতা ক্ষতি নাই তাতে॥
... ...
এত বলি মুখ ভারি ঘরে খিল দিয়া।
রহিলেন গদাধর আবদ্ধ হইয়া॥'—পুঁথি

গদাধর বিষম জেদ ধরল এবং বলল, ধনীমা'র কাছে ভিক্ষা গ্রহণ না করলে তার সত্যভঙ্গ হবে। খেয়ালী বালকের প্রবল জেদে শুভ অনুষ্ঠান পণ্ড হ'তে বসেছে দেখে অগ্রজেরা অগত্যা তাকে ঐ বিষয়ে সম্মতিদান করলেন। অতঃপর গদাধরের শুভ উপনয়নকালে যথাসময়ে শ্রীমতী ধনী কামারণী তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভিক্ষাপ্রদান ক'রে তার 'ভিক্ষামাতা' হলেন।

'মরি কি সৌভাগ্য তব ধনী কামারিণী।
ভিক্ষা দিলে তাঁয় বিশ্বে ভিক্ষা দেন যিনি॥'
—পুঁথি

*

দক্ষিণেশ্বরে পেটের বিষম পীড়ায় পীড়িত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে আগমন করেছেন। তখন তাঁর দিব্যোন্মাদ অবস্থা। তাঁর ভাবের বিরাম নেই—কখন কখন বাহ্যজ্ঞানহারা হয়ে পড়েন। একদিন সমস্ত দিবস ভাবে বিভোর হয়ে রইলেন—একেবারে বেহুঁশ। সারাদিন তাঁর আহারাদি নেই। তাঁর ঐরূপ অবস্থার সংবাদ পেয়ে পল্লীর অনেকেই তাঁকে দেখতে এল এবং সমাগত লোকজনে ক্রমশঃ বাড়ি পূর্ণ হয়ে উঠল। যা হোক, তাঁর জন্য সকলেই বিষম চিন্তান্বিত।

ভিক্ষামাতা ধনী কামারণী তাঁর বিচিত্র ভাবের মর্ম জ্ঞাত ছিলেন এবং ঐসকল আবেশ-নিরাকরণের পদ্ধতিও তাঁর জানা ছিল। তিনি তাঁর ঐ ভাবের লক্ষণাদি নিরীক্ষণ ক'রে অবশেষে সমস্ত রহস্য বুঝতে পারলেন। যা হোক, তিনি তখন উপস্থিত সকলকে সম্বোধন ক'রে বললেন,—'তোমরা আমার গদাইকে কে কি আহার করাতে ইচ্ছা কর, শীঘ্রই নিয়ে এস। আজ এই সুযোগে তোমরা তাকে আহার করিয়ে তোমাদের মনের বাসনা চরিতার্থ করে নাও।'

ধনীর ঐ কথা শুনে যে যার মনের মতো ভোজ্যদ্রব্য আনতে ছুটল এবং কেহ মিষ্টি, কেহ দুধ, কেহ বা ফল এনে হাজির করল। অতঃপর তারা যে যার আনীত দ্রব্য নিজ নিজ হাতে

তাঁকে সস্নেহে ভোজন করান। তিনি প্রচুর দ্রব্য নিঃশেষে ভোজন করলেন। কিন্তু এতেও তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন না। তখন ধনী কামারণী আবার সকলকে সম্বোধন ক'রে বললেন—'এখনও যারা বাকী আছে, তারা সকলেই যে যার মনোমত ভোজ্য নিয়ে এস এবং গদাইকে আহার করিয়ে মনের সাধ মিটিয়ে নাও।'

'যে হও সে হও নাহি ভয় নাহি মানা।
আনিয়ে মিটায়ে লহ মনের বাসনা॥'—পুঁথি

সেখানে একজন ডোম উপস্থিত ছিল। সে ঐরূপ অভয় ও আশ্বাস পেয়ে দ্রুত নিজ কুঁড়ে ঘরে ছুটে গেল এবং গাছ হ'তে একটি সুপক্ক কাঁঠাল ছিঁড়ে মহানন্দে সেটি মাথায় নিয়ে হাজির হন। কি আশ্চর্য ঐ কাঁঠালখানি সম্পূর্ণ ভক্ষণ ক'রে তবে তিনি সেদিন ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হলেন।

'ভাগ্যবতী ভিক্ষামাতা ধনী কামারিণী।
প্রভুর ভাবের মর্ম বুঝিতেন তিনি॥'—পুঁথি

সন্ধ্যামণি

শ্রীকালিদাস রায়

সন্ধ্যা না হতে সন্ধ্যা নেমেছে মোর আঙনে,
তারা-ফুলে ভরা শ্যামল সন্ধ্যামণির বনে
বুঝি কিছু বুঝি ফুলেরা সকলে কি কথা কয়,
কবি আমি, রয় সে ভাষার সাথে সুপরিচয়।
গান ধরে তারা সমস্বরে,
সে গান আমারে উদাস করে।
কয় তারা—'কবি বিদায় নেওয়ার ক্ষণ যে এলো
যা করার আছে কর সত্বর, যা বলার আছে বলিয়া ফেলো।
আমরা আসিনি আলাপ জমাতে তোমার সাথে,
আমরা এসেছি দিন-ফুরানোর গান শোনাতে।
কোন্ সুরে গাই বোঝ তো কবি!
ভৈরবী নয়, দিবাবসানের এ যে পূরবী।
অস্তাচলের কোলেও ফুটেছে সন্ধ্যামণি,
তারা গায় শোনো অসীমে বরণ আমন্ত্রণী।'

স্বামীজীর জীবন—দেবস্য কাব্যম্*

শ্রীঅশোককুমার সরকার

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয় জাগৃতির ইতিহাসে পুণ্যময় এক মহান্ আবির্ভাবেরই নাম। তাঁর জীবন ও বাণী জাতির জীবনে যে নূতন চেতনার উদ্বোধন এবং সঞ্চার সম্ভব করেছিল, তা-ই আজও আমাদের যাত্রাপথের একটি সৌভাগ্যময় পাথেয়। বিস্ময়কর হ'লেও অতি বাস্তব সত্য এই যে, এক সন্ন্যাসীরই বাণী আধুনিক ভারতের প্রকৃত অভীষ্টের সন্ধান জানিয়ে দিয়েছে। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় জাগৃতির অজস্র বৈচিত্র্যের মধ্যেও কোথাও যেন একটি অপূর্ণতা ছিল, একটি রিক্ততা ছিল। সেই রিক্ততা অপসারিত ক'রে ও জাগৃতির রূপটিকে বাঞ্ছিত সৌষ্ঠবে পরিপূর্ণ ক'রে যিনি গ'ড়ে তুলেছিলেন, তাঁকে আধুনিক ভারতের প্রকৃত জাতীয় স্বরূপের সংগঠয়িতা ব'লে মনে করতে পারি। ভারতীয় নবজাগৃতির আগ্রহকে আত্মবিশ্বাসের প্রথম দীক্ষা দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—প্রাচীন উপনিষদের বাণী স্বামী বিবেকানন্দের নবীন কণ্ঠের নির্ঘোষে প্রাণময় হয়ে জাতিকে পরাভবের দীনতা হ'তে মুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াবার এবং নিজের শক্তিকে বিশ্বাস করবার নূতন এক ঐতিহাসিক আহ্বান সত্য ক'রে তুলেছিল। বাহিরের মহত্ত্বকে মনে-প্রাণে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ও বরণ করবার উদাত্ত আবেদন জানিয়েও তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, আপন মহত্ত্বের ঐতিহ্যকেও স্মরণ কর। সেদিনের সাংস্কৃতিক ভারতের চিন্তায় পরাঙ্মুকরণের যে প্রাবল্য মাত্রাছাড়া হয়ে দেখা দেবার উপক্রম করেছিল, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন কর্ম ও বাণী সেই বিভ্রান্তিকে প্রথম সবচেয়ে প্রবল বাধা দিয়ে স্তব্ধ করেছিল। সোনা ফেলে দিয়ে আঁচলে গেরো, এ-হেন ভুলের অভিশাপ থেকে তিনি জাতির চিন্তাকে রক্ষা করেছিলেন।

শুধু আত্মবিশ্বাসের দীক্ষা নয়, তিনি জাতিকে আত্মসম্মানের নূতন এক বোধের দীক্ষাও দিয়েছেন। গরিব ভারত ও দীন ভারতকে তিনি হীন ভারত ব'লে মনে করেননি। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, বাহির-বিশ্বের কাছে ভারতেরও দেবার মতো ঐশ্বর্য আছে। ভারত শুধু গ্রহীতা নয়, দাতাও হ'তে পারে। ভারত যেমন পরদেশের কৃতিত্ব ও মহত্ত্বের জীবন থেকে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করবে, তেমনিই অনেক শিক্ষা প্রদানও করবে।

আমরা জানি, তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির কোন ক্রিয়াকলাপের প্রবর্তক ছিলেন না। কিন্তু রাজনীতি তথা পলিটিক্সের তুলনায় অনেক বেশী মূল্যবান যে সম্পদ, যার নাম জাতির প্রাণশক্তি, তিনি তারই আধার রচনা করেছিলেন। ঈশ্বর-বিশ্বাস, মানবসেবা ও নিষ্কাম কর্মসাধনা, জাতির মর্মজীবনের সংগঠনে প্রশস্ত এক নৈতিক আদর্শের নির্মাণ তিনি চেয়েছিলেন। সেই নির্মাণের বনিয়াদও তিনি স্থাপন করেছিলেন। আজকের জাতীয় জীবনের অবস্থার দিকে দৃকপাত করলে এই সত্যই আবার নূতন ক'রে উপলব্ধি করতে হয় যে, তিনি যে পথ চিনিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, সেই পথই কাম্য পথ।

---

* ১৭.২.৫৮ তারিখে কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব সভায় প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণ।

স্বামীজী ছিলেন ধর্মতত্ত্বের প্রচারক, স্বামীজী ছিলেন সমাজ-সংস্কারক। সবই সত্য। কিন্তু শুধু এই পরিচয়ই তাঁর পূর্ণ পরিচয় নয়। ভারতের অনেক মনীষী ও অনেক সাধক ধর্মতত্ত্বের কথা শুনিয়েছেন। অনেক সমাজ-সংস্কারকও দেখা দিয়েছেন। স্বামীজীর সম্পর্কে বলা যায়, তিনি এ ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ। বৈরাগ্য তাঁকে মানুষের সংসার থেকে দূরে টেনে নিয়ে যায়নি। তিনি মানুষের সেবার মধ্যেই জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণামের আনন্দ সন্ধান করেছেন। "বহুরূপে সম্মুখে তোমার"—মানুষের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরের প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন। তাই বলতে ইচ্ছা করে, স্বামীজীর জীবনও যেন দেবস্য কাব্যম্, দেবতার কাব্য, যার পবিত্র গৌরব কখনও জীর্ণ হয় না, মুছেও যায় না। তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে আজ এ কথা কারও মনে হবে না যে, তিনি নিতান্ত একটি ঐতিহাসিক অতীত। তিনি আমাদের পিছনের কোন যুগের মানুষ নন, তিনি আমাদের সম্মুখের মানুষ। তাঁকে আরও ভাল ক'রে চিনতে ও বুঝতে হবে, আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে। তিনি আমাদের জাতীয় জীবনের চিরকালের প্রয়োজন, তিনি আমাদের ভবিষ্যতের অভিযাত্রারও অগ্রনায়ক।

স্মরণ করতে হয়, সমাজ-সংস্কারক বিবেকানন্দের প্রাণটিও কী বিপুল মমতায় অভিমণ্ডিত ছিল। সমাজের প্রাণে আঘাত ক'রে তিনি কোন সংস্কারসাধন করতে চাননি। জাতির চিন্তা ও আচরণের অনেক ভুলের তিনি কঠোর সমালোচক হয়েও সংস্কার এবং সংশোধনের জন্য তিনি যে হাত প্রসারিত করেছিলেন, সে হাত ছিল জাতিবৎসল এক করুণাকর সেবকের হাত। জাতির সম্মান ছোট হয়, জাতির ধর্মের অপবাদ হয়, এবং সামাজিক সংহতির বিপর্যয় হয়, এমন কোন পদ্ধতিতে তিনি সমাজের সংস্কার চাননি। তিনি জাতির আপন-ঘরের নিতান্ত আপন মানুষটির মতো ভালবাসায়-ভরা মন নিয়ে সামাজিক ভুলের প্রতিকার চেয়েছিলেন। ইনিই ভারতের সেই স্বামী বিবেকানন্দ যিনি ধর্মপ্রবক্তা সন্ন্যাসী হয়েও আধুনিক সমাজবাদের অধিকারসাম্য ও ভোগসাম্যের দাবি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেছিলেন। বেদান্তের মহান প্রবক্তা স্বামীজী; কিন্তু তার জীবনও মূর্ত বেদান্ত। সকল ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধার ঘোষণা যাঁর প্রচারের প্রধান বিষয় ছিল, সেই হিন্দু বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তার ঔদার্যও অতুলনীয় ব'লে মনে করতে হয়। সেদিনের ধর্মপ্রচারের জগতে এমন উদারতার বাণী ঠাকুর-স্বামীজী ছাড়া আর কারও মুখে শুনতে পাওয়া যায়নি। আজও খুব বেশী শুনতে পাওয়া যায় না।

আধুনিক ভারতের শিল্পকলার জাগৃতির ইতিহাসেও স্বামীজীর চিন্তা ও প্রতিভার দান সামান্য নয়। শিষ্যা নিবেদিতা তাঁর গুরু বিবেকানন্দের শিক্ষার প্রেরণাতেই ভারতীয় শিল্পকলার মহত্ত্বের পরিচয় উপলব্ধি করেছিলেন। ভারতীয় মূর্তিকলা ও স্থাপত্যের বিষয়ে স্বামীজীর চিন্তা ভারতের সাংস্কৃতিক নবোন্মেষের আশা সফল ক'রে তুলতে সাহায্য করেছে। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারতীয় সঙ্গীতের মর্মজ্ঞ ব্যাখ্যাতা। তাঁর উপদেশ ও তাঁর পত্রাবলী যেন ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের সার্বিক অভ্যুদয়ের নির্দেশ। পরিচ্ছদ ভাষা খাদ্য- ছোট-বড় সকল বিষয়ে এই সন্ন্যাসীর চিন্তা যেন স্নেহশীল এক প্রতিপালকের সদাজাগ্রত আগ্রহের মঞ্জুষা। তাঁর স্বপ্ন, তাঁর সেবক-প্রাণের ভালবাসা যেন তাঁর দেশের মানুষের জীবনকে সব দিকে সুন্দর ক'রে ও শক্তি দিয়ে গ'ড়ে তুলতে চেয়েছে। সাহিত্যের

সমালোচকও আজ বিস্মিত হয়ে স্বীকার করেছেন, বাংলাভাষার গদ্যে স্বামীজীও বিশেষ একটি প্রাণবন্ত ভঙ্গীর প্রবর্তক। তাঁর বাংলা পত্রাবলী তাঁর সেই কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে।

শ্রীজওহরলাল নেহরু তাঁর 'ভারত-আবিষ্কার' গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দকে ভারতীয় জাতীয়তার প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন। বলা বাহুল্য, এই উক্তিতে ঐতিহাসিক সত্যটিই স্বীকৃত হয়েছে। স্বামীজীর জীবন ও বাণীর অফুরান মহিমা স্মরণ ক'রে আজ আমরা এই প্রার্থনাই করতে পারি, যে ঐতিহাসিক সত্যটি স্বীকৃত হয়েছে, তার যেন কোন বিকৃতি না হয়। রাষ্ট্র, জাতি ও সমাজ, কারও পক্ষে আজ এই বিশ্বাসে প্রসন্ন হওয়া উচিত নয় যে, স্বামীজীকে শুধু একটি স্বীকৃতি দেওয়াই কর্তব্যের ও কৃতজ্ঞতার যথেষ্ট। আমাদের জাতীয় জীবনের সহস্র কাজের ভিতর দিয়েই স্বামীজীর প্রচারিত আদর্শের রূপায়ণ চাই। তাই হবে স্বামীজীর মহত্বের প্রকৃত স্বীকৃতি।

আকাঙ্ক্ষা

শ্রীশান্তশীল দাশ

সহজ জীবন চাই, সুন্দর জীবন,
দৃষ্টি ঊর্ধ্বপানে আর স্বপ্নে তুষ্ট মন ;
অন্তরে কল্যাণব্রত, বৈরীভাব নয়
কারো'পরে, শুভবোধে বিধৃত হৃদয়।
চারিধারে হাসিমুখ, কর্মযজ্ঞরত
জীবনের প্রতিক্ষণ, শ্রদ্ধায় আনত
চিত্ত সদা, মহতের অনুগামী হয়ে
সম্মুখের পথে গতি সর্বজনে লয়ে।

দুর্বল অক্ষম যারা বঞ্চিত না হয়,
বিপুলা এ ধরণীতে সবার আশ্রয়
রয়েছে যে। মিলে-মিশে সব একসাথে,
কিছু সুখ, কিছু দুঃখ, হর্ষ-বেদনাতে
সমপ্রাণ হয়ে সব গড়ুক জীবন—
মৃত্তিকায় বাস, চিত্ত ঊর্ধ্বে বিচরণ।

দুর্গা-লক্ষ্মী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

এস মরণশৃঙ্খল চূর্ণ করি' মা, গরলমোচন শিহরণে।
এস জীবনোচ্ছল মধুচ্ছন্দে স্বর্গবাঞ্ছিত বিকশনে।
তব জ্যোতি গুণ্ঠিত জলদে,
ডাকে বিশ্ব: "বরদে! বল দে!"
এস দনুজ-দলনী! বহ্নিবরণী! চক্রশূল-প্রভঞ্জনে।
এস মা ভবানী! রমারাণী! বৈজয়ন্তী স্যন্দনে॥

কাঁদে দৈববাণী সাধনা যত, বঞ্চিতা নভতৃষ্ণা,
দিশা- দীপনে কর' উজল আশা, বিদলি' মায়া কৃষ্ণা।
কর' মোহবন্ধন ছিন্ন,
মর- ক্লৈব্যকারা দীর্ণ,
এস পৌর্ণমাসী প্রভা-রাশির অনিন্দ্য হাসির ঝলকনে।
এস মা ভবানী! রমারাণী! বৈজয়ন্তী স্যন্দনে॥

নব নব প্রভাতী গাহিলে কতবার দুখনিশি-বিজয়ে!
কত- বার বিপদে তারিলে তব প্রেমচাহনি-অভয়ে!
করে নিয়তি নিঠুর পরীক্ষা,
দাও শরণসুন্দর দীক্ষা,
এস কান্তিময়ী! চির শান্তিনিঝরে আর্ত অবনির ক্রন্দনে।
এস মা ভবানী! রমারাণী! বৈজয়ন্তী স্যন্দনে॥

এস লক্ষ্মী! আলো জ্বালি', কালো নাশি' তব বরদানে।
কোরো ক্ষমা, যদি না স্ফুরে কণ্ঠে ভক্তি মা স্তবগানে।
চাই বাসিতে তো ভালো,
শুধু প্রাণ ম্লান নিরালো,
বিনা কৃপা তব কে প্রণতি সাধে পূর্ণ আত্মসমর্পণে?
এস মা ভবানী! রমারাণী! বৈজয়ন্তী স্যন্দনে॥

নিবেদিতার সমাজ-চিন্তা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

আধুনিক কাল : বিশ্ব-সংহতির যুগ

নিবেদিতার মতে আমরা এখন যে-যুগের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি এক নূতনতর পরিণতির দিকে তা হল এক বিশ্ব-সংহতির যুগ। এমন একটি সময় ছিল যখন হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা আচার-ব্যবহার ও দিন-চর্যার রীতিতে শিল্পকলারসের উপভোগ-পদ্ধতিতে, এমন কি রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ছিল সম্পূর্ণ পৃথক জনগোষ্ঠী। কিন্তু আজ এঁদের মধ্যে যাঁরা আধুনিক মনোভাবসম্পন্ন তাঁরা এ সকল বিষয়ে প্রায় একই দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন। এখন যা কিছু পার্থক্য বর্তমান তা ধর্মীয় মত ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ। পৃথিবীর বিভিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় সেজন্য ক্রমশঃ এক-মানসিকতা-প্রাপ্ত ঐক্যবদ্ধ মানবসমাজের রূপ ধারণ করছে। এর ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষী, ধর্মসম্প্রদায়বিশিষ্ট জাতি বা নেশনগুলির মধ্যে জাতীয় সংহতি ক্রমশঃ বর্ধিত হচ্ছে।

কিন্তু শুধু জাতীয় সংহতির মাত্র নয়, এ যুগ বিশ্ব-সংহতির যুগ, আন্তর্জাতিকতার যুগ। আজ ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশের দিকে তাকালেই দেখা যায় জনজীবনযাত্রা ক্রমশঃ একই ধরন প্রাপ্ত হচ্ছে, কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সর্বত্র প্রকট হয়ে উঠছে যার চরম পরিণতি পরিলক্ষিত হচ্ছে আমেরিকার ক্ষেত্রে। এই সকল দেশের ক্ষেত্রে জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে তত প্রভাবশালী মনে হয় না, যত প্রভাবশালী মনে হয় সাধারণ আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে। এ বিষয়ে নিবেদিতার দূরদৃষ্টি কতদূর প্রসারিত ছিল তা আজ আমরা সুস্পষ্ট অনুভব করছি। তখনও এশিয়া-ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে জাতিগত বৈশিষ্ট্যেরই প্রাধান্য ছিল। আজ কিন্তু সারা এশিয়ায়, এমন কি ভারতেও এই আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যের ছাপ—বেশে বাসে আচার-আচরণ প্রভৃতিতে বেশ প্রকট। এই সাধারণ আন্তর্জাতিক বেশ বাস বা দিনচর্যার ধরন রুচি-সম্মত কিনা সে প্রশ্ন এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এ যুগে রুচিবিষয়ে ঐক্যই এখানে আমাদের পরিলক্ষণীয়। এটা রুচিহীনতার ঐক্যও হতে পারে। কিন্তু রুচি-অভ্যাস, দিন-চর্যার বিষয়ে যে এক সাধারণ মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী সর্বত্র পরিস্ফুট তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

নিবেদিতা শুধু এই যুগলক্ষণ লক্ষ্য ক'রেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর অনুপম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানী দৃষ্টি প্রয়োগ করেছেন এই বৈশিষ্ট্যের কার্যকারণ-নির্ধারণকল্পে।[১] তাঁর মতে উপরি উক্ত আন্তর্জাতিক-মানসিকতা উদ্ভবের মূল কারণ যোগাযোগ-ব্যবস্থার এ যুগে অভূতপূর্ব উন্নতি। বর্তমান যুগে যোগাযোগ-ব্যবস্থার এই উন্নতি সারা পৃথিবীকে এক ক'রে দিয়েছে। সমগ্র পৃথিবী এখন আর কতগুলি খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের সমষ্টিমাত্র নয়, সমগ্র পৃথিবী এখন এক অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড। আমরা এখন প্রায় বিদ্যুৎ-গতিতে পৃথিবীর একস্থান হতে অপর স্থানে যাতায়াত করতে পারি। এর ফলে প্রত্যেক জাতির একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সকল সময়

---

১ Civic And National Ideals—P. 23-33

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে গতায়াত ক'রে থাকে। এদের সঙ্গে একটি জাতির মোট জনসংখ্যার তুলনায় বেশী না হতে পারে, কিন্তু আগেকার যুগের বহির্দেশ-পর্যটনকারীদের সংখ্যার অনুপাতে বিপুল পরিমাণে যে বেশী তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন এক ব্যক্তির জন্ম একদেশে হতে পারে, তার কর্মক্ষেত্র পৃথিবীর অপর এক বা একাধিক দেশে অবস্থিত হতে পারে। এর ফলে নানা দেশ, জাতির বিচিত্র চিন্তাধারার প্রত্যেক জাতির মানস-ক্ষেত্রে প্রবলবেগে প্রবেশ ঘটছে। এর ফলশ্রুতিতে এ যুগ সকল দেশের, সকল জাতির সকল বিচিত্র মানুষকে গোষ্ঠীগত, স্থানগত এবং জাতিগত চেতনার ঊর্ধ্বে এক সাধারণ বিশ্বচেতনায় স্থাপিত করেছে।

যাতায়াতের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত অভূতপূর্ব উন্নতি সম্ভব হয়েছে যন্ত্রের উন্নতি-সাধন-মাধ্যমে। এযুগে অসাধারণ যান্ত্রিক উন্নতি ঘটেছে। টেকনোলজীর (Technology) উন্নতির ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় যুগ আর নেই। কিন্তু নিবেদিতার মতে এর ফলে সর্বথা শুভ হয়নি। কারণ যান্ত্রিকতার এই অসাধারণ উন্নতি এ যুগের মানসিকতায়ও যান্ত্রিকতার প্রাধান্য ঘটিয়েছে। এই যান্ত্রিকতা আজ আমাদের চিন্তা-চেষ্টা-আয়াস সবকিছুর মধ্যে অনুস্যূত হয়ে মৌলিকতাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করতে বসেছে। স্বাধীন-চিন্তা, কর্মে স্বকীয়তা, ব্যক্তিত্বে স্বাতন্ত্র্য ক্রমশই লোপ পাচ্ছে। সকল প্রকার চিন্তার ক্ষেত্রে এক যান্ত্রিক ঐক্য মননশীলতাকে আজ ধ্বংস করতে বসেছে। কর্মের ক্ষেত্রেও আজ যান্ত্রিক দক্ষতাই প্রধান হয়ে উঠেছে, স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত। ফলে মানুষের আর স্বাধীন স্বতন্ত্র স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতায় অনন্য ব্যক্তি-সত্তা থাকছে না, সে ক্রমশঃ একটি যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে। এ যুগে মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা হয়ত মিলেছে, অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও তার করায়ত্ত, কিন্তু মানুষের ভাবনৈতিক স্বাধীনতা বা মনের স্বাধীনতা আজ নিদারুণভাবে সঙ্কুচিত ও বিপর্যস্ত।

সেজন্য এ যুগ ঠিক ততটা দুর্নীতির যুগ নয় যতটা এ যুগ হল নীতিহীনতার যুগ। নিবেদিতার নিজের ভাষায় "In constitution and effort it (modern epoch) is not so much immoral as unmoral." গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কথা। যন্ত্রের কোন নীতির প্রয়োজন নেই, যন্ত্র বিবেক-প্রসূত-নীতিবশ নয়, যন্ত্র পরবশ। মানুষ ক্রমশঃ যন্ত্র হয়ে ওঠায় সেও আর নীতিবশ নয়, সে পরবশ। বিবেক বা প্রজ্ঞা তার চালক নয়। এ যুগের মানুষের নীতিহীনতা অথবা নীতিবিষয়ে উদাসীনতা এখন অধিকতর প্রকট। আমরা সুস্পষ্ট দেখছি দুর্নীতির চেয়ে এটা কম ক্ষতিকর নয়। নীতি ও সামাজিক বিধি-শৃঙ্খলা মানুষের সুস্থ সুন্দর জীবনযাত্রার নিয়ামক। তার অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিকে বিকাশলাভ করতে এগুলি বিশেষ সহায়তা করে। এ যুগে তাই নূতন সৃষ্টির পরিমাণ অপরাপর যুগের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। সাহিত্য-শিল্প-দর্শন-চিন্তার ক্ষেত্রে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সেজন্য যে অর্থে পূর্ববর্তী যুগগুলিকে সৃজনশীলতার যুগ বলা হয়, সে অর্থে বর্তমান যুগ সৃজনশীলতার যুগ নয়। সেজন্য এ যুগের উপজীব্য তার নিজ-সৃষ্টি নয়, অতীতের সৃষ্টির উপর সে বেঁচে আছে ("It does not produce, it avails itself of the production of the past".)। সুতরাং এ যুগকে আমরা সকল ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে যতটা নূতন মনে ক'রে ভাবাবেগে গদ্‌গদ হই, এ যুগ আসলে ততটা অচিন্ত্যনীয়রূপে নূতন নয়। সাধারণ

ভাবে মানস-শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে, ভাবজগতে এ যুগ এক অনুর্বর চর্বিত-চর্বণের যুগ—এ সত্য স্বীকার না ক'রে উপায় নেই।

তাই ব'লে এ যুগের কোন দিকে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, এ যুগে মানুষের বড় কোন কিছু প্রাপ্তি ঘটেনি—এমন কথাও বলা চলে না। নিবেদিতার মতে এ যুগের নূতন সংপ্রাপ্তিও কিছু কম নয়, তুচ্ছ নয়, সামান্য নয়। নিবেদিতার মতে এ যুগের সর্বাপেক্ষা বড় সংপ্রাপ্তি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি এবং সর্বত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধরণ সংঘবদ্ধতা এসেছে, যার ফলে জ্ঞানবিস্তার সহজ হয়েছে। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে শুধু যে যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও পরিভ্রমণ-ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে তাই নয়, দৈনন্দিন সংবাদ-সরবরাহের ক্ষেত্রেও সংঘটিত হয়েছে এক অসাধারণ সংঘবদ্ধতা ও উন্নতি। আজ পৃথিবীর এক প্রান্তের সংবাদ মুহূর্তমধ্যে অপর প্রান্তে পৌছে যেতে পারছে। তারই ফলে একপ্রকার বিপুল মানস-মুক্তি সম্ভব হয়েছে সর্বসাধারণের পক্ষে। জ্ঞানের প্রসারের জন্যই যে পৌরোহিত্য-শক্তির কবলে পড়ে এতকাল বিরাট জনসমাজ অকথ্যভাবে নিপীড়িত ও শোষিত হয়ে এসেছে, সেই কণ্ঠ-রোধকারী নিপীড়নশক্তি আজ সম্পূর্ণ পরাহত। এটি নিশ্চিতরূপে এমন একটি সংপ্রাপ্তি যা পূর্ব যুগে লাভ হয়নি। এদিক দিয়ে এ যুগ অনেক বড়, পূর্বাপর সকল যুগের চেয়ে বড়। মানুষ চিরকাল ধরে এজন্য এ যুগের কাছে ঋণী হয়ে থাকবে।

কিন্তু তা ব'লে কি মানুষের মানসমুক্তি আজ সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হতে পেরেছে? নিবেদিতার মতে তা হয়নি। তার কারণ, এ যুগ পুরাতন যুগের পূর্বতন আকারের পৌরোহিত্যকে দমন করতে সমর্থ হলেও, নিজস্ব এক নূতন ধরনের পৌরোহিত্যের জন্ম দিয়েছে। তার অত্যাচার ও শোষণ কম শ্বাসরোধকারী নয়, কম নির্মম নয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ-পরিবেশনায় অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হওয়ার ফলে পুরাতন ধর্মীয় পৌরোহিত্যের ভেলকিবাজীর স্বরূপ জনসাধারণ ধরতে পেরেছে। সেজন্য যে-শক্তি একদিন অমিত ব'লে মনে হোত, তা আজ মিথ্যাচার, লোভ ও স্বার্থপরতার হীন ষড়যন্ত্র ব'লে প্রতিপন্ন। তার স্বরূপ এ ভাবে উদ্ঘাটিত হওয়ার ফলে, আজ সে সম্পূর্ণ শক্তিহীন ও মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সংবাদ-পরিবেশনা এবং প্রচার-শক্তির ক্ষমতাই কি আজ সীমাহীন হয়ে দেখা দেয়নি? রাজনৈতিক মতবাদ, স্বার্থ ও লোভের হাতে ক্রীড়নক হয়ে উঠে এই সংঘবদ্ধ প্রচারশক্তি মানুষের মানস স্বাধীনতার কি ক'রে টুঁটি চেপে ধরেছে তা আজ আমরা সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সংবাদ-পরিবেশকরা তথা সংবাদ-পরিবেশনা-সংস্থাগুলি তাদের নিজস্ব কুসংস্কারগুলি এবং অন্ধ মতবাদ জনসমাজের উপরে চাপিয়ে দিচ্ছেন—এ কঠোর অভিযোগ সে-যুগেই নিবেদিতা ক'রে গিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর দূরদৃষ্টির পরিমাণ দেখে সত্যই বিস্মিত হতে হয়। রাজনৈতিক স্বার্থ-সাধনে নিযুক্ত প্রচারযন্ত্রের আজ যে প্রকার নির্মম জুলুমবাজী আমাদের বিবেকের স্বাধীনতা হরণ করতে বসেছে তা ভুক্তভোগী আমরা একালে যেভাবে বুঝছি তখন তা ততটা বোঝা যায়নি। 'মস্তিষ্কের ধোলাই' নামক উৎকট ব্যবস্থাও তখন ঠিক চালু হয়নি। তথাপি ধূম দেখেই তিনি যেন বহ্নির অবস্থান অনুমান করতে পেরেছিলেন ব'লেই আমাদের উদ্দেশ্যে সাবধান-বাণী রেখে গেছেন—

"The modern epoch has its own point of greatness. It has organised knowledge in science—as it has organised the world of travel. It has organised information, too, in the daily press. By these means, it has to a great extent minimised the power of those priesthoods under which men were wont to groan. True, but at the same time it has made its own priesthoods, of journalists or at worst, of journalistic censors, ready to enforce their orthodoxy on an ignorant world".[২]

তথাপি যা আমরা এ যুগে লাভ করেছি তা সামান্য নয়। এ যুগের ত্রুটি সম্বন্ধে যেমন আমরা অবহিত হব, তেমনি এর প্রাপ্তিকেও আমরা গ্রহণ করবো সাগ্রহে, সংরক্ষণ করবো সযত্নে। এ যুগের জ্ঞানজগতে অভূতপূর্ব সংগঠন যে বিপুল তাৎপর্যপূর্ণ সে কথা স্বীকার করতে নিবেদিতা মুক্তকণ্ঠ। আগেকার যুগে সাধারণ মানুষের কাছে কতটুকু জ্ঞান লভ্য ছিল? মহৎ-জীবনের মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব, ততটুকু ছাড়া বিরাট জ্ঞানজগতের সকল দুয়ারই তার কাছে রুদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ মহৎ-জীবনের স্থান নিয়েছে শব্দকোষ, বিশ্বকোষ, বিপুল বিরাট গ্রন্থাগারগুলির সংগৃহীত বিপুলতর গ্রন্থরাজি। সেজন্য আজ জ্ঞানজগতের সকল দুয়ার সকলের জন্য উন্মুক্ত; সেই উন্মুক্ত দ্বারগুলি সকলকে সমান আহ্বান জানাচ্ছে, আজ কেউই সেখানে প্রত্যাখ্যাত নয়। নিবেদিতার মতে এর তাৎপর্য প্রভূত—"The lives of the saints have given place to dictionaries and encyclopædias, in the formation of libraries, and the change is charged with significance."[৩] সে তাৎপর্য হল এই যে, জ্ঞানজগতে বিশেষ সুবিধার আজ অবসান ঘটেছে। মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির পক্ষে এ নিশ্চয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা।

এর ফলে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বহু মানুষের অবদান ঘ'টে তাকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেছে। মানুষের মানস-ক্ষেত্রের চৌহদ্দিও আজ অনেক বর্ধিত হয়েছে।

এরূপ পরিবর্তিত এবং প্রসারিত মানস-ক্ষেত্রের আজ চাহিদা কি? ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে আজ কোন্ আদর্শ এ যুগের বিশ্ব-সচেতন মানুষের ঠিক ঠিক প্রয়োজন মেটাবে? এ অত্যন্ত সঙ্গত এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এ ক্ষেত্রেও অতি নিপুণ বিশ্লেষণী শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে নিবেদিতা এ যুগের মানসলোকটিকে আমাদের সামনে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছেন। তাঁর মতে বাহ্য আন্তর্জাতিকতার অনুসঙ্গরূপে ভাবজগতে এবং বৌদ্ধিক ক্ষেত্রেও আজ সমন্বয় ও সংহতির একান্ত প্রয়োজন। প্রাক্ আধুনিক যুগে ব্রাহ্মণ হয়ে কিংবা ক্ষত্রিয় হয়ে, কেউ বা বৈশ্য কেউ বা শূদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করত। আজ আর কেউ কিছু হয়ে জন্মায় না। এমনকি বিদ্যালয়ে পাঠরত অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকও আজ তার সম্মুখে প্রসারিত সকল সম্ভাবনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা ক'রে দেখে এবং তারপর নিজক্ষেত্রকে নিজেই বেছে নেয়। আজ প্রত্যেক দেশের প্রতিটি ব্যক্তির পশ্চাৎপটে অবস্থিত সারা বিশ্ব। এমনকি আমাদের পারিবারিক জীবনও এই বিশ্ব-পরিপ্রেক্ষিত হতে বিচ্ছিন্ন নয়, বাইরের বিপুল বিশ্বের ভয়াবহ বিরাটত্ব ও ঔদাসীন্যের গ্রাস হতে গৃহজীবনের মাধুর্য একটুকরো নিশ্চিত আশ্রয়, একটি নিরাপদ আত্মরক্ষার স্থান—"So

২ Civic And National Ideals—p. 30

৩ Civic And National Ideals—P 30

far does the world-consciousness tend to be the unspoken background of the individual life that even the sweetness of home lies much in the sense of the vast without, from which it is a shelter and a refuge"[৪]। এককথায় সারাবিশ্ব আজ এক অখণ্ড ভূখণ্ড এবং মানুষ আজ এক বিশ্ব-'চেতন' বিশ্ব-নাগরিক। তার চিন্তা-চেষ্টা, ধ্যান-ধারণা, আদর্শ-লক্ষ্য—এ গুলি আজ ক্রমশই সারা জগতের সঙ্গে অচ্ছেদ্য-বন্ধনযুক্ত। সারা বিশ্বের নানা দেশের নানা কালের নানা বিচিত্র ধ্যান ধারণা ভাবনার অবিরাম প্রবলবেগে সংক্রমণ তাকে অনুক্ষণ আলোড়িত করছে। সেজন্য সে আজ একটি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন। এই যে নানা দেশ-কালের আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী নানা চিন্তা তার সম্মুখে গ্রহণের অবিরাম দাবী জানাচ্ছে তার কোন্‌টিকে সে গ্রহণ করবে? সেজন্য সাধারণ মানুষ আজ অত্যন্ত বিভ্রান্ত। এই বিভ্রান্তি-নিরসন এ যুগের একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন ক'রে বিচিত্র ধারণাগুলির একটি সামগ্রিক রূপ প্রদান করা, সেই বিপুল ধ্বনি-বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি সুর-সংগতি আনা। (ক্রমশঃ)

৪ Civic And National Ideals—P. 30

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ"

[অনুবাদক শ্রীইন্দ্রমোহন চক্রবর্তী]

('কাম্যকর্ম-ফলে স্বর্গ লভি' মূঢ়জন
পুনরায় জরামৃত্যু করে যে বরণ।)
অবিদ্যার মধ্যে যারা রয় বর্তমান,
"আমরাই একমাত্র পণ্ডিত ধীমান্"—
এইরূপ মনে করি সেই মূঢ়গণ
বহুধা পীড়িত হয়, অনর্থ-ঘটন,
অন্ধদ্বারা নীয়মান যথা অন্ধজন ॥৮

অবিদ্যায় বহুভাবে যারা বর্তমান,
"আমরা কৃতার্থ" এই করে অভিমান,
জানে না আসক্তিহেতু প্রকৃত যে তত্ত্ব,
কর্মফলভোগশেষে হইয়া দুঃখার্ত
স্বর্গ হতে হয় তারা স্বতঃই বিচ্যুত ॥৯

ইষ্টাপূর্ত-যাগ-কর্ম ইহাই বরিষ্ঠ
এইরূপ মনে করি যারা কর্মনিষ্ঠ,
অন্য কোন শ্রেয়োমার্গ সেই মূঢ়গণ
পারে না পারে না হায় লভিতে কখন।
স্বর্গের সুকৃত পৃষ্ঠে করি পুণ্যভোগ
পুনঃ পায় মনুষ্য বা হীনতর লোক ॥১০

স্বাশ্রমবিহিত তপ-উপাসনা-রত
অরণ্যে করেন বাস ভৈক্ষাচর্যাব্রত—
সন্ন্যাসী প্রশান্তচিত্ত, গৃহস্থ বিদ্বান্
সূর্যদ্বারে রজোহীন করেন প্রয়াণ
অমৃত পুরুষ সেই আত্মা সুমহান্
নিয়ত করেন যেই লোকে অধিষ্ঠান ॥১১

কর্মদ্বারা লভ্য লোক পরীক্ষা করিয়া,
নিত্যবস্তু কর্মলভ্য নহেক জানিয়া
ব্রাহ্মণ বৈরাগ্যধর্মে দীক্ষিত হইয়া
নিত্যবস্তুলাভ হেতু করিবে গমন
বেদজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞ কোন গুরুর সদন;
সমিধ লইয়া হস্তে বন্দিবে গুরুরে
করিতে সে-বিদ্যালাভ অন্তঃশ্রদ্ধাভরে ॥১২

শান্তচিত্ত শমান্বিত আগত শিষ্যেরে
ব্রহ্মবিদ্ সেই গুরু অতি যত্নভরে
শিখাবেন ব্রহ্মবিদ্যা, যে বিদ্যা-প্রভাবে
যথাযথ সে অক্ষর পুরুষে জানিবে ॥১৩

—মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।২

স্বামী বিবেকানন্দ ও সারা বার্নহার্ড

ব্রহ্মচারী জ্ঞানচৈতন্য

'নূনং ভূতানি ভগবান্ যুনক্তি বিযুনক্তি চ'— ভূতসকলের সংযোগ ও বিয়োগের কারণ ভগবান। তাই অনন্ত কালের প্রবাহে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন আকস্মিক একটা কিছু নয়, উহা দৈবনির্দিষ্ট। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ও অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ডের সাক্ষাৎকারে কি ধরনের কথাবার্তা হয়েছিল বা কি ভাবের আদানপ্রদান হয়েছিল তা আমরা জানি না; কিন্তু এটা ঠিক যে ঐ সাক্ষাৎকারের পিছনে বিধির কোন গূঢ় উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকবে যা মানুষের বুদ্ধির বাইরে।

বাংলার আদিম রঙ্গমঞ্চে এবং নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রবাহে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা কিছু কিছু অনুরণিত হয়েছে, একথা এখন অনেকেই জানেন। গিরিশচন্দ্রকে তিনি রূপান্তরিত করেছিলেন। এইরূপ আধ্যাত্মিক রূপান্তরে শিল্পপ্রতিভার ধ্বংস হয় না, হয় প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো পরিপূর্ণ বিকাশ।

শ্রীরামকৃষ্ণের মতো স্বামী বিবেকানন্দও পাশ্চাত্ত্যের বহু রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখেছেন। পাশ্চাত্ত্যের বহু অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় ছিল। এবং কেউ কেউ তাঁর শিষ্যত্বও গ্রহণ করেছিলেন। এঁরা স্বামীজীর কাছ থেকে কতভাবে যে উপকৃত হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। ঠিকভাবে বলতে গেলে তিনি বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী গায়িকা মাদাম ক্যালভেকে আত্মহত্যার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। ক্যালভে তাঁর আত্ম-জীবনীতে এসব কথা লিখে গেছেন। স্বামীজী ছিলেন শিল্পী সন্ন্যাসী। কুমারস্বামী লিখেছেন: যে-সমস্ত শিল্পী সংযমের মধ্য দিয়ে সত্যং-শিবং-সুন্দরম্-এর দিকে এগিয়ে যান, তাঁরাই পরবর্তীকালে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছেন। স্বামীজী সারা বার্নহার্ড সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন: 'লা দিভিন সারা' অর্থাৎ দৈবী সারা।

সারা বার্নহার্ড (১৮৪৪—১৯২৩) প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অদ্ভুত প্রতিভাশালিনী। তাঁর নাট্য-প্রতিভা তুলনা-হীন। প্রথম জীবনে তিনি কনভেণ্টে শিক্ষালাভ করেন এবং ষোল বছর বয়সে রঙ্গমঞ্চে নেমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপর ফরাসী দেশ ছেড়ে তিনি লণ্ডনের Gaiety থিয়েটারে এবং পরে বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় ঘুরে ঘুরে অভিনয় করতে থাকেন। বিদেশীরাই প্রতিভার মূল্য অধিক দেয়। ১৮৯১ সালে তিনি দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকা ভ্রমণ ক'রে বিশ্ববিখ্যাত হন। সেইকালে তরুণ ও উৎকট নাট্য-সমালোচক বার্নার্ড শ-এর সামনে সাধারণ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর টিকে থাকা দায় ছিল। কিন্তু বার্নহার্ড তখন গৌরবের চরম শিখরে; তিনি নিজেকে শিল্প-সুষমা ও ভাব-মূর্ছনা দিয়ে গড়েছিলেন। আর একথা সত্য যে, জাগতিক সমালোচনা প্রতিভাকে টলাতে পারে না।

স্বামীজীর সঙ্গে বার্নহার্ডের প্রথম সাক্ষাৎ-কারটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ এবং মনে হয় যেন একটু রূপক ধরনের। স্বামীজী গিয়েছিলেন নিউইয়র্কের একটি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখতে আর বার্নহার্ড একটা আকর্ষণীয় ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ত্যাগীর সম্রাট বুদ্ধকে

প্রলুব্ধ করবার মরণপণ চেষ্টা করছিলেন রাজনর্তকীবেশী অপ্সরা বার্নহার্ড। অভিনয়টি ছিল চমকপ্রদ। স্বামীজী অভিনয়টির সারমর্ম লিখে পাঠালেন লণ্ডনের মিঃ ই. টি স্টার্ডিকে (১৩-২-১৮৯৬): "ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড এখানে 'ইৎশীল' (Iziel) অভিনয় করেছেন। এটি কতকটা ফরাসী ধাঁজে উপস্থাপিত বুদ্ধজীবনী। এতে রাজনর্তকী ইৎশীল বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করতে সচেষ্ট; আর বুদ্ধ তাকে জগতের অসারতা উপদেশ দিচ্ছেন। (সে কিন্তু সারাক্ষণ বুদ্ধের কোলেই বসে আছে।) যা হোক, শেষ রক্ষাই রক্ষা—নর্তকী বিফল হল। মাদাম বার্নহার্ড ইৎশীলের ভূমিকায় অভিনয় করেন। আমি এই বুদ্ধব্যাপারটা দেখতে গিয়েছিলাম। মাদাম কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে আমায় দেখতে পেয়ে আলাপ করতে চাইলেন। আমার পরিচিত এক সম্ভ্রান্ত পরিবার এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। তাতে মাদাম ছাড়া বিখ্যাত গায়িকা মাদাম মোরেল এবং শ্রেষ্ঠ বৈদ্যুতিক টেসলা ছিলেন।"

চিঠিটির বিষয় নাটকীয়, উভয়ের সাক্ষাৎকারটি নাটকীয় এবং অভিনয়টি যেন এই জীবন দুটির রূপক ও বাস্তবকে এক ক'রে দিয়েছে। এই সাক্ষাৎকারে উভয়ের মধ্যে কি ধরনের কথাবার্তা হয়েছে জানা যায় না; তবে চিঠিদৃষ্টে মনে হয় স্বামীজী ঐ অনুরাগী দলটিকে বেদান্তের মহান বাণী শুনিয়েছেন। ঐ চিঠিতে স্বামীজী নিজেই লিখছেন, "মাদাম (বার্নহার্ড) খুব সুশিক্ষিতা মহিলা এবং দর্শনশাস্ত্র অনেক পড়ে শেষ করেছেন।" সকলের সামনেই স্বামীজী বৈদান্তিক সৃষ্টিতত্ত্ব বোঝালেন এবং দেখালেন যে উহা বিজ্ঞানসম্মত। টেসলা গণিতের দ্বারা জড় ও শক্তি উভয়কে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করবার জন্য সচেষ্ট হন এবং স্বামীজীকে পরের সপ্তাহে ঐ পরীক্ষা দেখবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। বৈদান্তিক প্রাণ, আকাশ ও কল্পের তত্ত্ব শুনে বৈদ্যুতিক টেসলা মুগ্ধ হন। ঐ সাক্ষাৎকারমূলক চিঠিতে স্বামীজী লিখেছেন, "আমি শুষ্ক সুকঠিন যুক্তিকে প্রেমের মধুরতম রসে কোমল ক'রে তীব্র কর্মের মসলাতে সুস্বাদু ক'রে এবং যোগের পাকশালায় রান্না ক'রে পরিবেশন করতে চাই, যাতে শিশুরা পর্যন্ত তা হজম করতে পারে।" স্বামীজী তাঁর নবীন ভাবধারাকে নবাগতদের মাঝে এমনি ভাবে ছড়িয়ে দিতেন।

স্বামীজীর সঙ্গে বার্নহার্ডের দ্বিতীয় দেখা হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে 'ইউরোপী সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখ' প্যারিস নগরীতে। এই পরিবেশটিও ছিল বেশ সুন্দর। স্বামীজীর নিকটতম বন্ধু মিঃ ফ্রান্সিস লেগেট তাঁর প্যারিসস্থ প্রাসাদে ভোজনের দ্বারা আপ্যায়িত করবার জন্য নিত্য নূতন যশস্বী ও যশস্বিনী নরনারীর মিলন ঘটাতেন। কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নীতিবিদ্, সামাজিক, গায়ক, গায়িকা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর ও বাদক প্রভৃতি নানা জাতীয় গুণীর অপূর্ব সমাবেশ হ'ত। স্বামীজী লিখেছেন, "সে পর্বতনির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দিক-সমুত্থিত ভাববিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত, মনীষিমনঃসংঘর্ষ-সমুত্থিত চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ সকলকে দেশকাল ভুলিয়ে মুগ্ধ ক'রে রাখত।" এই কালে প্যারিসে ধর্মেতিহাস সভার অধিবেশন হয় এবং স্বামীজী তাতে যোগ দেন।

'পরিব্রাজক' গ্রন্থখানি স্বামীজীর ভ্রমণ-সংক্রান্ত চিঠির চয়ন। চিঠিগুলি লেখা 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে। এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে উপদেশ, খোসমেজাজী

গল্প, বিস্ফোরাত্মক কথাবার্তা, কৌতুকচ্ছটা, স্নেহদরদ, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, বিভিন্ন সভ্যতার ইতিবৃত্ত, ধর্ম ও প্রত্নতত্ত্ব ; আর আছে আচার্যের জ্বালাময়ী দৈববাণী। স্বামীজী লিখে চলেছেন, "মাদাম বার্নহার্ড বর্ষীয়সী ; কিন্তু সেজে মঞ্চে যখন ওঠেন, তখন যে বয়স, পুরুষ বা নারী যে চরিত্রের অভিনয় করেন, তার হুবহু নকল। বালক, বালিকা যা বল তাই– হুবহু—আর সে আশ্চর্য আওয়াজ। এরা বলে তাঁর কণ্ঠে রূপার তার বাজে।"

স্বামীজীর উপরি-উক্ত মন্তব্যের পিছনে রয়েছে এক বিরাট ইতিহাস। স্বামীজী 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে অন্যত্র লিখেছেন, "সার্দ প্রভৃতি নাট্যকার গত ন্যাপোলেঁওঁ সম্বন্ধে অনেক নাটক লিখচেন ; মাদাম বার্নহার্ড, রেজাঁ প্রভৃতি অভিনেত্রী, কক্লেঁা প্রভৃতি অভিনেতাগণ সে-সব পুস্তকে অভিনয় কোরে প্রতি রাত্রে থিয়েটার ভরিয়ে ফেলচে। সম্প্রতি 'লেগলঁ' বা গরুড়শাবক (L' Aiglon i. e. the Duke of Reichstadt) নামক এক পুস্তক অভিনয় কোরে মাদাম বার্নহার্ড প্যারিস নগরীতে মহা আকর্ষণ উপস্থিত করেচেন।" প্রশ্ন উঠবে—কে এই গরুড়শাবক এবং ঐরূপ অদ্ভুত নামকরণের হেতুই বা কি ?

এই গরুড়শাবক হ'ল নেপোলিয়ন বোনাপার্টের একমাত্র পুত্র। সে অষ্ট্রিয়ার রাজকন্যা মেরী লুইসের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। নেপোলিয়নের পতনের পর বালকটি মাতামহ-গৃহে ভিয়েনার প্রাসাদে নজরবন্দী হয়। কিন্তু দু-জন ফরাসী সৈনিক গোপনে ভৃত্যবেশে তার সেবাকাজে লাগে। সুযোগ পেলেই তারা কিশোর বালকটিকে পিতার রণগৌরব শোনাত আর তা শুনে শুনে বালকটি অদ্ভুত তেজস্বী হয়ে উঠত। ফরাসীরা চেয়েছিল বালকটিকে চুরি ক'রে এনে আবার বোনাপার্ট বংশ দাঁড় করাবে। কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত ধরা পড়ে গেল এবং বদ্ধপক্ষ 'গরুড়শিশু' ভগ্নহৃদয়ে অল্পদিনেই প্রাণত্যাগ করল।

এই 'গরুড়শাবক' নামকরণটি স্বামীজীর। এতে রয়েছে খানিকটা বীরত্বের ব্যঞ্জনা ; ফরাসী ভাষায় ঈগলপক্ষীকে *aigle* এবং তার শাবককে *aiglette* বলে। উপরন্তু এই ঈগল-পক্ষী রোমান ও ফরাসী সৈন্যবাহিনীর প্রতীক স্বরূপ ছিল। স্বামীজী তাই পুরাণবর্ণিত বিষ্ণুর বাহন ও বিনতানন্দন গরুড়কে ঈগলরূপে ব্যবহার করেছেন। গরুড় যখন নিজের মায়ের দাসীত্ব মোচনের জন্য স্বর্গ থেকে অমৃত নিয়ে আসছিলেন তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে বজ্রের দ্বারা আঘাত করেন। আঘাত খেয়ে একটুও বিচলিত না হয়ে তিনি দেবরাজকে বললেন : শতক্রতু, তুমি যে বজ্র দিয়ে আমাকে আঘাত করেছ তাতে আমার কিছুই হয়নি ; কিন্তু দধীচি মুনির সম্মানার্থে যার হাড় দিয়ে এই বজ্র তৈরী —তোমাকে একখানি পালক উপহার দিয়ে যাচ্ছি। স্বামীজীর চোখে নেপোলিয়ন গরুড়ের মতোই বীর ছিলেন।

যা হোক পূর্বোক্ত নাট্যের নামভূমিকায় অর্থাৎ নেপোলিয়নের বালক পুত্রের ভূমিকায় অভিনয় করলেন ছাপ্পান্ন বছরের বৃদ্ধা বার্নহার্ড। কি তাজ্জব ব্যাপার ! কি অদ্ভুত যাদুকরী সাজ ! কুইকার ইশারউড তাঁর Exhumation গ্রন্থে বার্নহার্ডের এই অভিনয় সম্বন্ধে লিখেছেন : "She···presents an astonishing slender and erect little personage in a riding-coat and high boots with spurs, neither boy nor girl, woman nor man, sexless, ageless, and altogether impossible by daylight, outside the walls of a theatre" একটু মজা ক'রে ইশারউড মন্তব্য

করছেন যে, 'unkind camera' বার্নহার্ডের বয়স অসম্ভব কমিয়ে দিয়েছে। স্বামীজী অবশ্যই এই নাটকখানিতে বার্নহার্ডের অপূর্ব অভিনয় দেখে থাকবেন। 'পরিব্রাজকের' বর্ণনার সঙ্গে এই বর্ণনার অপূর্ব সাদৃশ্য রয়েছে। তা ছাড়া বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বীরত্বের গাথা শুনতে ভালই বাসতেন। "যে বীর, 'আপনি কোন্ বংশে অবতীর্ণ ?'—এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'আমি কারুর বংশের সন্তান নই—আমি মহাবংশের স্থাপক'" স্বামীজী নিশ্চিতই ঐ মহা-বংশের প্রথম ও শেষ প্রদীপচ্ছটার নাট্যরূপ দেখেছেন কারণ ভিয়েনাতে সামবোর্ন প্রাসাদ (যেখানে বোনাপার্টপুত্র বন্দী অবস্থায় মারা যায়) দেখবার কালে আবার বার্নহার্ডের নাট্য-প্রতিভার উল্লেখ করেছেন এবং গরুড়শাবককে নিয়ে বেশ কিছুটা কৌতুকও করেছেন।

'পরিব্রাজকে' বার্নহার্ড সম্বন্ধে স্বামীজীর দ্বিতীয় মন্তব্য: "বার্নহার্ডের অনুরাগ, বিশেষ—ভারতবর্ষের উপর। আমায় বারংবার বলেন, তোমাদের দেশ 'ত্রেজাঁসিএন, ত্রেসিভিলিজে'—অতি প্রাচীন, অতি সুসভ্য। এক বৎসর ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত এক নাটক অভিনয় করেন; তাতে মঞ্চের উপর বেলকুল এক ভারতবর্ষের রাস্তা খাড়া ক'রে দিয়েছিলেন—মেয়ে, ছেলে, পুরুষ, সাধু, নাগা, বেলকুল ভারতবর্ষ!! আমায় অভিনয়ান্তে বলেন, 'আমি মাসাবধি প্রত্যেক মিউজিয়ম বেড়িয়ে ভারতের পুরুষ, মেয়ে, পোষাক, রাস্তাঘাট পরিচয় করেচি'।" একেই বলে শিল্প-প্রতিভা! পরিবেশের উপর মানুষের মনোভাব অনেকটা নির্ভর করে। সৃষ্টির ভিতর ভাবপ্রকাশই হ'ল শিল্প। ভাববিহীন রং-বেরং-এর পরিবেশসৃষ্টিকে শিল্প বলা যায় না। ভারতীয় কায়দায় বার্নহার্ড কেবল একখানি নাটকেই অভিনয় করেছেন। আর উহা হচ্ছে Morand and Silvestre-রচিত Izeil (ইৎসীল)। এই নাটকখানির মাধ্যমেই স্বামীজীর সঙ্গে বার্নহার্ডের প্রথম পরিচয়, একথা আমরা পূর্বেই ব'লে এসেছি।

'পরিব্রাজকে'র বিবরণ সমাপ্ত হয়েছে এভাবে: "বার্নহার্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল। 'সে মঁ র‍্যাভ' (ce mon rave), 'সে মঁ র‍্যাভ'—সে আমার জীবন স্বপ্ন। আবার প্রিন্স অব্ ওয়েলস তাঁকে বাঘ, হাতি শিকার করাবেন প্রতিশ্রুত আছেন। তবে বার্নহার্ড বললেন—সে দেশে যেতে গেলে, দেড় লাখ দু লাখ টাকা খরচ না করলে কি হয়? টাকার অভাব তাঁর নেই। 'লা দিভিন সারা' (La divine Sarah) দৈবী সারা—তাঁর আবার টাকার অভাব কি? যাঁর স্পেশাল ট্রেন ভিন্ন গতায়াত নেই; সে ধূমবিলাস ইউরোপের অনেক রাজরাজড়া পারে না। যাঁর থিয়েটারে মাসাবধি আগে থেকে দুনো দামে টিকিট কিনে রাখলে তবে স্থান হয়, তাঁর টাকার বড় অভাব নেই। তবে সারা বার্নহার্ড বেজায় খরচে! তাঁর ভারতভ্রমণ কাজেই এখন রইল।" নাই বা এলেন বার্নহার্ড ভারতে; কিন্তু তিনি যে ভারতপ্রেমিকা। ভারতের প্রতি তাঁর এই গভীর শ্রদ্ধা যে দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীকে ভাববিহ্বল করেছিল এতে সন্দেহ নেই। উপরি-উক্ত মন্তব্যের মধ্যে যুগপৎ রয়েছে লঘুচপল হাস্য-পরিহাস এবং গাম্ভীর্য। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের বিবেকানন্দের ছবিতে দেখা যায়, তাঁর জ্বলন্ত চক্ষু দুটি ছিল উদাস ও করুণায় ভেজানো; মুখখানি ক্লান্ত, শান্ত ও তন্ময়; দেহটি অবসন্ন এবং মনটি নির্বাণোন্মুখ। কিন্তু এর মধ্যেও অমৃত-আস্বাদনকারী বিবেকানন্দের ঠোঁট দুটি ছিল ফুর্তিতে ভরা। কেউ যদি কখনও অনুযোগের সুরে বলত, 'স্বামীজী,

আপনি কি একটু গম্ভীর হ'তে পারেন না ?' স্বামীজী উত্তর করতেন, "হাঁ, পারি। পেটে যন্ত্রণা উঠলে।' সঙ্গে সঙ্গে হাসির অ্যাটম বোম ফেটে পড়ত।

প্যারিসেই বার্নহার্ডের সঙ্গে স্বামীজীর শেষ দেখা। কেবলমাত্র কথোপকথনকেই যদি যোগসূত্রের মাধ্যম ধরা হয় তবে উভয়ের সাক্ষাৎকার মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু ভাবের বাহক ভাষা; ভাব ভাষার কারণাবস্থা এবং কার্যের চেয়ে কারণ অধিক শক্তিশালী হয়। বার্নহার্ডের পরবর্তী জীবন থেকে জানা যায় স্বামীজীর ভাব তাঁর ভিতর কিভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। স্বামীজী সরাসরি সূক্ষ্মভাবে অপরের ভিতর ভাব সঞ্চালিত করতেন। নাই বা করলেন তিনি দার্শনিক আলোচনা। দৈবী সারার জীবনের এক দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্ত সাক্ষ্য দিয়েছে যে তিনি কতটা নির্ভীক ও ভাবনাহীন ছিলেন এবং বিপদের মধ্যেও স্বামীজীর মতো হাসিখুশিতে ভরপুর থাকতেন।

দৈবী সারা পঞ্চাশ বছরের উপর পৃথিবীর বুকে গৌরবের চরমশীর্ষে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। ১৯০৫ সালে আটলান্টিক পার হবার কালে ঝড়ের দ্বারা তাড়িত হয়ে জাহাজের ডেকের উপর থেকে তিনি পড়ে যান এবং পায়ে ভীষণ চোট পান। ঐ যন্ত্রণা দশ বছর ধরে চলে। পা-খানি ক্রমশঃ পঙ্গু হয়ে আসছিল। ডাক্তার পাখানি কেটে ফেলা ছাড়া নিরাময়ের আর কোন পথ খুঁজে পেলেন না। কিন্তু অভিনেত্রী-দের শরীরই যে সব চেয়ে মূল্যবান। কোন্ ভরসায় এই মর্মন্তুদ কথা সারাকে বলা যায় ? দরদী ডাক্তার শেষে ত্রস্তভাবে সব কথা সারাকে বললেন। ডাক্তার ভেবেছিলেন যে সারা ভেঙ্গে পড়বেন। ঠিক উল্টো হ'ল। সারা একবার-মাত্র ডাক্তারের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "ঠিক আছে। যদি কাটতে হয়, কেটে ফেল।" অপারেশন-ঘরে যাবার সময় হাসিমুখে ছেলেকে বললেন, "ঘাবড়ে যেও না, আমি শীঘ্র ভাল হয়ে যাব।" কী অদ্ভুত হৃদয়ের বল! ঘরে ঢুকবার মুখে তিনি তাঁর একটা বাছাই করা অভিনয়ের একটি আবেগপূর্ণ বিষয় আবৃত্তি ক'রে শোনালেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি নিজেকে ঠিক রাখবার জন্য ঐরূপ হাস্য কৌতুক করছেন ?" সারা উত্তর দিলেন, "না। ডাক্তার ও নার্সদের খুশী করবার জন্য। কারণ এই অপারেশনটা তাদের পক্ষে বড় কষ্টকর হবে।" এর পর তিনি মাত্র আর সাত বছর বেঁচেছিলেন।

এ জগতে যা ভবিতব্য তা তো হবেই। দুশ্চিন্তার দ্বারা দুর্গতি নষ্ট হয় না। কিন্তু মহাপুরুষ-সংশ্রব ব্যর্থ হবার নয়। সারা বার্নহার্ডের অদ্ভুত মনোবল স্বামীজীর অমোঘ আশীর্বাদের ফল।

ব্যাকরণ-কথা

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীকালীজীবন চক্রবর্তী

ভাষার 'সংস্কৃত' নামটি খুব প্রাচীন নয়। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে (১১।৫৬) এবং সুন্দর-কাণ্ডে (৩০।১৭-১৮) 'সংস্কৃত' ভাষার কথা স্পষ্টতঃই উল্লিখিত হইয়াছে। ভাষা বুঝাইতে সংস্কৃতের এই ব্যবহারই বোধ হয় প্রাচীনতম। প্রাকৃত ভাষাগুলির অভ্যুত্থানের পর উহাদের সহিত পার্থক্য-নির্দেশের 'তাগিদে'ই খৃষ্টীয় শতকের প্রারম্ভ বরাবর ভাষা-নির্দেশক 'সংস্কৃত' নামটির প্রচলন হইয়া যায়। তাই একদিকে প্রাকৃত (=প্র+অকৃত) এবং অপর দিকে উহার বিপরীত অর্থসূচক সংস্কৃত (=সম্+কৃত) এই উভয়ের পাশাপাশি উল্লেখ শাস্ত্রাদিতে প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়। 'সংস্কৃত' অর্থাৎ ব্যাকরণ দ্বারা যাহার সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। 'নানার্থ-সংক্ষেপ' অভিধানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—

"সংস্কৃতং স্বাহিতোৎকর্ষে কৃত্রিমে নির্মলীকৃতে"—(১৮৮৭, ত্র্যক্ষর কাণ্ড, নানালিঙ্গাধ্যায়)। অর্থাৎ যাহার উৎকর্ষ-বিধান করা হইয়াছে, যাহা কৃত্রিম এবং নির্মলীকৃত তাহাকেই সংস্কৃত বলা যায়। মহাকবি কালিদাস ইহাকে বলিয়াছেন, "সংস্কার-পূত বাঙ্ময়" (কুমারসম্ভব, ৭।৯০) ইহার সঙ্গে তুলনীয় 'প্রকৃত্যা স্বভাবেন সিদ্ধমিতি প্রাকৃতম্'। অর্থাৎ প্রাকৃতই তখন স্বাভাবিক লৌকিক ভাষা, আর সংস্কৃত—ব্যাকরণাশ্রিত এমন এক কৃত্রিম ভাষা যাহা স্বীয় স্বাভাবিক গতি-বেগ হারাইয়া শিক্ষণীয় পর্যায়ে আসিয়া ঠেকিয়াছে। তাই পাণিনি-পরবর্তী ব্যাকরণগুলির একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য লক্ষিত হয়—সংস্কৃতভাষা শিক্ষা দেওয়া। এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখা উচিত যে, পাণিনি বা তৎপূর্ববর্তী বৈয়াকরণগণ প্রধানতঃ ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ব্যাকরণ রচনা করেন নাই। ইহা ছিল তাঁহাদের নিকটে নিতান্তই গৌণ ব্যাপার, কারণ তখন এই ভাষা শিষ্টদের কথ্য ভাষা ছিল। ভাষাশিক্ষা নয়, ভাষা-রক্ষা—এই উদ্দেশ্যই অন্ততঃ অষ্টাধ্যায়ীতে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তাই ইহার সূত্র-বিন্যাস বা বিষয়-বিন্যাস একেবারেই ভাষা-শিক্ষার উপযোগী নয়। শব্দানুশাসনের যে বিশ্লেষণী ধারা শিক্ষা ও নিরুক্ত নামক অপর দুই বেদাঙ্গের সাহচর্যে বেদাঙ্গ ব্যাকরণরূপে পাণিনিতে আসিয়া চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে, আধুনিক দৃষ্টিতে তাহা মুখ্যতঃ ভাষা-বিজ্ঞানের লক্ষণাক্রান্ত।

পাণিনি-পরবর্তী ব্যাকরণগুলির মধ্যে কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণই সর্বাধিক প্রাচীন। দক্ষিণ ভারতের প্রাকৃত-প্রাদুর্ভাব-গ্রস্ত সাতবাহন-(প্রাকৃতে 'শালিবাহন') রাজ-বংশে সংস্কৃত-শিক্ষা-প্রচলনের উদ্দেশ্যে সর্ববর্মাচার্য এই ব্যাকরণ রচনা করেন। কুমার কার্ত্তিকের দৈব সংশ্রব-বশতঃ ইহার নামান্তর কৌমার ব্যাকরণ। সর্ববর্মার আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় ১ম/২য় শতাব্দী। তিনিও এই ব্যাকরণের আদ্য প্রবক্তা নহেন। পূর্বোক্ত ঐন্দ্র ব্যাকরণের ধারায় বৈশম্পায়ন-শিষ্য কলাপী যে ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন তাহারই ভিত্তিতে তিনি সংস্কৃতশিক্ষার উপযোগী, অল্পসূত্র-বিশিষ্ট, চতুষ্টয়াত্মক (শব্দরূপ, কারক, সমাস ও তদ্ধিত) অতিশয় সরল এই কাতন্ত্র ব্যাকরণ রচনা করেন। কাতন্ত্র শব্দের অর্থ

'ঈষৎতন্ত্র' বা অল্পসূত্র। চতুষ্টয় অর্থাৎ চারি অবয়ব। ক্রমে ইহার সহিত ব্যাকরণের অপরিহার্য অন্যান্য বিভাগ এমন কি বৈদিক ব্যাকরণ ('ছন্দঃ প্রক্রিয়া') পর্যন্ত সংযোজিত হইয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। দুই প্রধান বৃত্তিকার বররুচি (খৃঃ ৪র্থ/৫ম শতাব্দীয়) এবং দুর্গসিংহের (খৃঃ ৮ম/৯ম শতক) প্রভাবে উঁহাদেরই নামানুসারে কাশ্মীরে এবং বঙ্গদেশে কাতন্ত্রের যথাক্রমে বাররুচ এবং দৌর্গ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে।

কাতন্ত্রের প্রধান গুণ ইহার সরলতা এবং ভাষাশিক্ষার উপযোগী বিষয়-বিন্যাস। কাশ্মীরী পণ্ডিত শশিদেব তাঁহার 'কাতন্ত্র-ব্যাখ্যান-প্রক্রিয়া' পুস্তকে এই ব্যাকরণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

'ছান্দসাঃ স্বল্পমতয়ঃ শাস্ত্রান্তরে রতাশ্চ যে।
ঈশ্বরা ব্যাধি-নিরতাস্তথালস্যযুতাশ্চ যে॥
বণিক্-শস্যাদি-সংসক্তা লোকযাত্রাদিষু স্থিতাঃ।
তেষাং ক্ষিপ্রপ্রবোধার্থং কাতন্ত্রং রচিতং পুরা॥'

ইহার অর্থ—ছন্দোবদ্ধ পদ্যাদির রচনা দ্বারা জীবিকা-নির্বাহকারীদের, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের, অন্য শাস্ত্রব্যবসায়ীদের, রাজা এবং জমিদার-গোছের সুখী ব্যক্তিদের, চির-রোগীদের, অলস ব্যক্তিদের, বণিক্ ও শস্যাদিসরবরাহকারীদের এবং সর্বসাধারণের সংস্পর্শে আসিতে হয় এমন ব্যক্তিদের শীঘ্র সংস্কৃতশিক্ষার জন্য প্রাচীনকালে কাতন্ত্রব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল।

পূর্বোক্ত কলাপীর ব্যাকরণ বোধ হয় সার্ববর্মিক কাতন্ত্রের অভ্যুদয়ের ফলে লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। কলাপী যজুর্বেদের 'কালাপ' শাখার প্রবর্তক, তৎপ্রবর্তিত আম্নায়ের নাম 'কালাপক' (পা. সূ. ৪।৩।১২৬)। পাণিনির ৪।২।৬৫ সূত্রের ভাষ্যে 'কালাপক'-শব্দে যে সূত্রগ্রন্থ উপলক্ষিত হইয়াছে, তাহা অনেকের মতে কলাপি-রচিত ব্যাকরণ-গ্রন্থ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। এই সূত্রের কাশিকা-বৃত্তিতে উদাহৃত হইয়াছে 'কালাপকম্ অধীতে কালাপকঃ।··· চতুষ্টয়ম্ অধীতে চাতুষ্টয়ঃ'। হরিনামামৃত ব্যাকরণের "উপজ্ঞাতম্" (৭।৫৬২) সূত্রের বৃত্তি-ভাগে শ্রীজীব গোস্বামী 'কালাপ' ব্যাকরণের নাম করিয়াছেন—'পাণিনিনোপজ্ঞাতং প্রথমকৃতং পাণিনীয়ম্, কালাপং ব্যাকরণম্'। ইহার 'বালতোষণী'-টীকায়—'·· কালাপমিতি কলাপিনোপজ্ঞাতমিত্যর্থঃ।' কাশিকা-ধৃত 'চাতুষ্টয়' শব্দের উদাহরণ হইতে প্রতীয়মান হয় প্রাচীন কালাপক বা কালাপ ব্যাকরণেও চারিটি অবয়ব-বিভাগ ছিল। বর্তমান কাতন্ত্রের আখ্যাত প্রকরণের "ভুজঃ স্বরাৎ স্বরে দ্বিঃ" (৪১৪) সূত্রটিকে বৃত্তিকার দুর্গসিংহ যে 'আদ্য ব্যাকরণ' হইতে গৃহীত বলিয়াছেন ('আদ্যব্যাকরণমতমেতৎ') তাহা সম্ভবতঃ প্রাচীন কালাপ ব্যাকরণ। আবার ঐ আখ্যাতেরই "ভবেতরঃ" (১০৩) সূত্রের পঞ্জিকায় ত্রিলোচনদাস 'বৃদ্ধ-কাতন্ত্র' আখ্যায় যাঁহাদের কথা বলিয়াছেন তাঁহারা যে ঐ প্রাচীন ব্যাকরণেরই পণ্ডিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা হইতে আর একটি সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, কলাপীর ব্যাকরণও 'কাতন্ত্র'-পদবাচ্য অর্থাৎ স্বল্পসূত্রাত্মক ছিল।

যজুর্বেদীয় কালাপ-শাখা-ভুক্তদের প্রধান বসতি ছিল মধ্য ও পশ্চিম ভারতে নর্মদা নদীর অববাহিকা-অঞ্চলে। পরবর্তীকালে যজুর্বেদের অধিকাংশ শাখাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া কৃষ্ণ ও শুক্ল ভেদে যে দুই প্রধান তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয় শাখার উদ্ভব হয় তাহারও সন্ধান এই অঞ্চলেই পাওয়া যায়। শুনা যায় সর্ববর্মাও ছিলেন প্রাচীন কালাপ বা পরবর্তী তৈত্তিরীয় শাখা-ভুক্ত বৈদিক। রাজা শালিবাহন ব্যাকরণ-রচনার পুরস্কার-স্বরূপ সর্ববর্মাকে যে ভৃগুকচ্ছ বা ভরুকচ্ছ

(বর্তমান গুজরাট প্রদেশের অন্তর্গত 'Broach') নামক স্থান দান করেন, তাহা ঐ নর্মদা নদীর মোহানায় অবস্থিত। শালিবাহনের রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুর (বর্তমানে মহারাষ্ট্র প্রদেশের অন্তর্গত 'পৈথান') হইতে এই ভৃগুকচ্ছের দূরত্ব প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার। এই প্রসঙ্গে তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ি প্রাতিশাখ্যের সহিত সার্ববর্মিক কাতন্ত্রের সূত্র-ঘটিত অসামান্য সাদৃশ্য এবং তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের প্রবক্তা বলিয়া কথিত কার্ত্তিকের সহিত কলাপ (বঙ্গদেশে এই নামই সমধিক প্রচলিত) ব্যাকরণের সূচনা-সংশ্রবও স্মরণীয়। সর্ববর্মা শেষ বয়সে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া স্কন্দস্বামী নাম গ্রহণপূর্বক নিরুক্তের ভাষ্য রচনা করেন, এইরূপ কিংবদন্তী।

খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ১২শ খৃষ্ট শতকে ভারতে মুসলমান আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত ব্যাকরণক্ষেত্রে যে তৎপরতা লক্ষিত হয়, তাহার ধারক ও বাহক এবং পরিচালক প্রায় সর্বক্ষেত্রেই জৈন এবং বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ। এই কার্য-কারিতাকে মোটামুটি ৪ ভাগে ভাগ করা যায়—(১) ত্রিমুনি ব্যাকরণের বৃত্তি, টীকা প্রভৃতি রচনা, (২) অষ্টাধ্যায়ীর বৈদিকাংশ বাদে সরল ব্যাখ্যা প্রণয়ন, (৩) সংস্কৃতভাষা-শিক্ষোপযোগী নূতন ব্যাকরণ রচনা এবং (৪) ব্যাকরণদর্শনের গ্রন্থাদি রচনা।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই নাম করিতে হয় অমর-সিংহের। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ এবং খৃষ্টীয় ৪র্থ/৫ম শতাব্দীয় রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত নবরত্নের অন্যতম। ১৩শ খৃঃ শতাব্দীয় বৈয়াকরণ বোপদেব তাঁহার 'কবি-কল্পদ্রুম' নামক ধাতু বিষয়ক গ্রন্থের প্রারম্ভে যে ৮ জন শাব্দিকের নাম করিয়াছেন, অমর (সিংহ) তাঁহাদের একজন। তাঁহার রচিত স্বতন্ত্র কোনও ব্যাকরণ পাওয়া যায় নাই। তাঁহার অমর-কোশ (প্রকৃত নাম 'নামলিঙ্গানুশাসন') অভিধান অমর হইয়া আছে। তাঁহার পরেই উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ বৈয়াকরণ চন্দ্রগোমী এবং জৈন বৈয়াকরণ দেবনন্দী। ইঁহারা দুইজনেই একই সময়ে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষভাগে যে দুই ব্যাকরণ রচনা করেন তাহা যথাক্রমে 'চান্দ্র' এবং 'জৈনেন্দ্র' ব্যাকরণ নামে পরিচিত। চন্দ্রগোমী ছিলেন বাঙালী। উত্তর-বঙ্গে তাঁহার জন্ম, কিন্তু বাস করিতেন পূর্ব-বঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলার বাকলা চন্দ্রদ্বীপে। মৌর্যযুগের অন্তে সংস্কৃতভাষার সমাদরবৃদ্ধির ফলে বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতগণ ক্রমে এই ভাষার শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইলেও তাঁহাদের ব্যবহৃত সংস্কৃত সর্বথা ব্যাকরণ সম্মত ছিল না। ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ এই সংস্কৃতকে বলা হইত 'বৌদ্ধ সংস্কৃত'। ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া বৌদ্ধদিগকে বিশুদ্ধ সংস্কৃতশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করিবার জন্য চন্দ্রগোমী সাম্প্রদায়িক আবরণে চান্দ্র ব্যাকরণ রচনা করেন। তিনি এই ব্যাকরণ লইয়া নালন্দায় গিয়া সেখানকার ব্যাকরণাধ্যাপক বৌদ্ধ চন্দ্রকীর্তিকে ইহার পাণ্ডুলিপি দেখান এবং যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেন। চন্দ্রকীর্তিও 'সমন্ত ভদ্র' নামে এক শ্লোকবদ্ধ ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে খৃঃ ১ম শতাব্দীয় বৌদ্ধাচার্য ইন্দ্রগোমী প্রাচীন ঐন্দ্র ব্যাকরণের ভিত্তিতে এক ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। খৃঃ ১৭শ শতাব্দীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত লামা তারানাথের মতে অষ্টাধ্যায়ীর অনুসরণে রচিত চান্দ্র ব্যাকরণের ন্যায় ইন্দ্রগোমীর ব্যাকরণের ভিত্তিতে সার্ববর্মিক কাতন্ত্র রচিত হয়। বৌদ্ধ বৈয়াকরণদের মধ্যে একমাত্র চন্দ্রগোমীই সম্প্রদায়-নিষ্পত্তি' করিয়া যান। পূর্ণাঙ্গতার জন্য এই ব্যাকরণ পূর্ববর্তী সমস্ত বৌদ্ধ ব্যাকরণকে নিষ্প্রভ করিয়া অদ্যাপি বর্তমান। ইহার সারাংশ-অবলম্বনে ১১শ/১২শ খৃঃ শতাব্দীয় সিংহলী বৌদ্ধ পণ্ডিত কাশ্যপ

'বালাববোধন' নামক ব্যাকরণ রচনা করিয়া সিংহলে প্রচার করেন। জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের প্রণেতা দিগম্বর জৈন পূজ্যপাদ দেবনন্দী দাক্ষিণাত্যের লোক। বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের 'কোরঙ্গল' নামক স্থানে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম; পরিণত বয়সে জৈন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি একজন প্রামাণিক জৈনাচার্যরূপে পরিগণিত হন।

অষ্টাধ্যায়ীর বৈদিকাংশ বাদ দিয়া অবশিষ্টাংশকে সহজতর করিয়া পরিবেষণ করাই যেন চান্দ্র ও জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ব্যাপারে চান্দ্রই অধিকতর সরল। ইহার সূত্রসংখ্যা ৩০২৯। জৈনেন্দ্রের ৩০৬৩। ৯ম খৃঃ শতাব্দীর গুণনন্দী প্রয়োজনবোধে এই সংখ্যা বাড়াইয়া ৩৬৯৬ সূত্রাত্মক বৃহত্তর সূত্রপাঠ প্রস্তুত করেন। এই বর্ধিত সংস্করণের নাম শব্দার্ণব। বিষয়-বিন্যাসে উভয় ব্যাকরণই স্বাভাবিকতার পরিপন্থী। সংজ্ঞার ব্যবহারে জৈনেন্দ্র বড় বেশী কৃত্রিমতার পক্ষপাতী। চান্দ্র ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাতে পূর্বপ্রচলিত অন্বর্থ সংজ্ঞাগুলিও যথাসম্ভব বাদ দিয়া সরলতা-সম্পাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে। এইজন্য ইহাকে 'অসংজ্ঞক ব্যাকরণ' বলা হয়। দেবনন্দী তাঁহার সূত্রপাঠে ছয়জন পূর্বাচার্যের নাম করিয়াছেন—শ্রীদত্ত (১।৪।৩৪), যশোভদ্র (২।১।৯৯), ভূতবলি (৩।৪।৮৩), প্রভাচন্দ্র (৪।৩।১৮০), সিদ্ধসেন (৫।১।৭) এবং সমন্তভদ্র (৫।৪।১৪০)। বলা বাহুল্য ইঁহাদের কাহারও ব্যাকরণ-বিষয়ক কোনও রচনা বর্তমানে পাওয়া যায় না।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের শেষদিকে মহাপণ্ডিত ভর্তৃহরির আবির্ভাব। অষ্টাধ্যায়ীর কাশিকা-বৃত্তির রচয়িতা বৌদ্ধ জয়াদিত্যও এই সময়ের লোক। ভর্তৃহরিও বৌদ্ধ সংশ্রব-মুক্ত নহেন। খৃষ্টীয় ৬৫১।৫২ অব্দ নাগাদ তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তাঁহার 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থ ব্যাকরণ-দর্শনের এক যুগান্তকারী গ্রন্থ। পতঞ্জলির মহাভাষ্যের মতো বাক্যপদীয়ও স্বক্ষেত্রে অদ্যাপি অদ্বিতীয় গ্রন্থরূপে দেদীপ্যমান। শব্দব্রহ্ম-বাদ বা শব্দাদ্বৈতবাদ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব। মহাভাষ্যের 'ভাষ্যদীপিকা' টীকা এবং ব্যাকরণ-শিক্ষা-মূলক ভট্টিকাব্যও তাঁহারই রচনা। অনেকের মতে ভট্টিকাব্য অন্য এক ভর্তৃহরি কর্তৃক রচিত। সে যাহাই হউক, পতঞ্জলির পরে ব্যাকরণক্ষেত্রে এত বড় প্রতিভার উদ্ভব আর হয় নাই। ভর্তৃহরির ১০ বৎসর পরে জয়াদিত্যের মৃত্যু। বর্তমান কাশিকা-বৃত্তির যুগ্ম কর্তৃত্ব জয়াদিত্য এবং বামনে আরোপিত হইলেও জয়াদিত্যই মূল গ্রন্থের রচয়িতা। ইহাতে বৈদিকাংশ বাদ দেওয়ায় পরে বামন ঐ অংশ সংযোজিত করিয়া ইহার যথাযথ সংস্কার বিধান করেন। অষ্টাধ্যায়ীর প্রাচীন বৃত্তিরূপে ইহা এখনও স্বমহিমায় বর্তমান। ইহা সর্বত্র মহাভাষ্যের মতানুসারী নয় এবং বিরোধ-স্থলে সর্বত্রই ইহার মতামত উপেক্ষণীয়ও নয়। মতবিরোধের কারণ পাণিনীয় দুই পৃথক্ ধারা হইতে এই দুই মহাগ্রন্থের উদ্ভব। কাশিকার অপর নাম 'সদ্বৃত্তি' বা 'মহাবৃত্তি'। ৮ম খৃঃ শতকে কাশিকার উপরে 'কাশিকা-বিবরণ-পঞ্জিকা' নামে যে টীকা রচিত হয়, তাহার প্রণেতা জিনেন্দ্রবুদ্ধিও ছিলেন বৌদ্ধ এবং কাশ্মীরদেশীয়। এই টীকা সচরাচর 'ন্যাস' বা 'কাশিকা-ন্যাস' নামে প্রচলিত।

খৃষ্টীয় ৯ম শতকে শ্বেতাম্বর জৈন পাল্যকীর্তি প্রাচীন শাকটায়নের ধরনে অষ্টাধ্যায়ী এবং জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের অবলম্বনে 'শব্দানুশাসন' নামে এক ব্যাকরণ রচনা করেন। প্রাচীন

শাকটায়ন হইতে পৃথক্ করিয়া ইহাকে জৈন শাকটায়ন বা অভিনব শাকটায়ন বলা হয়। এই ব্যাকরণের সূত্রসংখ্যা মোট ৩২৩৬। সংজ্ঞাগুলি প্রায়শঃ কৃত্রিম। বিষয়-বিন্যাস কিন্তু জৈনেন্দ্রাদির তুলনায় স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে সহজে অনুসরণীয়। জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের অসুবিধা এবং অপূর্ণতা ইহাতে অনুপস্থিত। পাল্যকীর্তি স্বয়ং ইহার যে বৃত্তি রচনা করেন তাহার নাম অমোঘবৃত্তি। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষের রাজত্বকালে (খৃঃ অঃ ৮১৫-৮৭৭) এই বৃত্তি রচিত এবং তাঁহারই নামে নামাঙ্কিত। গণপাঠ, ধাতুপাঠ, লিঙ্গানুশাসন এবং উণাদ্যংশ রচনা করিয়া শাকটায়ন 'সম্প্রদায়-নিষ্পত্তি' করেন। এইগুলি মোটামুটিভাবে ঐ অমোঘবৃত্তিরই অঙ্গীভূত। সূত্রপাঠে তিনি তিনজন প্রাচীন বৈয়াকরণের নামোল্লেখ করিয়াছেন—ইন্দ্র (সম্ভবতঃ জৈনেন্দ্র, ১।২।৩৭), সিদ্ধনন্দী (২।১।২২৯) এবং আর্যবজ্র (১।২ ১৩)।

খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে ক্রমদীশ্বর 'সংক্ষিপ্ত-সার' ব্যাকরণ রচনা করেন। ব্যাকরণের শেষে তাঁহার পরিচয়-জ্ঞাপক যে শ্লোকটি লক্ষিত হয় তদনুসারে তাঁহার পিতার নাম চক্রপাণি, পিতামহ শ্রীপতি। তিনি পূর্বগ্রাম'বাসী দ্বিজ এবং কবি। বাদীন্দ্র তাঁহার উপাধি। এই 'পূর্বগ্রাম' কোথায় তাহা সঠিক জানা যায় নাই। তান্ত্রিক ৫১ পীঠের অন্যতম জয়ন্তীতে দেবী—জয়ন্তী, ভৈরব—ক্রমদীশ্বর। একমতে ইহা শ্রীহট্টের জয়ন্তী পরগণার অন্তর্গত কালযোড় বাউরভোগ নামক স্থানের পীঠ, অন্যমতে হাওড়া জেলার অন্তর্গত এবং দামোদর নদের পশ্চিমতীরস্থ জয়ন্তী গ্রামেই এই পীঠস্থান। বর্তমানে এই পীঠের অধিষ্ঠাত্রীদেবী মেলাইচণ্ডী দামোদর নদের পূর্বতীরে আমতা গ্রামে আনীতা এবং স্থাপিতা। মার্টিন রেলওয়ের আমতা স্টেশনের দক্ষিণদিকে দেবীমন্দিরের অগ্নিকোণে স্থিত 'ক্রমদীশ্বর' নামক অনাদি শিবলিঙ্গকে পীঠস্থানের ভৈরব বলা হয়। এই আমতা গ্রামই কি প্রাচীন পূর্বগ্রাম? ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ক্রমদীশ্বর শৈবদের নিকট হইতে 'বাদীন্দ্র-চূড়ামণি' উপাধি লাভ করেন এবং খৃষ্টীয় ১০ম শতকে মধ্যভারতে অভ্যুদিত শৈব পাশুপত সম্প্রদায়ের জন্য সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ রচনা করেন। ঐ সময়ে শৈবগণ সাধারণের কথ্য ভাষায়ই ধর্মপ্রচার করিতেন বলিয়া এই ব্যাকরণের শেষে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণও সংযোজিত হইয়াছে। ইহা এই ব্যাকরণের একটি বৈশিষ্ট্য। এই ব্যাকরণ সংক্ষিপ্তও নয় বা অন্য কোনও ব্যাকরণের সার-সংগ্রহও নয়। পরিশিষ্ট এবং প্রাকৃতপাদ মিলাইয়া ইহার সূত্র-সংখ্যা পাঁচহাজারের উপরে। এই সূত্র-বাহুল্য ক্লান্তিজনক। তবে সূত্রগুলি সরল এবং বিষয়-বিন্যাস সহজে ভাষা-শিক্ষার উপযোগী। পূর্ববর্তী প্রায় সমস্ত ব্যাকরণের প্রভাবই ইহাতে ন্যূনাধিক বর্তমান। জুমর নন্দী এবং গোয়ী চন্দ্র এই ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ের অপর দুই প্রধান পুরুষ। ইহারা যথাক্রমে এই ব্যাকরণের সংশোধিত বৃত্তির প্রণেতা এবং টীকাকার। বঙ্গদেশীয় কাতন্ত্রে দুর্গসিংহের যে স্থান, সংক্ষিপ্তসারে জুমর নন্দীর স্থান তদনুরূপ। তাঁহার বৃত্তিকে বলা হয় 'জৌমর বৃত্তি', এমনকি 'জৌমর ব্যাকরণ' নামেও এই ব্যাকরণ পরিচিত। জৌমর ধাতুমালা এই ব্যাকরণের একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ।

(ক্রমশঃ)

স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি*

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী নির্বেদানন্দ

নরেন্দ্রনাথ প্রথম প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সংশ্লিষ্ট নিজের সর্ববিধ অভিজ্ঞতাকেই ফরাসী দার্শনিক ডে-কার্টের মতো সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করলেও বারবার শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার ফলে ক্রমে স্থিরনিশ্চয় হলেন যে, তিনি নিজেই ভুল বুঝছেন। প্রথম দর্শনকালে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ একজন অর্ধোন্মাদ ব'লেই ধারণা করেছিলেন; কিন্তু ক্রমে বুদ্ধিজগতেও তাঁর পূর্ণ আধিপত্য রয়েছে দেখতে পেয়ে অসীম শ্রদ্ধায় তাঁর হৃদয় পূর্ণ হ'ল। ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের ফলে তিনি বুঝতে পারলেন, ধর্মাচার্য হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের মধ্যে এমন কিছুই নাই যাতে যুক্তির প্রতি তাঁর নিজের অতি অনুরাগ ব্যাহত হ'তে পারে। আধ্যাত্মিকতালিপ্সু শিষ্যকে শিক্ষাপ্রদানকালে ও তার কাছে নিজের উপলব্ধির কথা বলার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণভাবেই তা ক'রে থাকেন। তাঁর অনাড়ম্বর, উদার, নিরহঙ্কার ভাব লক্ষ্য করলে তাঁকে একজন গতানুগতিক আদেশকারি-ভাবাপন্ন আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা ব'লে মনে হ'ত না, বরং শিষ্যকে অবাধস্বাধীনতা-প্রদানকারী একজন বাস্তবতানিষ্ঠ আধুনিক সত্যান্বেষী ব'লেই ধারণা হ'ত। শিক্ষানবীশরা তাঁর অনেক কথা ধারণা করতে পারত না; কিন্তু তিনি কখনো একথা বলতেন না যে তিনি বলছেন ব'লেই তা মেনে নিতে হবে। বরং শিষ্যদের কাছে নিজের উপলব্ধিলব্ধ সত্যগুলি উত্থাপিত ক'রে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা-সহায়ে তা যাচিয়ে বাজিয়ে নিতে বলতেন। ধর্ম-নির্দিষ্ট বিভিন্ন পরীক্ষা-প্রণালীগুলি জানিয়ে দিতেন তিনি, এমনকি বিভিন্ন রুচির, বিভিন্ন ধাতের ও বিভিন্ন যোগ্যতার অধিকারী-দের জন্য বিভিন্ন পথও নির্দিষ্ট ক'রে দিতেন। মানব-মনস্তত্ত্বের ব্যাপক ও গভীর জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাঁর শিক্ষা-প্রণালী এবং তা কখনো যুক্তিবিরোধী হ'ত না। শ্রীরামকৃষ্ণের এই সব আচরণের ভেতর, তাঁর ক্ষিপ্রপ্রদত্ত সরস প্রত্যুত্তরের অন্তরস্থ অন্তর্ভেদী যুক্তির ভেতর, এবং তাঁর জ্ঞানালোকবর্ষী উপমায় বিচার ও সংগঠন-শীল কল্পনার বিস্ময়কর সামঞ্জস্যের ভেতর নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের আর একটা দিকের সন্ধান পেয়েছিলেন। বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রবণ দিকটিই নজরে আসত; তাঁর এই বুদ্ধিপ্রদীপ্ত দিকটিরও সন্ধান পেয়ে, তাঁর মধ্যে হৃদয় ও বুদ্ধির এই অনন্যসাধারণ সমন্বয় দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ। এর সঙ্গে নিজের ধাতের তুলনা ক'রে পরবর্তী-কালে নরেন্দ্রনাথ কবিসুলভ সুললিত ভাষায় বলেছিলেন, "বাইরে তিনি ছিলেন পুরোপুরি ভক্ত কিন্তু অন্তরে ছিলেন পূর্ণজ্ঞানী।... আমি হচ্ছি এর ঠিক বিপরীত।" এত সব দেখাশোনার ফলে তাঁর পূর্বের অবজ্ঞার ভাব ক্রমে প্রার্থনার রূপ নিল; কঠিন দুর্ভেদ্য পাষাণ কোমল হয়ে থনকের কাছে আত্মসমর্পণ করল, পাষাণ ভেদ করার কাজও হ'ল শুরু।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথার মূল্য নিজ উপলব্ধিসহায়ে যাচাই ক'রে বুঝে নেবার জন্য নরেন্দ্রনাথ তাঁর ওজস্বী মনের সব আগ্রহ, সব উৎসাহ কেন্দ্রীভূত

---

* লেখকের মূল গ্রন্থ 'Sri Ramakrishna & Spiritual Renaissance' হইতে অনূদিত—সঃ

ক'রে অধ্যাত্মসাধনা শুরু ক'রে দিলেন। গুরুর নির্দেশ মতো বিভিন্ন সাধনপদ্ধতি অনুসরণ ক'রে চললেন তিনি। এ সাধনাকে সম্পূর্ণ যুক্তি-সম্মত পরীক্ষাপ্রণালী ব'লে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ক'রে তিনি মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন এতে।

এ সময় নরেন্দ্রনাথের ভেতর যে পরিবর্তন এসেছিল তাকে অদ্ভুত পরিবর্তন, তর্ক- ও সিদ্ধান্ত ধারার একেবারে অচিন্তনীয় আমূল পরিবর্তনই বলতে হবে। আধুনিক ভারতের তৎ-কালীন প্রসিদ্ধ যুক্তিবাদী দার্শনিক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল একসময় তরুণ নরেন্দ্রনাথের বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক ছিলেন, তিনি নরেন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাসের এই দিক-পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে সে সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত দিয়ে গেছেন—"আমার চোখের সামনে যে পরিবর্তন ঘ'টে চলেছিল, খুব মনোযোগ দিয়ে আমি তা লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছিলাম। ধর্মভাব-বিহ্বলতা ও কালীপূজারূপ ধর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতিকে আমার মতো একজন বেদান্তবাদ, হীগেলের মতবাদ ও বিপ্লববাদের উদগ্র তরুণ পূজারী যে কি চোখে দেখতো, তা সহজেই অনুমেয়। যখন দেখলাম, আমার কাছে যা অজ্ঞেয়, অতি-প্রাকৃতিক রহস্যবাদ ব'লে মনে হত, তারই ফাঁদে ধরা পড়েছেন বিবেকানন্দের মতো স্বাধীনচিন্তাশীল, আজন্ম কালাপাহাড়ী-ভাবাপন্ন, নবভাবস্রষ্টা, প্রবল-প্রভাব বুদ্ধির অধিকারী এবং অপরকে নিজের ভাবে টেনে আনার মতো শক্তিমান একজন পুরুষ, তখন আমার বিশুদ্ধ যুক্তি-দর্শনের কাছে সেটা একটা হেঁয়ালীর মতোই ঠেকল; এর কোন রহস্যই তখন ভেদ করতে পারিনি।"

একদিন বেদান্তোক্ত চৈতন্যসত্তার সর্ব-ব্যাপিত্ব নিয়ে নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর আরো কয়েকজন গুরুভাই মিলে খুব হাসি-ঠাট্টা করছিলেন। বিষয়টিকে মাত্রাহীন ভাবে অতি-রঞ্জিত ও হাস্যকর ব'লে মনে হচ্ছিল তাঁদের। ঠাট্টা ক'রে তাঁরা বলছিলেন, "এই ঘটিটাও ঈশ্বর!...এই মাছিগুলোও ঈশ্বর!" আর হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছিলেন। এমন সময় ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে এসে নরেন্দ্রনাথের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে স্পর্শ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের অনুভূতিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলজগৎ চৈতন্যময় জগতে রূপায়িত হ'ল—সকলের ভেতর, চেতন-অচেতন সবকিছুর ভেতর তিনি সর্বব্যাপী আনন্দময় এক শুদ্ধ চৈতন্যের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। বাড়ী ফিরে যাবার পরও তাঁর এই সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন চলতে থাকল; যা দেখেন, স্পর্শ করেন, তারই ভেতর ঈশ্বরকে দেখতে লাগলেন। তাঁর এই আধ্যাত্মিক ভাবাবেশ কয়েকদিন যাবৎ রয়ে গিয়েছিল।

ঋণ ও দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে সংসারটিকে ডুবিয়ে দিয়ে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথের পিতা দেহত্যাগ করলেন; নরেন্দ্রনাথই ভাইদের মধ্যে বয়সে বড় ছিলেন; কাজেই সাহস নিয়ে এই দুঃসহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার জন্য উঠে-পড়ে লাগতে হ'ল তাঁকে। কোন রকমে বেঁচে থাকার জন্য কঠিন ও করুণ সংগ্রাম শুরু হ'ল, যার ফলে জীবনের কঠোর বাস্তবতার স্পর্শ লাগল এই তরুণ সত্যান্বেষীর মনে। চারপাশের জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে মোহ কেটে যাওয়ায় হৃদয়ে যে দারুণ আঘাত লাগল, সে আঘাতে আরাম-কেদারায় বসে চিন্তা করা কৈশোরের দার্শনিক তত্ত্বগুলি শতধা চূর্ণ হয়ে গেল; দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যাত্মা ঋষির প্রেরণায় মনে সম্প্রতি যে বিশ্বাস গড়ে উঠছিল, যৌবনের সে বিশ্বাসও ভেঙ্গেচুরে গুঁড়ো হয়ে গেল। বাহ্য-প্রলেপ ও চাকচিক্য টুটে যাওয়ায় সমাজকে এখন পূতিগন্ধময় একটা মৃতদেহ ব'লে মনে

হ'ত—যা দেখলেই বমি আসে। সমাজের নির্দয় অন্তর্জীবনের সঙ্গে দুঃখকর সংযোগের ফলে তিনি হতাশা-ক্ষুব্ধ হলেন; মনে মানুষের প্রতি ঘৃণা জাগল। তাঁর বিক্ষুব্ধ চিত্ত জগৎ ও জগৎ-স্রষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উদ্যতপ্রায় হয়ে উঠল। সর্ববিষয়ে ভ্রূক্ষেপহীন সারল্য নিয়ে নিজের শোচনীয় অভিজ্ঞতার যে মর্মন্তুদ কাহিনী তিনি বিবৃত করেছেন, তা থেকেই বোঝা যায় যে, সহানুভূতির অভাবে তাঁর গর্বিত হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল, মাথা ঘুরে গিয়েছিল: "অনাহারে নগ্নপদে চাকরির আবেদন হাতে নিয়ে দুপুরের প্রচণ্ড রোদে আফিস থেকে আফিসে ঘুরে বেড়াতাম, সব জায়গা থেকেই বিফলমনোরথ হয়ে ফিরতে হ'ত। সংসারের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়েই বিশেষ-ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম যে, স্বার্থশূন্য সহানুভূতি এখানে অতীব বিরল—দুর্বলের দরিদ্রের স্থান এখানে নেই। দেখতাম, দুদিন আগেও যারা আমাকে কোন বিষয়ে কিছুমাত্র সহায়তা করার সুযোগ পেলে নিজেদের ধন্য জ্ঞান করেছে, সময় বুঝে তারাই এখন আমাকে দেখে মুখ বাঁকাচ্ছে এবং ক্ষমতা থাকলেও সাহায্য করতে চাইছে না। দেখে শুনে কখনো কখনো সংসারটা দানবের রচনা ব'লে মনে হ'ত। মনে হয়, এই সময় একদিন রোদে ঘুরতে ঘুরতে পায়ের তলায় ফোস্‌কা হয়েছিল এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের ছায়ায় বসে পড়েছিলাম। দু-একজন বন্ধু সেদিন সঙ্গে ছিল। তাদের মধ্যে একজন বোধহয় আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য গেয়েছিল—'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিঃশ্বাস পবনে…।' শুনে মনে হ'ল, মাথায় যেন কে লাঠি মারছে। মা ও ভাইদের নিতান্ত অসহায় অবস্থার কথা মনে পড়ায় ক্ষোভে, অভিমানে, নিরাশায় ব'লে উঠেছিলাম, 'নে, নে, চুপ কর, খিদের জ্বালায় যাদের আত্মীয়গণকে কষ্ট পেতে হয় না, খাওয়া-পরার অভাব যাদের কখনো সইতে হয় নাই, টানাপাখার হাওয়া খেতে খেতে তাদের কাছে এরূপ কল্পনা মধুর লাগতে পারে, আমারও একদিন লাগত; কঠোর সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে এখন একে বিষম ব্যঙ্গ ব'লে মনে হচ্ছে।' আমার কথায় বন্ধুটি বোধহয় নিতান্ত ক্ষুন্ন হয়েছিল—দারিদ্র্যের কী কঠোর পেষণে মুখ থেকে ঐ কথাগুলো বেরিয়েছিল, তা সে জানবে কি ক'রে? সকালে উঠে গোপনে খবর নিয়ে যেদিন জানতে পারতাম ঘরে সকলের মতো খাবার নেই, হাতে পয়সাও নেই, সেদিন মাকে 'আমার নিমন্ত্রণ আছে' ব'লে বেরিয়ে যেতাম; কোনদিন সামান্য কিছু খেয়ে, কোনদিন উপোস ক'রেই কাটিয়ে দিতাম। ধনী বন্ধুরা কখনো কখনো তাদের বাড়ীতে গিয়ে গান গাইবার আমন্ত্রণ জানাতো, কিন্তু আমার আর্থিক দুরবস্থার বিষয় খবর নেবার কৌতূহল তাদের ভেতর প্রায় কারুরই হ'ত না। আমি নিজের মনের ভেতরই তা চেপে রাখতাম।"

যে জগতে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যায়, সে জগতের স্রষ্টা করুণাময় ঈশ্বর! নরেন্দ্রনাথের মনে এরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে উঠলো। তাঁর মানসরাজ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক বিজয়-অভিযানের পূর্বের যে সন্দিগ্ধতা মনের গভীরতর প্রদেশে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল, তা এখন সদর্পে বেরিয়ে এসে তাঁর মনের ওপর নিজের প্রভাব বিস্তার ক'রে বসল এবং প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করতে লাগল—দেখে শুনে জগৎটাকে পিশাচের সৃষ্টি ব'লেই মনে হয়, এর মূলে কোন করুণাময় মঙ্গলময় ঈশ্বর

নেই। ইতিপূর্বে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের বই প'ড়ে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত যে অমঙ্গলের পূর্বাভাষ তিনি একটু পেয়েছিলেন, যার বাস্তব স্পর্শ লাভ ক'রে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন, এখন তা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মতো তাঁর ওপর ফেটে পড়ল। তাঁর হৃদয়রূপ পাষাণ ভেদ ক'রে যে খননকার্য শ্রীরামকৃষ্ণ শুরু করেছিলেন, ভয়াবহ দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা ও আত্মীয়স্বজনের ঔদাসীন্য সে-কাজে সত্যই বিস্ফোরক-প্রয়োগের কাজ করল। সে বিস্ফোরণে তাঁর সুখ-লালিত বুদ্ধিবৃত্তিকেন্দ্রিক জীবনরূপ বহিস্তরটি ভেঙ্গে গিয়ে ভেতর থেকে আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে বদ্ধমূল অবিশ্বাসরূপ গন্ধকজাত জমাট আবর্জনা-গুলো বের হয়ে গেল। কিছুদিন ধরে তিনি বিকট ধূম এবং গলিত উত্তপ্ত গিরিস্রাব উদ্গীরণ ক'রে চললেন। সর্ববিধ আস্তিক্য-ভাবের ওপর তাঁর কথাগুলো বোমার মতো ফেটে পড়তে লাগল। তাঁর গর্বোন্নত বিদ্রোহী মন ঈশ্বর ও ধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড প্রতিবাদের মতো মাথা তুলে দাঁড়াল।

বন্ধু ও আত্মীয়েরা ভুল বুঝলেন তাঁকে। তাঁর অন্তরে দিব্য আনন্দের চিরন্তন ধারার উৎস-মুখ আবৃত ক'রে যে বিস্ফোরক পদার্থগুলি জমে ছিল, সেগুলিকে সরিয়ে দেবার প্রয়োজনেই যে তাঁর এই নাস্তিকতার বজ্রনাদ, সেকথা তখন তাঁদের ধারণাতেই এলো না! কাজেই তাঁকে নিন্দা করার লোকেরও অভাব হ'ল না, তাঁরা ব'লে বেড়াতে লাগলেন যে, নরেন্দ্রনাথ নাস্তিক হয়ে গেছেন, বোধ হয় লম্পটও হয়েছেন, সংশোধনের কোন আশাও নাই আর। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিশ্বাস অটল রেখেছিলেন, উদ্গীরণের ফলে নরেন্দ্র-নাথের হৃদয়ে সঞ্চিত ঈশ্বরে-অবিশ্বাসরূপ বাহ্য আবর্জনা কখন নিঃশেষ হয়ে যাবে, ধৈর্য নিয়ে সেই শুভমুহূর্তের প্রতীক্ষায় ছিলেন তিনি। গুরুর এই সীমাহীন ভালবাসা- ও ধৈর্য-প্রসঙ্গে পরে তিনি বলেছেন, "একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণই আমার ওপর বিশ্বাস অটল রেখেছিলেন ; আমার মা ও ভাইরা পর্যন্ত তা রাখতে পারেন নাই। আমার প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাসই তাঁর সঙ্গে আমার চিরমিলন ঘটিয়েছিল। ভালবাসা কাকে বলে, তা একমাত্র তিনি জানতেন।"

বেশ দীর্ঘদিন একটানা যন্ত্রণা-ভোগের পর নরেন্দ্রনাথ যখন শারীরিক ও মানসিক অবসাদের শেষসীমায় এসে পৌছেছেন, তখন হঠাৎ একদিন বিস্মিত হয়ে দেখলেন, প্রায় অলৌকিকভাবে তাঁর ভেতর থেকে আধ্যাত্মিকতার ধারা হু-হু ক'রে বেরিয়ে আসছে, এ-ধরনের অনুভূতি তাঁর জীবনে এই প্রথম। উৎস-মুখের আবরণ ক্রমে পাতলা হয়ে আসছিল, সেই মুহূর্তে একটা ছোট ছিদ্রপথ হয়েছিল তাতে, আর তার ভেতর দিয়েই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের তরল ধারা বেরিয়ে এসে তাঁর মনের ভেতর যেটুকু সন্দেহ ও বিভ্রান্তি তখনো অবশিষ্ট ছিল তার সবটুকুই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে দিয়ে গেল। সহসা-প্রদীপ্ত প্রজ্ঞা-সঞ্জাত জ্ঞানালোকে হৃদয় ভরে উঠল। সে আলোকে তিনি দেখতে পেলেন ঈশ্বরের করুণার সঙ্গে জগতের দুঃখকষ্টের সামঞ্জস্যবিধান কিভাবে সম্ভব হয়। এই অনুভূতিলাভের পূর্বে অসীম হতাশা ও শারীরিক অবসাদে তিনি পথের পাশে একটা রোয়াকের ওপর শুয়ে পড়েছিলেন ; এখন অনির্বচনীয় আনন্দধারায় স্নাত হয়ে মৃগশিশুর মতো হালকা শরীর নিয়ে সেখান থেকে উঠে পড়লেন। প্রজ্ঞাসহায়ে জানতে পারলেন যে গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করার জন্য তিনি পৃথিবীতে আসেন নাই।

(ক্রমশঃ)

যুক্তি বিজ্ঞান ও ধর্ম

অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে, বিজ্ঞান যুক্তি-নির্ভর এবং ধর্ম বিশ্বাস-নির্ভর এবং এটাই নাকি এদের মৌলিক পার্থক্য। অনেক প্রচলিত ধারণার মতোই এ ধারণাও সত্য নয়। বর্তমান জগতে মানুষের পক্ষে ধর্মের প্রয়োজন পুরনো যে-কোন যুগের থেকে কম তো নয়-ই, বরং বেশী। সে-ধর্ম যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার ক'রে নিতে হবে, তবেই গ্রহণ করা চলবে।

মানুষের সমস্ত জীবনকে যা' বিধৃত ক'রে আছে তাই ধর্ম। স্বামীজী তাঁর পরিচ্ছন্ন ভাষায় একে বলেছেন, 'মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশই ধর্ম।" এই দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মকে কোন বিশেষ নামে সনাক্ত করা চলে না। দেবত্বের বিকাশ হিন্দুর মধ্যে যতখানি হ'তে পারে, মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতির মধ্যেও ঠিক ততখানিই হ'তে পারে। তবে সবটাই নির্ভর করছে, সে কেমনভাবে জীবন গঠন ও পরিচালনা করবে তার ওপর। একটি বিশ্বজনীন ধর্মের প্রয়োজন বর্তমানে সর্বাধিক—এখন একে কবির ভাষায় 'মানুষের ধর্ম' বা অন্য যে-কোন আখ্যাই দিই না কেন।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য, যে-কোন ধর্মের প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন অন্ধ বিশ্বাস কাজ করেছে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে তার পুনরাবির্ভাব এখনও হয় মাঝে মাঝে। এর কারণ—স্বার্থসিদ্ধি; "দেবত্বের বিকাশ" নিশ্চয়ই নয়। সব প্রচলিত ধর্মেই পুরোহিত-সম্প্রদায়ের শোষণের কথা সর্বজনবিদিত। হাল আমলে ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তাও কারুর অজানা নেই। বিজ্ঞানকেও অনুরূপভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ; কিন্তু তাই ব'লে বিজ্ঞানকে কেউ অভিযুক্ত করে না। ধর্ম 'মনের আফিং', অতএব নির্দ্বিধায় পরিত্যাজ্য—এই মতবাদ কিন্তু সহজেই গ্রহণ করা হয়। বিজ্ঞান ও ধর্মকে এই বিপরীত দৃষ্টিতে দেখার কারণ কী ? ধর্মের মূল কথা যে যুক্তির দৃঢ়ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা' জানা না থাকার দরুনই এই বিভ্রম হচ্ছে।

একটা কথা প্রথমেই ব'লে রাখা ভাল—যুক্তি ও বিশ্বাস পরস্পর-বিরোধী, এ ধারণা কিন্তু অনেকাংশে অসত্য। যখন কোন মানুষের যুক্তির উপরই একান্তভাবে নির্ভর করার প্রবণতা দেখা যায় তখনও একথা সত্য যে, তার নিজের যুক্তির অভ্রান্ততার ওপর তার অগাধ বিশ্বাস আছে ব'লেই সে ওরূপ করছে। এছাড়া, আজ যেটা যুক্তি, কাল তা' বিশ্বাসে পরিণত হ'তে পারে। যেমন ধরুন, স্যার আইজ্যাক নিউটনের "গতির তৃতীয় সূত্র" ('প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সম প্রতিক্রিয়া আছে') যুক্তির ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছিল এবং এখনও হ'তে পারে। কিন্তু আমরা প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে একে সত্য ব'লে ধরে নিই ; কারণ নিউটনের কথায় আমাদের বিশ্বাস আছে। অথবা আধুনিক পদার্থবিদ্যায় ইলেকট্রন ইত্যাদির অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে ; আমরা চোখে না দেখলেও তা' বিশ্বাস করি, কারণ পদার্থবিদ্‌দের যুক্তির ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে। এরকম অজস্র দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়। এর দ্বারা একটি কথাই প্রমাণিত হয়—যুক্তি ও বিশ্বাস অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী তো নয়ই, বরং হাত-ধরাধরি

ক'রে চলে। মহামুনি পতঞ্জলি একে বলেছেন, "আগম"-প্রমাণ ; ইংরেজীতে বলা যায় "citing authority" অথবা তর্কশাস্ত্রের পরিভাষায় "argumentum ad veracundium"। মতে অবিশ্বাস বা সংশয় দেখা দিলে অবশ্যই যুক্তিকে আশ্রয় করতে হবে এবং বিচারের মাপকাঠি হিসাবে ধরতে হবে।

সম্পূর্ণ যুক্তি-নির্ভর একটি বিশ্বজনীন ধর্মের বর্তমানে কেন প্রয়োজন, এরূপ ধর্ম আদৌ আছে কিনা বা সম্ভব কিনা, থাকলে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন হবে—এসব প্রশ্ন বিশদভাবে আলোচনার সময় আজ এসেছে। একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তা সম্ভব নয় মোটেই, তবে প্রধান বক্তব্যগুলি অন্ততঃ সূত্রাকারে এখানে তুলে ধরা যেতে পারে।

বিংশ শতাব্দীতে দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে। তৃতীয় আর একটির সম্ভাবনাও বাদ দেওয়া যাচ্ছে না, যতক্ষণ পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার ও অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রণমুখী রাষ্ট্র-সমূহ অবস্থান করছে। রণলিপ্ত হ'তে তাদের আর কতক্ষণ ? বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এ যুদ্ধের আবির্ভাব ও অবসান হ'তে পারে ; কিন্তু মাঝখানে নিশ্চয়ই রেখে যাবে মানুষের বহু শতাব্দীর আয়াসসাধ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি বীভৎস ধ্বংসস্তূপ। একেই মহাপ্রলয় বলে কিনা জানি না। তবে আত্মহা মানুষ যে একটা প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, তার যথেষ্ট প্রমাণ জাতির অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিদিন পাওয়া যাচ্ছে। আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মজয়ের প্রয়োজন তাই দুনিয়ার মানুষের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে সুনির্দিষ্ট হওয়ার কাল এসেছে। আত্মজয়ের বিজ্ঞানের নামই ধর্ম—সে ধর্ম বলে, একের বিকাশই বহু। আসল সত্তা এক ; কিন্তু তাকেই আমরা "বহুরূপে সম্মুখে" দেখতে পাই —"একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি", উপনিষদে এমন ধর্মেরই নিঃসন্দিগ্ধ, অকুতোভয় ব্যাখ্যান আছে। পরিষ্কার বলা হয়েছে—

"সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥"

একই পরমসত্তা বিশ্বচরাচরে অনুস্যূত হয়ে আছেন—তাঁকে এখন যে নামেই ডাকা হোক না কেন।

আধুনিক পদার্থবিদ্যা একই তত্ত্বের দিকে চলেছে মনে হয়। যুক্তি দিয়েই অবশ্য এ সত্য পাওয়া গেছে যে, বস্তু (mass) ও শক্তি (energy) আলাদা কিছু নয় ; একটি অপরটিতে নিরন্তর রূপান্তরিত হয়ে চলেছে—আইনস্টাইন বহুদিন পূর্বেই প্রমাণিত করেছেন যুক্তি ও গবেষণার সাহায্যে। কিন্তু একটি দ্বৈতের (energy and space) সম্মুখীন হয়ে পদার্থবিজ্ঞান আর এগুতে পারছে না। ভারতীয় দর্শনের দ্বৈত, যেমন 'প্রাণ ও আকাশ' বা "পুরুষ ও প্রকৃতি" কিন্তু এক, অদ্বিতীয় ব্রহ্মে গিয়ে লীন হয়েছে। Energy ও space-ও যে বস্তুতঃ একই সত্তার অভিব্যক্তিমাত্র—এ-সত্যে উপনীত হবার জন্য পাশ্চাত্য পদার্থবিদদের আকুলতার সীমা নেই। এর নজীর মেলে আইনস্টাইনের 'Unified Field Research'-এ। অদ্বৈত বেদান্ত বহু শতাব্দী পূর্বে এক সত্তা বা ব্রহ্মের কথা আশ্চর্য স্বচ্ছতা ও নির্ভীকতার সঙ্গে ঘোষণা করেছে। 'ব্রহ্ম' এই নামকরণ সবার মনঃপূত না হ'তে পারে, হিঁদুয়ানির গন্ধও হয়ত এর মধ্যে অনেকে পেতে পারেন ; কিন্তু তাই ব'লে এর সত্যতা এবং মূল যুক্তিগ্রাহ্যতা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। দুনিয়াসুদ্ধ সবই যদি একই সত্তার বিকাশ

হয় এবং তা' সবার জানা থাকে তবে বিরোধ ও সংগ্রামের স্পৃহা আর থাকে না। দুর্ভাগ্যক্রমে এ সত্যটি আমাদের অধিকাংশের জানা নেই। যাদের জানা আছে তাদেরও সেইমত উপলব্ধি হয়নি। আপামর জনসাধারণকে এই সত্য জানানোর প্রয়োজন আজ দেখা দিয়েছে, কারণ সাধারণ মানুষ আজ সব-চাইতে সচেতন। স্বামীজী তাই বলেছেন: "বনের বেদান্তকে ঘরে আনতে হবে," বেদান্তের মতো সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য একটি বিশ্বজনীন ধর্মের প্রয়োজন বর্তমানে বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। যার যা' ধর্ম (হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান) তা' নিয়েই সে থাক; কিন্তু সব সময়েই মনে রাখতে হবে, আমরা এক সত্তারই বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। পূর্ণ ধার্মিক হলেই পূর্ণ ধর্ম-নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এর জলন্ত প্রমাণ। তিনি যখন বলেন, একই 'জল', তাকে কেউ বলে 'পানি', কেউ বলে 'ওয়াটার', কেউ-বা বলে 'aqua'; অনুরূপভাবে একই পরমসত্তা, কেউ বলে 'ঈশ্বর', কেউ বলে 'আল্লা', কেউ বলে 'গড', তখন বুঝতে কিছু অসুবিধা হয় না। বিরোধের ভাবও অন্ততঃ সাময়িকভাবে মন থেকে মুছে যায়। কবি যখন বলেন:

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্ম-পর;
আমার দেবতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর?"

তখনও একই ধরনের ঐক্যানুভূতি আমাদের মনে জাগে।

সুতরাং সমস্ত পৃথিবীর মানুষের প্রাণে সাড়া জাগাতে পারে এমন ধর্ম আছে বইকি এবং এই ধর্ম সম্পূর্ণ যুক্তি-নির্ভর। জৈব অস্তিত্বের যেমন ক্রমবিকাশ (evolution) এবং ক্রম-সঙ্কোচন (involution) সব সময়েই ছিল এবং আছে, তাত্ত্বিক আলোচনায়ও তেমনি বরাবরই বিশ্লেষণ (analysis) এবং সংশ্লেষণ (synthesis) ছিল এবং আছে। বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে 'বহুই' সর্বদা বিদ্যমান, আর সংশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে 'একই' চিরন্তন সত্য। সংশ্লেষণের বৈশিষ্ট্য হ'ল সামান্যীকরণ (generalisation)। সামান্যীকরণের প্রধান লক্ষণ আবার আপাতবৈষম্য বা বহিরঙ্গের বিভেদকে পরিত্যাগ ক'রে অন্তরঙ্গ ঐক্যকে খুঁজে বার করা। একটি ছোট দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে—ট্রামে বা বাসে যখন চড়ি, তখন মানুষে মানুষে বিভেদ করা হয়; 'Ladies' seat' লেখা থাকায় নর-নারী-বিভেদ স্বীকৃত হয় বিশেষভাবে। কিন্তু অন্য প্রাণীর যেমন, Feline species—cat, tiger, lion, etc. অথবা Bovine species—cow, buffalo, bison, etc. থেকে মানুষকে (human species or homo sapiens) যখন পৃথক বলি তখন মানুষের rationality-কে differentia হিসেবে ধরি, নরনারীবিভেদ ঘুচে যায়। আবার প্রাণিজগৎকে যখন জড়পদার্থ থেকে পৃথক বলি, তখন sensory—reactions-কে differentia হিসেবে ধরি; মানুষ, গরু, বাঘ, সিংহের ভেদ তখন দেখি না—সবাই এরা নড়ে-চড়ে, খায়-দায়, ঘুমায়, বংশ-বৃদ্ধি করে; জড়পদার্থ তা' করে না। এর থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হচ্ছে—সামান্যীকরণ যত ব্যাপক হচ্ছে, তত আপাত-বিভেদকে কম গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং মূল ঐক্যকে জোর দেওয়া হচ্ছে। সামান্যীকরণের চূড়ান্ত সীমা হ'ল শুদ্ধসত্তা—"সদেব সৌম্য ইদমগ্রে আসীৎ।" একেরই ক্রমবিকাশ ও ক্রমসঙ্কোচন বিশ্বচরাচর জুড়ে বরাবর চলেছে; যার যুক্তিতে এখন যতটুকু ধরা পড়ে—সবার যুক্তি কিছু

সমান নয়। স্বামীজী যখন বলেন, অলৌকিক ব'লে বাস্তবিক কিছু নেই, তখন এই অর্থেই তিনি উহা বলেন। বাস্তবিক বিশ্বপ্রকৃতি বা মানবপ্রকৃতিকে আমরা কতটুকু জানি? আমাদের জানার পরিধির বাইরে হলেই তা' আমাদের কাছে অলৌকিক ব'লে মনে হয়। আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্বপ্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় রহস্য-জালকে যুক্তির সাহায্যে ছিন্ন করতে গিয়ে এক পরম ঐক্যের আভাসমাত্র পেয়ে ফিরে ফিরে আসছে। অদ্বৈতবেদান্ত মানুষের অন্তঃ-প্রকৃতির নিগূঢ় মায়াকে যুক্তির আলোকে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে পেয়েছিল পরম ঐক্যের সন্ধান, বলতে পেরেছিল নিঃসংশয়ে—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

যুক্তি উপায়মাত্র; সত্যে উপনীত হওয়াই লক্ষ্য। বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়ের ক্ষেত্রেই মূল লক্ষ্য অভিন্ন—তা' হ'ল সত্যলাভ। এই সত্য-লাভের জন্য উভয়েই যুক্তিকে তৃপ্ত করতে চায়। কিন্তু এই যুক্তি তর্কমাত্র নয়—পতঞ্জলি-নির্দিষ্ট তিন প্রকার প্রমাণ-ই ["প্রত্যক্ষানু-মানাগমাঃ প্রমাণানি"—(১) প্রত্যক্ষ (direct perception), (২) অনুমান (inference) এবং (৩) আগম (প্রত্যক্ষদ্রষ্টার কথা, authority)] প্রয়োজনমত এর দ্বারা গৃহীত হয়ে থাকে। একথা বিজ্ঞানচর্চায় যতখানি সত্য, ধর্মানুসন্ধানেও ততখানিই সত্য। সুতরাং যুক্তিই হ'ল সেই সেতু, যা' আধুনিক বিজ্ঞান ও সনাতন ধর্মের মিলন সাধন করতে পারে। সৌভাগ্যের কথা, আধুনিক দুনিয়ার সেরা মনীষীদের নজর এইদিকে একটু একটু ক'রে পড়ছে; আগামী কালে আরও পড়বে একথা সুনিশ্চিত।

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত 'বেদান্তকেশরী'

[অনুবাদ: পূর্বপ্রকাশিতের পর]

অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য

সাত্ত্বিক বৃত্তিতে যার হয় প্রতিচ্ছবি,
আবির্ভাব সত্ত্বগুণী প্রাণে হয় যার,
দেখা দেয় শিশুযুবাবৃদ্ধ-আদিরূপে,
শরীর-বিকারে যার না হয় বিকার,
তাঁহার উত্তম গতি কর্তব্য জানিয়া
বিচক্ষণ জীব তাঁরে, সঙ্কল্পে অচল,
অভ্যাসের বশে করি দেবত্বে উন্নীত,
ঊর্ধ্বে লন নিঃসংকল্প করিয়া অন্তর ॥৪৫

কামনার অন্ত মনে—হয়ে শূন্যকাম,
কাম্য আত্মামাত্র, সুখসায়রে মগন,
আত্মলাভে হয়ে আপ্তকাম, দেহলয়ে
চরম অবস্থা'পরে করে অবস্থান।
দেহান্তে তাঁহার প্রাণ পুনঃ না জনমে,
প্রবেশ না করে পুনরায় দেহান্তরে;
পরপর স্বকারণে পরম আত্মায়
হয় তাহা লীন—যথা লবণ সাগরে ॥৪৬

সাগরের জল যদি হয় ঘনীভূত
লোকে তাহা যেরূপ সৈন্ধব নাম ধরে,
পুনরায় জলধিতে করিলে নিক্ষেপ
লীন হয় তাহা, নামরূপ পরিহরে,
সেইমত আত্মজ্ঞানী পরমাত্মা সনে
মিশি যায়; চিত্ত মিশে চন্দ্রিমার সনে,
অনলে বচন, সূর্যে চক্ষু, পরিণত
হয় রক্ত-আদি জলে, শ্রবণ গগনে ॥৪৭

দুগ্ধমাঝে ঘৃত যথা হয় পরিজ্ঞাত
মাধুর্যে পৃথক্ বলি, ঠিক তাবি সম
লোকাচারে জীব হতে ব্রহ্ম বিলক্ষণ।
তবু তায় শ্রান্তি হতে বিশ্রাম পরম
যা লভিলে অন্য লাভ তৃণপ্রায় গণে।
যেথা কভু নাহি হয় ভীতির উদ্ভব,
নিবিড় আনন্দরূপে স্ফুরে যা অন্তরে,
অমৃত তা জেনো, আর বিনশ্বর সব ॥৪৮

তন্তু দিয়া ওতপ্রোত বিস্তৃত বসন
বিবিধ বিচিত্র বর্ণে সর্বত্র রঞ্জিত;
বিশ্লেষণে বিচারিলে তাহার স্বরূপ
বস্ত্র হয় সূত্রমাত্রে শেষে অবসিত।
সেইমত বিশ্ব এই বিচিত্র রচনা,
গিরি পুর গ্রাম নর পশুর আবাস,
বিরাটের মূলরূপে প্রোত ইহা, আর
বিরাট আকাশে, তথা ব্রহ্মেতে আকাশ ॥৪৯

উপাধির ভেদে প্রতিবিম্ব রূপে রূপে,
ভিন্ন ভিন্ন রূপ তাঁর, যেন নানা বেশ;
দ্রষ্টা এক, জলমাঝে হয় অনুরূপ
প্রতিচ্ছবি দিকে দিকে অসংখ্য অশেষ।
শ্রুতিমন্ত্রে মায়াবলে ইন্দ্র নানারূপ
উক্ত হন, সর্বব্যাপী ব্রহ্ম সেইমত
জীবরূপ ধরি অকস্মাৎ বুদ্ধি-রূপ
স্বচ্ছ উপাধিতে যেন প্রতিবিম্ব-গত ॥৫০

তত্ত্বজ্ঞ হেরেন নিজ শুদ্ধবুদ্ধিবলে
রবি সম বিধাতার প্রবল মায়ায়
কিরণের মত অগণিত প্রতিচ্ছবি
জীব ভাসে বুদ্ধি যেথা সাগরের প্রায়।
যেরূপ আকার যেথা হয় দর্পণের,
মুখ তাতে মুকুরিত হয় সেইমত;
আদর্শের অনুরূপ ব্রহ্মবস্তু হন,
তবু নিজ সৎ-স্বরূপে রহেন সতত ॥৫১

এক রবি নানা জলে যথা শোভা পায়,
নানা পাত্রে নানা ভাবে হয়ে ছায়ান্বিত,
আধারের স্থিরত্ব-চাঞ্চল্য অনুসারে
পরমাত্মা হন নানাভাবে অধিষ্ঠিত—
ছোট বড় নানা জীবে প্রতিচ্ছবি সম
হন তাবি নিজ নিজ স্বভাবানুমত;
বাস্তবিক সেই সেই স্বভাবে অস্পৃষ্ট
পরমাত্মা জ্ঞানিচিত্তে হন প্রতিভাত ॥৫২

যেরূপ ভাস্কর-রশ্মি সুধাকরগ্রহে
প্রতিফলনের ফলে করে বিদূরিত
নিবিড় নিশীথ-তমঃ গৃহমাঝে পশি,
কিংবা কাংস্যপাত্রে যদি হয় বিচ্ছুরিত,
সেইমত পরমাত্মা বুদ্ধিতে প্রকাশি
ইন্দ্রিয়ের দ্বারে বাহিরিয়া উদ্ভাসয়
রূপ রস গন্ধ আদি পদার্থসকল,
স্বজ্যোতিতে বৃত্তি সব করে প্রভাময় ॥৫৩

উপাধির বশে ব্রহ্ম হন প্রকাশিত—
তিন ভাবে—পরমাত্মা, বুদ্ধিতে সীমিত,
আর বুদ্ধিমাঝে শুধু আভাসের প্রায়;
সলিলে গগন যথা ত্রিধা রূপায়িত—
জলে অবচ্ছিন্ন, প্রতিবিম্বে পরিণত,
পরিব্যাপ্ত সলিলের বাহিরে ভিতরে।
পূর্ণ আর বুদ্ধিগত হলে একীভূত,
অবিদ্যা স্বকার্য সহ অন্তর্ধান করে ॥৫৪

সৃষ্টিতত্ত্বে বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান

ব্রহ্মচারী অমিতাভ

ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, তা ক্রমশই শাখা বিস্তার করতে করতে পুষ্টিলাভ করেছে বেদান্তের দৃঢ় ভিত্তিতে। ঠিক তেমনি ক'রেই গীর্জাঘরের লণ্ঠনের দোলা গ্যালিলিওর মনে যে রং ধরিয়েছিল, তা বিজ্ঞানের পুরোনো ধারণা-গুলিকে পালটাতে পালটাতে সজ্জিত হলো নতুন রূপে। বস্তুতঃ আজ তাই সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে দেখি এক অপূর্ব সামঞ্জস্য।

পেছনের দিকে তাকাতে তাকাতে বৈজ্ঞানিকেরা খুঁজে পেলেন ধূলি-মেঘকে (dust-cloud); ওরাই এ বিশ্বের প্রথম বাসিন্দা। আকাশের বুকে হঠাৎ এক শক্তি অনুভব ক'রে বিকিরণ (radiation) ছড়াতে লাগলো ঐ মেঘের দল। তীব্র উষ্ণতায় জন্ম নিলো বিভিন্ন নীহারিকা (galaxy)। জন্মের পর থেকেই কিন্তু ওরা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। তাই সৃষ্টির পরক্ষণ থেকেই ওরা পরস্পরের কাছ থেকে দ্রুতবেগে ছুটে চললো বিভিন্ন দিকে আর তারই সাথে সৃষ্টি ক'রে চললো অসংখ্য তারা (star)। এই তারাগুলি আবার তৈরি করলো বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহকে। তারাগুলির মধ্যে বেশির ভাগ অংশই কেবল তীব্র তেজ। গ্রহ-উপগ্রহগুলি কালের বিবর্তনে ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগলো —প্রথমে তরল ও পরে কঠিন অবস্থায় পরিণত হলো। বেদান্ত এ মত জানিয়েছিলো বহু আগেই। মরুৎ, তেজ, অপ্ ও ক্ষিতি —কালের বিবর্তনে একে একে এরা হাজির হয়। মরুৎ (airy or gaseous material) থেকে তেজ (radiation) ছড়ানোর ফলে বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি—বেদান্তের এ মত তো বিজ্ঞান আগেই স্বীকার করেছে; আর কে না জানে, এর ফলে উৎপন্ন পদার্থ ঠাণ্ডা হ'তে হ'তে প্রথমে অপ্ (liquid state) ও পরে ক্ষিতিতে (solid state) পরিণত হয়।

প্রশ্ন উঠবে, বেদান্ত বলছে—'আকাশাৎ বায়ুঃ' অর্থাৎ আকাশ থেকেই বায়বীয় প্রথম পদার্থের সৃষ্টি। তবে কি এই ধূলি-মেঘের (dust-cloud) সৃষ্টি ঘটেছে আকাশ থেকে? বেদান্তের মতে আকাশের (space) উপর প্রাণের (cosmic energy) ক্রিয়ার ফলেই ঘটেছে এই বিশ্ব-সৃষ্টি। এ প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞান এখনও চুপ; তবুও দেখা যায় বেদান্তকেই বিজ্ঞান সমর্থন করছে এ ব্যাপারে। মাঝে একটি কথা ব'লে নিই। এই বিশ্ব কিন্তু আর পাঁচটা জিনিসের মতোই সসীম (finite)। প্রবল ঘণ্টাধ্বনির মতো বিস্ফোরণ (the big bang) ক'রে যে বিশ্ব শুরু হয়েছিল, তা আজ বাড়তে বাড়তে বিরাট হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে আরো বড় হবে, কারণ এ প্রতিক্ষণেই বেড়ে চলেছে। তারপর? শেষের কথাটি শেষেই বলবো, কারণ পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগছে—'বিশ্ব বাড়ছে' ব্যাপারটা কি। বৈজ্ঞানিকেরা দিলেন বেলুনের উদাহরণ। একটি বেলুনের গায়ে হরেক রঙের কালির ছিটে (inkspot)। ফুঁ দেওয়ার সাথে সাথে বেলুনটি ফুলতে

লাগলো, অর্থাৎ তার আয়তন বেড়ে যেতে লাগলো এবং সেইসঙ্গে কালি-বিন্দুগুলির মধ্যের দূরত্বও ক্রমশঃ বেশী হতে লাগলো। দেখলে মনে হবে, ফুঁ দেওয়ার সাথে সাথে কালি-বিন্দুগুলি পরস্পরের কাছ থেকে ছুটে পালাচ্ছে। মনে করা যাক, এই বেলুনটিই আমাদের বিশ্ব ও কালির বিন্দুগুলি নীহারিকার (galaxy) মেলা। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, বিশ্বের প্রসারমানতা (expansion of universe) ও নীহারিকার সরে যাওয়া সমার্থক। এই যে নীহারিকার সরে যাওয়া, একেই বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন 'ঘটনা' (events)। এরই সাথে সাথে চলেছে সৃষ্টি (creation)। অধ্যাপক হয়েল (Hoyle) বলছেন,—"নীহারিকার ছুটে চলা ও বিশ্বের প্রসারণের জন্য যে ঘাটতি পড়ে, তা পুষিয়ে দেয় নতুন সৃষ্ট নীহারিকা" ('Nature of the Universe', page 115)। অতএব ব্যাপারটা হলো, বিশ্ব বাড়ছে ব'লেই সৃষ্টি হচ্ছে। এই বিশ্ব বেড়ে যাওয়া ব্যাপারটাকে বৈজ্ঞানিকেরা 'আকাশ বাড়ছে' (space expansion) ব'লে ব্যাখ্যা করছেন। আইনস্টাইনের আকাশের বক্রতা-ধর্ম (curvature of space) থেকে প্রমাণ হলো 'আকাশ' জিনিসটা একেবারে শূন্য (void) নয়। আকাশ (space) যাকে বলি, তাও একটা পদার্থ (material substance), তবে খুবই সূক্ষ্ম। তাই কোয়াণ্টাম বিজ্ঞানের আধুনিক তত্ত্বে (modern quantum mechanics of field) দেখি, বহু দূরের আকাশে, যেখানে অন্যান্য পদার্থ নেই, সেখানেও potentiality রয়েছে যা সৃষ্টিকার্যে সমর্থ। আবার আপেক্ষিক তত্ত্বের সাধারণ নিয়মে (General Theory of Relativity) পাই যে অভিকর্ষ (gravitional force), তড়িৎ-চুম্বক-শক্তি (electro-magnetic force) দেশ-কাল-গঠনের (geometry of space-time) উপর নির্ভরশীল। কাল (time) আবার দেশেরই (space) একটি অংশ (dimension)। এইভাবে দেখা গেলো, পদার্থ বা শক্তি সব কিছুই আকাশ (space) থেকে উৎপন্ন। তাই বৈদান্তিকের মতে ধূলি-মেঘের (dust-cloud) সৃষ্টিও আকাশ থেকেই। বেদান্ত বলছেন, এই আকাশের উপর প্রাণের (cosmic energy; potentiality) ক্রিয়ার ফলেই এই সৃষ্টি (creation)।

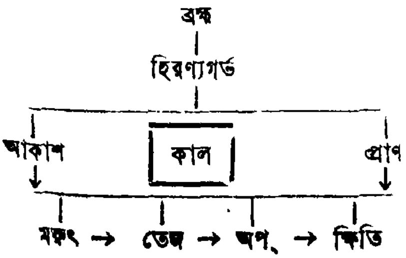
আগেই বলেছি, বিজ্ঞানের মতে বিশ্ব (universe) একটা বেলুনের বা বুদ্বুদের মতো, অর্থাৎ গোলাকার (spherical)। এ বিষয়ে বেদান্ত কিছু বলেন নাই; তবে 'ব্রহ্মাণ্ড' কথাটির মানে হল, বিশ্ব ঠিক গোল নয়, অনেকটা ডিমের মতো আকার (elliptical shape)। এটা হাসির কথা নাও হতে পারে, কারণ বিজ্ঞান নিজেই স্বীকার করেছে যে, ঠিক গোলাকার (perfectly spherical) কোন বস্তু হ'তে পারে না; ডিম্বাকৃতি পদার্থই সুসঙ্গত। নীহারিকাগুলির আকার, সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলির কক্ষপথ ইত্যাদি এর সত্যতা প্রমাণ করছে।

যাই হোক, যা বলছিলাম: জেমস্ জীন্স্ তাঁর 'Stars in their Courses' বইয়ে বলছেন—"বহুদিন ধরে যদি এই মহাকাশে একেবারে সোজা চলতে পারি, তবে একদিন বিশ্বের চারদিকে ঘুরে আবার নিজের ঘরেই ফিরে আসবো (১৪১ পৃষ্ঠা)।" ভাববেন না যেন 'Home! sweet home!'-এর টানে ফিরে আসবো। আসল কথা, আগেই বলেছি বিশ্ব

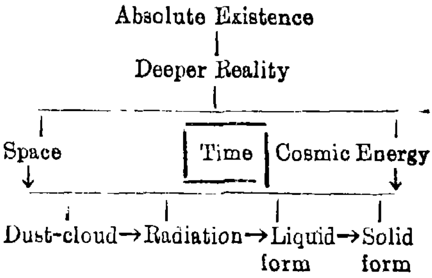
পৃথিবীর মতোই গোল। আচ্ছা, বৈজ্ঞানিকেরা তো বল্লেন—'আকাশ বাড়ছে'। কিন্তু কোথায় বাড়ছে? তবে কি এই বিশ্বের বাইরেও কিছু রয়েছে? এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদের অঙ্ক চুপ, তবে কলম সচল। স্যার জীন্‌স্ আগের বইতেই বলছেন যে, এই বিশ্বের বাইরে কি আছে, তা আমরা কখনোই জানতে পারবো না। তাই বিজ্ঞান এ নিয়ে আপাতত মাথা ঘামাচ্ছে না, তবে ঠারে-ঠোরে বলছে—"যার মধ্যে থেকে এই বিশ্বের সৃষ্টি তা হচ্ছে শূন্য, দেশ-কালের সম্মিলন-ভূমি (the substance out of which this is blown, the soapfilm, is empty space welden on to empty time;)" এই শূন্য দেশ ও কালকে বেদান্তের সূক্ষ্ম দেশ ও সূক্ষ্ম কাল এবং এই সম্মিলনভূমিকে হিরণ্যগর্ভ ধরা যায়। বিজ্ঞানের মতে এই শূন্য দেশ-কালের সম্মিলনভূমি হচ্ছে উচ্চতর সত্য (deeper reality)। বৈজ্ঞানিক এখানে দার্শনিক হয়ে বলছেন—এই deeper reality-র উপরে আছে Absolute Existence। ডঃ হ্যারিস তাঁর 'Man's Place in the Universe' বইয়ে বলছেন, "In real existence, all attributes, qualities, all individualities are dissolved in one eternal presence." (page 58)। একেই বেদান্ত বলছে ব্রহ্ম।

আমরা ভাবতে পারি:

(বৈদান্তিক মত)



(বৈজ্ঞানিক মত)



সৃষ্টি না হয় বোঝার চেষ্টা করা যায় কিছুটা। কিন্তু এরপর? 'শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।' তাপ-বলবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রানুযায়ী (2nd Law of Thermodynamics) এনট্রোপী (entropy) বাড়তে বাড়তে সমস্ত বিশ্ব একদিন ধ্বংস হবে। আইনস্টাইনের ভাষায় বলতে হয়, তখন থাকবে কেবল সূক্ষ্ম আলো-তরঙ্গ। তারপর? বেদান্তের মতে এই সৃষ্টি তার কারণে (cause) ফিরে যাবে। এই ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকেরা অনেক মাথা ঘামিয়ে মোটামুটি চারটি মত খাড়া করেছিলেন:

(১) একটি কেন্দ্রশক্তি (point source) থেকে এই বিশ্বের সৃষ্টি।

(২) বিশ্ব প্রথমে একটি স্থির-বিশ্ব (static Einstein universe) ছিলো ও পরে তা বাড়তে শুরু করেছে।

(৩) এই বিশ্ব প্রথমে বিরাট বিশ্ব ছিলো। তা থেকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে এসে আবার বাড়তে শুরু করেছে।

(৪) এই বিশ্ব বেড়ে যাচ্ছে, তবে প্রতিনিয়ত নতুন পদার্থ সৃষ্টির জন্য এ কোনদিনই ধ্বংস হবে না।

প্রথম মতটি George Gamow-র, দ্বিতীয় মতটি—Lemaitre-Eddington universe এবং

তৃতীয় মতটির প্রবর্তক হয়েল (Hoyle)। মতগুলি গড়ে উঠেছিলো ১৯৫০ সনের আগেই। ১৯৬৫ সনে শ্‌মিড্‌ (Schmid) এক নতুন তথ্য উপস্থাপিত করলেন। পাঁচটি নতুন কোয়াজার (Quasar) ও চারটি পুরোনো কোয়াজারের বর্ণালী (spectrum) পরীক্ষা ক'রে যে কথা শোনালেন তা থেকে বোঝা গেলো, এই বিশ্ব প্রসারণ ও সংকোচনের (expansion and contraction) মধ্যে স্পন্দিত হয়। আগেই বলেছি, 'এনট্রোপী-বৃদ্ধি' প্রমাণ করেছে বিশ্ব একদিন ধ্বংস হবে। বেদান্তের মতে একটি কেন্দ্রশক্তি থেকেই বিশ্ব বেড়ে চলেছে এবং প্রলয়ের ক্রমে পদার্থগুলি ক্রমশঃ তাদের নাম-রূপ বিসর্জন দিতে দিতে আবার উল্টো পথে তার কারণে ফিরে যাবে। নাম-রূপ বিসর্জন দেওয়ার ক্রমটা বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করছেন। তারাগুলিকেই দেখুন না। Red Giant, White Dwarf, Variable নাম বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে বদলাচ্ছে তাদের রূপ যতক্ষণ না জীবন-প্রদীপ নিভে গিয়ে পরিপূর্ণ অন্ধকার বিরাজ করে বহির্মণ্ডলে। যে তেজ (radiation) তাদের জন্ম দিয়েছিলো, সেই তেজেই তাদের ভবলীলা সাঙ্গ। এমনি ক'রে সমস্ত কিছু একদিন নিভে যাবে, চারদিকে বিরাজ করবে ঘোর, মহাঘোর অন্ধকার। বেদান্তের ও বিজ্ঞানের দু'জনেরই মত এই যে, এরপরে জন্ম নেবে নতুন বিশ্ব। ডঃ হ্যারিস বলছেন তাঁর 'Man's Place in the Universe' বইয়ে—"এই বিশ্বের পূর্বে অন্য একটি বিশ্ব ছিলো, তার আগেও অন্য বিশ্ব, আবার এ বিশ্বের পরে হবে নতুন বিশ্ব"।

প্রলয়ের পর নতুন বিশ্ব জেগে ওঠার আগে কি অবস্থা ছিলো, অপরূপভাবে তা বর্ণিত হয়েছে নাসদীয় সূক্তে। 'নাসীদ্রজো নো ব্যোমা'—রজো (স্থূলপদার্থ) বা ব্যোম (সূক্ষ্মপদার্থ) কিছুই ছিল না তখন। শেষ তারাটি নিভে যাওয়ার পর 'তম আসীৎ তমসা গূঢ়ম্'। শেষ প্রশ্ন মনে জাগে—সৃষ্টির স্পন্দন কিভাবে তার মধ্যে জেগে ওঠে। বিজ্ঞান এ প্রশ্নের উত্তরে নিরুত্তর। বেদান্তও নিরুত্তর, তবে কবির ভাষায় বর্ণিত হয়েছে রূপকের ভাবে—

'কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ
প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা
কবয়ো মনীষা।'

সমালোচনা

Vivekananda Commemoration Volume, 1965. The University of Burdwan. Pp. 127 + 8 + 47. Price : Rs. 5·00

স্বামীজীর জন্মশতবর্ষ-জয়ন্তী (জানুআরি ১৯৬৩—জানুআরি ১৯৬৪) উপলক্ষ্যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে কোন স্মারকগ্রন্থ-প্রকাশের উদ্যোগ করেছিলেন ব'লে আমাদের জানা নেই। সেদিক দিয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রয়াস অনন্য। 'স্বামীজীর প্রতি অর্ঘ্যনিবেদন'-এর ঐকান্তিক আগ্রহে ওই বিশ্ববিদ্যালয়-প্রেস-কর্মীরা স্বেচ্ছাবৃতভাবে গ্রন্থটি মুদ্রণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ব'লে মুখবন্ধে জানা গেল। তাঁদের এই মনোভাব শুধু প্রশংসনীয় নয়, শ্রদ্ধার যোগ্য।

প্রস্তাবনায় গ্রন্থের সুরটি নিখুঁতভাবে বেঁধে দিয়েছেন উপাচার্য ডঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেন: "আজ নানাদিকে নানাভাবে স্বামীজীর চিন্তা ও সাধনার স্বাঙ্গীকরণে সমবেত আগ্রহ। আমাদের গ্রন্থখানি সেই প্রয়াসেরই নিদর্শন। এই মহামানবের তপস্যার উত্তরাধিকার আমাদের। তাঁর অহ্বানে আমাদের সকল কর্ম ও মনন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক।"

অতঃপর সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাংলায় চব্বিশটি রচনা, স্বামীজীর প্রতি মহান সমসাময়িকদের শ্রদ্ধাঞ্জলি-সংকলন, স্বামীজীর বাণী-চয়ন ও জীবনপঞ্জী সংগ্রথিত।

স্থান পেয়েছে স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে ডঃ রাধাকৃষ্ণনের স্মরণীয় উদ্বোধনী ভাষণ। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে ধর্ম ও কর্মের সমন্বয়ে স্বামীজীর প্রয়াসের বিশ্লেষণ করেছেন। শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে শুনিয়েছেন রবীন্দ্র অরবিন্দ সম্পর্কে তাঁর কিছু স্মৃতিচারণ এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন স্বামীজী ও শ্রীঅরবিন্দের বাণীর মিলের দিকটির প্রতি। ডঃ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সচেতন করেছেন স্বামীজীর বীর্য-সাধনার তাৎপর্য সম্পর্কে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে, স্বামীজী ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, আবার ওই নবজাগরণকে চূড়ান্ত রূপদানও করেছিলেন তিনি। অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীর মূল প্রতিপাদ্য: স্বাধীন ভারত এক হিসাবে স্বামীজীর দান। কী আশ্চর্য সুন্দরভাবে তিনি দেখিয়েছেন যে, একদিকে বিদ্যাসাগর, কবি মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্ন ও সাধনা স্বামীজীর মধ্যে সফল হয়েছিল আবার পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ, স্যর আশুতোষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র কী গভীর প্রেরণা পেয়েছিলেন স্বামীজীর সাধনা থেকে। আর তুলেছেন এই সঙ্গত প্রশ্ন যে, স্বামীজীর দান আমরা ঠিকভাবে কাজে লাগাচ্ছি কিনা। নবজাগ্রত ভারত ও স্বামীজী সম্পর্কে শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরীর দীর্ঘ আলোচনাটি একটি মূল্যবান ঘনীভূত গবেষণাপত্র। ভারতীয় জনগণের অধ্যাত্মজীবন সম্পর্কে স্বামী রঙ্গনাথানন্দের ভাষণটি অল্পের মধ্যে একটি মহৎ বিষয় পরিবেশনের সফল সুন্দর দৃষ্টান্ত। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বামীজীর দান সম্পর্কে অধ্যক্ষ জে. লাহিড়ীর নিবন্ধটি মৌলিক চিন্তার পরিচায়ক। বিশ্ব-রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা স্বামীজীর বাণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রণের জোরদার আবেদন শ্রীঅমূল্য সেনের 'ধর্ম ও রাজনীতি'। মানুষকে তার

মহত্তম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার জন্য স্বামীজীর শরণ নিতে হবে—এই বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন শ্রী বি. কে. সেনগুপ্ত। বিবেকানন্দ ও পাশ্চাত্য দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন শ্রীমৃণালকান্তি ভদ্র।

শ্রীঅযোধ্যানাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধ এবং শ্রী শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের 'বিবেকানন্দ-প্রশস্তিঃ' সরস সংস্কৃত রচনার উজ্জ্বল নিদর্শন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের আলোচনার বিষয় 'স্বামী বিবেকানন্দ ও সংগীত কল্পতরু'। 'ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর' মন্ত্রপ্রতিম এই বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পশ্চিমা যান্ত্রিক দক্ষকে শিবমন্ত্রে দীক্ষা দিবার দায়িত্ব পূর্বাচলের পুরোহিতদের।... স্বামী বিবেকানন্দের সমন্বয়ী সাধনা এই পথে আমাদের...প্রোজ্জ্বল প্রদীপ-শিখা।'—বলেছেন মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী তাঁর 'সমন্বয়ে স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবন্ধে। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেনের বিশ্বাস 'জড়সর্বস্ব বৈজ্ঞানিক সাধনায় সমুদ্ভূত আসন্ন বিপদ' থেকে রক্ষা করবেন 'নবযুগের মন্ত্রদাতা বিবেকানন্দ'। কালের যাত্রায় বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে সাহিত্যরসসিঞ্চিত তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন শ্রীজীবেন্দ্র সিংহরায়। স্বামীজীর কয়েকটি দিক নিয়ে গভীর এবং আন্তরিক ভাবনার নিদর্শন স্বর্গত অধ্যক্ষ গোপাল চন্দ্র মজুমদারের রচনাটি।

স্বামীজীর সঙ্গে অসম্পৃক্ত হলেও স্মারক-গ্রন্থটির মূল্য বাড়িয়েছে মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ লিখিত 'মধ্যযুগের বারাণসীতে বাঙালী পণ্ডিতমণ্ডলী'-বিষয়ক গবেষণাপত্র, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনে মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে শ্রী জে. এন. মহান্তির রচনাটি, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের আলোকসম্পাতে সাংখ্য সম্পর্কে শ্রীদেবপ্রসাদ সেনের একটি নিবন্ধ এবং শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়-কৃত ব্যাখ্যাসহ শ্রীমৎ প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী-বিরচিত 'শ্রীশ্রীগুরুপাদাব্জদলপঞ্চকম্'।

সব মিলিয়ে স্মারকগ্রন্থটি স্বামীজীর পূজায় নিবেদিত একটি অর্ঘ্যের মর্যাদা পেয়েছে। ধন্য তাঁরা, যাঁরা এর উদ্যোগ করেছেন। ধন্য তাঁরা, যাঁরা এতে যোগ দিয়েছেন।

—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গীতা মাতা কী গোদ মেঁ (দূসরা ভাগ—পহলা খণ্ড)—লেখক 'সীকর'। প্রকাশক: শ্রীগীতা আশ্রম, ১০ সদর বাজার, দিল্লী ক্যান্ট। পৃষ্ঠা ১৫২+২২, মূল্য—দুই টাকা।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা সার্বভৌম শাস্ত্রগ্রন্থ। জগতের সর্বত্র এই গ্রন্থের সমাদর ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণের নিকট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা-গ্রন্থের যতই আলোচনা হইবে ততই মানবচিত্তে শ্রদ্ধা ও আস্তিক্যবুদ্ধি জাগরিত হইবে—এবিষয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে গীতা অনুধ্যানের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সুপণ্ডিত লেখক বিভিন্ন দিক হইতে গীতা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন এবং স্বীয় চিন্তাধারা সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। ৩২টি অধ্যায়ে এই গ্রন্থে আলোচিত বিষয়সমূহের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি: ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধির অভ্যাস, শুদ্ধাচরণের পথ, জ্ঞানপ্রাপ্তির পথ, বৈদান্তিক বিচারের ক্ষমতা, ভারতীয় ঋষিগণের দিব্যদৃষ্টি, ভারতীয় সংস্কৃতি, সমস্ত উন্নতির মূলে প্রকৃত এবং তীব্র জিজ্ঞাসা। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, উপাসনা প্রভৃতি বিষয়ে সহজ ও সারগর্ভ আলোচনাগুলি পাঠকগণের নিকট আদরণীয় হইবে। হিন্দী ভাষায় গ্রন্থখানি একটি মূল্যবান সংযোজন। গ্রন্থের প্রথম ভাগের মতো দ্বিতীয় ভাগের বর্তমান খণ্ডটিও সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ১৭ই ফাল্গুন (১. ৩. ৬৮), শুক্রবার শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৩তম পুণ্য জন্মতিথি উৎসব মহানন্দে ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারতি, উপনিষদ্‌ ও গীতা আবৃত্তি, উষাকীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা, হোম এবং দশাবতারের পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডী-পাঠ, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, শ্রীশ্রীকালীকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় দশহাজার ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

অপরাহ্নে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতি মহারাজ ও ডক্টর এম. এম. উইলী ইংরেজীতে, অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী ও স্বামী ব্যোমানন্দজী হিন্দীতে এবং ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যজীবন ও বাণী আলোচনা করেন। তাঁহারা বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যে-সময় যে-পরিবেশে জন্মিয়াছিলেন, বর্তমান জগৎ তাহা হইতে কত পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহা বর্তমান কালের, আগামী কালেরও জন্য; কারণ তাহা হইল বাহ্য পরিবর্তনশীল জগৎ ও জীবনের অন্তর্নিহিত শাশ্বত সত্য। পৃথিবীর সব ধর্মের মূলেই যে এই শাশ্বত সত্য বিদ্যমান, তাহা নিজ প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে তিনি বলিয়া গিয়াছেন। তিনি সারা পৃথিবীর মানুষকে, পণ্ডিত-মূর্খ ধনী-দরিদ্র সকলকেই এই সত্যের সন্ধান দিবার জন্য আসিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর জাগ্রত জীবনসত্যানুসন্ধিৎসাকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে তৃপ্ত করেন শ্রীরামকৃষ্ণ—সকল মানুষই স্বরূপতঃ ভগবান, ইহা উপলব্ধি ও ঘোষণা করিয়া। তাঁহার বাণী অমৃত-মন্ত্র—সর্বকালের অবক্ষয় হইতে সর্বদেশের মানুষের বাঁচিবার মন্ত্র। কিভাবে সত্যকে উপলব্ধি করিতে হইবে, কিভাবে মানুষ দেবত্ব লাভ করিবে, তাঁহার জীবন ও বাণী তাহারই নির্দেশক। তাঁহার বাণীকে ব্যক্তিজীবন, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে রূপায়ণের প্রচেষ্টাই ভারত তথা সমগ্র জগতের মানুষের কল্যাণ-পথ।

সারাদিন সহস্র সহস্র ভক্ত মঠে আগমন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণচরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

রাত্রে শ্রীশ্রীদশমহাবিদ্যার পূজা, শ্রীশ্রীকালী-মাতার বিশেষ পূজা ও হোম হয়। রাত্রিশেষে মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎস্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ১২ জনকে সন্ন্যাসব্রতে এবং ২৬ জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

জন্মতিথি-উৎসবের পরে পরবর্তী রবিবার ১৯শে ফাল্গুন (৩. ৩. ৬৮) সারাদিনব্যাপী সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরের পূর্বদিকে নির্মিত এক মণ্ডপে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের এক সুবৃহৎ প্রতিকৃতি ও তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সজ্জিত ছিল। প্রায় ১৫,০০০ ভক্ত হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। বেলুড় মঠে এই দিন দুইলক্ষাধিক লোকসমাগম হইয়াছিল।

সেবাকার্য

মহারাষ্ট্র ঃ গত ১৩. ১. ৬৮ হইতে ২৯. ১. ৬৮ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মহারাষ্ট্রের কয়নায় (সাতারা) ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত

জনগণের সেবাকার্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ বিতরিত হইয়াছে :

গম ৩,১১৮ কুইণ্ট্যাল ৪৯ কেজি, বিস্কুট ২৭ টিন, কম্বল ২৯১খানি, বেনিয়ান ৯৬৫টি, শাড়ী ২৬৯খানি, মেয়েদের পোশাক ১০১টি, পুরাতন বস্ত্র ৮১৫খানি, লণ্ঠন ২০২টি, কেরোসিন তৈল ৪টিন, মাল্টি-ভিটামিন ট্যাবলেট ৬,০৯০টি। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৩১,০৫৪।

উড়িষ্যা : গত জানুআরি (১৯৬৮) মাসে উড়িষ্যায় কটক জেলার পট্টমুণ্ডাই সেবাকেন্দ্র হইতে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বাত্যাবিপর্যস্ত ৩,৪১৭ ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বিতরণ করা হইয়াছে :

চাল ৪,৩৯১ কেজি, কম্বল ৭৭০টি, ধুতি ও শাড়ী ৬৮৭খানি, পুরুষদের পোশাক ৬৪৮টি, মহিলাদের পরিচ্ছদ ৬৯৮টি, তোয়ালে ৪০টি।

কার্যবিবরণী

কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠান : এপ্রিল, ১৯৬৬ হইতে মার্চ, ১৯৬৭ পর্যন্ত সেবাপ্রতিষ্ঠানের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পূর্বনাম ছিল 'শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান'। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানটিকে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে একটি সাধারণ হাসপাতালে পরিণত করা হয়। বর্তমানে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৪০০টি বেড আছে। এখানে আউটডোরে ১৪টি এবং ইনডোরে ১২টি বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে আর্তনারায়ণের সেবা করা হইতেছে। দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগের চিকিৎসারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেবা-প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ৪টি আধুনিক ল্যাবরেটরি, ৬টি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত অপারেশন-থিয়েটার, ব্লাড-ব্যাঙ্ক, ইলেকট্রিক লনড্রি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই হাসপাতালে সর্বপ্রকার আধুনিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আছে।

৩৫ বৎসর পূর্বে দক্ষিণ কলিকাতায় প্রসূতি ও শিশুদের সেবাকল্পে স্থাপিত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি অতি সাধারণ অবস্থা হইতে অনলস প্রচেষ্টার ফলে আজ কলিকাতা মহানগরীর অন্যতম বৃহৎ পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে পরিণত হইয়াছে এবং উত্তরোত্তর বহুমুখী উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহার বিভিন্ন বিভাগগুলি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তত্ত্বাবধান করেন। চিকিৎসা ও সেবাদি কার্যে উপযুক্ত-সংখ্যক চিকিৎসক ও নার্স নিযুক্ত আছেন।

নার্সের কাজ ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা সেবাপ্রতিষ্ঠানের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্য। আলোচ্য বর্ষের শেষে শিক্ষার্থিনী পরিষেবিকার সংখ্যা ছিল ১৭৫।

বাহিরের সকল রোগীই ও হাসপাতালের শতকরা ৫০ জন রোগী বিনা-ব্যয়ে চিকিৎসিত হয়। আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ৯৭,০১৭ (নূতন ৩৮,০৭৫); অন্তর্বিভাগে দশ হাজারের বেশী রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। উভয় বিভাগে অস্ত্রচিকিৎসা যথাক্রমে ৮,২৫০ ও ৫২৯টি।

সেবাপ্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন ও গবেষণার বিভাগটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কলেজ অব মেডিসিন'-এর অঙ্গীভূত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত এই পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগে এম. ও., এম. ডি., এম. এস. ডিগ্রী কোর্স অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বৃন্দাবন : রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৬—মার্চ, ১৯৬৭)

প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই সেবাশ্রম ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে মথুরা রোডের উপর প্রশস্ত ভবনে স্থানান্তরিত হয়। এখানে মেডিক্যাল, সার্জিক্যাল, চক্ষু, কর্ণ, দন্ত, রেডিওলজি প্রভৃতি সুপরিচালিত বিভাগ আছে। আলোচ্য বর্ষে অন্তর্বিভাগে চক্ষুরোগী-সহ ২, ৮২ জন রোগী ভর্তি হয় এবং ১,৭৪৫ জন আরোগ্য লাভ করে। চক্ষু-অস্ত্রোপচারসহ মোট ৬৮৪টি অস্ত্রোপচার করা হয়।

আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে ২,১৫,৪৮৭ জন রোগী (পুরাতন ১,৮০,৬ ২) চিকিৎসিত হয় এবং চক্ষুরোগী-সহ মোট ৯৩২ জনের অস্ত্রোপচার করা হয়। বহির্বিভাগে গড়ে দৈনিক চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫৯০।

আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক বিভাগে নূতন ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৪,৫০০ এবং ২০,৯৭৬। এক্স-রে বিভাগে ৭৩৩টি এক্স-রে করা হয় এবং ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ১০ ৪৬১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। ফিজিও-থেরাপি বিভাগে ৮০ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

উল্লেখযোগ্য যে, বৃন্দাবন সেবাশ্রমের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিভাগটি হইল চক্ষু-বিভাগ; চক্ষুরোগে আক্রান্ত সহস্র সহস্র রোগী এখানে চিকিৎসালাভ করিয়া নিরাময় হইতেছে।

আমেরিকায় বেদান্ত

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র, নিউ-ইয়র্ক —এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও প্রচারক স্বামী নিখিলানন্দজী গত সেপ্টেম্বর মাসে (প্রতি রবি-বার)—আধ্যাত্মিক উজ্জীবনের প্রয়োজনীয়তা, হিন্দুধর্মের মর্মকথা, হিন্দু আধ্যাত্মিকতার দুইটি প্রধান ধারা; অক্টোবর মাসে—উপনিষদের প্রজ্ঞা, হিন্দুধর্মে মহাপুরুষগণ, ঈশ্বরের মাতৃত্ব, আত্মা ও তাহার পরিণাম, ধ্যানের কৌশল; নভেম্বর মাসে—অন্তর্মুখ ভাবের অভ্যাস, জাতিবিভাগ: ইহার দোষ ও গুণ, মায়া এবং ধর্মাচরণ ও পার্থিব কামনা-বাসনা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন; এতদ্ব্যতীত তিনি প্রতি শুক্রবার উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করেন এবং ছাত্রগণ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ব্যক্তিগতভাবে সাধন সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পান।

স্বামী নিখিলানন্দজী এক বৎসরের জন্য ফিলাডেলফিয়ার টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মের সহযোগী-অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন; তিনি গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদিগকে হিন্দুধর্মের সারকথা শিক্ষা দিবেন।

বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি, চিকাগো —এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ভাষ্যানন্দজী গত অক্টোবর মাসে (প্রতি রবিবার): কৃষ্ণ ও তাঁহার সর্বজনীন বাণী, আধ্যাত্মিকতা ব্যতীত জীবনের নিষ্ফলতা, মাতৃভাবে ঈশ্বরের উপাসনা, ধর্মজীবন ও সামাজিক দায়িত্ব এবং মরমিয়াবাদিগণ ও তাঁহাদের অনুভূতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ধ্যানশিক্ষার সঙ্গে প্রতি মঙ্গলবার ভগবদ্গীতা, প্রতি বুধবার ধর্মপ্রসঙ্গ, এবং প্রতি শুক্রবার নারদ-ভক্তিসূত্র সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

উৎসব-সংবাদ

বাগেরহাট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২২.১.৬৮ তারিখ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ১০৬তম শুভ জন্মতিথি পূজা, পাঠ, ভজন ও প্রসাদবিতরণের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ডাক্তার কালীপদ পই মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আশ্রম-ছাত্রাবাসের ছাত্রবৃন্দ আবৃত্তি প্রবন্ধপাঠ এবং ডাঃ অরুণচন্দ্র

নাগ, শ্রীবিনোদ-বিহারী সেন, অধ্যাপক বিনোদ-বিহারী দাস, শ্রীভুবনমোহন চক্রবর্তী, শ্রীকুবের-চন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীকালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং ব্রহ্মচারী সুকুমার এই সভায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও ভাবধারা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে স্থানীয় শিল্পী শ্রীনিরাপদ দত্ত ও শ্রীঅনন্তকুমার মণ্ডল ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

প্রচারকার্য

স্বামী প্রণবাত্মানন্দ গত ২৬শে জুলাই হইতে ১১ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিম্নলিখিত স্থানসমূহে 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ,' 'জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে ছায়াচিত্রে মোট ৫১টি বক্তৃতা দিয়াছেন, তন্মধ্যে ৩টি বাংলা ভাষায় ও ৪৮টি হিন্দী ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে।

বিকানীর—রামকৃষ্ণ কুটীর, রাজকীয় এস. ভি. চৌপড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গঙ্গা চিলড্রেন স্কুল, ভারতীয় বিদ্যামন্দির, পরমানন্দ কলোনী।

যোধপুর—সরদার হাইস্কুল, রাজকীয় উচ্চ বিদ্যালয়, চৌপাশী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, দুর্গাবাড়ী, সৎপ্রসঙ্গ মন্দির।

আজমীর—রামকৃষ্ণ আশ্রম, রেলওয়ে হাসপাতাল, পলিটেক্‌নিক কলেজ, রেলওয়ে কলোনী, উচ্চ অন্ধবিদ্যালয়, টাউন হল, সমাজ-কল্যাণ কেন্দ্র, মহিলা কলেজ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রাজকীয় মহাবিদ্যালয়।

জয়পুর—আদর্শ বিদ্যামন্দির, জয়পুর গৌতম মার্গ, দুর্গাবাড়ী।

কিশনগড়—টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, আদিত্য মিলস্ ক্লাব, বিবেকানন্দ সমিতি, কিশনগড় কলেজ, পুলিস ট্রেনিং স্কুল, মদনগঞ্জ।

খেতড়ী—রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ স্মৃতি-মন্দির, টিচার্স ট্রেনিং স্কুল, কপার প্রোজেক্ট।

পিলানী—বিড়লা কলেজ, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল বোর্ডিং।

গোয়ালিয়র—রামকৃষ্ণ আশ্রম, হিন্দী সাহিত্য সভা, রাজকীয় মহিলা কলেজ, সনাতন ধর্মমণ্ডল, জে. সি. মিলস্।

মীরাট—বি. এ. ভি. ইণ্টার কলেজ, এস্. এস্. ভি. ইণ্টার কলেজ, রঘুনাথ মহিলা ডিগ্রী কলেজ, রামকৃষ্ণ আশ্রম।

দিল্লী—রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম।

হরিদ্বার- মির্জাপুর হেভী ইলেকট্রিক ওয়ার্কস্।

ভ্রম-সংশোধন

'উদ্বোধনের' গত ফাল্গুন সংখ্যায় ৭৭ পৃষ্ঠায় লেখকের নাম 'কানাইলাল' স্থলে 'রামকানাই' পড়িবেন।

বিবিধ-সংবাদ

কার্যবিবরণী

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের (৩৩, নয়াপট্টী রোড, দমদম, কলিকাতা ২৮) ১৯৬৫-৬৭ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত বালিকাদের জন্য ত্রৈবার্ষিক আর্টস কলেজ। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শে বালিকাগণ যাহাতে শিক্ষিতা হইতে পারে, এতদুদ্দেশ্যে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে এই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মহাবিদ্যালয়ে প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিগ্রী কোর্স পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ডিগ্রী কোর্সে ইতিহাস, পলিটিকাল সায়েন্স ও দর্শনশাস্ত্রে অনার্স পড়িবার ব্যবস্থা আছে।

১৯৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগে ৬২ জন এবং ডিগ্রী কোর্সে ১৬৮ জন ছাত্রী ছিল। ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে উভয় বিভাগে ছাত্রী ছিল যথাক্রমে ৬০ ও ১৯৯। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ১০ জন ও ৮ জন দরিদ্র ছাত্রী বিনা-বেতনে পড়িবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক।

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে আবাসিক মহাবিদ্যালয়ে পরিণত করিবেন—এইরূপ পরিকল্পনা লইয়াই ইহা স্থাপিত হয়। ছাত্রীনিবাসে স্থানাভাববশতঃ এই পরিকল্পনা এখনও কার্যকরী হয় নাই। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ছাত্রীনিবাসে যথাক্রমে ৮৭ ও ১০০ জন ছাত্রী ছিল। ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে ৪ জন ছাত্রীকে বিনা-খরচে এবং ৭ জন ছাত্রীকে আংশিক খরচে থাকিবার সুযোগ দেওয়া হয়।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। বিভিন্ন সময়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক জগজ্জননী সারদাদেবী এবং ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও উপদেশাবলী অবলম্বনে বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

সালেপুর (কটক জেলা)—শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবা-সঙ্ঘ ১৯৩৬ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব-সময়ে প্রতিষ্ঠিত। সেই সময় হইতে এই সঙ্ঘের কার্য নিয়মিতভাবে পরিচালিত হইতেছে। ইহার সেবাকার্যের বিভাগ প্রধানতঃ এই কয়টি: (১) সংস্কৃত বিদ্যামন্দির, (২) ছাত্রাবাস, (৩) দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়, (৪) রামকৃষ্ণ পল্লী পাঠাগার এবং (৫) শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা-মন্দির।

ইহা ছাড়া এখানে পৃথিবীর সর্ব ধর্ম-প্রবর্তকগণের জন্মোৎসব পালন করা হয়। ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির অনুমোদিত দুর্গাপূজাদি সকল প্রকার পূজা উৎসব নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কল্পতরু-উৎসব, জন্মবার্ষিকী উৎসব, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব, শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসবাদি মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত শ্রীচন্দ্রশেখর মিশ্রের সভাপতিত্বে গঠিত একটি কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক স্থানীয় জনগণের সদিচ্ছা ও অর্থসাহায্যে সেবাকার্য পরিচালিত হয়।

উৎসব-সংবাদ

যোরহাট: শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ২১ ও ২২শে জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি-উৎসব প্রতিপালিত হইয়াছে। ২১শে জানুআরি অধ্যক্ষ ভবেন্দ্রমোহন পাঠক মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভায় স্বামীজীর জীবন

ও বহুমুখী কর্মধারা আলোচিত হয়। শ্রীআনন্দ চন্দ্র বড়ুয়া, অধ্যাপক শ্রীঅরুণ গোস্বামী, অধ্যাপক সত্যভূষণ গুহবিশ্বাস ও ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে অধ্যক্ষ শ্রীপাঠক ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তন ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগধর্মী অবদানের কথা বিশদভাবে বলেন। সভার শেষে স্থানীয় 'ইউনাইটেড স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' ও 'গেটওয়ে টু হেল্থ্ ইন্‌স্টিটিউটের' সহযোগিতায় 'ব্যায়াম-প্রদর্শনী' অনুষ্ঠিত হয়। আসামের প্রখ্যাত ব্যায়ামবীর শ্রীসময় বরদলৈ, শ্রীপ্রফুল্ল দেবনাথ ও তাঁহাদের সহকারিবৃন্দ কয়েকটি আকর্ষণীয় ক্রীড়া প্রদর্শন করেন।

২২শে জানুআরি সকালে পূজাদি ও সন্ধ্যায় ভক্তিমূলক সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানান্তে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নওরাঃ গত ২রা ফেব্রুআরি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলা-পার্ষদ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীর জন্মোৎসব তাঁহার জন্মস্থান ২৪ পরগণা জেলার ভাঙ্গড় থানার অন্তর্গত নওরা গ্রামে পূজা ও প্রসাদবিতরণাদির মাধ্যমে মনোজ্ঞভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শিকড়া-কুলীনগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ আশ্রমে গত ৩১শে জানুআরি হইতে ৪ঠা ফেব্রুআরি পর্যন্ত প্রতিদিন মঙ্গলারতি, পূজা, পাঠ, সন্ধ্যারতি প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর ১০৬তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

৩১শে জানুআরি বিশেষ পূজার ব্যবস্থা ছিল। এই দিন সন্ধ্যায় স্থানীয় বালকবৃন্দ কর্তৃক 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' নাটিকাভিনয় ও রাত্রে শ্রীশ্রীকালীপূজা হয়। ১লা ফেব্রুআরি বিকালে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' পাঠ হয় ও সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন জন-শিক্ষা-মন্দির চলচ্চিত্রে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' দেখান। ২রা ফেব্রুআরি বিকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গ এবং সন্ধ্যায় শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক কীর্তন হয়। ৩রা ফেব্রুআরি বিকালে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' আলোচনা এবং সন্ধ্যায় স্থানীয় মুসলমান ফকীরদের বাউল কীর্তন হয়। ১লা, ২রা ও ৩রা তিন দিনই পাঠ ও প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন স্বামী দেবানন্দ।

৪ঠা ফেব্রুআরি সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া ভজন গাহিতে গাহিতে সাধুব্রহ্মচারী-সহ 'তীর্থপরিক্রমা' করা হয়। ঐ সময় আশ্রম পরিচালিত 'ব্রহ্মানন্দ বিদ্যাভবনের' মাধ্যমিক বিভাগের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন শ্রীদুলাল মণ্ডল। মধ্যাহ্নে হিন্দুমুসলমান-নির্বিশেষে চারিসহস্রাধিক ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও স্বামী তীর্থানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় শিবপুর কল্পনামজ্লিস কর্তৃক 'সাধক-কবি রামপ্রসাদ' কীর্তনাভিনয় হয়।

বড় আন্দুলিয়াঃ (নদীয়া) গত ১২ই ফেব্রুআরি গদাধরের মেলা উপলক্ষে নদীয়ার বড় আন্দুলিয়া গ্রামের লোকসেবা শিবিরে একটি সভা আহূত হয়। সভায় মৌলভী রেজাউল করীম সভাপতির এবং স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী বলেন, বিজ্ঞান এবং ধর্ম—উভয়ের মিলনভূমি একটি পরম সত্তা; তাহারই সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত বৈচিত্র্যকে গাঁথিয়াছিলেন। মৌলভী সাহেব বলেন, সমস্ত ধর্মের মূল সত্যগুলি এক এবং এই জন্যই প্রতিবেশীর ধর্মবিশ্বাসকে সকলেরই শ্রদ্ধা করা উচিত। ১৫ই ফেব্রুআরি অনুষ্ঠিত সভায় বেলুড় মঠের স্বামী অজজানন্দ একটি মনোজ্ঞ ভাষণে সকলকে মুগ্ধ করেন।

উদ্বোধন

দিব্য বাণী

নিত্যানন্দৈকরসং সচ্চিন্মাত্রং স্বয়ংজ্যোতিঃ।
পুরুষোত্তমমজমীশং বন্দে শ্রীযাদবাধীশম্ ॥১
যং বর্ণয়িতুং সাক্ষাচ্ছ্রুতিরপি মূকেব মৌনমাচরতি।
সোঽস্মাকং মনুজানাং কিং বাচাং গোচরো ভবতি ॥২
যদ্যপ্যেবং বিদিতং তথাপি পরিভাষিতো ভবেদেব।
অধ্যাত্মশাস্ত্রসারৈর্হরিচিন্তনকীর্তনাভ্যাসৈঃ ॥৩

প্রবোধসুধাকরঃ—শঙ্করাচার্য

পুরুষোত্তম যিনি যাদবপ্রধান,
তিনিই জগৎপতি, তিনিই আবার
স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম জনমবিহীন
সচ্চিৎ-আনন্দরূপ,—তাঁরে নমস্কার।
বেদ যাঁর বর্ণনায় মৌন মূকসম—
ভাষায় স্বরূপ যাঁর কহিতে না পারে—
আমাদের, মানুষের ভাষার সীমায়
কেমন করিয়া হায় ধরিব তাঁহারে!
সত্য; তবু এ-ও সত্য— শ্রীহরির কথা
কীর্তনের চিন্তনের প্রয়াস যেথায়
সেই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রমাঝে আভাস তাঁহার
যতটুকু পাইবার তাহা পাওয়া যায়।

চিত্তে সত্ত্বোৎপত্তৌ তড়িদিব বোধোদয়ো ভবতি।
তর্হ্যেব স স্থিরঃ স্যাদ্ যদি চিত্তং শুদ্ধিমুপযাতি ॥১৬৬
শুদ্ধতি হি নান্তরাত্মা কৃষ্ণপদাম্ভোজভক্তিমৃতে
বসনমিব ক্ষারোদৈর্ভক্ত্যা প্রক্ষাল্যতে চেতঃ ॥১৬৭
যদ্বৎ সমলাদর্শে সুচিরং ভস্মাদিনা শুদ্ধে।
প্রতিফলতি বক্ত্রমুচ্চৈঃ শুদ্ধে চিত্তে তথা জ্ঞানম্ ॥১৬৮

প্রবোধসুধাকরঃ—শঙ্করাচার্য

সত্ত্বগুণোদয়ে হয় চিত্তের মাঝারে
বিদ্যুৎ-চমক সম জ্ঞানের উদয় ;
চিত্ত যদি শুদ্ধ হয় তবে সে প্রকাশ
সে বিমল চিত্তমাঝে স্থির হয়ে রয়।
অন্তরাত্মা, চিত্ত কভু শুদ্ধ নাহি হয়
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজে ভক্তি না হইলে ;
ভক্তিতে চিত্ত হয় মালিন্যরহিত,
বস্ত্র যথা ক্লেদমুক্ত হয় ক্ষার-জলে।
মলিন দর্পণে যদি দীর্ঘকাল ধরি'
করা যায় ভস্ম দিয়া যত্নে পরিষ্কার,
তখন দেখিলে মুখ তাহার ভিতর
ফোটে মুখ-প্রতিচ্ছবি অতি চমৎকার ;
সেইরূপ চিত্তখানি পরিশুদ্ধ হলে
দীর্ঘকাল সযতন ভক্তির সাধনে
স্বপ্রকাশ পূর্ণজ্ঞান প্রকাশে তখনি
অতীব নির্মল সেই চিত্তের দর্পণে।

কথাপ্রসঙ্গে

ভগবান বুদ্ধ

একটা সীমা আছে, যাহার বাহিরে আমাদের মনবুদ্ধি যাইতে পারে না, সে সীমার ওপারের খবর আমাদের কাছে আনিয়া দিতে পারে না।

অথচ ধর্মজগতের সব কিছুর ভিত্তি সেই মনবুদ্ধির ওপারের অস্তিত্বের খবরটুকুই। সেই রাজ্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই ধর্মলাভের চেষ্টা, যাহার চরম পরিণতি সেই রাজ্যে প্রবেশ।

তাই তাহার সম্বন্ধে জানা আমাদের চাই-ই, সেখানে পৌছাইবার পথের সন্ধানও। জানা মানে ইঙ্গিত মাত্র, আভাস মাত্র পাওয়া; কারণ ভাষায় বা চিন্তায় তাহার স্বরূপ কি তাহা তো কখনই ধরা পড়িবে না। এ জানা হইল অনেকটা ঘি না খাইয়া ঘি খাইতে কিরূপ তাহা অপরের মুখে শুনিয়া সেবিষয়ে ধারণা করার মতো, বেলফুল যে শুঁকিয়া দেখে নাই, তাহার অপরের বর্ণনা শুনিয়া সে গন্ধ সম্বন্ধে ধারণা করার মতো।

সত্যদ্রষ্টাগণ এই রাজ্যে পৌছিয়া, ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের অনুভূতির কথা, পথের কথা আমাদের কাছে বলিয়া যান। তাঁহাদের প্রত্যক্ষ-করা সত্যের বিবৃতিই সাধারণ অবস্থায় আমাদের সে-সত্য সম্বন্ধে ধারণা করার একমাত্র উপায়। তাঁহাদের কথা লইয়াই শাস্ত্র রচিত হয়। আমাদের বেদ হইল এরূপ সত্যদ্রষ্টাগণের অনুভূতিরই বিবৃতি। বেদের কথা তাই আমাদের ধর্মের প্রামাণ্য। যিনি কাশী গিয়া দেখিয়া আসিয়া তাহার বর্ণনা দিতেছেন, কাশী সম্বন্ধে তাঁহার কথাই প্রামাণ্য, অভ্রান্ত।

অবশ্য মন-বুদ্ধির পারের সত্য লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় হইল নিজে মনবুদ্ধির পারে যাওয়া। কাশীর বর্ণনা না শুনিয়াও কাশীতে গিয়া পৌছিতে পারিলে নিজেই সব দেখিতে পাওয়া যাইবে।

আর ধর্মের মূল লক্ষ্য তো এইটাই। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, যোগ প্রভৃতি বহু পথ ধরিয়াই এই লক্ষ্যে পৌছানো যায়। তবে জ্ঞানপথে প্রথম হইতেই এই লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া চলিতে হয়। ভগবানলাভ, আত্মজ্ঞানলাভ, ব্রহ্মনির্বাণলাভ, মুক্তিলাভ, নির্বাণলাভ—সবই একই কথা। আমরা নিজেকে দেহ বলিয়া, মন-বুদ্ধি বলিয়া ভাবি, দেহ-মনের মৃত্যু-ভয়-দুঃখকে আমাদের মৃত্যু, আমাদের ভয়, আমাদের দুঃখ বলিয়া ভাবি। কিন্তু চেষ্টা করিয়া যদি নিজেকে এসব হইতে আলাদা করিয়া লইতে পারা যায়, বলা বাহুল্য, তখন আর মৃত্যু-ভয়-দুঃখাদি আমাদের স্পর্শ করিতে পারিবে না। ইহা যে করা যায়, তাহাও সত্যদ্রষ্টাগণ বলিয়াছেন। দেহ, মন, বুদ্ধি হইতে আলাদা হইলে আমাদের থাকে কি? প্রত্যক্ষদর্শীরা একবাক্যে বলিয়াছেন, থাকে একটি চিরবিদ্যমান, আনন্দময়, চৈতন্যময় সত্তা। বলিয়াছেন, সেইটিই আমাদের স্বরূপ, সেইটিই বিশ্বের সব কিছুর স্বরূপ, যাহাকে বিশ্বনিয়ামক ঈশ্বর বলি, তাঁহারও স্বরূপ।

কিন্তু জিজ্ঞাসিত হইলেও এবিষয়ে কোন কিছু বলিতেন না বুদ্ধদেব। কাশী তিনি গিয়াছেন, দেখিয়া ফিরিয়াও আসিয়াছেন, কিন্তু কাশীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে চুপ করিয়া থাকিতেন। কেবল বলিতেন কিভাবে সেখানে যাইতে হয় তাহার কথা—কিভাবে দেহমনবুদ্ধির পারে যাইয়া দুঃখকষ্টকে চিরনির্বাসিত করা যায়,

তাহার কথা। নিজে বলেন নাই শুধু তাই নয়, এবিষয়ে অপরের বলা কথাকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন নাই, বেদের প্রামাণ্য মানেন নাই। কিন্তু মূলতঃ তাঁহার উপদিষ্ট সাধন বেদান্তের, বেদের জ্ঞান-মার্গেরই সাধন।

খুব সহজভাবে ইহার কারণ নিজেই বলিয়াছেন তিনি : তোমার বুকে একটি তীর আসিয়া বিঁধিয়াছে। তুমি যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছ। এ অবস্থায় তুমি কি করিবে? তুমি কাহারো কাছে গিয়া তাহাকে তীরটি তুলিয়া ফেলিতে বলিবে যাহাতে তোমার যন্ত্রণার উপশম হয়, না তাহাকে প্রশ্ন করিতে থাকিবে—তীরটি কে ছুড়িল, কেন ছুড়িল, কিভাবে ছুড়িল ইত্যাদি? দেখিতেছি জগতে দুঃখ আছে, দেখিতেছি দুঃখ জীবনকে জর্জরিত করে; জগতে সব কিছুরই যখন কারণ আছে, এ দুঃখও অকারণে আসে না, এরও কারণ আছে; চেষ্টা করিলে এ দুঃখকে দূর করা আমাদের পক্ষে সম্ভব, এবং তাহার উপায়ও আছে। এই দুঃখকে দূর করিবার কাজেই লাগিয়া যাও—জগৎ নিত্য না অনিত্য, সান্ত না অনন্ত, দেহ ও আত্মা এক না পৃথক, যে সত্যলাভ করিয়াছে মৃত্যুর পর সে কি অবস্থায় থাকে, এই সব বিষয় আলোচনা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিয়া লাভ কি? উহাতে আসল কাজ দুঃখ-লাঘব তো হইবে না। বসিয়া বসিয়া কাশী সম্বন্ধে বিভিন্ন জনের বর্ণনা লইয়া আলোচনা বা বাদ-বিসংবাদ করিলে তো আর কাশী যাওয়া হইবে না! বিভ্রান্তি কিছুটা বাড়িতে পারে তাহাতে, এইমাত্র। যদি কাশী যাইতে হয়—দুঃখকষ্টের পারে যাইতে হয়, পথের সন্ধান জানিয়া অগ্রসর হও। এইটিই আসল কাজ। এইটিই কর।

দুঃখের হাত হইতে মুক্তি পাইবার উপায়-রূপে তিনি বলিয়াছেন বেদান্তের জ্ঞানমার্গের সাধনেরই দুইটি মূল কথা—পূর্ণ সংযম-অভ্যাস এবং সত্যে মনকে পূর্ণভাবে একাগ্র করা। তাহা হইলেই অবিদ্যা নাশ হইয়া সত্যলাভ হইবে—নির্বাণলাভ হইবে। এই নির্বাণ মানে সর্ববিধ দৈহিক ও মানসিক অবস্থার নির্বাণ—অর্থাৎ দেহ-মন-বুদ্ধিতে আমি-বোধের নির্বাণ—তাহার অতীত যে অস্তিত্ব, তাহার নির্বাণ নহে। এই অস্তিত্বটি যে চির-অনির্বাণ আনন্দময় ব্রহ্ম, এই কথাটিই শুধু বলেন নাই তিনি, যাহা বেদান্ত বলিয়াছেন। দেহমনের চিরবিলয়ের পূর্বেও এই নির্বাণলাভ হইতে পারে, দেহমন সক্রিয় থাকিলেও উহাদের সহিত একাত্মবোধ চির-নির্বাপিত হইতে পারে। বুদ্ধদেব নিজেই তাহার প্রামাণ; নির্বাণলাভের পরও তিনি সুদীর্ঘকাল লোকশিক্ষা দিয়াছেন। বেদের জ্ঞানমার্গের কথাই তিনি বিশাল হৃদয় লইয়া প্রচার করিয়াছেন আপামর সাধারণের কাছে। বেদের আসল কথা, চরম সত্য ও তাহা লাভের উপায়ের কথা যেখানে, বেদের সেই জ্ঞানকাণ্ডের কথা তখন প্রায় কেহই জানিতে পারিত না; বেদের কর্মকাণ্ড লইয়াই, স্থূল দেহে বা সূক্ষ্ম দেহে (মন-বুদ্ধি প্রভৃতিতে) নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়াই ইহলোকে ও পরলোকে ধর্মবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিবিধ ভোগ কিভাবে করা যায় তাহা লইয়াই সকলে তখন উন্মত্ত; বেদের মূল লক্ষ্য যে জ্ঞানলাভ, সেকথা প্রায় সকলেই বিস্মৃত। যাহারা সরাসরি নিবৃত্তিমার্গে চলিতে অপারগ, সংযত ভোগের মাধ্যমে তাহাদের ক্রমশঃ তাহার যোগ্য করিয়া তোলাই যে প্রবৃত্তিমার্গের মূল উদ্দেশ্য, লোকে তখন ইহাও ভুলিয়া গিয়াছে, ইহলোক ও পরলোকের ভোগকেই ধর্মের চরম লক্ষ্য বলিয়া ভাবিতেছে। বেদের রত্নভাণ্ডারের দ্বার তখন সাধারণের নিকট অবরুদ্ধ, পুরোহিত

গণ যাহা বেদের প্রামাণ্য বলিয়া বলেন, তাহাই তাহাদের মানিয়া লইতে হয়। করুণার্দ্রহৃদয় বুদ্ধ সিংহবিক্রমে এই দ্বার ভাঙিয়া দিলেন, বেদের রত্নরাজি দুহাতে বিলাইলেন আপামর সাধারণের কাছে: দেহমনবুদ্ধিতে আবদ্ধ থাকা জীবনের উদ্দেশ্য নয়, আবদ্ধ থাকিলে জীবনের দুঃখের হাত হইতে কিছুতেই রেহাই পাওয়া যায় না—স্থূল সূক্ষ্ম সর্ববিধ দেহাত্মবুদ্ধি নির্বাপিত করাই মানবজীবনের লক্ষ্য। বেদের প্রামাণ্যরূপে কেবল কর্মকাণ্ডের কথামাত্র নিজ স্বার্থসিদ্ধির অনুকূলে উত্থাপিত করিয়া পুরোহিতগণ সাধারণ মানুষের নিকট যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতেছিলেন, সেরূপ বেদপ্রামাণ্যের বজ্রমুষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্যই বোধ হয় বেদের সারকথাগুলি প্রচার করিয়াও বুদ্ধদেব বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়াছিলেন।

দুঃখের নিবৃত্তি-সাধনই তাঁহার জ্ঞানলাভের প্রেরণা। রাজ্য-সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র, স্বাস্থ্য ও পূর্ণ যৌবনে যখন তাঁহার নিজের জীবন সুখলাভের সর্ববিধ উপচারে কানায় কানায় পূর্ণ, সেই সময়ই অপরের জীবনের কয়েকটি মাত্র ঘটনা দেখিয়াই মানবজীবনের দুঃখ ও নশ্বরতায় তিনি স্থিরনিশ্চয় হন, দুঃখের কবল হইতে মানুষকে বাঁচাইবার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া পথের সন্ধানে কঠোর সাধনায় রত হন এবং দীর্ঘ তপস্যান্তে সে সাধনায় সিদ্ধকাম হইবার পর উহা সর্বসাধারণের নিকট প্রচার করেন।

দুঃখের কারণরূপে তিনি অবিদ্যাকেই মূল বলিয়াছেন। জীবনের বেড়াজালে দেহমন-ইন্দ্রিয়ের কারাগারে বদ্ধ হইয়াছি বলিয়াই তো আমরা দুঃখ পাই! এই জীবনের জালে নিজেকে জড়াইবার, জন্মাইবার মূলে হইল আমাদের দেহলাভের ইচ্ছা। কেন আমরা জন্মাইতে চাই? —বিষয়ের প্রতি, রূপরসাদির প্রতি আমাদের একটা আকর্ষণ আছে; জীবনের মাধ্যমে বিষয়সম্ভোগের তৃষ্ণা, বাসনা আছে বলিয়াই এই আকর্ষণ উদ্ভূত হয়। বাসনার কারণ হইল বিষয়সম্ভোগজনিত যে আনন্দ আমরা পূর্বে পাইয়াছি, সেই অনুভূতি; উহা পুনরায় পাইবার জন্য আমাদের মনে তীব্র ইচ্ছা জাগে। এই সুখানুভূতির কারণ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ। চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন না থাকিলে এই সংযোগই ঘটিত না। আবার ইহারও মূল ভ্রূণাবস্থায় দেহ-মনের সংযোগ। সেখানে এই দেহটিকে গড়িয়া তোলে কে?—বিজ্ঞান, চেতনা আমাদের দেহমনাশ্রিত যে 'আমি' বোধ তাহাই। এই বিজ্ঞানের কারণ হইল সংস্কার; আমাদের যে বর্তমান 'আমি', তাহা তো আমাদের পূর্ব-পূর্ব-জন্মার্জিত সর্ববিধ চিন্তা ও অনুভূতিরই ফল। এ সংস্কার জন্মায় অবিদ্যার জন্য; অবিদ্যায় বা সত্যজ্ঞানের অভাবে আমরা দেহের মনের সুখদুঃখাদিকে আমার সুখদুঃখাদি বলিয়া ভাবি বলিয়াই এই সংস্কার জন্মাইতে পারে। কাজেই অবিদ্যার নাশেই সত্যলাভ হয়, আর তখনই সর্ববিধ দুঃখের অবসান ঘটে।

আচার্য শঙ্কর ও বুদ্ধ

দুঃখের চির-অবসান আর জ্ঞানলাভ একই কথা। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের এই অবিদ্যাকে, 'আমি দেহ', 'আমি মনবুদ্ধি', এই মিথ্যা জ্ঞানকে অতিক্রম করিতেই হইবে; দেহমনবুদ্ধির পারে আমাদের যে অস্তিত্ব, সেখানে পৌছিতেই হইবে।

বুদ্ধদেবের বিশাল হৃদয় যেমন মানুষের দুঃখ দূর করার উদ্দেশ্যেই এই সত্যলাভকে লক্ষ্য করিয়াছিল, পরবর্তীকালে আচার্য শঙ্করের অতুলনীয় বুদ্ধিবৃত্তি তেমনি এই সত্যলাভের পথে চলিতে প্রেরণা পাইয়াছিল সত্যকে লাভ

করিবার জন্যই—জীবন ও বিশ্বের মূলে কি সত্য আছে, সে বিষয়ে জ্ঞানলাভের প্রেরণায়ই।

সত্য সম্বন্ধে ভাষায় যতদূর বলা যায়, শঙ্করাচার্য তাহা বলিয়াও গিয়াছেন, বেদের প্রামাণ্য শুধু মানেন নাই, যুক্তিবিচার সহায়ে যতখানি করা সম্ভব উহা প্রতিষ্ঠিতও করিয়া গিয়াছেন।

আর একটি বিষয়েও বুদ্ধদেবের সহিত তাঁহার পার্থক্য সুস্পষ্ট। পূর্ণ জ্ঞান—যাহা মনবুদ্ধির অতীতে না যাইলে লাভ করা যায় না, তাহার অধিকারী বিরল, সাধারণ মানুষ তাহা ধারণাই করিতে পারে না। তাহাদের ধারণাশক্তিকে ক্রমবর্ধিত করিয়া তাহাদিগকে ধাপে ধাপে সেদিকে আগাইয়া লইয়া যাইতে হয়, প্রতি ধাপের উপযোগী একটি অবলম্বন তাহাদের দিয়া। আমাদের ধর্মে তাহার ব্যবস্থা আছে—স্থূলতম সাকারোপাসনা হইতে সুরু করিয়া উচ্চতম নির্গুণ নিরাকার আত্মস্বরূপের ধ্যান পর্যন্ত। সকল সত্যদ্রষ্টাই সকলের উপযোগী পথের নির্দেশ দেন, বুদ্ধদেবও দিয়াছেন, কিন্তু সেখানে সাধারণ মানুষের অবলম্বন ছিল না; পরবর্তীকালে সাধারণ মানুষ তাই বুদ্ধদেবকেই 'ঈশ্বর' করিয়া লইয়াছে, উহা ছাড়া তাহারা করিবেই বা কি? আচার্য শঙ্কর কিন্তু অদ্বৈতবাদ প্রচার করিলেও সাধারণের জন্য সাকারোপাসনাকে উড়াইয়া দেন নাই; নিম্ন অধিকারীর সত্যলাভে প্রস্তুতির জন্য উহার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াছেন।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে প্রবহমান সনাতন ভাবধারাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্যই ভারতের ভাগ্যবিধাতা বুদ্ধের হৃদয়রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। একই প্রয়োজনে পরবর্তীকালে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন শঙ্করের বুদ্ধিরূপে।

আধুনিক যুগে একই প্রয়োজনে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দরূপে তাঁরই আবির্ভাব।

স্বামী প্রেমানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা (বেলুড়) মঠ,
১১. ১২. ১৯০৮

ভাই শশী,

তোমাদের কুশল সংবাদে সকলে আনন্দিত হইলাম। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর এমাসে আসা হইল না। আগামী মাঘ মাসে আসিবার কথা আছে। সেই সময় শরৎ ভায়া গিয়া তাঁহাকে আনিবেন। খোকা ৩।৪ দিন মার দেশ হয়ে এখানে আসিয়াছে শুনিলাম। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বাতে ভুগিতেছেন। এই মঙ্গলবারে মার জন্মতিথিপূজা, সেই উপলক্ষে অনেক ভক্ত আগামী বড়দিনে জয়রামবাটী গিয়া ৩।৪ শত টাকা ব্যয় করিয়া তথায় মহোৎসব করিবেন। মহারাজজীকে আমার অনেকানেক প্রণাম জানাইবে। গত বৃহস্পতিবারে মাদ্রাজের সেই ভক্ত জগদীশম্ আবার ৩।৪টি বন্ধুর সহিত এখানে এসেছিল। মঠ ও দক্ষিণেশ্বর দেখে অতি আনন্দিত হয়ে গেছেন। আজকাল বিস্তর মান্দ্রাজী ভক্ত আসিতেছেন। তুমি আমাদের ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে ও সকল ভক্তদের ভালবাসা জানাইবে। মহারাজ কতদিনে এখানে ফিরিবেন? সেই সঙ্গে তোমার আগমন প্রার্থনীয়।

এবার শীত এখানে খুব পড়েছে। তোমাদের কুশলাদি লিখিয়া বাধিত করিবে। এখানকার সকলে ভাল আছে জানিবে।

ইতি দাস
বাবুরাম

(২)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ভরসা   (বেলুড় মঠ)

২৪।১২।০৮

ভাই শশী,

শ্রীযুক্ত মহারাজজীর প্রেরিত শ্রীশ্রীরামেশ্বর জীউর বিভূতি, বিল্বপত্র ও কুঙ্কুম পাইয়া আমরা তাহা মস্তকে ধারণ ও ভক্তদের বিতরণ করিয়াছি। মহারাজজী যে, শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছেন তাহাতে আমরাও অতিশয় প্রীত হইলাম। মহারাজজীর শরীর ও মন যে ভাল আছে ইহাও বিশেষ আনন্দের বিষয়। তিনি সুস্থ শরীরে দীর্ঘায়ু হয়ে বিরাজ করেন ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। তোমার আন্তরিকতা ও প্রবল ইচ্ছাতেই মহারাজজী ঐসকল দেব-দেবী দর্শন করিয়া পুলকিত হইয়াছেন, এই জন্য আমরাও তোমাকে শত শত ধন্যবাদ জানাইতেছি। তুমি ছাড়া আর কাহারও সাধ্য ছিল না যে মহারাজজীকে অত দূরে নিয়ে যেতে সমর্থ হইত। সেইজন্য তুমি আমাদের শত সহস্র ধন্যবাদ ও প্রীতিসম্ভাষণ জানিবে। অনেক স্থান দর্শন না করিয়ে তুমি বুদ্ধিমানের কার্যই করিয়াছ। শ্রীশ্রীপ্রভু পশুশালা হইতে কেবল সিংহ দর্শন করেই ফিরেছিলেন। নানা স্থানে ওঠানামাতে মহারাজের কষ্ট হইত। আমাদের সঙ্গে তোমায় কত কষ্ট পেতে হয়েছিল, জানা আছে ত? মহারাজজী যদি কাঞ্চীপুর যান তবে কামিখ্যা মায়ীর মন্দিরে সেই ব্রাহ্মণটির দ্বারা দেবীর সহস্রনাম-স্তোত্র অবশ্য অবশ্য শুনাইবে। সে ভাবটি কখনও ভুলিব না। অতি সুন্দর।

Ceylon-এ শীঘ্র রেল খুলিবে আমরাও শুনেছি। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বাত বোধ হয় তত বেশী নয়। সম্প্রতি তথা (জয়রামবাটী) হইতে লোক ফিরিয়াছে। তথায় বড়দিন মহোৎসব হবার কথা ছিল, এখন স্থগিত রহিল। শরৎ ভায়া মাঘ মাসে জয়রামবাটী গিয়া শ্রীশ্রীমাকে কলিকাতায় আনিবে। ভক্ত পরিবার যত বাড়ে ততই ভাল। এখানে আজকাল বিস্তর লোক আসিতেছে, সকলেই মহারাজজী কবে আসিবে জানিতে ইচ্ছুক। তুমি কতদিনে মহারাজজীর সঙ্গে এসে আমাদের দর্শন দিবে? আজকাল জ্বর-জ্বালা কাহারও নাই। এবার এখানে ঠাণ্ডা কিছু বেশী, সকলে বলছে। এই ঠাণ্ডায় শঙ্করানন্দজী গত সোমবারে মায়াবতী গেল; এখন ভালয় ভালয় পৌঁছালেই মঙ্গল। গোপালদাদা, তারকদাদা প্রভৃতি ভাল আছেন। দমদম মাষ্টার শ্রীবৃন্দাবনে ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে এখানে গত শনিবারে এসেছে ও ভাল আছে।

মহারাজজীকে শুনাইবে যে ডাবরি গাই এখনও প্রসব করে নাই। বোধ হয় মাঘমাসে হবে। চন্দুরী দুধ দিচ্ছে, তবে শীতে ভারি কমেছে। আজকাল গোলাপ ২।৪টি বেশ ফুটছে, যা তোমাদের ওখানে বিরল।

একটি সাহেব ডাক্তার, যে মায়াবতী ছিল, নাম Hallock, এখানে কয়েক দিন আছে। আমরা সকলে ভাল আছি। মহারাজজীকে আমাদের সকলের সহস্র সহস্র সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ও আন্তরিক ভালবাসা জানাইবে। তিনি যে পরম সুখী হয়েছেন, এই আমাদের পরম লাভ। তুমি আমাদের প্রণাম ভালবাসা জানিবে ও ছেলেদের প্রীতিসম্ভাষণ জানাইবে। ইতি

তোমাদের দাস—বাবুরাম

বুদ্ধ-বাণী

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

আসক্তি সে ত' অগ্নির সম
হৃদয় কেবলি দহে,
দ্বেষ এনে দেয় পাপ-উত্তাপ—
জীবন ভরিয়া রহে।
অন্তবিহীন বাসনা সৃজিছে
সর্ব দুঃখ ভয়,
শান্তি সে যে গো নির্বাণ-লাভ—
চির আনন্দময়!

ধর্মদানই সকল দানের সেরা,
জয় করে সব দান;
ধর্মের রস সকল রসের শ্রেয়,
করিও সে রস পান।
ধর্মজ আনন্দ-সুধা
মিটায় যে অভাবের ক্ষুধা,
এ নিখিলে আনন্দ যা আছে,
করে তা' অতিক্রম;
তৃষ্ণার ক্ষয়—সব দুখ-বোধ
ক'রে দেয় উপশম।

ভূমি যদি হয় তৃণাচ্ছন্ন,
শস্য কভু না ফলে;
মোহ-পরায়ণ সেইরূপ হয়
বিনষ্ট পলে পলে।
মোহ-হীন জনে যে করিবে দান,
পাবে সে পরম ফল;
মুক্তির পথে তা' হবে সহায়—
জীবনের সম্বল।

আচার্য শঙ্কর

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন

শঙ্করাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য দক্ষিণ ভারতের কেরল প্রদেশে কালাডি নামক গ্রামে ৬০৮ শকে (৬৮৬ খৃষ্টাব্দে) বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন (মতান্তরে বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী) নম্বুরী ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতা শিবগুরু স্বধর্মনিষ্ঠ যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও পুত্র না হওয়ায় তিনি গ্রামের নিকটস্থ বৃষপর্বতে কেরলরাজ-প্রতিষ্ঠিত শিবালয়ে সস্ত্রীক মহাদেবের আরাধনা করিতে থাকেন। এক বৎসর পরে ভগবান শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বপ্নে অভীষ্ট বর প্রদান করিলে শিবগুরু পুত্রলাভ করেন। ইনিই জগদ্বিখ্যাত আচার্য শঙ্কর।

শিশুকাল হইতেই শঙ্কর অসাধারণ মেধাবী ও শ্রুতিধর ছিলেন। তিন বৎসর বয়সেই তিনি পিতৃহীন হন। স্বামীর অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য শঙ্করের মাতা পঞ্চম বৎসরে উপনয়ন দিয়া পুত্রকে শাস্ত্রাভ্যাসের জন্য গুরুগৃহে প্রেরণ করেন। অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন শঙ্কর দুই বৎসরেই সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া গুরুর আদেশে গৃহে প্রত্যাগমন করেন এবং মাতৃসেবায় রত হন।

গুরুগৃহে অবস্থানকালে শঙ্কর একদিন এক ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করিলেন। ব্রাহ্মণী গৃহে কিছু না থাকায় তাঁহাকে একটি আমলকী ফল প্রদান করেন এবং নিজেদের দারিদ্র্যের কথা নিবেদন করেন। ব্রাহ্মণীর দুঃখে বিগলিত হইয়া শঙ্কর কাতরপ্রাণে লক্ষ্মীদেবীর স্তব করেন এবং ব্রাহ্মণীকে আশ্বস্ত করিয়া গুরুগৃহে ফিরিয়া আসেন। সেই রাত্রেই দেবীর কৃপায় ব্রাহ্মণীর প্রচুর ধনলাভ হইয়াছিল। আচার্য শঙ্করের জীবনীলেখক মাধবাচার্য 'শঙ্কর-দিগ্বিজয়' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ঐ রাত্রে ব্রাহ্মণীর গৃহে স্বর্ণ আমলকীর সৃষ্টি হইয়াছিল।

গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার কিছুদিন পরে আর একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে, যাহাতে শঙ্করের খ্যাতি চতুর্দিকে প্রসারিত হয়। শঙ্করের মাতা গৃহ হইতে কিছু দূরে আলোয়াই নদীতে প্রত্যহ স্নান করিতে যাইতেন। একদিন গ্রীষ্মকালে স্নান করিয়া বাটী ফিরিবার পথে প্রচণ্ড রৌদ্রে অবসন্ন হইয়া তিনি মূর্ছিতা হইয়া পড়েন। তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া শঙ্কর তাঁহার অনুসন্ধানে গিয়া দেখেন তিনি অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছেন। সেবাশুশ্রূষার দ্বারা সংজ্ঞালাভ করাইয়া মাতাকে গৃহে লইয়া আসিয়া শঙ্কর কাতরভাবে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন যেন নদী তাঁহাদের বাটীর নিকট দিয়া প্রবাহিত হয়। অতি আশ্চর্যের বিষয়, কিছুদিনের মধ্যেই আলোয়াই নদীর গতি পরিবর্তিত হইয়া শঙ্করের বাটীর পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল।

একদিন কয়েকজন জ্যোতিষী শঙ্করের গৃহে আসিয়া কোষ্ঠী বিচার করিয়া বলিয়া যান যে, শঙ্কর অতি অল্পায়ু হইবে—অষ্টম বর্ষে তাহার মৃত্যুযোগ আছে। ঐ সময় হইতে শঙ্করের মনে সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য তীব্র বাসনা জন্মে। তিনি মাতাকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে থাকেন, কিন্তু বিধবা মাতা একমাত্র সন্তানকে কিছুতেই অনুমতি প্রদান করিলেন না। কয়েকদিন পরে কোন কার্যোপলক্ষে আলোয়াই নদী পার হইয়া

আসিবার কালে শঙ্করকে এক কুম্ভীর আক্রমণ করে। শঙ্কর উচ্চৈঃস্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিতে থাকিলে বৃদ্ধা মাতা বা কেহই জলে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে যাইতে পারিলেন না। তখন শঙ্কর সেই অবস্থায় দূর হইতে মাতাকে বলিলেন, "মা, সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া মৃত্যু হইলে সদ্গতি হয়, আপনি আমাকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিন।" পুত্রের কল্যাণের জন্য মাতা অনুমতি প্রদান করিলে বিধাতার ইচ্ছায় কুম্ভীর শঙ্করকে পরিত্যাগ করে। ঐ ঘটনার কিছুকাল পরে মাতাকে অনেক বুঝাইয়া এবং তাঁহার মৃত্যুকালে আসিয়া সৎকার করিবেন ও ভগবদ্দর্শন করাইবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া শঙ্কর গৃহত্যাগ করিলেন।

গুরুগৃহে শাস্ত্রপাঠকালে শঙ্কর গুরুর নিকট শুনিয়াছিলেন মহর্ষি পতঞ্জলি দেহধারণ করিয়া গোবিন্দপাদ নাম লইয়া নর্মদাতীরে এক গুহায় বহুকাল সমাধিস্থ আছেন। অষ্টমবর্ষীয় বালক সদ্গুরুলাভের আশায় মাসাধিককাল পদব্রজে দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া নর্মদাতীরে সেই গুহাদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং গুহা প্রদক্ষিণ করিয়া যোগীকে ভক্তিভরে স্তব করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ গোবিন্দপাদের সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি শঙ্করের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে দীক্ষাদানপূর্বক নিজের নিকট রাখিলেন এবং ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ও যোগ-সাধনের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। গোবিন্দপাদ তখন শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদানপূর্বক বলিলেন—"বৎস, তুমি কাশীধামে গমন কর এবং বিশ্বেশ্বরের প্রসাদে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া বৈদিক ধর্ম প্রচার কর।" শঙ্কর কাশীতে বিশ্বেশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিবার জন্য প্রত্যক্ষ আদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর শঙ্করাচার্য কাশী হইতে বদরিকাশ্রম গমন করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বয়সে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-রচনা সমাপ্ত করিয়া শিষ্যগণকে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে দশোপনিষদের ও গীতার ভাষ্য এবং বহু গ্রন্থ রচনা করিলেন।

আচার্য শঙ্করের প্রথম শিষ্য সনন্দন। তিনি পরম গুরুভক্ত ছিলেন বলিয়া আচার্য তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। এজন্য অপর শিষ্যগণ কিঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিত ছিলেন। একদিন শঙ্করাচার্য শিষ্যদিগকে সনন্দনের গুরুভক্তির পরিচয় ও শিক্ষা দিবার জন্য নদীর অপর পারে অবস্থিত সনন্দনকে এপার হইতে আহ্বান করিলেন। গুরুভক্ত শিষ্য গুরুদেবের আহ্বানে নদীর ব্যবধান লক্ষ্য না করিয়াই দ্রুতবেগে আসিতে লাগিলেন। গুরুভক্তির কি অপার মহিমা! সনন্দনের প্রতি পদক্ষেপে নদীবক্ষে এক একটি করিয়া পদ্ম প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। তিনি পদ্মগুলির উপর দিয়া অনায়াসে নদী পার হইয়া আচার্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই সময় হইতে তাঁহার নাম 'পদ্মপাদ' হইল।

বদরিকাশ্রমে চারি বৎসর অবস্থান করিবার পর পুনরায় কাশীধামে আগমন করিয়া শঙ্করাচার্য শিষ্যগণকে শিক্ষাদান এবং শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া বৈদিক ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মসূত্র-প্রণেতা ব্যাসদেব শঙ্করের সহিত শাস্ত্রবিচার করিবার জন্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে আগমন করেন। অষ্টাহকাল শাস্ত্রালোচনা ও তর্ক করিবার পর ব্যাসদেব সন্তুষ্ট হইয়া নিজমূর্তিতে দর্শন দিয়া শঙ্করাচার্যকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "তোমার ভাষ্য উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তুমি শঙ্করের অবতার। তুমি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হও। দূষিতধর্মমতাবলম্বী আচার্যগণকে বিচারে পরাস্ত

করিয়া ধর্মের গ্লানি হইতে সনাতন ধর্ম রক্ষা এবং বেদান্তমত প্রচার কর। ধর্মসংস্থাপনের জন্য তোমার আয়ু বত্রিশ বর্ষ পর্যন্ত বর্ধিত হইল।"

অনন্তর শঙ্করাচার্য শিষ্যগণের সহিত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। তিনি হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ-পূর্বক বিভিন্নমতাবলম্বী প্রতিপক্ষগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৌদ্ধবাদ, জৈনমত, পাশুপত, ভৈরব, কাপালিক প্রভৃতি মতবাদকে হীনপ্রভ করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষাপূর্বক অদ্বৈত বেদান্তের মত প্রচার করেন। তিনি প্রথমে মগধে মাহিষ্মতীনগরে গমন করিয়া মীমাংসকাচার্য কুমারিলভট্টের শিষ্য মণ্ডনমিশ্রকে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বমতে আনয়ন করেন। এই মণ্ডনমিশ্র সুরেশ্বরাচার্য নামে শঙ্করের প্রধান শিষ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি মহারাষ্ট্রে ও শ্রীশৈলে শৈব ও কাপালিক প্রভৃতি মতবাদিগণকে পরাস্ত করেন। শ্রীশৈলে 'উগ্রভৈরব' নামে এক কাপালিক ভৈরবের নিকট বলি দিয়া সিদ্ধিলাভ করিবার মানসে গোপনে আচার্যের নিকট প্রার্থনা করে যেন তিনি বলির জন্য তাঁহার দেহ দান করেন। দেহজ্ঞানশূন্য উদারহৃদয় শঙ্করাচার্য কাপালিকের বলিস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, "আমি সমাধিস্থ হইলে আমার মস্তক বিচ্ছিন্ন করিও।" এদিকে আচার্যকে দেখিতে না পাইয়া নৃসিংহদেবের ভক্ত পদ্মপাদ গুরুদেবের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তাঁহার রক্ষার জন্য ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভগবান নৃসিংহদেব পদ্মপাদের শরীরে আবিষ্ট হইয়া নক্ষত্রবেগে বলিস্থানে গমনপূর্বক কাপালিকের খড়্গ শঙ্করাচার্যের উপর পতিত হইবার পূর্বেই কাপালিকের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন।

আচার্য শঙ্কর দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া যে যে স্থান দিয়া গমন করিয়াছিলেন সেখানকার লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও স্থানে স্থানে মন্দির নির্মাণ করিয়া তত্রত্য দেবতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বদরীনাথে নারদকুণ্ড হইতে বদরীনারায়ণের মূর্তি এবং হৃষীকেশে গঙ্গাগর্ভ হইতে বিষ্ণুবিগ্রহ উদ্ধার করিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। দাক্ষিণাত্যের কামাক্ষী দেবীর মন্দির তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। পুরীধামে কালযবনের অত্যাচারে পাণ্ডারা জগন্নাথ-বিগ্রহের উদরস্থিত রত্নপেটিকা চিল্কা হ্রদের তীরে প্রোথিত করিয়া লুকাইয়া রাখে। কালক্রমে ঐ স্থান বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়া যাইলে শঙ্কর যোগবলে ঐ স্থান নির্ণয় করিয়া রত্নপেটিকা উদ্ধার করিয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

শঙ্করাচার্য ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠ নির্মাণ করিয়া প্রত্যেক মঠে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্থাপন করিয়া পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে মহীশূর প্রদেশে তুঙ্গভদ্রার তীরে শৃঙ্গেরী মঠ এবং ঐ মঠে সরস্বতীদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি পুরীধামে গোবর্ধন মঠ স্থাপন করেন। তৎপর উজ্জয়িনীতে ভৈরবদিগের অত্যাচার দমন করিয়া দ্বারকায় সারদা মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কামরূপে অভিনবগুপ্তকে বিচারে পরাস্ত করিয়া শাক্তদের দুর্নীতি দমন করেন। কামরূপে অভিনবগুপ্ত অভিচারের দ্বারা আচার্যের শরীরে ভগন্দর রোগের সৃষ্টি করে। পদ্মপাদ নৃসিংহ-মন্ত্র জপ করিয়া ঐ রোগ আচার্যের শরীর হইতে অভিনবগুপ্তের দেহে সঞ্চারিত করিয়া গুরুদেবকে রোগমুক্ত করেন। অনন্তর শঙ্করাচার্য মিথিলা ও কাশ্মীর হইয়া বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া সেখানে বিষ্ণুপ্রয়াগের নিকট জ্যোতির্মঠ স্থাপন করেন। তিনি

শৃঙ্গেরী মঠে সুরেশ্বরাচার্য, গোবর্ধন মঠে পদ্মপাদাচার্য, সারদা মঠে হস্তামলকাচার্য এবং জ্যোতির্মঠে তোটকাচার্য—এই চারিজন শিষ্যকে মঠাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। সুরেশ্বর ও পদ্মপাদের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। অপর দুইজন সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি এইরূপ:

হস্তামলকাচার্য—ইনি ত্রয়োদশ বৎসর বয়স পর্যন্ত মূকের ন্যায় ছিলেন। পিতা তাঁহাকে শঙ্করের নিকট আনয়ন করিলে ইনি আচার্যকে প্রণাম করিয়া 'হস্তামলক' নামে একটি সুন্দর স্তোত্র পাঠ করিয়া আত্মপরিচয় দেন এবং তাঁহার শিষ্য হন। এজন্য ইঁহার নাম হস্তামলকাচার্য হইয়াছিল। শঙ্কর ঐ স্তোত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।

তোটকাচার্য—আচার্যের শৃঙ্গেরী মঠে অবস্থানকালে ইনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইঁহার নাম ছিল গিরি। গিরির বিদ্যাবুদ্ধি অল্প ছিল, কিন্তু তিনি অত্যন্ত গুরুসেবাপরায়ণ ছিলেন। একদিন শাস্ত্রব্যাখ্যাকালে ইনি গুরুর বস্ত্র ধৌত করিতে যাওয়ার জন্য অনুপস্থিত থাকায় শঙ্কর তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। পদ্মপাদ প্রভৃতি শিষ্যগণ গিরিকে মূর্খ বলিয়া আচার্যকে অপেক্ষা করিতে নিষেধ করেন। তখন শঙ্করাচার্যের কৃপায় গিরির ব্রহ্মবিদ্যার স্ফুরণ হয়। গিরি তোটক ছন্দে গুরুদেবের স্তব করিতে করিতে আগমন করেন। আচার্য এইরূপে পদ্মপাদ প্রভৃতিকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তদবধি গিরি তোটকাচার্য নামে প্রসিদ্ধ হন।

আচার্য শঙ্কর তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী ও পুরী—এই দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'মঠাম্নায়' নামে মঠ ও সন্ন্যাসীদের বিধিনিষেধসূচক গ্রন্থ রচনা করিয়া ইঁহাদিগকে পূর্বোক্ত মঠচতুষ্টয়ের অধীন করেন। পরিশেষে তিনি কেদারনাথে প্রত্যাবর্তন করিয়া বত্রিশ বৎসর বয়সে অতিমানবলীলা সংবরণ করেন।

শঙ্কর-বিরচিত কয়েকটি প্রধান গ্রন্থ ও রচনাবলীর নামোল্লেখ করা হইল: (১) ব্রহ্মসূত্রভাষ্য বা শারীরক মীমাংসা। (২) ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর ও নৃসিংহপূর্বতাপনী উপনিষদসমূহের ভাষ্য। (৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-ভাষ্য। (৪) সনৎসুজাতীয় ভাষ্য। (৫) বিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্য। (৬) হস্তামলকভাষ্য। (৭) বিবেক-চূড়ামণি। (৮) আনন্দলহরী। (৯) উপদেশ-সাহস্রী। (১০) অপরোক্ষানুভূতি। (১১) প্রবোধসুধাকর। (১২) যোগতারাবলী। (১৩) মণিরত্নমালা। (১৪) গঙ্গা, যমুনা, ভবানী, দক্ষিণামূর্তি, শিব, বিষ্ণু ও গণেশাদি দেবদেবীর স্তোত্র। (১৫) মোহমুদ্গর। (১৬) বোধসার, বাক্যসুধা, দশশ্লোকী, আত্মানাত্ম-বিবেক ইত্যাদি।

এক্ষণে শঙ্করাচার্যমতানুগ অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে:

অদ্বৈতবাদ—আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। মায়ার সাহায্যে তিনি আকাশাদি প্রপঞ্চরূপে বিবর্তিত হইয়াছেন। জগৎপ্রপঞ্চ মায়িক অর্থাৎ মিথ্যা। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জীব নিত্যমুক্ত—অবিদ্যার বলে আপনাকে বদ্ধ মনে করে। ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্বিশেষ অর্থাৎ ব্রহ্মের নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি ধর্ম নাই, যাহার দ্বারা তাঁহাকে নির্দেশ করা যাইতে পারে। মায়ার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই অথচ ইহা আকাশকুসুমের মতো অভাবাত্মকও নহে, সুতরাং অনির্বচনীয়।

আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদের সারকথা অর্ধ শ্লোকে বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"।

অদ্বৈতবাদের ধারণা করিতে হইলে মায়া কি তাহা প্রথমে বুঝিতে হইবে। যাহা পরিবর্তনশীল, অচিরস্থায়ী ও বিনাশী তাহা মায়াময়। এই দৃশ্যমান জগৎ প্রত্যক্ষ প্রতিভাত হইতেছে। ইহাকে অসৎ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নহে। অথচ ইহা যে একেবারে সৎ তাহা বিচার ও যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হয় না, কারণ ইহার পরিবর্তন ও বিনাশ আছে, ইহা চিরস্থায়ী নহে। সুতরাং ইহা অনির্বাচ্য, মায়াময়।

সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্তসারে বলিয়াছেন: "অজ্ঞানং তু সদসদ্ভ্যামনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ।" অর্থ—অজ্ঞান অর্থাৎ মায়া সৎও নহে, অসৎও নহে অর্থাৎ অনির্বচনীয়। ইহা সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণাত্মক। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে ইহা বিলীন হইয়া যায়। ইহা ভাবরূপ তুচ্ছ পদার্থ।

জ্ঞানবাদীরা জগৎকে আকাশকুসুম বা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় একেবারে মিথ্যা বলেন নাই। তাঁহারা জগতের ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্যে (১।১১।১) বলিয়াছেন: প্রাগ্ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানাৎ নিয়মেন কর্তব্যানি শ্রৌতস্মার্তানি কর্মাণি। অর্থাৎ, যতদিন আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপলব্ধি না হয় ততদিন বেদ- ও স্মৃতি-বিহিত কর্মসকল নিয়ম করিয়া সম্পাদন করা উচিত। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম-উপলব্ধির পর দেখা যায় জগৎ মিথ্যা, তাহার পূর্বে ব্যবহারিক জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না।

শঙ্করাচার্য সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন উত্তম অধিকারীর জন্য নির্গুণ উপাসনা অর্থাৎ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি এবং মন্দাধিকারীর জন্য সগুণ উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। তিনি সাধারণ গৃহস্থের জন্য পঞ্চ দেবতার (গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা) উপাসনার নির্দেশ করিয়াছেন। অদ্বৈতমতের সিদ্ধান্ত এই যে সগুণ উপাসনায় নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়।

এক্ষণে নির্গুণ উপাসনার কথা বলা হইতেছে: 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ 'তুমি হও সেই' প্রভৃতি বেদবাক্য যে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করে তাহা সিদ্ধান্ত করার নাম মনন। যখন শ্রবণ ও মনন দ্বারা ব্রহ্মচৈতন্য বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না তখন সেই বিষয়ে চিত্ত স্থাপন করিয়া যে ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন অনুভব তাহার নাম নিদিধ্যাসন। নিদিধ্যাসনের পরিপাক-অবস্থার নাম সমাধি। নিদিধ্যাসনে ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় বিষয়ের জ্ঞান থাকে। চিত্ত ক্রমে ধ্যাতা ও ধ্যান এই দুইটি বিষয় পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ধ্যেয় বিষয়ে স্থির হইয়া যায়। চিত্তের এই অবস্থাকে নির্বিকল্প সমাধি বলে। এই সমাধি জন্মজন্মার্জিত পাপ ও পুণ্য বিনাশ করিয়া ফেলে। প্রথমে তত্ত্ববস্তুর পরোক্ষ জ্ঞান হয়। পরে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে হস্তামলকবৎ তত্ত্ববস্তুর উপলব্ধি হয়। মধ্যাহ্ন-সূর্য যেমন অন্ধকার নাশ করে, সেইরূপ উক্ত অপরোক্ষ জ্ঞান সংসারের কারণ অবিদ্যা-অন্ধকারকে নষ্ট করিয়া ফেলে। তখন জীব সংসারমুক্ত হইয়া নিরতিশয় সুখ-স্বরূপ ব্রহ্মই হইয়া যায়।

আচার্য শঙ্কর সম্বন্ধে কেহ কেহ অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। তাঁহারা শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও নাস্তিক বলিতেও কুণ্ঠিত হন না।

তিনি কিরূপে ধর্মের গ্লানি হইতে দেশকে রক্ষাপূর্বক আসমুদ্রহিমাচল সনাতন বৈদিক ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হইয়া আছে। অদ্বৈতমত সার্বভৌম ও উদার। এজন্য অদ্বৈতবাদীদের কাহারও সহিত বিবাদ নাই। তাঁহারা দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি যত মত আছে কোনটিকেই তুচ্ছ জ্ঞান করেন না। তাঁহারা সকল মতবাদই স্বীকার করেন, কিন্তু ব্রহ্ম নির্গুণ নির্বিশেষ—ইহা চরম তত্ত্ব বলিয়া থাকেন, এই মাত্র প্রভেদ। আচার্য শঙ্কর তাঁহার বেদান্তদর্শনের অধ্যাসভাষ্যে এই নির্বিশেষ মতবাদ প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য একাধারে মহাজ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত ছিলেন। তিনি জ্ঞানরাজ্যের সার্বভৌম সম্রাট ছিলেন, ইহা অবিসংবাদিত।

শঙ্কর-রচিত 'যোগতারাবলী' গ্রন্থপাঠে বুঝা যায়, তিনি যোগমার্গের কিরূপ প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ী, জালন্ধরাদি মুদ্রা, সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলিনী, ষট্‌চক্র ও নাদানুসন্ধান সমাধি প্রভৃতির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর যে মহাযোগী ছিলেন, সে সম্বন্ধে দুই-একটি ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে।

গুরু গোবিন্দপাদের নিকট অবস্থিতিকালে একদা নর্মদার জলপ্লাবন হয়। নদীর জল অত্যন্ত স্ফীত হইয়া তীরবর্তী গৃহাদি ভাসাইয়া গোবিন্দপাদের গুহামধ্যে প্রবেশের উপক্রম করে। যোগী তখন সমাধিস্থ। শঙ্কর গুরুদেবের সমাধির বিঘ্ন হইবে আশঙ্কা করিয়া গুহার মুখে একটি কলস স্থাপন করিলেন। জলস্রোত কলসমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, কিন্তু উহার এক বিন্দুও গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল না। এই জলস্তম্ভন শঙ্করের যোগসিদ্ধির পরিচায়ক।

এইবার শঙ্করসাহিত্য হইতে উদ্ধৃতি দিয়া শঙ্করাচার্যের ভক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। আচার্য শঙ্কর ভক্তিকে জ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়াছেন। যথা, তাঁহার 'বোধসার' গ্রন্থে :

ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাস্ত্যপায়শতৈরপি।
ভক্তির্জ্ঞানং তথা মুক্তিরিতি সাধারণক্রমঃ॥

অর্থ—ভক্তি ব্যতীত শত শত উপায় দ্বারাও জ্ঞানলাভ করা যায় না। প্রথমে ভগবদ্ভক্তি, তাহা হইতে জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ হয়, ইহাই সাধারণ ক্রমানুসারে হইয়া থাকে।

তিনি 'বিবেকচূড়ামণি'তে বলিয়াছেন :

মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।

অর্থ—মোক্ষের কারণস্বরূপ উপায়গুলির মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

ভক্তেরা যে ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা শ্রীহরির দর্শনলাভ করেন, সে সম্বন্ধে শঙ্কর তাঁহার 'প্রবোধসুধাকর' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

যদ্যপি গগনং শূন্যং তথাপি
জলদামৃতাংশুরূপেণ।
চাতকচকোরনাম্নোর্দৃঢ়ভাবাৎ পূরয়ত্যাশাম্॥
তদ্বৎ ভজতাং পুংসাং দৃগ্‌বাঙ্মনসাম-
গোচরোঽপি হরিঃ।
কৃপয়া ফলত্যকস্মাৎ সত্যানন্দা-
মৃতেন বিপুলেন॥*

অর্থ—যদিও গগন শূন্যাকার তথাপি মেঘরূপে চাতকের এবং সুধাংশুরূপে চকোরের দৃঢ়ভাববশতঃ আশা পূরণ করিয়া থাকে। সেইরূপ দৃষ্টি, বাক্য ও মনের অগোচর হইলেও শ্রীহরি অহৈতুক কৃপাপূর্বক ভক্তপুরুষগণের প্রতি বিপুল সত্য-আনন্দ-সুধায় ফলবান্ হইয়া থাকেন।

* এই শ্লোকটি মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার তাঁহার 'ফেলোশিপ লেকচারে' উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আচার্য শঙ্কর মহাভারতের অনুশাসন-পর্বের অন্তর্গত 'বিষ্ণুসহস্রনামে'র উপর ভাষ্য রচনা করিয়া নামমাহাত্ম্য ও হরিভক্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

শঙ্কর-রচিত দেবদেবীর সুললিত স্তোত্রগুলি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তিভাবের পরিচায়ক।

শঙ্করাচার্য যে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুরাগী ছিলেন তাহা শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার 'তত্ত্বসন্দর্ভ' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্করের কুলদেবতা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি কিরূপ কৃষ্ণভক্ত ছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁহার 'প্রবোধসুধাকর' গ্রন্থ। ইহাতে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলার অধিকাংশই বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই যে নির্গুণ ব্রহ্ম তাহা তিনি এই গ্রন্থের "সগুণ-নির্গুণয়োরৈক্যপ্রকরণম্"-এ দেখাইয়াছেন। যথা,

সাক্ষাৎ যথৈকদেশে বর্তুলমুপলভ্যতে রবেবিম্বম্।
বিশ্বং প্রকাশয়তি তৎ সর্বৈঃ সর্বত্র
দৃশ্যতে যুগপৎ॥
যদ্যপি সাকারোঽয়ং তথৈকদেশী বিভাতি
যদুনাথঃ।
সর্বগতঃ সর্বাত্মা তথাপ্যয়ং সচ্চিদানন্দঃ॥

অর্থ—সূর্যমণ্ডল আকাশের একাংশে গোলাকার দৃষ্ট হন, কিন্তু সমগ্র বিশ্বকে প্রকাশিত করেন এবং সকলে তাঁহাকে সর্বত্র এককালে দর্শন করিয়া থাকে। সেইরূপে যদুনাথ যদ্যপি সাকার এবং গৃহাদির একদেশে অবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হন, তথাপি তিনি সর্বব্যাপক, সকলের আত্মা এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

আচার্য শঙ্করের জীবন জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির সমন্বয়ের অপূর্ব দৃষ্টান্ত। অদ্বৈতবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার আসমুদ্রহিমাচল পরিভ্রমণ ও বিভিন্নমতবাদী আচার্যদের বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বমতে আনয়ন, প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য, নানা গ্রন্থাদির প্রণয়ন এবং ভারতের চারি প্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপনপূর্বক দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা তাঁহার অতুলনীয় কীর্তি। জীবনকালেই তাঁহার কীর্তিকলাপ সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের প্রসন্নগম্ভীর অধ্যাসভাষ্যে শ্রুতি-বাক্যের যুক্তিপূর্ণ অপূর্ব সমন্বয় অদ্বিতীয়। এই ভাষ্যের মধ্যে তিনি অন্যান্য দার্শনিক মত যেভাবে প্রপঞ্চিত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার নিদর্শন। শঙ্করাবতার আচার্য শঙ্করের মনীষা ভারতের জাতীয় জীবনের মহাতপস্যার ফল। শঙ্করের জীবন-সুষমায় স্নাত হইলে আশার তৃপ্তি, জীবনের পূর্ণতা, প্রাণের বল, হৃদয়ের তেজ, বুদ্ধির স্ফূর্তি এবং সর্বোপরি মানবের পরিপূর্ণ আত্মদর্শন লাভ হয়। আচার্য শঙ্করের মতো মহাপুরুষ পৃথিবীতে বিরল।

ভগিনী নিবেদিতা শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন:

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শঙ্করাচার্যের মহিমা ধারণা করিতে অক্ষম। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। তিনি স্বল্পকাল মধ্যে এরূপ গভীর সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক সাহিত্য রচনা করিয়া ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর হৃদয়ে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। দীর্ঘ বারশত বৎসরকাল তাঁহার এই মহিমাকে কেহই বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি এরূপ স্তোত্রসকল রচনা করিয়াছেন যে, তাহাদের গভীর মাধুর্য বিদেশীয়গণের অনভ্যস্ত কর্ণেও নিঃসন্দেহে অনুভূত হইয়া থাকে। আমরা এই মহত্ত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে পারি, কিন্তু ইহা আমাদের বোধগম্য নহে। আমরা Francis of Assissiর ভক্তিভাব, Abelard-এর

বুদ্ধিমত্তা, Martin Luther-এর পুরুষোচিত তেজস্বিতা ও স্বাধীনচিত্ততা এবং Ignatius Lyolaর রাজনৈতিক কর্মকুশলতা চিন্তা করিয়া আনন্দিত ও বিস্মিত হইতে পারি, কিন্তু কে একাধারে এই সকলের সমষ্টির চিন্তা করিতে পারে ?*

* এই প্রবন্ধ-রচনায় বেদ, উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র এবং বেদান্তের প্রকরণগ্রন্থ ব্যতীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য লইয়াছি : ১। পঞ্চদশীর বেদান্তরহস্য—শ্রীকুমুদবান্ধব চট্টোপাধ্যায় ২। বেদান্তদর্শনের ইতিহাস—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী ৩। আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ৪। শঙ্করগ্রন্থমালা—মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন ৫। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস—ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

মন্মনা ভব

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

পরিবর্তনের স্রোতে অপম্রিয়মাণ
এ জল-বুদ্বুদরাশি ;—তুমি হে ধীমান,
খুঁজো না এদের মাঝে সান্ত্বনা আত্মার !
মৃত্যুজাল বিছায়েছে এরা সেই 'মার'
বিষাক্ত কামনা-শরে করে যে জর্জর।
অনন্তের পদপ্রান্তে বাঁধো তুমি ঘর।
সেই ঘরে নিশিদিন ফেলে রাখো মন !
কাজ করো অবিরাম ; চিত্তে অনুক্ষণ
নিত্যের ভাবনা যেন জ্বলে অনির্বাণ,—
আরতির দীপশিখা পবিত্র, অম্লান !
আমরা মনেতে বদ্ধ, মুক্ত মোরা মনে।
মন-করী বশে এলে হৃদয়-আসনে
বসিবেন জগদ্ধাত্রী। ছড়ানো যা আছে
—কুড়িয়ে রাখো তা সেই চরণের কাছে।

নিবেদিতার সমাজচিন্তা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

সেজন্য যুগপ্রয়োজন মেটাবার জন্যই এ যুগের আরম্ভ হ'তে ভাবজগতে নানাভাবে সমন্বয়-প্রয়াস চলছিল। প্রথম থেকেই দেখা গেল সঙ্কীর্ণ জাতীয় ভাবাদর্শ আর মনীষিচিত্তকে সন্তুষ্ট করতে পারছিল না। যুগ-প্রবণতা প্রথম মনীষিচিত্তেই প্রতিফলিত হয়। নানা দেশের বিচিত্র চিন্তা ধ্যান ধারণার মধ্যে যে অপূর্ব সুর-সংগতি আছে তা তাদের অনুভূতিতে প্রথম অপূর্ব সুরলহরীরূপে ধরা দিল। আমরা জানি যে, আমাদের দেশে মনীষিশ্রেষ্ঠ রামমোহন এগিয়ে এলেন পশ্চিমকে বরণ ক'রে নিতে। কিন্তু আমরা একথা অল্পলোকেই জানি বা স্মরণ রাখি যে, পাশ্চাত্যও সেই প্রথম হ'তেই এগিয়ে এসেছিল প্রাচ্যকে গ্রহণ করতে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে দেখা যায়, Thoreau (থরো) প্রাচ্যভূমির বিভিন্ন ভূখণ্ডে (চীন ভারত ও পারস্যের এবং গ্রীক ভাষার) বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের একটি সঙ্কলন প্রকাশ ক'রে সারা পৃথিবীময় প্রচার করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। চিন্তাবিদ্ এমার্সন ১৮৩৮ খৃঃ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি প্রখ্যাত ভাষণে বেদান্ত-দর্শন-প্রোক্ত দর্শনমতের অনুরূপ এক চিন্তাধারা উপস্থাপন করলেন। লেখক Edgar Allan Poe-ও তাঁর Eureka (ইউরেকা) নামক বিশিষ্ট রচনায় ঔপনিষদিক ভাবধারা প্রচার করেন।[২] এদের সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান কবি Whitman-এর। ভারতকে সুস্পষ্ট আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি একটি অপূর্ব রচনায় বললেন :

"To us, my city···
The Originatress comes,
The nest of languages, the bequeather of poems, the race of old
The race of Brahma comes".
(A Broadway Pageant)

তাঁর অপর একটি অনুপম কবিতা যা ভগিনী নিবেদিতা তাঁর আলোচনার একস্থানে উদ্ধৃত করেছেন, তার মূলকথা সারা বিশ্বের ভাবধারাকে গ্রহণ। তারই কয়েকটি লাইনে তিনি বলছেন—"শুধু পাশ্চাত্য মহাদেশই নয়

সারা পৃথিবীর সেরা সম্পদ তোমার সাথে
ভেসে চলেছে,
হে তরণী, তোমার মাস্তুল ভারসাম্য ঠিক
রেখেছে : হে কর্ণধার,
প্রাচীনতার জন্য শ্রদ্ধার্হ পূজারী এশিয়া আজ
তোমার সাথে ভেসে চলেছে।[৩]

Whitman-এর মধ্যে এই বিশ্বগ্রহণপ্রবণতা এক আধ্যাত্মিক একাত্মবোধ এনেছিল, যে

---

১ Romain Rolland—Life of Vivekananda —P 48

২ "His famous lecture...given in 1838 at the University of Harvard expressed belief in the Divine in man akin to the concept of the Self, Atman, Brahman.—R. Rolland—Life of V.—P 47

৩ Thy Mother With Thy Equal Brood—অনুবাদ : ভারততীর্থে নিবেদিতা—পৃঃ ১৬৯

একাত্মবোধ বেদান্তোক্ত অদ্বৈতানুভূতির সমগোত্রীয়। এরূপ একটি একাত্মবোধক কবিতায় তার প্রমাণ মেলে :

"Was somebody asking to see the soul ?
See your own shape and countenace,
Persons, substances, beasts and trees,
The running rivers, the rocks and sands.
All hold spiritual joys and afterwards loosen them
How can the real body ever die and be buried ?[৪]

কিন্তু কবি ও মনীষিবৃন্দ যা উপলব্ধিতে লাভ করেছিলেন তাকে একটি বৌদ্ধিক যুক্তিসহ রূপ দেওয়া তখনও বাকি ছিল। তা শুধু নয়, এমন একজনের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল যিনি প্রাচীন ও আধুনিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে একই সঙ্গে নিজের মধ্যে ধারণ ক'রে তাকে জীবন্ত ক'রে তুলবেন। গত শতাব্দীর শেষভাগে তাঁর আবির্ভাব ঘটলো। তিনি ভারতের স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি পৃথিবীর যাবতীয় ভাবধারাকে এক অপূর্ব সমন্বয়-সূত্রে গ্রথিত করেছেন। যে আধুনিক যুগের পথ বেয়ে ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে আমরা আজ চলেছি তার মানসলোককে পূর্ণ পরিণতি প্রদান ক'রে সেই ভবিষ্যৎকে তিনি সৃষ্টি ক'রে গিয়েছেন। তাঁর অসামান্য সমন্বয়-প্রতিভার কথা বলতে গিয়ে Romain Rolland বলেছেন, "In two words—equilibrium and synthesis Vivekananda's constructive genius may be summed up."[৫] তাঁর সমস্ত চিন্তা একত্র অনুধ্যান করলে এর তাৎপর্য অনুভব করা যায়। যেমন বহু বিভিন্ন নদীজলধারা বহু বিভিন্ন উৎস হ'তে উদ্গত হয়ে, আরও বহু বিচিত্র পথে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে সাগর-সঙ্গমে মিলিত হয় এবং এক অখণ্ড জলরাশি সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনি বহু বিভিন্ন দেশে কালে বহু বিচিত্র মানসক্ষেত্রে উদ্গত অগণিত বিচিত্র চিন্তাধারা অবশেষে বিবেকানন্দের সাগরতুল্য মহামনীষিমনে এসে মিলিত হয়ে এক অপূর্ব অখণ্ড ভাবধারা সৃষ্টি করেছে। এই সাগর-সঙ্গমতুল্য বিশাল ভাব-সম্পদ পৃথিবীর সব চিন্তাকে, সব মত ও পথকে কিভাবে গ্রহণ করেছে, সে-কথাপ্রসঙ্গে রোঁমা রোঁলা আরও বলেছেন—"He embraced all the paths of the spirit : the four yogas in their entirety, renunciation and service, art and science, religion and action from the most spiritual to the most practical." সকল ধর্ম মত পথ, অতীত বর্তমান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ধর্ম ও বিজ্ঞান তাঁর মধ্যে অনুপম সামঞ্জস্যে বিরাজ করেছে। আধ্যাত্মিক হ'তে ব্যবহারিক সকল কর্মের সব পথকে তিনি সুসামঞ্জস্যের সঙ্গে একত্র গ্রথিত করেছেন। কিন্তু এই সমন্বয়-চিন্তা শুধু বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে যুক্তিসহরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েই সিদ্ধ হয়নি; তিনি সকল বিচিত্র মত পথ ও চিন্তার মধ্য দিয়ে নিজে গিয়ে, সেগুলিকে বাস্তবে পূর্ণ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তবে একত্বে পৌঁছেছেন। এই গ্রহণ তাই শুধু বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ নয়, জীবনরসে পুষ্ট ক'রে গ্রহণ। তাঁর গ্রহণের এ এক অনন্য পন্থা ছিল। তিনি যা কিছু গ্রহণ করেছেন তা তাঁর সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে তাঁর কর্মে, চিন্তায়, আচরণে প্রতিমুহূর্তে জীবন্ত সত্য হয়ে উঠেছে। এই গ্রহণ তাই আংশিক গ্রহণ নয়, পরিপূর্ণ গ্রহণ। বিষয়টি ব্যাখ্যা ক'রে রোঁমা রোঁলা বলেছেন—

---

৪ Leaves of Grass—Starting From Panmanock—no. 13

৫ Life of Vivekananda—P 283

"As in a quadriga, he held the reins of all the four ways of truth and he travelled towards unity along them all simultaneously." সত্যের সকল বিচিত্র পথের মধ্য দিয়ে একই কালে বিচরণ ক'রে একত্বে পৌঁছানো—এ সত্যই অভিনব। শুধু নানা ধর্মপথগ্রহণ সম্পর্কেই যে এ কথা তাঁর সম্বন্ধে সত্য তা নয়, তিনি যা কিছু গ্রহণ করেছেন সবকিছুর মধ্য দিয়ে একত্বে বা সমন্বয়ে পৌঁছেছেন। সব পথকে যেন তিনি একসঙ্গে সেই মহাসমন্বয়ের লক্ষ্যে চালিত করেছেন। তাঁর অতীতকে গ্রহণ এত সত্য যে, তাঁকে কেবলমাত্র অতীতের ব'লে দাবী করা যেতে পারে। তাঁর আধুনিককে গ্রহণ ঠিক ততখানি সত্য—আধুনিকের বিজ্ঞান, টেকনোলজি তিনি মহোৎসাহে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন। যতখানি উৎসাহে প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদের তিনি প্রচারক, ততখানি পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, বিজ্ঞানবাদ, যুক্তিবাদ, এমনকি materialism-এরও তিনি গ্রহীতা। এমন সর্বান্তঃকরণে তিনি এই সকল পাশ্চাত্য ভাবধারা গ্রহণ করেছেন যে, আজও অনেক পাশ্চাত্য মনীষী তাঁকে পাশ্চাত্য-ভাবধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ব'লে মনে ক'রে থাকেন।[৬] এদিক দিয়ে উপরে উদ্ধৃত হুইটম্যানের কবিতায় যে-কর্ণধারকে সম্বোধন ক'রে বলা হয়েছে যে, "সারা পৃথিবীর সেরা সম্পদ নিয়ে তুমি ভেসে চলেছো", তারই যেন বিগ্রহমূর্তি বিবেকানন্দ। সেজন্য তাঁর মধ্যে মানুষের সর্বপ্রকার শক্তির একটি অপূর্ব সমন্বিত প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। রোঁলার ভাষায়—"He was the personification of the harmony of all human energy." এবং এই সমন্বয়ের ভিত্তিতে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন রোঁলার মতে 'মানবতার এক মহানগরী' (Civitas Die—The City of Mankind) আধুনিকযুগ-প্রবণতার যেখানে শেষ পরিণতি। পৌরোহিত্য-শক্তির নাশ, জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধার অবসান, মানুষের সকলপ্রকার কর্ম ও মত-পথকে সমান মর্যাদা প্রদান—এ সকলেরই লক্ষ্য এক এবং সে লক্ষ্য হ'ল মানবিক অধিকারের ভিত্তিতে এক নূতন সাম্য-সমাজ-গঠন। এ জন্যই নিবেদিতা তাঁর মধ্যে এক নবযুগাচার্যকে—"The pioneer and prophet of the new world order"—লক্ষ্য ক'রে গিয়েছেন।

বিবেকানন্দের সমন্বয়-চিন্তার তাৎপর্য আজও আমরা ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। এবং তা পারিনি ব'লে 'নবযুগাচার্য' ব'লে বিবেকানন্দকে যে প্রায়ই অভিহিত করা হয়ে থাকে তা আমাদের কাছে একটি কথার কথা মাত্র। এ বিশেষণ নিছক গুরুবাদীদের আবেগ-প্রসূত—এমন সমালোচনাও সেজন্য আজ সোচ্চার হয়ে উঠছে। শুধু বিবেকানন্দকেই যে আজ এজন্য ভুল বোঝা হচ্ছে তা নয়, এই নবযুগকেও স্বাভাবিক ভাবেই ভুল বোঝা হচ্ছে। কারণ নবযুগের মানসলোককে যিনি পূর্ণ পরিণতির পথে উত্তীর্ণ করেছেন, তাঁকে না বুঝলে নবযুগের মানসলোকের পূর্ণ পরিচিতি লাভ কি ক'রে সম্ভব হতে পারে? সেজন্য

৬ সুপ্রসিদ্ধ লেখক Christopher Isherwood ১৯৬৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর কলকাতায় বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশ্বধর্মসভায় 'Vivekananda and the West' শীর্ষক ভাষণে একথা বলেছিলেন। বর্তমান লেখিকা ভাষণটি বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত ক'রে সেই সভায় উপস্থাপিত করেছিলেন।

নিবেদিতা বিবেকানন্দের বাণীকে এই নবযুগের পরিপূর্ণতা হিসেবে কেন দেখেছেন তার একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আজ বিশেষ প্রয়োজন। নিচে আমরা সেই প্রয়াসই করব।

নবযুগাচার্য বিবেকানন্দ: যেদিন বিশ্ব-ধর্মসভায় (১৮৯৩) বিবেকানন্দ উপস্থিত হয়েছিলেন তার সমস্ত পরিবেশ ও সংস্থানের একটি অপূর্ব চিত্র নিবেদিতা উপস্থাপিত করেছেন আমাদের সামনে একটি অনন্য রচনায়[৭]: "The vast audience that faced him represented exclusively the occidental mind. ...There is very little in the modern consciousness, very little inherited from the past of Europe that does not hold some outpost in the city of Chicago. ...Such was the psychological area, such was the sea of mind, young, tumultuous, overflowing with its own energy and self-assurance, yet inquisitive and alert withal, which confronted Vivekananda when he rose to speak". তাঁর সম্মুখে পাশ্চাত্য পৃথিবী—নবীন পৃথিবী, তার তারুণ্যশক্তি, তার নবীন আত্মবিশ্বাস এবং জিজ্ঞাসা নিয়ে উপস্থিত ছিল। আর তাঁর পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছিল এক পুরাতন পৃথিবী—"Behind him, on the contrary, lay an ocean, calm with long ages of spiritual development." এ সম্পূর্ণ আর এক রকম পৃথিবী—আত্মিক সাধনায় অভিজ্ঞ, নানা ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাসে সমৃদ্ধ, ঋষিপদ-লাঞ্ছিত এক সৌম্য সুগম্ভীর পৃথিবী। এই উভয় পৃথিবী—প্রাচীন ও আধুনিক—যেন দুটি বিপরীতগামী বিশাল চিন্তসাগর যা সেদিন সেই মহামুহূর্তে এসে সম্মিলিত হয়েছিল বিবেকানন্দের মধ্যে, নিবেদিতার অনুপম ভাষায়—"These, then, were the two mind-floods, two immense rivers of thought, as it were, Eastern and modern, of which the yellow-clad wanderer on the platform of the Parliament of Religions formed for a moment the point of confluence." ধর্মমহাসভার সেই পুণ্যক্ষেত্রে এই দুই বিপুল জীবনধারার সঙ্গমে এক নূতন জীবনবাদের জন্ম হ'ল যা সুস্পষ্টভাবেই এক অনাগত ভবিষ্যৎ দিনের সূচনা করল।

নিবেদিতার সৃষ্ট এই চিত্রটি নিরর্থক আবেগের প্রকাশ নয়, সত্যই অতি গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ। বিবেকানন্দের বাণীর মধ্য দিয়ে ধর্মমহাসভায় অতীত-বর্তমানের মহামিলন-সেতু রচিত হয়ে ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হ'ল। সেই প্রথম এইরূপ অপূর্ব সমন্বয়বাণী জগতের মানুষ শুনল যে, "Our salutations go to all the past Prophets whose teachings and lives we have inherited, whatever might have been their race, clime or creed! Our salutations go to all those Godlike men who are working to help humanity, whatever be their birth, colour or race! Our salutations to those who are coming in future—living Gods—to work unselfishly for our descendants."[৮] অতীতের সকল দেবমানবদের সঙ্গে বর্তমানের এবং অনাগত ভবিষ্যতের সকল কল্যাণব্রতী মানুষদের তিনি যুক্ত করলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভেদ ঘুচাতে চেয়ে বললেন—"My message in life is to ask the East and the West not to quarrel over different ideals, but to show them that the goal is the same in both cases, however opposite

৭ Introduction to the Complete Works of Vivekananda, Vol. I

৮ Vivekananda—A Biography In Pictures—p. 86

it may appear." প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন, অতীত ও বর্তমানের মিলন শুধু এ ভাবেই সাধিত হ'ল না। প্রাচ্যের অতীত কালের অধ্যাত্মজীবনবাদ আর আধুনিক পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান—এ উভয়ের মধ্যেও তিনি অপূর্ব সমন্বয় ঘটালেন। এ বিষয়ে বললেন তিনি—"It is good and very grand to conquer external nature, but grander still to conquer our internal nature. It is grand and good to know the laws that govern the stars and planets; it is infinitely grander and better to know the laws that govern the passions, the feelings, the will of mankind. This conquering of the inner man, understanding the secrets, belong entirely to religion." অতীতের প্রাচ্যের আত্মানুসন্ধান আর আধুনিক পাশ্চাত্যের বহিঃপ্রকৃতির অনুসন্ধান—উভয়ই অপূর্ব মহিমান্বিত। অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির অনুসন্ধান উভয়ই সত্যানুসন্ধান-প্রয়াস। অন্তঃপ্রকৃতির অনুসন্ধান ধর্মের বিষয়ীভূত আর বহিঃপ্রকৃতির অনুসন্ধান বিজ্ঞানের। সুতরাং ধর্ম ও বিজ্ঞানে একই সত্য প্রকাশিত—"Art, Science and Religion are but three different ways of expressing a single truth." (ক্রমশঃ)

মায়ের বাড়ী

শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

ডাক এসেছে মধুর ভোরে মায়ের বাড়া থেকে—
সেথায় আমি একটি প্রণাম আসবো শুধু রেখে।
আছে মায়ের আসনখানি—
আছে মায়ের পরম-বাণী
মায়ের পরশ কোথায় আছে, আসবো আমি দেখে!

মা যেখানে একলা বসে জপত মালাখানি—
সেই সে ছোট গৃহকোণে তীর্থ বলে মানি!
সেথায় মায়ের চরণধুলি,
রতন বলে মাথায় তুলি—
মায়ের স্নেহ রেখে গেছেন এই বাড়ীতে মেখে।

আলমোড়া-যাত্রীর ডায়েরী

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রতি সকলেরই একটা চিরন্তন আকর্ষণ আছে। শুধু ভারতবাসী নয়, পৃথিবীর সকল দেশের সবশ্রেণীর মানুষ সুযোগ পাইলেই উহা দেখিয়া যায়। দেখিয়া চমৎকৃত হয়। অফুরন্ত সৌন্দর্য হিমালয়ের। বিশেষতঃ কুমায়ন পর্বতমালার। ঐরূপ শ্যামল শোভা পার্বত্য প্রদেশে আর কোথাও দেখা যায় না। শুধু শ্যামা বনশ্রী নয়, রজতশুভ্র স্রোতস্বিনীও পর্বতকন্দরে অপূর্ব দীপ্তি বিকিরণ করে।

সেই কুমায়ন প্রদেশের আলমোড়া শহর দুইবার দেখিবার অবসর ঘটিয়াছিল। একবার ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, আর একবার পরবৎসর ঠিক ঐ সময়।

১৯৬১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর বৈকাল ৫-৩০ মিনিটে অমৃতসর এক্সপ্রেস ধরা হইল। দুইটি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা ছিল—একটি 'স্লিপিং কোচ'-এ। রাত্রে সুনিদ্রা না হইলেও বিশ্রামের কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। লক্ষ্ণৌ স্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম পরদিন সকালে।

এখান হইতে গাড়ী বদল করিয়া নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের নৈনীতাল এক্সপ্রেস ধরিতে হইবে রাত্রি ৮ টায়। তাহার স্টেশনও স্বতন্ত্র, আরও একটু পশ্চিমে। সমস্ত দিন অবিরাম বৃষ্টি। শহর দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও সুযোগ হইল না। রেলওয়ে বিশ্রামাগারেই আশ্রয় লইতে হইল। আটটায় ট্রেন ছাড়িল। অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে পথে কিছুই দেখা গেল না।

কাঠগুদাম স্টেশনে গাড়ী আসিয়া থামিল, তখন বেলা ৮টা বাজিয়া গিয়াছে। ইহার পর আর রেলের পথ নাই। এই স্থান হইতে ৮২ মাইল দূরে আলমোড়া। বাসেই যাইতে হইবে।

বেলা ৯টার পর বাস ছাড়িল। পাথরকাটা পথ। এক পাশে অত্যুচ্চ পাহাড়, অন্য পাশে গভীর খাদ। সে পথ আবার চলিয়াছে সর্পিল গতিতে। এক এক স্থানে পথ এরূপ বাঁকিয়া গিয়াছে যে, বাঁকের মুখের অপর দিকে কি আছে কিছুই দেখা যায় না। পাহাড়ের গায়ে দৃষ্টি বাধিয়া যায়। বাসগুলি সেই সব বিপজ্জনক স্থানে পুনঃপুনঃ হর্ন বাজাইতে থাকে। অসাবধান হইলে যে-কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটিতে পারে। সেই কারণে কাষ্ঠ- বা প্রস্তর-ফলকে মাঝে মাঝে পথের নির্দেশ দেওয়া আছে এবং সেই সব ফলকে অনেক সাবধান-বাণীও লেখা আছে।

বেলা প্রায় ১১টার সময় আমরা 'গরম-পানি'তে পৌছিলাম। 'আপ' ও 'ডাউন' দুই দিকের বাসই এইখানে আসিয়া থামে। বাসগুলি একত্র হইলে এক এক করিয়া উহারা নিজ নিজ পথে চলিয়া যায়। কারণ এ পথে পাশাপাশি দু'খানি বাস যাইবার স্থান নাই। যাত্রীরা এইখানে নামিয়া আহার করিয়া লয়, নিকটে অনেক খাবার-দোকান আছে, এবং মুখ হাত পা ধুইয়া লইবারও জায়গা পাওয়া যায়। আমরাও কিছু খাইয়া লইলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে বাস ছাড়িল।

বেলা ২টার সময় আমরা আলমোড়ায় গিয়া পৌছিলাম। 'ব্রাইটন কর্ণারের' (Brighton corner) নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটীরের সম্মুখেই বাস থামিল। মঠের তদানীন্তন ম্যানেজার মহারাজ নিকটে আসিয়া তাঁহার বালক-

ভৃত্যদের সাহায্যে আমাদের জিনিসপত্র বাসের মাথা হইতে নামাইয়া লইলেন। পথের ১৫।২০ ফুট নীচে মঠের অতিথিশালায় আমরা আশ্রয় পাইলাম।

অতিথিশালাটি একটি ছোট্ট দ্বিতল বাটী। উপরে দুইখানি এবং নীচে দুইখানি ঘর। ঘরের সংলগ্ন স্নানের ঘর প্রভৃতি। পশ্চিমে বেশ প্রশস্ত ঘেরা-বারান্দা। বারান্দার সম্মুখেই উন্মুক্ত আকাশ এবং কুমায়ুন পর্বতশ্রেণীর অপূর্ব শোভা।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন না থাকিলে এই বারান্দার উত্তর সীমায় বসিয়া নন্দাকোট (২২৫১০´), নন্দাদেবী (২৫৬৪৫´), নন্দাঘুন্টি (২০৭০০´), ত্রিশূল (২৩৪৬০´, ২২৩২০´, এবং ২১৮৫০´), হাতিপর্বত (২২৩৭০´), গৌরীপর্বত (২২০২´), নীলকান্ত (২১৬৫০´) এবং চৌখাম্বা (২৩৪২০) প্রভৃতি পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্রমের পশ্চিমে অনতিদূরে কোশি নদীর খরস্রোত পাহাড়ের গভীর খাদের মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছে দেখা যায়। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে আশ্রমের উত্তর সীমায় 'ব্রাইটন কর্ণারে' আসিয়া অনেকে এই সকল তুষারাবৃত পর্বতমালা দেখিয়া যান।

এই প্রসঙ্গে আলমোড়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটীর নির্মাণের ইতিবৃত্ত বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পাহাড়ের ঢাল ধরিয়া উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে আলমোড়া শহরটি গড়িয়া উঠিয়াছে। উহার পরিমাণ (area)—সাড়ে চারি বর্গমাইলের কিছু বেশি এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উহার উচ্চতা ৫৪০০´ ফুট।

চাঁদবংশের রাজারা সর্বপ্রথম কুমায়ুন প্রদেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। সোমচাঁদ, মতান্তরে বালকল্যাণচাঁদ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রয়াগে (বর্তমান এলাহাবাদে) রাজত্ব করিতেন। ৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কতুরির রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনি আলমোড়ার চম্পাবত নামক স্থানটি যৌতুক পান। প্রয়াগ হইতে চম্পাবতে আসিবার সময় তিনি যোশী ব্রাহ্মণদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। আলমোড়ার অভ্যুদয়ের সঙ্গে যোশী-ব্রাহ্মণগণেরও বিশেষ সম্পর্ক আছে। আলমোড়ার নিজস্ব সংস্কৃতি তাঁহাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। রাজারা রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, আর ব্রাহ্মণেরা মানুষ তৈরি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতে আর্য-সংস্কৃতি এই ভাবেই বিস্তারলাভ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চাঁদরাজারা কুমায়ুনে রাজত্ব করেন। তাহার পর রাজশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িলে গুর্খারা আলমোড়া অধিকার করে। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে আলমোড়ায় গুর্খাদিগের আধিপত্য ছিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ইংরেজদিগের কবলে উহা পতিত হয়।

এই সময় কুমায়ুনে প্রচুর শণ উৎপন্ন হইত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন ভারতবর্ষে আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে। শণের লোভে তাহারা লর্ড গার্ডনারের অধীনে একদল সৈন্য কুমায়ুনে প্রেরণ করে। গুর্খারা প্রথমে প্রবল বাধা দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ সৈন্যদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। কিছুকাল খণ্ডযুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ২৬শে এপ্রিল আলমোড়ার পতন হয়। আলমোড়া হইতে মাত্র আড়াই মাইল দূরে সীতালি পাহাড়ের যুদ্ধে গুর্খারা পরাজিত হয়। পরাজিত হইলেও আলমোড়া ব্যতীত কুমায়ুন প্রদেশের অন্যান্য স্থান সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে ইংরেজদিগের আরও কয়েক বৎসর সময় লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটীরের সূত্রপাতের সংবাদ পাই

পূজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের ২০।১১।১৫ তারিখের পত্রে। এই পত্র-মধ্যে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে লিখিতেছেন—"শুনিয়া থাকিবে মহাপুরুষ এখানে একটি কুটীর-নির্মাণের উদ্যোগ করিয়া গেছেন। মোহনলাল তার তদ্বির বন্দোবস্ত করিতেছে। কুড়ি টাকা দাম দিয়া একখণ্ড জমি শ্রীমহারাজের নামে খরিদ হইয়াছে। সেই স্থান সাফ-শুধরা করিয়া কুটিয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাতে এক দেউল উঠিয়াছে। কার্য চলিতেছে। যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়, তিন-চারি মাসের মধ্যে দুইটি ছোট ঘর তৈয়ার হইয়া যাইবে।"

পূজনীয় হরি মহারাজের ১২।১২।১৬ তারিখের আর একখানি পত্রে জানিতে পারা যায়, তিনি পূজার্হ বাবুরাম মহারাজকে লিখিতেছেন—"মহাপুরুষের উদ্যোগে এখানে একটি কুটীর-নির্মাণের বন্দোবস্ত হইয়াছে।···সাধু হরিদাস শরীরত্যাগের পূর্বে দুই শত টাকা আমাকে দিবার জন্য তাহার ভাইকে কহিয়া গিয়াছিল। সেই টাকা এবং বেলগাঁর···এক ডাক্তারের দেড়-শত টাকা—এই লইয়া কার্য আরম্ভ হইয়াছে। মোহনলাল শা প্রথমে বলেছিলেন, পাঁচশত টাকায় কুটীর তৈয়ার হইয়া যাইবে। এখন কিন্তু বলিতেছেন—হাজার টাকার কমে হইবে না। ···মাত্র দুইটি ঘর হইবে। অল্প আরম্ভ। তাঁহার ইচ্ছা থাকিলে আরও হইতে পারিবে।"

তাঁহার কথা বিফল হয় নাই। ছোট করিয়া আরম্ভ হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটীর এখন বেশ বড় হইয়াছে। সাধু ও ভক্তদিগের থাকিবার জন্য অতিথিশালা ব্যতীতও আশ্রম-বাটীতে অনেকগুলি ঘর নির্মিত হইয়াছে। রান্না ও ভাঁড়ার ঘর স্বতন্ত্র। সর্বত্রই ইলেক্ট্রিক আলো ও কলের জলের সুব্যবস্থা হইয়াছে। আশ্রম-নির্মাণের প্রথমাবস্থায় অনেক নীচের একটি ঝরণা হইতে জল তুলিয়া আনিয়া আশ্রমের সকল কাজ করিতে হইত। সেই ঝরণার ধারে পূজনীয় হরি মহারাজ একটি কুটীর বাঁধিয়া বেশ কিছুদিন তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। সেই ঝরণা ও কুটীরটি এখনও বর্তমান। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে এক উদ্বাস্তু-দম্পতি আসিয়া সেই স্থানে বাস করিতেছেন। হরি মহারাজের কুটিয়াটি তাঁহাদের ঠাকুরঘর হইয়াছে। আশ্রম-সংলগ্ন একটি ভাল গ্রন্থাগার আছে। সেখানে প্রায় ৪৫০০ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের নামে গ্রন্থাগারটির নামকরণ করা হইয়াছে 'তুরীয়ানন্দ লাইব্রেরী'। মঠের একজন সাধু উহার তত্ত্বাবধান করেন। সকল প্রকার পুস্তকই গ্রন্থাগারটিতে রাখা হইয়াছে। তবে ধর্মগ্রন্থ ও জীবনীর সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দী ভাষার অনেকগুলি দৈনিক সংবাদপত্র ও মাসিকপত্র আসিয়া থাকে।

এইবার আমরা পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি। শ্রদ্ধেয় সত্য মহারাজ আশ্রমবাটীতে ফিরিয়া গেলে আমাদের জন্য গরম জল আসিল। আমরা একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া বসিলেই অপর একজন আসিয়া আমাদিগকে আশ্রমবাটীতে লইয়া গেলেন। সেখানে আমাদের জন্য উষ্ণ অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুতই ছিল। দুই দিন পর ভাত-তরকারী খাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম।

নিজেদের নির্দিষ্ট ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। আজ আর কোথাও বাহির হওয়া গেল না। রাত্রে আহারের প্রয়োজন ছিল না। তবুও সুযোগ্য কর্মাধ্যক্ষের সুব্যবস্থায় ঘরে বসিয়াই এক এক বাটি গরম দুধ পাইলাম, তাহাই পান করিয়া শয়নের উদ্যোগ করা গেল।

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১। আজ হইতে আমরা নিয়মিত আশ্রমবাসী। এইদিন বিকালে একটু শহরে ঘুরিয়া আসিলাম।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১। বাসের রাস্তা আশ্রমবাটী হইতে প্রায় ২৫০ ফুট উঁচুতে, অতিথিশালার কাছেই। সেই রাস্তা ধরিয়া আজ বেড়াইতে বাহির হইলাম। কিছুদূর উত্তরে যাইলেই এল্. আর. শার প্রকাণ্ড দোকান। এই দোকানে প্রায় সকল রকম জিনিসই পাওয়া যায়। বিস্কুট, লজেন্স, পাঁউরুটি তো পাওয়াই যায়। তাহা ছাড়া, সুচ সুতা হইতে কাপড় জামা, ছাতা ছড়ি, বাসনপত্র, মনোহারীর সকল প্রকার জিনিস, এমন কি দৈনিক খবরের কাগজও এখানে বিক্রয় হয়। এই রাস্তা ধরিয়া কৈলাস, মানসসরোবর প্রভৃতি পুণ্য তীর্থে যাওয়া যায়। উহার দুইধারে অনেক দোকান, কয়েকটি হোটেল এবং দুইটি চিত্র-গৃহ দেখিলাম। আলমোড়ার পোস্ট আফিস এই রাস্তারই পশ্চিমে একটু নামিয়া যাইতে হয়। মিউনিসিপ্যাল আফিস বা পৌরপ্রতিষ্ঠান এই রাস্তার উপরেই। এই রাস্তার পশ্চিমে নীচের দিকে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান ও আফিস আছে।

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১। বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া আলমোড়ার বাজারে যাওয়া গেল—উহা পথের পূর্বদিকে অনেক উঁচুতে লম্বালম্বি সমতল জায়গায়—দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড় মাইল। মধ্যস্থলে চওড়া পাথুরে পথ। চড়াই-উতরাইও আছে। দুইধারে দোকান। সকল রকমের জিনিসই বাজারে পাওয়া যায়। তরিতরকারির স্বতন্ত্র দোকান খুব কম। কাছেই পশমের সুতা তৈরি করার কারখানা। সেখানে তৈরী পশমের সুতার বিক্রয়কেন্দ্রও এই বাজারে আছে। কম্বল ও গরম-কাপড়ের দোকানও অনেকগুলি দেখিলাম। তামার হাঁড়ি, কলসী ও কাঠের বাসনের দোকান দেখা গেল কয়েকটি। খরিদ্দার এদেশের লোকই বেশী। আশ্রমের কয়েকজন সাধু ব্যতীত বাঙ্গালী আর বড় চোখে পড়িল না। বাজারের উত্তর সীমা হইতে বড় রাস্তায় নামিয়া আশ্রমে ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল।

এই বাজারের মধ্যেই পশ্চিমদিকে একটু উঁচু জায়গায় আলমোড়া পুলিশ স্টেশন বা থানা।

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১। আজ বৈকালে শ্রদ্ধেয় ভুবন মহারাজের (স্বামী শমানন্দ) সহিত বেড়াইতে বাহির হইলাম। ইনিও আমাদের পূর্বপরিচিত। বরাহনগর আশ্রমে বহুদিন ছিলেন। তিনি আমাদের গ্র্যানাইট পাহাড় প্রদক্ষিণ করাইলেন। উহার শিখরদেশে যে ব্যাঘ্রবাহিনী ষড়্ভুজা মূর্তি আছে তাহাও দেখাইলেন। একখানি অখণ্ড প্রস্তরগাত্রে দেবীমূর্তি সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে খোদিত। নিত্য পূজারও ব্যবস্থা আছে। নিকটস্থ পুলিশ ফাঁড়ির পাহারাওয়ালারা এখন এই মন্দিরটি রক্ষণাবেক্ষণ করেন। কোন এক পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী এই দেবীমূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখানে কুটীর বাঁধিয়া তিনি তপস্যা করিতেন। তাহার পর তিনি কোথায় চলিয়া যান। ঘর-দুয়ার নষ্ট হইতে থাকে। কয়েক বৎসর পূর্বে নিকটে একদল সৈন্য আসিয়া ছাউনি ফেলে। তাহাদের দলপতি এই মন্দির ও তৎসংলগ্ন গৃহাদি ভগ্নাবস্থায় দেখিয়া উহাদের সংস্কারসাধন করেন। এখনও কোন কোন সন্ন্যাসী আসিয়া মাঝে মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেবীমূর্তির সম্মুখে ধুনি রহিয়াছে। উহা যে প্রজ্বালিত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ বর্তমান। অদূরে একখানি রান্নাঘর আছে। যিনি এখানে থাকিবেন, ইচ্ছা করিলে সেখানে

পাক করিয়া আহারাদি করিতে পারিবেন।

যে পাহাড়টির উপর এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত, সেস্থানে প্রচুর পাইনগাছ। এক এক স্থানে পাইনগাছগুলি এক একটি প্রস্তরময় সমতল ভূমিতে এমনভাবে বেষ্টন করিয়া আছে যে, সেখানে এক একটি নিভৃত কুঞ্জ প্রস্তুত হইয়াছে। আশ্রমের অনেক সাধু এখানে আসিয়া জপ-ধ্যানাদি করেন।

মন্দিরসংলগ্ন গৃহের প্রশস্ত বারান্দায় আমরা কিছুকাল বসিয়া ভাবগম্ভীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করিলাম। সম্মুখে অনন্ত আকাশ। তন্নিম্নে পাহাড়ের পর পাহাড়—তৃণগুল্ম-আচ্ছাদিত। আশ্রমে ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল।

৩রা অক্টোবর, ১৯৬১। আজ দুর্গানবমী, স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জন্মতিথি। আশ্রমে বিশেষ পূজা ও হোমের ব্যবস্থা ছিল। বৈকালে একাকীই বেড়াইতে বাহির হইলাম, বাজারের পথে উপরের দিকে একটি শিবমন্দির দেখিলাম। বিগ্রহের নিত্যপূজা হয়, তাহারও চিহ্ন দেখা গেল। এইস্থানে এইটিই বিশেষত্ব দেখিতেছি। যেখানে যত মন্দির আছে, সেখানে তত দেবদেবীও আছেন এবং তাঁহাদের নিত্যসেবারও ব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশে অনেক বিগ্রহশূন্য মন্দির ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে দেখা যায়, অনেক শিবমন্দিরে শিবমূর্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁহার পূজার কোন ব্যবস্থাই নাই।

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৬১। আজ বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া আশ্রমের পূর্ব-দক্ষিণদিকে পাহাড়ের মধ্যে এক দুর্গামন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেবীমূর্তির শুধু সুন্দর মুখখানিই দেখা গেল। আর সকল অঙ্গ রক্তবস্ত্রে আবৃত। পার্শ্বেই শিবমন্দির। শিবলিঙ্গের গৌরীপীঠ তামার, এবং লিঙ্গের মস্তকে যে সর্প ফণা ধরিয়া আছে উহাও তাম্রনির্মিত। অদূরে হনুমান-মন্দির। মহাবীরের প্রস্তরমূর্তিটি ক্ষুদ্র হইলেও মনোহর। এই মন্দির-প্রাঙ্গণে কোন এক ভক্ত তাঁহার কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থ একটি ধর্মশালা নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সেখানে দুই-তিনখানি মাত্র একতলা ঘর আছে। আরও একটি গৃহ দেখিলাম, সেখানেও একজন মাত্র সাধু আসিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিলাম না। ঘরগুলিও অযত্নরক্ষিত। ভুবন মহারাজের নিকট শুনিলাম—জলাভাবে এখানে কেহ বাস করিতে পারে না, পূজারী প্রতিদিন আসিয়া পূজা করিয়া চলিয়া যান। 'সারকিট হাউস'-এর তলদেশ দিয়া আর একটি পাহাড় প্রদক্ষিণ করিয়া অন্যপথে আশ্রমে ফিরিলাম।

৬ই অক্টোবর, ১৯৬১। আজও বেড়াইতে বাহির হইয়া পাহাড়ের উপরের দিকে না গিয়া নীচের পথ ধরিলাম। প্রাচীন পায়ে-চলা পথ বাহিয়া একটি গোরস্থানের নিকট পৌছিলাম। সেখানে ইতস্তত: অনেক কবর রহিয়াছে দেখিলাম। অনেকগুলি কবরের গাত্রে স্মৃতি-ফলকও রহিয়াছে—উর্দু বা ফার্সিতে লেখা; দেখিয়া মনে হইল কবরগুলি অতি প্রাচীন। ভাষা না জানায়, ঐগুলি কাহাদের কবর বা উহাতে কি সন-তারিখ লেখা আছে জানিতে পারিলাম না। পরিত্যক্ত দুইটি নূতন ধরনের গৃহও দেখিলাম। উহাদের ছাদ দোচালা ঘরের মতো দুধারে ঢালু। দেওয়ালের গায়ে খর্বাকৃতি কয়েকটি দরজা। জানালার কোন চিহ্ন নাই। ঘর-দুইটির উচ্চতা ৫।৬ ফুটের অধিক হইবে না। ভিতরে গিয়া দাঁড়াইলে ছাদে মাথা ঠেকিবার সম্ভাবনা।

এই পথের ধারেই বিশ্ববরেণ্য স্বামী

বিবেকানন্দ ভারতপর্যটনকালে পরিশ্রমে ও ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া একদিন মূর্ছিত হইয়া পড়েন। পথের সাথী স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ জলের অন্বেষণে যান। নিকটবর্তী কোন ঝরনা হইতে জল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেখেন যে, একজন সদাশয় ফকির শশা খাওয়াইয়া স্বামীজীকে সুস্থ করিয়া তুলিয়াছেন। সেই ফকির এই কবরস্থানের নিকটেই বাস করিতেন।

আমরা জানি, পাশ্চাত্যদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বামীজী আবার যখন আলমোড়ায় আসেন তখন স্থানীয় 'প্যারেড গ্রাউণ্ডে' এক মহতী সভায় আলমোড়াবাসীরা তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। সেই অভ্যর্থনাসভার এক পার্শ্বে বৃদ্ধ ফকিরকে দেখিয়া স্বামীজী চিনিতে পারেন এবং সভামঞ্চ হইতে নামিয়া ফকিরকে নিজ পার্শ্বে লইয়া গিয়া প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং পরে শ্রোতৃবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"এই ফকির সেদিন আমার জীবনরক্ষা না করিলে আপনারা বিবেকানন্দের আবির্ভাব দেখিতে পাইতেন না।" ফকিরও সেই কথা শুনিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়েন।

এই প্রাচীন পায়ে-চলা পথ ধরিয়া আমরা আরও কিছুদূর গেলাম। এই পথ কাঠগুদাম পর্যন্ত গিয়াছে। অব্যবহারে ইহা এখন আর পূর্বের ন্যায় ব্যবহারযোগ্য নাই। এই পথেই লোকে পূর্বে কৈলাস-মানসসরোবর প্রভৃতি পুণ্যতীর্থে গমন করিত। এই পথের ধারেই আমরা দুইটি গৃহস্থের বাড়ী দেখিলাম। সেখানে তাহারা সপরিবার বাস করিতেছে। দূরে পাহাড়ের নীচেও অনেক ঘর দেখিতে পাওয়া গেল। বলা বাহুল্য, ঘরগুলি দেহাতী পাহাড়ীদের। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া আমরা আশ্রমে ফিরিলাম।

৯ই অক্টোবর, ১৯৬১। স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের আজ জন্মতিথি। শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটীরে বিশেষ পূজাদির আয়োজন হইয়াছে। বাজারের পূর্বদিকে পাহাড়ের নীচে শ্রীরামকৃষ্ণ-ধামেও পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজের জন্মতিথি-উৎসব হইতেছে দেখিয়া আসিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ ধাম রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহিত সংযুক্ত না হইলেও উহার প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান অধ্যক্ষ পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজেই মন্ত্রশিষ্য। এখানে তিনি মৌমাছির চাষ, অর্থাৎ মৌমাছি পুষিয়া কিভাবে মধু সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা জনসাধারণকে শিখাইবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। এ অঞ্চলে অনেকে তাঁহার নিকট হইতে মধুমক্ষিকার চাষ শিখিয়া জীবিকা অর্জন করিতেছে। অনেক হাসপাতালে এ স্থান হইতে মধু বিতরণ করা হয় শুনিলাম। (ক্রমশঃ)

ব্যাকরণ-কথা

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীকালীজীবন চক্রবর্তী

খৃষ্টীয় ১১শ ও ১২শ শতাব্দীকে ব্যাকরণ-রচনার দিক দিয়া এক প্রাচুর্যের যুগ বলা চলে। ভোজদেবের 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' নামক ব্যাকরণ, মহাভাষ্যের কৈয়ট-রচিত 'প্রদীপ' টীকা, বর্ধমান উপাধ্যায়-প্রণীত 'গণরত্নমহোদধি' নামক বিখ্যাত মৌলিক গ্রন্থ, কাশিকার হরদত্ত মিশ্র-রচিত 'পদমঞ্জরী' টীকা, কাশিকা-ন্যাসের উপরে মৈত্রেয় রক্ষিত-রচিত 'তন্ত্রপ্রদীপ' টীকা এবং পাণিনীয় ধাতুপাঠের টীকা 'ধাতুপ্রদীপ', শ্বেতাম্বর জৈন হেমচন্দ্রের হৈম ব্যাকরণ, অষ্টাধ্যায়ীর (বৈদিকাংশবাদে) উপরে রচিত পুরুষোত্তমদেবের 'ভাষাবৃত্তি' এবং 'পরিভাষা-বৃত্তি', শরণদেবের 'দুর্ঘটবৃত্তি', ইন্দু মিত্রের 'অনুন্যাস' (পূর্বোক্ত ন্যাসের টীকা) প্রভৃতি এই সময়ে রচিত হয়।

মালবের পরমার-বংশীয় নবম নরপতি ধারেশ্বর ভোজদেব (১০১০-১০৫৫ খৃঃ অঃ) 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' নামে যে ব্যাকরণ রচনা করেন তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাকরণের মূল এবং আনুষঙ্গিক যাবতীয় বিষয় একাধারে ইহার সূত্রপাঠের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ফলে ইহার সূত্র-সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার (৬৪২৮)। এত অধিক সূত্র আর কোনও ব্যাকরণে নাই। খিলপাঠসহ সমগ্র পাণিনি ব্যাকরণের সহিত কাত্যায়নের বার্ত্তিক-পাঠ মিলাইয়া এই ব্যাকরণের সূত্রগুলি রচিত হইয়াছে। কেবল তাহাই নয়, প্রসঙ্গতঃ ভোজদেব ব্যাড়ি, পতঞ্জলি, কাশিকারদ্বয় এবং এই সম্প্রদায়ের অন্যান্য প্রামাণিক আচার্যদের দৃষ্ট বা উপদিষ্ট সমস্ত প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ইহার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন। এমন কি অন্য ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ের আবিষ্কৃত নূতন তথ্যাদিও ইহাতে বাদ দেওয়া হয় নাই। ইহার 'কাঠামোটি' রাখা হইয়াছে অষ্টাধ্যায়ীরই অনুরূপ। পাণিনীয় প্রত্যাহারসূত্র আংশিক পরিবর্তনসহ গৃহীত হইয়াছে। বৈদিকাংশ এবং স্বরপ্রক্রিয়াও—যাহা পাণিনি পরবর্তী অন্য কোন ব্যাকরণে দেখা যায় না—এই ব্যাকরণে বাদ পড়ে নাই। একমাত্র ধাতুপাঠ ভিন্ন অন্য কিছুই এই ব্যাকরণ-অধ্যয়নকালে অন্য গ্রন্থ হইতে পড়িতে হয় না। সূত্রগুলি অনেকস্থলে এত সরল যে, ব্যাখ্যা ভিন্নই তাহাদের অর্থ বুঝা যায়।

হৈম ব্যাকরণের পূর্ণ নাম 'সিদ্ধ-হেমচন্দ্রাভিধ-স্বোপজ্ঞ শব্দানুশাসন' অথবা 'সিদ্ধ-হেম-শব্দানু-শাসন'। গুজরাটের চৈলুক্য-বংশীয় রাজা সিদ্ধরাজ জয়সিংহের (১০৯৪-১১৪৩ খৃঃ অব্দ) সভাপণ্ডিত জৈনাচার্য হেমচন্দ্র (১০৮৮-১১৭২ খৃঃ অব্দ) রাজারই অনুপ্রেরণায় উভয়ের নামাঙ্কিত এই ব্যাকরণ রচনা করেন। গুজরাটের বর্তমান আমেদাবাদ জেলার অন্তর্গত ধন্ধুক নামক স্থানে 'শ্রীমোঢ়' নামক বণিক্ কুলে হেমচন্দ্রের জন্ম হয়। এই বণিক্-সম্প্রদায় ভারত তথা পৃথিবীকে আর একটি সুসন্তান দান করিয়াছেন—তিনি হইলেন মহাত্মা গান্ধী। প্রায় ৯ বৎসর বয়সে জৈনধর্মে দীক্ষালাভান্তে স্তম্ভতীর্থে (বর্তমান Cambay) দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর বিদ্যাভ্যাসের পর ২১ বৎসর বয়সে সূরি- বা আচার্য-পদে উন্নীত হইয়া তিনি 'হেমচন্দ্র' নামে আখ্যাত হইতে থাকেন।

অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহাকে 'কলিকাল-সর্বজ্ঞ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তদ্রচিত নানা গ্রন্থের মধ্যে ব্যাকরণই তাঁহার প্রথম রচনা এবং বৈয়াকরণ-রূপেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ।

হৈম ব্যাকরণের প্রথম ৭ অধ্যায়ে সংস্কৃত এবং শেষ ৮ম অধ্যায়ে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এক 'সংক্ষিপ্তসার' ভিন্ন অন্য কোন ব্যাকরণেই একাধারে এই দুই ভাষার ব্যাকরণ আচরিত হয় নাই। মোট সূত্র-সংখ্যা ৪৬৮৫, তন্মধ্যে ১১১৯টি প্রাকৃতের জন্য। এই প্রাকৃত ব্যাকরণ অতিশয় উৎকৃষ্ট। মূলতঃ পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীর এবং প্রসঙ্গতঃ পূর্ববর্তী সমস্ত ব্যাকরণের সারাংশের অবলম্বনে রচিত হইলেও এই ব্যাকরণে প্রধানতঃ অভিনব (বা জৈন) শাকটায়ন ব্যাকরণের অনুসরণ করা হইয়াছে। ইহা গৌণতঃ শাকটায়নীয় ব্যাকরণেরই অপেক্ষাকৃত সহজ ও উন্নত সংস্করণ-বিশেষ। নিজে জৈন হইয়াও হেমচন্দ্র তাঁহার ব্যাকরণকে যথাসম্ভব অসাম্প্রদায়িক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার লঘু ও বৃহদ্ ভেদে দুইটি বৃত্তিও তাঁহারই রচনা। বৃহদ্ বৃত্তিটি এক অতি বিশাল ব্যাপার। ব্যাকরণের আনুষঙ্গিক গ্রন্থসমূহ বলিতে গেলে এই বৃত্তিরই অংশীভূত। সমগ্র ব্যাকরণ-সমুদ্র মন্থন করিয়া বিভিন্ন বৈয়াকরণের মতামত আলোচনাপূর্বক এই বৃত্তি রচিত হইয়াছে। ব্যাকরণের উপরে ৮৪০০০ শ্লোকাত্মক এক বৃহন্ন্যাসও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। ইহার সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। পরবর্তী রাজা কুমারপালের চরিতাবলম্বনে হেমচন্দ্র 'কুমারপালচরিত' নামে সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে এক দ্ব্যাশ্রয়-কাব্য রচনা করেন। ইহাতে ভট্টিকাব্যের ন্যায় একাধারে কাব্য-রচনা এবং ব্যাকরণ-শিক্ষা—এই উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'অভিধান-চিন্তামণি' নামক শব্দ-কোশ আর একটি উৎকৃষ্ট রচনা।

পাণিনি-পরবর্তী এই সব ব্যাকরণকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মধ্যযুগীয় বলা যাইতে পারে। সার্ববর্মিক কাতন্ত্র হইতে এই যুগের সূচনা এবং খৃষ্টীয় ১২শ শতকে রচিত হৈম ব্যাকরণ পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। এই যুগের সারস্বত ক্ষেত্র প্রধানতঃ বেদবিরোধী নাস্তিক বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতগণ কর্তৃক অধ্যুষিত, ফলে এই যুগের ব্যাকরণও প্রায়শঃ এই দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। অত্যধিক উচ্চমানবশতঃ ত্রিমুনি-ব্যাকরণের চর্চা সার্বজনীন আয়ত্তের বাহিরে থাকায় সাধারণ ক্ষেত্রে কার্যোপযোগী সরলতর ব্যাকরণের জন্য ক্রমবর্ধমান আগ্রহের ফলস্বরূপ সর্ববর্মার কাতন্ত্র ব্যাকরণের উদ্ভব। জৈন-বৌদ্ধ ক্ষেত্রেও অনুরূপ আগ্রহের ফল ইন্দ্রগোমী এবং চন্দ্রকীর্তি প্রভৃতির ব্যাকরণ। ইহাদের অপূর্ণতা এবং সংক্ষিপ্ততা-হেতু আস্তিক হিন্দুধর্ম ও দর্শনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য উন্নততর ব্যাকরণে শিক্ষালাভ অপরিহার্য হওয়ায় ত্রিমুনি-ব্যাকরণের ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত সরল অথচ সম্পূর্ণ (exhaustive) ব্যাকরণের আবশ্যতা হইতেই প্রায় একই সময়ে বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়ে যথাক্রমে 'চান্দ্র' এবং 'জৈনেন্দ্র' ব্যাকরণের সৃষ্টি। একাধারে সারল্য অথচ সমগ্রতা এই মধ্যযুগীয় ব্যাকরণ-ধারার সর্বপ্রধান লক্ষণ। এই কারণেই প্রথমে সংক্ষিপ্তাকারে রচিত সার্ববর্মিক কাতন্ত্র ক্রমে বৃহত্তর আকার ধারণ করিয়াছে, ইন্দ্রগোমী প্রভৃতির সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র ব্যাকরণ লুপ্ত হইয়াছে এবং যুগের শেষ-প্রান্তে রচিত হইয়াছে বিশালকায় সরস্বতীকণ্ঠা-ভরণ এবং হৈম ব্যাকরণ।

খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে

ভারতে মুসলমান আধিপত্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতের মধ্যযুগীয় প্রসার-প্রতিপত্তি ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে থাকে। রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে চলিতে থাকে মুসলমান ধর্মেরও বিস্তার। ফলে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক প্রবল সংঘাত-জনিত অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সহজেই বিজাতীয় ভাষার প্রাধান্য ঘটে। এই অবস্থায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহন সংস্কৃতভাষার শিক্ষা-ক্ষেত্র সুগম রাখিবার জন্য বৈয়াকরণদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তাঁহাদের হাতে উপাদানও ছিল প্রচুর। তাই এই সময়ে একদিকে পাণিনি ও অপরদিকে কাতন্ত্রকে ভিত্তি করিয়া এবং মধ্যবর্তী নাস্তিক ব্যাকরণগুলির বৈশিষ্ট্যও কতক পরিমাণে আত্মসাৎ করিয়া সংস্কৃতশিক্ষার উপযোগী যতদূর সম্ভব সহজ এবং অল্পসময়-সাধ্য ব্যাকরণ-রচনার যেন একটা প্রতিযোগিতা লাগিয়া গেল। ইহার ফলে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে ভারতের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বিশেষতঃ পূর্বাঞ্চলে কতকগুলি নূতন ব্যাকরণের অভ্যুত্থান ঘটে। ইহাদের মধ্যে বোপদেবের মুগ্ধবোধ, অনুভূতি স্বরূপাচার্যের সারস্বত, পদ্মনাভদত্তের সুপদ্ম, পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশের প্রয়োগ-রত্ন-মালা ব্যাকরণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য মহারাষ্ট্রীয় বৈয়াকরণদের হাতে অষ্টাধ্যায়ীর যুগোপযোগী প্রক্রিয়া-বদ্ধ 'কৌমুদী'-সংস্করণ। ১৩শ খৃঃ শতাব্দীয় সারস্বত ব্যাকরণ হইতে সুরু করিয়া ১৯শ শতকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগরের ব্যাকরণ-কৌমুদী জাতীয় গ্রন্থ-রচনার কাল পর্যন্ত ৭ শত বৎসরব্যাপী বিদেশী শাসনের যুগকে আমরা ব্যাকরণ-ইতিহাসের যুগ বলিতে পারি। বোপদেব, ভট্টোজি দীক্ষিত এবং নাগেশ ভট্ট এই যুগের শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ প্রতিভা, ১৪শ খৃঃ শতকে সায়ণাচার্য-রচিত 'মাধবীয় ধাতুবৃত্তি' ব্যাকরণের শ্রেষ্ঠ খিল-গ্রন্থ এবং ১৬শ শতকে রচিত 'হরিনামামৃত' শ্রেষ্ঠ সাম্প্রদায়িক ব্যাকরণ। এই যুগেরই শেষভাগে ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ইংরেজ পণ্ডিতগণের সবিস্ময় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, যাহার ফলশ্রুতি পাশ্চাত্যে সংস্কৃতের প্রচার এবং আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞানের উদ্ভাবন। নিম্নে এই যুগের ব্যাকরণগুলির বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল।

সারস্বত ব্যাকরণের বৃত্তি, টীকা প্রভৃতির রচয়িতাদের মধ্যে অধিকাংশই সন্ন্যাসী—কেহ হিন্দু, কেহ বা জৈন। ইহার প্রতি সন্ন্যাসীদের অনুরক্তির কারণ সহজে সংস্কৃতভাষা শিখিয়া ধর্ম-মূলক সংস্কৃতগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করা। কাজেই ইহাকে 'সন্ন্যাসীদের ব্যাকরণ' বলা যাইতে পারে। ইহার প্রণেতা অনুভূতি স্বরূপাচার্যও ছিলেন সন্ন্যাসী, যদিও ইহার মূল কর্তৃত্ব দেবী সরস্বতীতে আরোপিত। অনুভূতির আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী তাঁহাকে যে ৭০০ সূত্র প্রদান করেন তাহারই অবলম্বনে এই ব্যাকরণ রচিত হয়। 'সারস্বতীমৃজুং কুর্বে প্রক্রিয়াং নাতি-বিস্তরাম্'—ব্যাকরণারম্ভে এই উক্তিই ঐরূপ কিংবদন্তীর কেন্দ্রবিন্দু। বর্তমানে প্রচলিত সারস্বতের বিভিন্ন সংস্করণে মোট সূত্র-সংখ্যা ১৬০০ হইতে আরম্ভ করিয়া কিঞ্চিদধিক ২০০০ পর্যন্ত দেখা যায়। ইহা হইতে মনে হয়, অনুভূতির সময়ে অপ্রচলিত অতি প্রাচীন এবং কঠিন 'সারস্বতী প্রক্রিয়া' নামে কোনও সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণাদর্শের অবলম্বনে প্রয়োজনীয় পরি-বর্ধনাদির দ্বারা তিনি উহার যে সরল রূপ প্রদান করেন, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন অঞ্চলে সুবিধামত তাহাতে বহু নূতন সূত্র সংযোজিত হইয়াছে, বহু সূত্র পরিবর্তিত হইয়াছে, এমন কি বাদও পড়িয়াছে অনেক পূর্ব সূত্র। এই কারণে

সারস্বতের বহু পাঠান্তর দৃষ্ট হয় এবং প্রক্রিয়া-বিভাগেও অনেক পার্থক্য পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ সমস্ত ব্যাকরণের মধ্যে ইহারই সর্বাধিক বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কাতন্ত্র প্রথমে যে উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, টীকা-পঞ্জী প্রভৃতির রচয়িতাদের হাতে পড়িয়া বিশাল-কায় হওয়ার দরুন উহা সেই উদ্দেশ্য হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ায় এই সারস্বতই সেই কাতন্ত্রিক উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে পূরণ করিয়া আসিতেছে।

অনুভূতির আবির্ভাব-কাল-সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা না গেলেও সারস্বতের প্রসার-প্রতিপত্তির কাল লক্ষ্য করিয়া মনে হয়, তিনি খৃষ্টীয় ১৩শ শতকের গোড়ার দিকে এই ব্যাকরণ রচনা করেন। তিনি ছিলেন প্রধানতঃ অদ্বৈত-বাদী নৈয়ায়িক। গৌড়পাদ-রচিত মাণ্ডুক্য-কারিকার উপরে শঙ্করাচার্য-কৃত ভাষ্যের এক টীকা তাঁহার রচনা। ইহা ছাড়া ১২শ খৃঃ শতকে আনন্দবোধাচার্যরচিত ন্যায়মকরন্দের 'সংগ্রহ' নামে টীকা, আনন্দবোধের 'ন্যায়দীপা-বলী'র 'চন্দ্রিকা' টীকা প্রভৃতিও তৎকর্তৃক রচিত। শঙ্করাচার্য-রচিত সমস্ত ভাষ্য-গ্রন্থের টীকাকার দ্বারকামঠাধীশ খৃঃ ১৪শ শতাব্দীয় আনন্দজ্ঞান বা আনন্দগিরি ছিলেন অনুভূতির ছাত্র। আবার এই আনন্দগিরির সতীর্থ অনুভূতির অপর ছাত্র নরেন্দ্রগিরি বা নরেন্দ্রাচার্যই সারস্বতের বৃত্তি-প্রণেতা। গুজরাটের আনন্দপুর নামক নগরে বাস করিতেন বলিয়া ইহাকে 'নরেন্দ্রনগরী'ও বলা হইত।

মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে সারস্বতের খুব প্রসার লক্ষিত হয়। বহু মুসলমান শাসক এবং হিন্দুরাজা এই ব্যাকরণের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। পরে সিদ্ধান্তকৌমুদী ও লঘু-কৌমুদীর প্রভাবে উত্তর ভারতের এক প্রধান অংশ হইতে বিতাড়িত হইলেও বিহার, কাশী, মালব, নাগপুর এবং নেপাল-রাজ্যে ইহার ন্যূনাধিক পঠন-পাঠন এখনও দৃষ্ট হয়। বঙ্গ-দেশের কোন কোন অঞ্চলে ইহার প্রভাব এখনও বর্তমান। ত্রিপুরা-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ধনঞ্জয় ঠাকুর ১৮৮০ খৃঃ অব্দ নাগাদ স্বীয় ব্যয়ে এই ব্যাকরণ মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন। বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্ভে Sir Charles Wilkins (১৭৪৯—১৮৩৬)—যিনি East India Co-র writer-এর চাকুরি লইয়া ১৭৭০ খৃঃ অব্দে ভারতে আসেন এবং দেশে ফিরিয়া গিয়া India Office Library-র প্রথম গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন—খুব আগ্রহের সহিত এই ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া ইহারই ভিত্তিতে ইংরেজী ভাষায় প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ 'A Grammar of the Sanskrit Language' প্রণয়ন করেন। ১৮০৮ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। রংপুরে ইউরোপীয় অফিসারদের সংস্কৃতশিক্ষার জন্য সারস্বতেরই এক সংস্করণ প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

বহু গ্রন্থের রচয়িতা মহাপণ্ডিত বোপদেব ১৩শ খৃঃ শতকের মধ্যভাগে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ রচনা করেন। আধুনিক বেরারের অন্তর্গত বেদপাদ নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম। পিতা কেশব এবং গুরু ধনেশ ব্রাহ্মণ হইয়াও ছিলেন চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। দেবগিরির (দৌলতাবাদ) যাদব-বংশীয় রাজা জৈত্রপালের পুত্র মহাদেবের (১২৬০—১২৭১) এবং পরে মহাদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা রামচন্দ্রের (১২৭১— ১৩০৯) অন্যতম মন্ত্রী, পরম-বিদ্যোৎসাহী এবং বিশিষ্ট গ্রন্থকার হেমাদ্রির পৃষ্ঠপোষকতায় বোপদেব তাঁহার গ্রন্থাদি রচনা করেন। এক কথায়, হেমাদ্রিই ছিলেন বোপদেব-প্রতিভার আবিষ্কারক। ভক্তি-শাস্ত্রে শ্রীমদ্‌ভাগবত-পুরাণ-সংক্রান্ত একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া বোপদেব বৈষ্ণব সমাজে গোস্বামি-রূপেও

পূজিত। নাভাজি-রচিত 'ভক্তমাল' গ্রন্থের (১০ম মালা) আভাস এবং অন্যান্য প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক পণ্ডিতগণের অনেকে তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিসংস্কর্তা বলিতে ইচ্ছুক।

সমস্ত বিখ্যাত ব্যাকরণের মধ্যে মুগ্ধবোধ আকারে ক্ষুদ্রতম, মোট সূত্রসংখ্যা ১১৮৫। অষ্টাধ্যায়ী-ই ইহার প্রধান ভিত্তি। সংজ্ঞাগুলির একাক্ষরিক সংক্ষিপ্ততা এবং একই সূত্রে পাণিনির একাধিক (কোথাও ১৮টি পর্যন্ত) সূত্রের অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করিয়া মনে হয়, সুদীর্ঘ ১০।১২ বৎসরের পরিবর্তে কত অল্পকালের মধ্যে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা পরীক্ষা করাই ছিল যেন এই ব্যাকরণ-রচনার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য মুগ্ধবোধের এই সংক্ষিপ্ততা সর্বথা শুভজনক হয় নাই। ব্যাকরণের সাধারণ সংজ্ঞাগুলিকে বর্জন করায় অসুবিধা হইয়াছে এই যে, সাধারণভাবে ব্যাকরণ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে মুগ্ধবোধের ছাত্রকে ঐসব প্রসিদ্ধ সংজ্ঞাগুলিও জানিয়া লইতে হয়, কেবল মুগ্ধবোধের জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ থাকিলে চলে না। উক্ত সংক্ষেপের ফলে ইহার সূত্রগুলিও হইয়া পড়িয়াছে আপাত দুর্বোধ্য এবং উহাদের ভাষাও হইয়া দাঁড়াইয়াছে যেন কুলিশ-কঠোর—যাহাকে বলা চলে 'দাঁত-ভাঙ্গা ভাষা', যেমন—"ঢ্রোঢ়ি র্ঘশ্চানুঃ" (৭৭)—মুগ্ধবোধের একটি সূত্র। ইহা ছাড়া সূত্রের অল্পতার দরুন কেবল সহজ সংস্কৃতশিক্ষা ভিন্ন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের কঠিন ও জটিল অংশের সমাধান মাত্র মুগ্ধবোধের জ্ঞানদ্বারা সর্বত্র সম্ভবপর নয়।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতকে মারাঠী পণ্ডিতদের দ্বারা পাণিনির পুনরভ্যুদয়ের ফলে মুগ্ধবোধের প্রসার সংকীর্ণ হইতে থাকে এবং পরিশেষে বঙ্গদেশে ভাগীরথীর উভয় তীরে ইহার প্রচলন সীমাবদ্ধ হয়। ঐ শতকেই বিখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌমের ভ্রাতুষ্পুত্র কাশীনাথ বিদ্যানিবাস (ইনি 'ভাষাপরিচ্ছেদ'-রচয়িতা বিশ্বনাথ তর্ক-পঞ্চাননের পিতা) মুগ্ধবোধের এক টীকা রচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গে মুগ্ধবোধ সম্প্রদায়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। ক্রমে সমগ্র রাঢ়-অঞ্চলে বিশেষতঃ নবদ্বীপ এবং ত্রিবেণীর পণ্ডিতসমাজে এই ব্যাকরণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী বহু পণ্ডিত এই ব্যাকরণ-সম্প্রদায় হইতে আবির্ভূত হন। কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ-প্রতিষ্ঠার পর উহাতে প্রথমে মুগ্ধবোধেরই পঠন-পাঠন মুখ্যতঃ প্রচলিত হইতে দেখা যায়। ২৪ পরগনার আঁড়িয়াদহের ঘোষাল-বংশীয় রামতর্কবাগীশ 'প্রমোদজননী' টীকা রচনা করিয়া মুগ্ধবোধের দুর্বোধ্যতা-দোষ অনেকাংশে প্রশমিত করিয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশের 'সুবোধা' টীকাও উল্লেখযোগ্য। বোপদেবের আর যে একটি গ্রন্থ প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় তাহা হইতেছে ধাতুবিষয়ক অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ 'কবিকল্পদ্রুম'। শ্লোকে নিবদ্ধ এই গ্রন্থে অন্ত্যবর্ণানুক্রমে সমস্ত ধাতু সজ্জিত করিয়া বিভিন্ন বৈয়াকরণের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করায় সমস্ত ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ে ইহা আদরণীয় হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

পাতা ঝরে, পাতা আসে

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

শীতের শূন্যশাখায় কিছুদিন থেকেই কোন অলক্ষ্য শিল্পীর নিপুণ হাতে একটি দুটি করে সবুজের আঁচড় জেগে উঠছিল। মাঘ শেষ হয়ে তখন ফাল্গুন আসছে। বেহিসাবী প্রকৃতি কখনো দক্ষিণে কখনো উত্তরে হাওয়ার অঞ্চল নিয়ে অন্যমনস্ক-খেলায় মত্ত। সকাল বেলার রোদ বুঝতে দেয় না সন্ধ্যার শিশিরে কতখানি হিম লুকানো থাকবে। তবু যখন এই মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাই, বেশ বুঝতে পারি শীতের আবরণ ক্রমে অনাবশ্যক হয়ে আসছে, বাতাসে অন্তরঙ্গ উষ্ণতা, রৌদ্রে প্রখরতর শাসন, আর আসন্ন কোনো পদক্ষেপ প্রান্তর থেকে প্রান্তরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত।

ঘরের সামনে বরুণ গাছটির পাতা ঝরে পড়েছিল অগ্রহায়ণের হাওয়ায়, ফাল্গুনের মাঝামাঝি তারা আবার ফিরে এলো। চৈত্রের সূচনায় এখন অপর্যাপ্ত শ্বেতস্তবকে ছেয়ে গেছে বরুণের শাখাপ্রশাখা। আর দুদিন পরেই মধুমত্ত ভৃঙ্গদল নিশিদিন সুরের জালে ছেয়ে রাখবে এই বরুণের সবদেহ। কত বিচিত্র প্রজাপতি ও পতঙ্গের দল আসবে মধুপ্রসাদের প্রার্থী হয়ে, আর তাদের আগমন-সম্ভাবনায় গড়ে উঠবে হালকা রেশমের মতো দীর্ঘ মাকড়সার জাল। সারা রাতের শিশির পড়ে ভোরের আলোয় সেই মাকড়সার জাল দুলতে থাকবে অগণন মনি-মাণিক্যের ঝালরের মতো।

পুরো একটি মাস সত্যিই মধুমাস হয়ে বসন্তোৎসব জাগিয়ে রাখে আমার প্রাঙ্গণে। পাতার সবুজ সে কয়দিন ফুলের শুভ্রতায় মুখ ঢাকে। ঈশ্বরের অনন্ত-বিকশিত করুণার মতো অসংখ্য পুষ্পগুচ্ছের আভরণে বরুণের সেই রাজবেশ প্রতিটি বসন্তের নিশানা রেখে যায় চোখের সামনে। কখনো চেয়ে দেখি, কখনো নিত্য অভ্যস্ততায় কর্মব্যস্ত পথচলার মুহূর্তে তাকে অনায়াসে ভুলে থাকি। তবু এক একদিন জ্যোৎস্নারাত্রে যখন চরাচরে পরিব্যাপ্ত নীলিমায় পৃথিবীর নূতন অর্থ ধরা দিয়েছে, তখন জানালা খুলে বরুণের পুষ্পপল্লব-সমাকীর্ণ মৌনগম্ভীর শাখাপ্রশাখার ফাঁকে ফাঁকে আলো-অন্ধকারের খেলায় যেন অনাদি রহস্যের সংকেত জাগে। হয়তো এমনি কোন মুহূর্তে ঋগ্বেদের কবি মনে করেছিলেন,

মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

—এ মন্ত্রের ঋষির নাম মধুচ্ছন্দা। এই অপূর্ব স্তোত্রটিই হয়তো তাঁর নামকরণের মূলে। তবু তিনি সেই সত্যে এসে পৌঁছেছিলেন যার আলোয় বিশ্বের চিরন্তন সত্য এই মর্ত্যমানবপ্রাণে অন্তত: ক্ষণেকের জন্যও উদ্ভাসিত হয়, আর শাশ্বত কাল নিরবধি প্রেরণায় ধন্য হতে থাকে।

যাঁরা প্রকৃতির অরণ্য ছেড়ে নগরের অরণ্যে স্বেচ্ছানির্বাসিত তাঁদের কাছে অধিকাংশ ঋতুর রঙবদল দেওয়ালপঞ্জীর পাতায় আবদ্ধ। অভিধানের অর্থে ফাল্গুন তাঁদের বসন্তকাল। কিন্তু এই আকাশ ও মাটির নিত্যমিলনপ্রাঙ্গণে এলে দেখতে পাওয়া যায় প্রকৃতির হোলিখেলায় ফাল্গুনে চৈত্রে বৈশাখে জ্যৈষ্ঠে বিশেষ কোনো অমিল নেই। বরং রৌদ্র যত দগ্ধ করে, প্রকৃতির বুকের রঙ তত ঘন হয়ে ওঠে। ডালে

ডালে পাতায় পাতায় সেই নানারঙের বাণী আকাশকে আমন্ত্রণ জানাতে থাকে। আবার মাটির বুকে আপন মনে রঙীন আলপনা এঁকে চলে—খেয়ালী বাতাসের দুষ্টুমিতে তা কেবলই মুছে মুছে যায়।

ফাল্গুন-চৈত্রের সন্ধিলগ্নে যখন বর্ণে গন্ধে কূজনে সমস্ত বনভূমি নিবিড় তন্ময়তায় ভরে আছে, তখনই সকাল থেকে সন্ধ্যা অবিরল শব্দ শুনছি—পাতা ঝরে পড়ছে। কতো পাতা নতুন ক'রে এলো, কতো পাতা পুরোনো হয়ে ঝরে গেলো। চলতি পথের উপর উড়ে-যাওয়া শুকনো পাতা অনেক সময় চলমান পথিকের পদশব্দ বলে ভুল হয়। এই সাজানো বাগানের যেদিকে চাই সেদিকেই কোথাও না কোথাও পাতা ঝরছে—সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সমস্ত রাত—সর্বস্ব হারিয়ে ফেলার ধনুকভাঙা পণে ওরা রিক্তশাখ শুকজরার মৌনব্রত গ্রহণ করেছে। একদিকের পূর্ণতার সামঞ্জস্যের প্রয়োজনেই আর একদিকের শূন্যতা। পাতা আসে, পাতা ঝরে। পাতা ঝরে, পাতা আসে।

আসলে মৃত্যুকে যে অন্তর দিয়ে মেনে নিয়েছে, তার কাছে জীবন চিরন্তন; শুধু রূপ থেকে রূপান্তরে, আনন্দ থেকে আনন্দান্তরে যাত্রার ক্ষণবিরতি। সেই মহাজীবনচেতনায় অভিস্নাত ভারতবর্ষ তাই একদা তার নাট্যশাস্ত্রে বিয়োগান্তনাট্য বা ট্র্যাজেডিরচনার প্রয়াস নিষিদ্ধ করে'ছিল। উপনিষদের নচিকেতা তো মৃত্যুর দ্বারে এসে স্তব্ধবিস্ময়ে অভিভূত হয়ে থাকেননি, বরং মরণের কাছে পাওয়া চিরজীবনের বাণী বহন ক'রে ফিরে এসেছেন মানবলোকের প্রাঙ্গণে।

মৃত্যুই যাদের কাছে সবচেয়ে বড়ো রহস্য, জীবনের সীমায় সমগ্র সার্থকতা খুঁজতে যাওয়ার ভুল তো তারাই করে। যারা জীবনকে সবচেয়ে বেশী আঁকড়ে থাকতে চেয়েছে—যেমন গ্রীকজাতি—তারাই সবচেয়ে গভীর অশ্রুর সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে গেছে। পরবর্তী পৃথিবীর সব ট্র্যাজেডির আদিপুরুষ গ্রীক ট্র্যাজেডি। কে না জানে, এই বেদনাবোধের গভীরতাই জীবনচেতনার মাপকাঠি! তবু ভারতবর্ষ যে জন্মমৃত্যুর কৃত্রিম সীমানা পার হয়ে অনন্ত-সত্যের মুখোমুখি হতে চেয়েছিল, তার ব্যাপ্তি ও অতলতা অনেক বেশি।

এমন কিছু পাঠক বা শ্রোতা আছেন যাঁরা করুণ পরিণতি সইতে পারেন না। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষের কবি বা নাট্যকারেরা তাঁদের প্রতি কোনো করুণা প্রদর্শন করেননি। কিন্তু দুঃখ বা মৃত্যুর নেতিবাচক দিকটিই একমাত্র সত্য বলেও তাঁরা মানতে পারেননি। শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের যে মিলন ইহলোকে সম্ভব ছিল না, স্বর্গের তপোবনে তা তাঁরা ঘটিয়েছেন,—অথচ মানবস্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটেছে—একথা বলা চলে না। নীতিবাদীর যতই আপত্তি থাক, স্বর্গের অমরতার সিংহাসন দুর্যোধনের জন্যও পাতা থাকে। সব অগ্নিপরীক্ষার শেষে ধরিত্রীর সর্বংসহ মৌনবক্ষে সীতার সমস্ত বেদনা নির্বাণের শান্তিতে পরম সার্থকতা খুঁজে পায়।

মৃত্যু ও জীবন—এ দুয়ের মধ্যে কৃত্রিম ভাগ করতে যাওয়াই পাশ্চাত্য জীবনে ও সাহিত্যে এত তীব্র দ্বন্দ্বমুখরতার কারণ। এক হিসাবে প্রমিথিয়ুসের বন্দিদশার সঙ্গে আদম-ইভের স্বর্গচ্যুতির খুব মৌলিক পার্থক্য নেই। অগ্নিরই রূপান্তর মানববাসনা। আর বাসনাবশেই মানুষের আদিপাপ। এই আদিপাপের পরিকল্পনাতেই ঈশ্বর ও শয়তানের পৃথকীকরণ। মানব-ভবিতব্যের মূল ধারণায় ঈশ্বর ও শয়তানের দ্বৈতভাব ট্র্যাজেডির দ্বন্দ্বকে গভীরতর

করেছে, গ্যেটের ফাউস্টে যার অমর কাব্যরূপ। তবু সমগ্র য়ুরোপীয় সাহিত্যের দিকে তাকালে কি মনে হয় না যে, ট্র্যাজেডির নামান্তরে ডক্টর ফাউস্টের মতো মানুষের আত্মা শেষ অবধি শয়তানের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে? শুধু মিল্টনের কাব্যেই নয়, গোটা য়ুরোপীয় সাহিত্যেই শয়তানের বিশালতা ঈশ্বরের আকাশকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।

ঈশ্বর ও শয়তান, জীবন ও মৃত্যু, সুখ-দুঃখ -এ সবের মধ্যে যে কৃত্রিম ভাগ মানুষ সৃষ্টি করেছে, তার ফলে সেই দ্বিখণ্ডিত সত্তা ফিরে ফিরে নিজেকেই আঘাত ক'রে চলেছে। ভারতবর্ষ মানবচেতনার এই দ্বৈতচেতনাকেই কখনো একমাত্র সত্যের মর্যাদা দেয়নি বলেই মহাকবি রামপ্রসাদের সংগীতে ধ্বনিত হয়েছে -

শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি,
তাদের দুই সতীনে পিরীত হ'লে
তবে শ্যামা মাকে পাবি।

কোনো সন্দেহ নেই যে, সত্য মিথ্যা ভালো মন্দের কতকগুলি নির্দিষ্ট মাপকাঠি আমাদের বৃত্তবদ্ধ জীবন-যাপনে অনেক পরিমাণে সহায়ক। কিন্তু মানব-অভিজ্ঞতার সুদীর্ঘ ইতিহাসই বলে দেয় যে, সব উন্নতির সঙ্গে আসে অবসান, সব সার্থকতায় অন্তর্নিহিত থাকে ব্যর্থতার অমোঘ সম্ভাবনা। বিপরীতক্রমেও কথাটি সত্য। এ জগৎ-সৃষ্টিই ভালোমন্দে সত্যমিথ্যায় অনির্বচনীয় রহস্যে আবৃত—সে রহস্যেরই অন্য নাম মায়া।

সুতরাং সত্যযুগ, স্বর্ণযুগ বা বিশ্বব্যাপী সাম্য-যুগের কল্পনা—সবই মানুষের আদর্শগত শুভেচ্ছার প্রতিচ্ছবি। হয়তো ক্ষুদ্র সত্য থেকে মহত্তর সত্যের পথে যাত্রা। কিন্তু কখনোই শেষ অম্বিষ্ট নয়। কারণ অন্ন বস্ত্র বুদ্ধি মেধা—এ সব কিছু পার হয়ে আছে মানুষের অন্তরের অন্বেষণ। তার উত্তর না পেলে কোনো রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক শাসনদণ্ডই মানুষের অন্তরের স্বাধীন স্বরূপকে চিরকালের মতো বন্দী ক'রে রাখতে পারে না।

রামায়ণ বা মহাভারতের মতো জাতীয় জীবনেতিহাসের কাব্যে ভারতবর্ষ সংগ্রামকে স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু কখনোই লক্ষ্য মনে করে-নি। তাই কুরুক্ষেত্রের সর্বনাশা পরিণতি জেনেও অর্জুনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান—ফলের জন্য নয়, সত্যের জন্যই কর্মের সাধনা। যাঁরা কমেডি বা ট্র্যাজেডির সহজ ভাগে জীবনকে ভাগ করতে যান, তাঁরা নিরাসক্তির এই ক্রান্তদর্শী আদর্শের কথা ধারণায় আনতে পারেন না বলেই জীবনসত্যের অর্ধপরিচয় তাঁদের রচনায় ও ভাবনায় ফুটে ওঠে।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে দেখি, আমার ঘরের বারান্দা দিয়ে সোঁদাল-গাছের একটি শুকনো পাতা ধীর পায়ে যেন হেঁটে চলে গেল দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে। বরুণ গাছটিতে যখন পাতায় ফুলে প্রকৃতির ঐশ্বর্যভাণ্ডার উপচে পড়েছে, তখনই বারান্দার দক্ষিণ কোণে সোঁদালের পাতারা জীর্ণ ধূসরতায় থেকে থেকে ঝরে যাচ্ছে, আর তার কালো কালো লম্বা ফলগুলি হাওয়ায় দুলছে অশরীরীর সংকেতের মতো। ওই পাতাটির দিকে চেয়ে আমার এক শ্রাবণরাত্রির ঘুম-ভাঙা মুহূর্তটি মনে পড়লো। হঠাৎ জেগে উঠে সে রাতে হাওয়ায়-পাতায় বিষম যুদ্ধের শব্দ শুনে বারান্দায় এসে দেখি সোঁদালের সোনালি পাপড়িতে সমস্ত বারান্দা ছেয়ে গেছে। হাওয়ায় উড়ে ঘুরে ফিরে মাটিতে নামছে ওই পাপড়ির দল। ভিজে বাতাসে সোঁদালের মিষ্টি গন্ধে মনে হলো আকাশ থেকে অজস্র সুরধারা কেউ বাজিয়ে চলেছে আঁধারের অনন্ত হাতের ছোঁয়ায়। সেই সোঁদাল আজ কতো রিক্ত, কতো নিরাভরণ!

এই মুহূর্তে স্বয়ং বসন্তের অভিষেক-ধন্য বরুণ আমার প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছে পুষ্পকিরীটের রাজবেশে। তারপর একটি মাসও ফুরোবে না, সব পুষ্পাতিশয্যের অবসানে ঘন সবুজ পাতারা মাথা তুলবে সর্ব অঙ্গে, ফুলের প্রলাপ সংহত হবে গুচ্ছ গুচ্ছ ফলের নিঃশব্দ প্রকাশে। অনাহূত রবাহূত পতঙ্গ, প্রজাপতি, পথিকেরা সবাই ভুলে যাবে এই ফাল্গুনে এর কতো ঐশ্বর্য ছিল! আপনাতে আপনি তৃপ্ত প্রৌঢ়তায় বরুণ সেদিন দীর্ঘ ছায়া ফেলে শীতল করবে মধ্যাহ্ন-ধরিত্রীর তাপ। বর্ষা আসবে, অঙ্গে অঙ্গে আশীর্বাদের কণা ছড়িয়ে আরো সতেজ, আরো সবুজ ক'রে দিয়ে যাবে বরুণের দীর্ঘ ব্যাপ্ত বৃক্ষ-দেহের সব ক'টি শাখাপ্রশাখা। বিশাল পিতৃস্নেহে বুকভরা অর্কিডের শোভা নিয়ে শেষ বর্ষণের ধারাস্নান সেরে প্রথম শীতের আগমনী বাজবে একটি একটি ক'রে পাতাঝরার গানে। অবশেষে প্রখর শীতে শূন্য শাখায় আকাশের দিকে ঊর্ধ্ববাহু তপস্বী সেই সাধনায় মগ্ন হবে, যে সাধনার আদি ও অন্তে পূর্ণতাই একমাত্র সত্য। পূর্ণ থেকে পূর্ণ যখন বিদায় নেয়, তখন তো অবশেষ থাকে সেই পূর্ণেরই পরিচয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী জীবানন্দ

সর্বব্যাপী গুণাতীত ব্রহ্ম নিরাকার
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অনাদি অনন্ত,
ভক্তিহিমে ঘনীভূত হইলে সাকার
নররূপে ক্ষুদ্রজীবে দিতে ভূমানন্দ!

আদি যুগ হতে সব সাধনার ধারা
প্রধাবিত একসঙ্গে যেন মিলিবারে,
রামকৃষ্ণ-সুধা'ব্ধতে হল সত্তাহারা
সর্বধর্মভাবঘন একটি আধারে!

অমৃতসিন্ধুর এক বিন্দু কর পান,
অমৃতত্বলাভে তৃপ্ত হবে মন প্রাণ।

সাগর-সন্ধানে পরমহংস

শ্রীসন্তোষকুমার তালুকদার

পরমহংস যাবেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে!

দক্ষিণেশ্বরে আনন্দের হাট বসেছে—এ খবর কি বিদ্যাসাগর রাখেন না? কোথায় রামকৃষ্ণ-রূপ মহাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন বিদ্যাসাগর, আর কোথায় মহাসাগরই যাচ্ছেন সাগরসঙ্গমে!

আমরা সাধারণ যুক্তিতর্কের দ্বারা লীলাময়ের লীলারহস্যের সন্ধান পাবো কেন? কেউ তাঁর জন্য এক পা এগুলে তিনি যে দশ পা এগিয়ে যান সেই ভক্তের দিকে! সেখানে খাটে না কোন ওজর আপত্তি, চলে না কোন মান অভিমানের দ্বন্দ্ব। জ্ঞান-পিপাসা জেগেছে যাঁর মনে, শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন ক'রে যিনি আজ পরিশ্রান্ত, সেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা না ক'রে পরমহংস কি ঠিক থাকতে পারেন?

সত্যিই তো, ঠাকুর কি কারও একলার? তিনি কি কেবলমাত্র তাঁদেরই, যাঁরা আছেন তাঁরই আশেপাশে ভিড় ক'রে? তিনি কেবল তাঁদেরই জন্য? তা হ'তেই পারে না। তিনি জগদ্গুরু, তিনি সকলের। তিনি যাবেনই অযাচিতভাবে মানুষের দ্বারে দ্বারে।

কে জানে, বিদ্যাসাগরের মনের গোপন কোণে বৃহতের জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা জেগেছে কি না। যা সাধারণের ধারণার বহির্ভূত, প্রাণের ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে তা তো গোপন থাকবার কথা নয়। মনে বনে আর কোণে যেখানেই যখন তাঁর আহ্বান আসুক না কেন তিনি যে সঙ্গে সঙ্গেই তা শুনতে পান। তাই বুঝি চলেছেন ঠাকুর সাগরবক্ষের উত্তাল তরঙ্গকে প্রশমিত করতে, সব জানার শেষ জানাকে জানিয়ে দিতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ আগে থেকেই বিদ্যাসাগরের গুণপনায় মুগ্ধ। 'ছেলেধরা মাষ্টার', যিনি বিদ্যাসাগরের স্কুলেই অধ্যাপনা করেন, তাঁর মুখেও সাগর চরিত্রের অনেক নতুন খবর পেয়েছেন। বিদ্যাসাগরের সর্বজীবে দয়ার কথা তো সবজনবিদিত। বাছুররা মায়ের দুধ পায় না দেখে তিনি কয়েক বৎসর বন্ধ করলেন দুধ খাওয়া। আর ঘোড়া গাড়ী টানে, কিন্তু নিজের অপরিসীম বেদনার কথা বলতে পারে না, তাই অন্তরে অন্তরে অনুভব করলেন তাদের মূক বেদনার কথা, ঐ সঙ্গে বন্ধ করলেন গাড়ী চড়া। বিভিন্ন কঠিনরোগাক্রান্ত মানুষকে স্নেহের কোমল স্পর্শে কাছে টেনে এনে, নিজ হাতে ঔষধ ও পথ্য সেবন করিয়ে, তাদের নিভে-আসা জীবন প্রদীপে আবার সংযোগ করতেন নতুন তৈলধারা। এখানে ছিল না কোন জাতিপাতির ভেদবিভেদ, ছিল না কোন অপমান বোধের প্রশ্ন। এই খানেই সাগর-চরিত্রে 'ঈশ্বর' নামের ঐশ্বরিক স্পর্শ বাস্তবে রূপায়িত। এমনি বিদ্যাসাগরকে কি পরমহংস ভুলে থাকতে পারেন?

মানব মনের উপর পরমহংসদেবের অপূর্ব আধিপত্য ছিল। এ সম্বন্ধে স্বয়ং বিবেকানন্দও একসময় উক্তি করেছিলেন -"মনের বাইরের জড়শক্তিসকল কোন উপায়ে আয়ত্ত ক'রে কোন একটা অদ্ভুত ব্যাপার (miracle) দেখানো বড় বেশী কথা নয়—কিন্তু এই যে পাগলা বামুন লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মতো হাতে

নিয়ে ভাঙত, পিটত, গড়ত, স্পর্শমাত্রেই নতুন ছাঁচে ফেলে নতুন ভাবে পূর্ণ করত এর চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার (miracle) আমি আর কিছুই দেখি না।"

বিদ্যাসাগর নাস্তিক, বিদ্যাসাগর ম্লেচ্ছ—এমনি কত ধ্বনি তৎকালে অনুরণিত। কিন্তু আসল বিদ্যাসাগরের দিকে তাকাবার অবসর তখন সমাজপতিদের কোথায়? তাঁরা যে সকল বিদ্যাই আয়ত্ত করেছেন, পারেননি আসল বিদ্যাসাগরে ডুবতে। বলতেন গল্প ছন্দের যাদুকর পরমহংস—সেই যে হীরের দর যাচাই করতে পাঠিয়েছিল বেগুনওয়ালার কাছে। বেগুনওয়ালা বড়জোড় ন'সের বেগুন দিতে পারে, তা এও বাজার দরের চাইতে বেশি ব'লে ফেলেছে। পরে গেল কাপড়ওয়ালার কাছে। কাপড়ওয়ালার পুঁজি বেশি সে বললে ন'শো টাকা। এবার গেলো খাঁটি জহুরীর কাছে। জহুরী এক পলক দেখেই লাফিয়ে উঠল। বললে—এক লাখ টাকা দেবো। যার যেমন পুঁজি তার তেমন দর। সত্যিই তো তাই। ডোবায় অবগাহন করতে যারা অভ্যস্ত, সায়র-দীঘিতে নামতে যাদের ভয়, বিদ্যা-সাগরে তারা ডুববে কি ক'রে? এই সাগরে যে বিপুল জল, কত বিচিত্র তার তরঙ্গভঙ্গ! পরমহংস হ'লেন সেই আসল জহুরী। বিদ্যা-সাগরে অবগাহন ক'রে তার আসল রত্নের সন্ধান দেখিয়ে না দিয়ে কি থাকতে পারেন? আর এই বিদ্যাসাগর যে কস্তুরী মৃগের মতো, আপন গন্ধেই দিশেহারা, কে দেবে তাঁর বন্ধনদশা ঘুচাবার চাবিকাঠি হাতে তুলে!

"আমি ধর্ম সম্বন্ধে কাউকে কোন কথা বলি না কেবল বেতের ভয়ে। নিজের বেতের ভয়েই অস্থির, অন্যকে ধর্মের কথা ব'লে বেত্রাঘাতের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে ভয় পাই। দশজন আমাকে স্নেহ করে—এটাই আমার জীবনের লাভ। এমন স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ চাই না, যেখানে মানুষের সেবা বা উপকার করবার কোন সুযোগ নাই। আমি অবতার হ'তে চাই না"—বলেন বিদ্যাসাগর।

সাগর-চরিত্রের কথা বলতে গিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -"তিনি যে বাঙ্গালী বড়ো লোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি যে রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে—তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বড়ো ছিলেন. তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। তিনি প্রতিদিন দেখেছেন, আমরা আরম্ভ করি শেষ করি না; আড়ম্বর করি কাজ করি না, যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; পর্বতপ্রমাণ বাক্য রচনা করি, কিন্তু তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করতে পারি না।"

"টুলো ব্রাহ্মণের সতেজ মূর্তি বিদ্যাসাগর। যেকালে কপালে পবিত্র চন্দন লেখা মুছিয়া ফেলিয়া নবশিক্ষিত ব্রাহ্মণ মুখে পাউডার মাখিতে লাগিয়াছিলেন, উপবীত এবং তুলসীদাম বা রুদ্রাক্ষমালার স্থানে গলদেশে নেকটাই শোভিত করিতেছিলেন...ঐ সময় ব্রাহ্মণ-সমাজেরই একজন ইংরাজী শিখিয়া, একটা কলেজের উচ্চপদ পাইয়া যে টুলো ব্রাহ্মণ সেই টুলো ব্রাহ্মণই রহিয়া গেলেন।" -এ উক্তি করেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। শাস্ত্রসিন্ধুর পবিত্র বারি পান ক'রে যিনি হয়েছেন বিদ্যাসাগর, তাঁর বিচিত্র তরঙ্গের পরিমাপ করা কি এতই সহজসাধ্য?

সকল বিষয়েই তিনি ছিলেন সাগরসদৃশ অতলস্পর্শ। এই সাগর চরিত্র যাঁরা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের অনেকেই এমন বহু ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যে কথা ভাবলে এ টুলো ব্রাহ্মণের চরিত্র সম্বন্ধে বাস্তবিকই অবাক্ হ'তে হয়। যেসমস্ত মানুষের মন ও মুখ এক ছিল

না, ছিল না বাক্যের সঙ্গে কার্যের কোন সম্পর্ক, তাদের তিনি কোনদিনই পারেননি বরদাস্ত করতে। বিদ্যাসাগর ছিলেন গৃহী, কিন্তু তাঁর অন্তরে ছিল ত্যাগেরই বিভূতি।

"দর্শনশাস্ত্র পড়া শেষ হয়ে গেলে মানুষ তখন বুঝতে পারে যে, সে কিছুই জানে না। তখন সে ধর্ম ধর্ম করে।" জ্ঞানসমুদ্র মন্থন ক'রে আজ বিদ্যাসাগরে জেগেছে উত্তাল তরঙ্গ, তাই বুঝি আজ সাগরবক্ষের তরঙ্গকে প্রশমিত করতে চলেছেন রামকৃষ্ণ পরমহংস।

পরমহংস দেখা করতে আসবেন– একথা মাষ্টারের (শ্রীম) মুখে শুনে বিদ্যাসাগরও হয়েছেন আনন্দিত। তাই একবারমাত্র জিজ্ঞাসা করলেন—'কি রকম পরমহংস? তিনি কি গেরুয়া কাপড় প'রে থাকেন?" মাষ্টার তদুত্তরে বললেন—"আজ্ঞে না, তিনি এক অদ্ভুত পুরুষ, লালপেড়ে কাপড় পরেন···কোন বাহিক চিহ্ন নেই; তবে ঈশ্বর বই আর কিছুই জানেন না।" এমনি এক পরমহংসের সাথে দেখা হবে আজ বিদ্যাসাগরের, আর হবে সাগরের সাথে মহাসাগরের মিলন, ঐ সঙ্গে হবে কত অজানাকে জানা, কত নতুনের আস্বাদন!

বিকেল ৪টা। বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে এসে হাজির হবার সাথে সাথে বিশেষ ভাবান্তর লক্ষ্য করা যাচ্ছে; তাই মাষ্টারের হাত ধরে চলেছেন ঠাকুর। "কিন্তু জামার বোতাম খোলা রয়েছে—এতে কিছু দোষ হবে না তো?" একান্তই সাধারণ বালকের মতো ঠাকুর পরমহংসের এই জিজ্ঞাসা। আজ এত সাধারণ ব্যাপারেও ঠাকুরের ভাবনা কেন? সাগর-সন্ধানে চলেছেন কি না! আর এ যে বিদ্যাসাগর; কত তাঁর বিদ্যা, কত নাম, কি জানি কোন্ দিক দিয়ে কি ভুল ধরবে!

"না, আপনার কিছুতেই দোষ নেই; আপনি ওর জন্য ভাববেন না।" বালকস্বভাব পরমহংসকে নিশ্চিন্ত করতে জবাব দেন শ্রীম।

এতক্ষণে সাগরের সঙ্গে মুখোমুখি হ'লেন পরমহংস, তাই সাগর করলেন অভ্যর্থনা। কিন্তু কিছু খাবার আনলে ইনি খাবেন তো—বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীম-কে। সত্যিই তো, ইনি কি রকম 'পরমহংস' তা তো বিদ্যাসাগর আজও জানতে পারেননি। এবার ব্যস্ত হয়ে কিছু মিষ্টি এনে ঠাকুরকে মিষ্টিমুখ করালেন। আর ঐ সঙ্গে প্রস্তুত হ'লেন পরবর্তা মধুময় আলাপনের জন্য।

"আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল, বিল, নদী দেখেছি; এবার সাগর দেখছি"—বললেন যুগাবতার পরমহংস।

"তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান"—এমনি কথা ব'লে বসলেন বিদ্যাসাগর।

"না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যের সাগর। তুমি ক্ষীরসমুদ্র। আর সিদ্ধ তুমি তো আছই। আলু পটল সিদ্ধ হ'লে নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার এত দয়া!"

নিজের প্রশংসার কথা শুনে বিদ্যাসাগর আবার উত্তর করলেন—"কলাইবাঁটাসিদ্ধ তো শক্ত হয়।"

"কিন্তু তুমি তো তা নও"—উত্তর দিলেন পরমহংস।

এবার ব্রহ্ম সম্বন্ধে কথোপকথন।

"ব্রহ্ম বিদ্যা ও অবিদ্যার পার। যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ বা ভাগবত পড়ছে, আর কেউবা জাল করছে। প্রদীপ নির্লিপ্ত। ব্রহ্ম যে কি তা মুখে বলা যায় না। যার দর্শন হয় সে খবর দিতে পারে না, কালাপানিতে গেলে জাহাজ যেমন আর ফেরে না। সব উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কিন্তু ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট

হন নাই। ব্রহ্ম অচল, অটল, নিষ্ক্রিয়, বোধ-স্বরূপ। হিসেব ক'রে সে হিসেবের নিকেশ করে কার সাধ্যি। ব্রহ্ম বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, মন্ত্র, সমস্ত কিছুর পার। তিনি কি তা মুখে বলা যায় না। কে বলবে? যিনি বলবেন তিনিই নাই।

"শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য গিয়েছিলেন জনকের কাছে। জনক বললেন, আগে দাক্ষিণা দাও। শুকদেব বললেন, আগে উপদেশ না পেলে কেমন ক'রে দাক্ষিণা হয়। তখন জনক হাসতে হাসতে বললেন, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে আর কি গুরুশিষ্য-বোধ থাকবে? তাই আগে দক্ষিণার কথা বললাম।"

"বা! এটি তো বেশ কথা! আজ একটি নতুন কথা শিখলাম,—ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই।"—আনন্দে ব'লে বসলেন বিদ্যাসাগর। সত্যিই তো, এ যে একেবারে নতুন বলার কৌশল। আর তার চাইতেও কৌশলী মহাপুরুষ হলেন এই পরমহংস। ব্রহ্ম যে কি তা যে এত সহজভাবে কেউ অন্তরে পৌঁছে দিতে পারে, তা তো এতদিন জানা যায়নি। এমনি কত কথাই না আজ জাগছে বিদ্যাসাগরের মনে!

"তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি আর কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?"—এমনি আর এক প্রশ্ন করলেন বিদ্যাসাগর।

"বিভুরূপে তিনি সকলের ভিতর রয়েছেন—আমার ভিতরেও যেমনি পিপড়েটির ভিতরেও তেমনি। কিন্তু শক্তিবিশেষ আছে। যদি সকলেই সমান হবে তবে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নাম শুনে তোমায় আমরা কেন দেখতে এসেছি? তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে? তা নয়, তুমি দয়ালু, তুমি পণ্ডিত—এই সব গুণ তোমার আছে, তাই তোমার এত নাম। দেখ না, এমন লোক আছে একলা একশো লোককে হারাতে পারে, আবার এমন আছে একজনের ভয়ে পালায়। যদি শক্তিবিশেষ না হয়, লোকে কেশবকে এতো মানতো কেন? গীতায় আছে, যাকে অনেকে গণে মানে—সে বিদ্যার জন্যই হোক বা গাওনা-বাজনার জন্যই হোক বা লেকচার দেবার জন্যই হোক বা আর কিছুর জন্যই হোক··· নিশ্চিত জেন যে তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে। জমিদার সব জায়গায় থাকেন, কিন্তু অমুক বৈঠকখানায় তিনি প্রায় বসেন। যেখানে কার্য বেশী সেখানে বিশেষ শক্তির প্রকাশ। সূর্যের রশ্মি মাটিতে একরকম পড়ে, গাছে একরকম পড়ে, আবার আর্শিতে আর একরকম। আর ভক্তই তো ভগবানের বৈঠকখানা।"—এমনি ক'রে জবাব দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

যেমনি প্রশ্ন, ঠিক তেমনি তার জবাব। মনে হয়, এ প্রশ্নের জবাব—পরীক্ষার-পূর্ব রাত্রিতে বালকস্বভাব পরমহংসের যেন মুখস্থ ক'রে তৈরি করা। কিন্তু তা নয়। এর জবাব আসে অন্তরের অন্তস্তল হ'তে। কোন্ অজানা শক্তি কোন্ গোপন কোণে বসে বসে যে এমনি কত প্রশ্নের জবাবের ভাষা যুগিয়ে দিচ্ছেন, তাঁর খবর রাখেন একমাত্র এই পরমহংস।

"আপনি সব জানেন—তবে খপর নাই। বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে, কিন্তু বরুণ রাজার খপর নাই।"—বললেন আত্মভোলা শ্রীরামকৃষ্ণ।

বিদ্যাসাগরের এত বিদ্যা, কিন্তু সাধারণ কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন? তাই আবার পরমহংসের কথাতেই তার জবাব দিতে হয়—"কি জানো, জালে প্রথম প্রথম বড় বড় মাছ

পড়ে—রুই কাতলা। তারপর জেলেরা পাঁকটা পা দিয়ে ঘেঁটে দেয়, তখন চুনো-পুঁটি পাঁকাল এ সব মাছ বেরোয়,—আবার একটু দেখতে দেখতেই ধরা পড়ে। ঈশ্বরকে না জানলে ক্রমশঃ ভিতরের চুনো-পুঁটি বেরিয়ে পড়ে। শুধু পণ্ডিত হ'লে কি হবে? বিদ্যা-সাগরের অনেক পড়া আছে, কিন্তু অন্তরে কি আছে তা দেখে নাই। ছেলেদের লেখা-পড়া শিখিয়েই আনন্দ, কিন্তু আসল আনন্দের আস্বাদ পায় নাই।"

তাই বুঝি পরমহংস এসেছেন বিদ্যা-সাগরে একটু তোলপাড় করতে।

লোকে স্ত্রী-পুত্রের জন্য ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলে, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য ক'জন চোখের জল ফেলে বল দেখি?—বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ। 'যত্র জীব, তত্র শিব'। মানুষরূপী ঈশ্বরের জন্য চোখের জল ফেলেছেন বিদ্যাসাগর। বিধবাদের অফুরন্ত চোখের জলে, দরিদ্রের বুকফাটা কান্নার সাথে যিনি নিজের অশ্রু মিশিয়ে দিয়েছিলেন, এমনি বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বলবো কোন মুখে?

আর জীবনপ্রান্তের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগরের মনে এসেছিল এক প্রবল ধর্মীয় স্পৃহা। তাই একদিন বন্ধু গুরুদাসকে জিজ্ঞাসা ক'রে বসলেন—

"আচ্ছা গুরুদাস, তুমি তো গীতা পড়েছ। গীতার শিক্ষা কি বলতে পারো?"

"যা দিয়ে মানুষের শরীর মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হয়, সেই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা। গীতা আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে।" —বললেন গুরুদাস।

"ঠিক বলেছ। এ শিক্ষা সর্বকালের। বোধ করি সর্ব ধর্মেরও।"

বিদ্যাসাগরের মুখে ধর্মপ্রসঙ্গ শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন স্যার গুরুদাস। আর ধর্ম ও ভগবানের বিষয় যে বিদ্যাসাগরের মুখে খুব কমই শোনা যেত। সকল কর্মের ফল ভগবানে সমর্পণ ক'রে স্বীয় শক্তি অনুসারে লোকের সেবা করা—গীতার এই আদর্শের মূর্ত বিগ্রহ বুঝি এই বিদ্যাসাগর।

রাত অনেক হয়েছে। এবার সত্যিই বিদায় নিতে হবে পরমহংসকে। তাই যাবার সময় একবার দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির বাগানে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন বিদ্যাসাগরকে আর ঐ সঙ্গে করলেন একটু তাত্ত্বিক রসিকতা:

"আমরা জেলে-ডিঙ্গি। খাল বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ, কি জানি যদি যেতে গিয়ে চড়ায় লেগে যায়। অবশ্য তার মধ্যে এ সময় জাহাজও যেতে পারে।"

এবার বিদ্যাসাগর উক্তি করলেন—"হ্যাঁ, এটি বর্ষাকাল বটে।"

সাগর-অন্তরে এসেছে আজ নবানুরাগের বর্ষা। অনুরাগের প্রাবল্যে সব যে একাকার হয়ে গেছে।

যাবার জন্য গাড়ী প্রস্তুত। কিন্তু এখনো পরমহংস গাড়ীতে উঠছেন না কেন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি কি ভাবছেন? অযাচিত-ভাবে বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য, সাগরবক্ষের বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ প্রশমনের জন্য মায়ের ছেলে কি মায়ের কাছে দু'চার কথা ব'লে নিচ্ছেন? এ না হ'লে পরমহংস! —যাঁর কাছে চাইতে হয় না, সবই পাওয়া যায় অযাচিতভাবে!

বিদ্যাসাগর এবার গাড়ীতে তুলে দিলেন পরমহংসকে। আর বিদায়ের সময় প্রণাম ক'রে হাতজোড় ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন একান্ত বিনীত-ভাবে। রাতের অন্ধকার ঠেলে গাড়ী এগিয়ে

চললো গন্তব্যস্থলে। কিন্তু এই মিলন-মুহূর্ত আরও দীর্ঘস্থায়ী হ'লে বোধ হয় ভাল হ'তো। আর কেনই বা এতদিন সান্নিধ্যলাভ হয়নি এ মহাপুরুষের সঙ্গে! জীবনের আসল সত্য তো আজও জানা হয়নি। যে কথা বলার ছিল, সে-কথা তো সব বলা হয়নি এ পরমহংসের কাছে! এই অদ্ভুত লোকটির সাথে দেখা হবার পর সবই যেন কেমন ভুল হয়ে গেল! এই পরমহংসই কি পারেন জীবনের আসল সত্যকে জানিয়ে দিতে, জীবন-নৌকার কাণ্ডারী হয়ে সংসার-সমুদ্র তরিয়ে দিতে? কিন্তু সত্যিই তো যিনি ঈশ্বর বই আর কিছুই জানেন না, যিনি অযাচিতভাবে ফিরছেন মানুষের ঘরে ঘরে—এ পরমহংস কে? এমনি কত প্রশ্নই হয়তো জাগছে বিদ্যাসাগরের মনে! এতক্ষণে গাড়ী এগিয়ে গেছে দৃষ্টির বাইরে, বহু দূরে। কিন্তু এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর কি ভাবছেন? জানি না সাগরের মন চুরি গেছে কি না!

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত
'বেদান্তকেশরী'

[অনুবাদ: পূর্বপ্রকাশিতের পর]

অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য

লোকপ্রচলিত কোন পুতুলখেলায়
দেখা যায় স্তম্ভ-সূত্র হইতে চালিত
একসাথে কাষ্ঠ-পুত্তলিকা অগণন
দেখায় সঙ্গীত আর ভঙ্গি কতমত;
সেইমত ভূর্ ভুবঃ আদি সর্বলোক
সূত্রাত্মা নামক তত্ত্বে হয়ে অনুস্যূত
তাঁহারি ইচ্ছায় হয় সদাই চালিত ॥৫৫

অতীত ভবিষ্য বর্তমান তিন কালে
একই রূপ থাকে যাহা, হয় তাহা খ্যাত
সত্য বলি। সেই সত্য—ব্রহ্ম নিরুপাধি;
ক্ষিতি অপ্ আদি মূর্ত, প্রাণাদি অমূর্ত
বস্তুও বিনাশকালে তাঁতে হয় গত।
তিনিই সত্যের সত্য; আর কোন কিছু
সত্য বা অধিক সত্য নাহি তাঁর মত ॥৫৬

শুক্তি রৌপ্য, রজ্জু সর্প, মরু জল বলি—
অসত্য হলেও—ব্যবহারে উদ্ভাসিত ;
সত্যের আশ্রয়ে সত্তা তত্ত্বজ্ঞানাবধি
সে-সবার, লোক-সিদ্ধ নিয়মে গ্রথিত ;
অখিল জগৎ সত্য সত্যের সত্যেতে,
সবই আবির্ভূত হয় ব্রহ্মের আধারে।
জ্ঞান হলে এ সকলি হয় প্রমাণিত
মিথ্যা বলি ; জ্ঞানিগণ সত্য কন তাঁরে ॥৫৭

আকাশও সেথায় খুঁজে পায় নিজ সীমা,
কাল লীন হয় সেই কালাতীত মাঝে,
দিক সেথা অবসিত সীমাহীনতায়।
ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভও ক্ষুদ্র তাঁর কাছে —
বিপুলায়তন মহাসাগর যেমন
অংশমাত্র পৃথ্বীজোড়া একার্ণব মাঝে ॥৫৮

বারি যথা সিন্ধু হতে উঠিয়া আকাশে
জলধর হতে নামি পশে সর্বৌষধি
নানা বর্ণে গন্ধাদিতে হয়ে পরিণত,
পৃথক্ অপরিমিত অন্তরাত্মা এক
অগণিত জীবে রূপায়িত সেই মত।
তাঁর প্রেরণায় বসুমতী ভার বহে,
মেঘ বর্ষে সুনিয়ত নিখিল জগতে,
অগ্নি জ্বলে আর করে সর্ববস্তু পাক ;
তিনি অন্তর্যামী, তিনি স্থিত সর্বভূতে ॥৫৯

'সর্বভূতে নিজ আত্মা নিরখিবে', আর
'আপন আত্মায় স্থিত ভূত সমুদয়',
সলিলে-তরঙ্গে যথা নাহি কোন ভেদ
সেইমত নিরখিয়া নিখিল আত্মায়
'বস্তু সেই এক ব্রহ্ম—অন্য কিছু নাই,
নাই নানা'—শ্রুতি এই শেষ বাণী কয়।
যে-মানব ইহা ভুলি নানা হেরে হেথা,
মৃত্যু হতে মৃত্যু তার নিত্য গতি হয় ॥ ৬০

আকাশ সর্বত্র-ব্যাপ্ত, তবু ঘটমাঝে
বিধৃত আকাশে মোরা ঘটাকাশ কই ;
যেন জন্মে, নড়ে-চড়ে, ধরে ঘটাকার,
নাশ পায় এ আকাশ—ভাবি মোরা তাই
যদিও অরূপ সর্বব্যাপী সে আকাশ
জন্ম গুণ আদি তার কোন কালে নাই।
রূপ-গুণ-হীন নিত্য আত্মা মোরা, তবু
ভাবি সেইমত—যেন শরীরের সাথে
আমাদেরও জন্ম-মৃত্যু-বিকারাদি হয় ॥ ৬১

যতখানি গুড়ের প্রমাণ পড়ে চোখে
ততখানি মধুরতা তাহাতে প্রকাশ,
যতখানি কর্পূরের রাশি ততখানি
তাহে আছে পরিব্যাপ্ত কর্পূর-সুবাস,
যতদূর বিশ্বে প্রতিভাত তরু, গিরি,
নগর, উদ্যান, মন্দিরাদি শোভমান
ততদূর চৈতন্যের হতেছে স্ফুরণ,
পরিশেষে সে সবার এক অবসান ॥ ৬২

বাদ্য হতে যেই ধ্বনি নিঃসরে চৌদিকে—
যে আঘাত পড়ে তায় তারি পরিণতি ;
কিন্তু বাদ্য আর তার আঘাত-নিঃস্বন
না হয় পৃথক্—এক সাথে অনুভূতি।
মায়া যার উপাদান সে বিশ্বজগৎ
ব্রহ্ম সাথে বিজড়িত হয়ে ভাসমান ;
প্রত্যগাত্মা তার মাঝে হইলে সাক্ষাৎ,
আর তাহে নাহি হয় জগতের ভান ॥ ৬৩

সাক্ষাৎ হয়েছে তব জ্ঞানময় সেই
পরমাত্মা, যিনি হন নিখিল-ঈশ্বর,
জানিয়াছ তিনি সর্বজীব-অন্তর্যামী,
আকাশের মত সর্বব্যাপী, চিরস্থির,
দেখিতেছ ব্রহ্ম ভিন্ন সকলি অসৎ,
বিদ্যমান শুধু সব আভাসের মত ;
'শুদ্ধ ব্রহ্মরূপে আছি আমি' এই বোধে
নিরন্তর রহ, সব প্রযত্নে বিরত ॥ ৬৪

মৃত্যুর আঘাত ও জীবনের ধর্ম

অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

লাভ-ক্ষতির হিসেব, দেনা-পাওনা নিয়ে মারামারি, অর্থ ও যশের আকাঙ্ক্ষা একদিন মনে হয় সবই অর্থহীন। প্রিয়জনের নিষ্ঠুর মৃত্যুর কালো খড়্গখানি সবই খণ্ডিত ক'রে দিয়ে যায়। চোখের জল বাধা মানে না, হৃদয় দীর্ণ ক'রে বেদনা শতধারায় উৎসারিত হয়। সকল অনুভূতি বিবশ, হৃদয়ের তন্ত্রী বিকল হয়ে যায়। বিধাতার শুভবুদ্ধির বিরুদ্ধে তীব্র অভিমান পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে অন্তরে। বিদীর্ণ মন বার বার বলতে থাকে: কেন তুমি এত কৃপণ? দিয়ে কেন আবার ফিরিয়ে নাও? কেন এই বঞ্চনা? কেন এই প্রতারণা?

উত্তর মেলে না। কঠিন পাষাণে আহত হয়ে জিজ্ঞাসা ফিরে আসে আবার অন্তরে। অনন্ত জিজ্ঞাসা, অজস্র জিজ্ঞাসা। অন্তর আলোড়িত হয়। জীবন-যন্ত্রণা তীব্র হ'তে তীব্রতর হয়ে ওঠে। চারিদিকে অন্ধকার। নিকষ-কালো পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার। পথের দিশা হারিয়ে যায়। দিক্‌চিহ্নহীন অসীম শূন্যপথে ঘুরতে থাকে জগৎ। কালের চেতনা হয় অবলুপ্ত। মজ্জমান মানুষের মতো বেদনাহত মানুষ তখন ধরতে চায় কোন আশ্রয়। অন্তর হাহাকার ক'রে ওঠে একটু আলোর জন্য। কোথায় আলো? কোথায় আলো? সৃষ্টিতে বিধাতাপুরুষ ব'লে যদি কেউ থাকো, আমার চারিদিকের দুর্ভেদ্য অন্ধকার দূর করো। আবার সৃষ্টিকে দেখতে দাও স্ব-রূপে। আমার দৃষ্টি-সীমাকে প্রসারিত করো। দেখতে দাও রহস্যাচ্ছন্ন অতীতকে, বিসর্পিত তরঙ্গিত বর্তমানকে, প্রহেলিকাময় ভবিষ্যৎকে। দেখিয়ে দাও, বুঝিয়ে দাও জীবনের প্রকৃত রূপ কী? জীবন কী চায়, জীবনের দাবি কী?

ধীরে ধীরে শীর্ণ আলোর রেখা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তমসাচ্ছন্ন মনের দিগন্তে। দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়। মনের চক্ষু সৃষ্টিকে দেখতে পায় তার স্ব-রূপে। সৃষ্টিতে প্রাণের উজ্জীবন যেমন সত্য, ধ্বংসও তেমনি অমোঘ সত্য। কাল পূর্ণ হলে ফুল শুকিয়ে যায়, ঝরে পড়ে। প্রবল ঝঞ্ঝায় বনস্পতি ধুলোয় লোটায়। সৌন্দর্যে সুষমায় বিকশিত হাস্যোজ্জ্বল প্রকৃতি একদিন ম্লান হয়ে যায়। দিকে দিকে প্রকৃতির শূন্যতা, রিক্ততা, রুক্ষতা।

আবার একদিন হঠাৎ-হাওয়ার আলোড়নে প্রকৃতির বুকে জাগে নবীন প্রাণের স্পন্দন। নবাঙ্কুরের সবুজ সৌন্দর্যে প্রকৃতি হেসে ওঠে। চারিদিকে নতুনের সমারোহ, অন্তহীন প্রাণ-তরঙ্গ। প্রাণের এ নতুন সজ্জা শুধু প্রকৃতি-জগতে নয়, জীব-জগতেও। সুকুমার তনু একদিন জীর্ণ হয়, তারপর মৃত্যু এসে সে দেহের বিলুপ্তি ঘটায়। যে মুহূর্তে মৃত্যু এসে একটি গৃহের সকল বন্ধন ছিন্ন ক'রে দিয়ে যায় সে মুহূর্তে আর একটি গৃহে জেগে ওঠে নবীন জীবন—নতুন আশা নিয়ে, ভাষা নিয়ে, ভালোবাসা নিয়ে:

'জীবনেরে কে রাখিতে পারে
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।'

সৃষ্টি চলছে বিলয়ের দিকে, নতুনের গতি পুরাতনের দিকে, আবার আবর্তন—এই নিরবচ্ছিন্ন গতিই তাহলে সৃষ্টির ধর্ম, জীবন ও

প্রাণের রহস্য। এ রহস্য স্বয়ংপ্রকাশিত জীব-জগতে, প্রকৃতি-জগতে। সভ্যতার আদিযুগ থেকে দর্শনে, ধর্মে, তত্ত্বগ্রন্থে, সাহিত্যে এ সত্যকে রূপ দেওয়া হয়েছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। নানা তর্কে, নানা সিদ্ধান্তে সে একই সত্যের প্রকাশ। স্নেহজগৎ থেকে ছিন্নমূল বেদনাহত মানুষ সে তত্ত্বালোচনা শুনে হয়ত বা কিছু সান্ত্বনা পায়।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়। জীর্ণের ধ্বংস অবধারিত—কি প্রকৃতি-জগতে, কি জীব-জগতে। এ নিয়ে মানুষের অত নালিশ নেই, অন্তরবিদারী হাহাকার নেই—যেহেতু সজ্ঞানে সে দেখতে পায় 'মৃত্যু অহরহ জীবনকে নবীন করছে।' কিন্তু স্বভাব-দুর্বল মানুষের ভীরু হৃদয় সান্ত্বনাহীন বেদনায় আর্তনাদ ক'রে ওঠে যখন সে হঠাৎ দেখতে পায় সদ্যবিকশিত ফুলের মতো তার সুন্দর শিশুটি একদিন মৃত্যুর নির্মম আঘাতে বিবর্ণ হয়ে গেছে, কোন নিষ্ঠুর দৈত্য এসে মূলসহ তাঁর স্নেহের বৃন্তটিকে উৎপাটিত করেছে। নিয়তির এ নিষ্ঠুরতায় মানুষ বিমূঢ় হয়। সযত্নরচিত উদ্যানের সব চাইতে সুন্দর ফুলটি যদি কেউ অজান্তে ছিঁড়ে নেয়, উদ্যান-কর্তার যে বেদনা, এ যাতনা ঠিক তেমনি। এ যন্ত্রণার শেষ নেই। যতদিন সে বেঁচে থাকে তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি তার অন্তরে জ্বলতে থাকে। এ আগুন আগ্নেয়গিরির অন্তঃ-প্রবাহিত লাভাস্রোত। আকস্মিকভাবে কখনও উদ্গীর্ণ হয়, যখন হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থান করে তখন দেখা যায় না। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, হিতৈষীরা সান্ত্বনা দেন, ভগবান দিয়েছেন, ভগবান নিয়েছেন। ক্রন্দন বৃথা!

"বৃথা এ ক্রন্দন!" অব্যর্থ সত্য। হাস্যে, কলরবে, অর্থহীন বাক্যতরঙ্গে যে একদিন গৃহ-খানিকে মুখরিত ক'রে রেখেছিল, সে আর কোনদিন ফিরবে না। ফেরাবার চেষ্টা বৃথা। সুখ যায়, আনন্দ যায়, জীবনের সহস্র দীপ এক-সঙ্গে নিভে যায়। শুধু থাকে স্মৃতি। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সে অনুভব করে একটিমাত্র নির্মম সত্য—'স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি, ভারমুক্ত সে এখানে নাই।'

হুমড়িখাওয়া জীবনে সকল চেতনা সাময়িক-ভাবে বিবশ হয়ে যায়। তবু মানুষ একেবারে ফুরিয়ে যায় না। জীবনের তাড়নায় সে আবার উঠে দাঁড়ায়। 'যে মাটিতে পড়ে লোকে উঠে তাই ধরে।' হয়ত বা এটাই জীবনের ধর্ম। সচেতন সুস্থ সবল দেহমন নিয়ে বাঁচতে পারো না পারো, চলতে তোমাকে হবেই। জগৎ তোমাকে থামতে দেবে না। পরিবার, সমাজ, ধর্ম, বিশ্বমানব—সকলেরই দাবি আছে—তোমার জীবনের ওপর। আনন্দ না থাক, কর্তব্যের দাবি তুমি উপেক্ষা করতে পারো না। সুতরাং চলো, চলো। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় চলাটাই জীবনের ধর্ম। তোমার ব্যক্তিগত আনন্দ অন্তর্হিত হয়েছে, কিন্তু বিশ্বের আনন্দ-যজ্ঞে তোমার আমন্ত্রণ অবারিত। তোমার বিরামহীন কর্ম দিয়ে, ক্লান্তিহীন সাধনার সাহায্যে সে যজ্ঞকে সার্থক ক'রে তুলতে হবে। যে আন্তরিক প্রয়াসে একটি শিশুমুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে তুমি চেষ্টা করতে, আরো শক্তি প্রয়োগ ক'রে দেখো, সে হাসি মুকুলিত হয়েছে তোমার পরিবেশের অগণিত শিশুমুখে।

এভাবে জীবনের তাড়না এসে পড়ে মানুষের পোড়-খাওয়া জীবনে। সে তাড়নায় মানুষ ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিসত্তা অতিক্রম করে। মৃত্যুর আঘাতে তার অন্তরে জেগে ওঠে সমষ্টিচেতনা। এ ধরনের চেতনা মানুষের স্বভাবদুর্বল মনকে সবল করে, সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে নিয়ে মনকে করে সম্প্রসারিত। ফলে মানুষের সমাজ হয় চলিষ্ণু, ধর্মচেতনায় আসে উদারতা, বিশ্ব-

মৈত্রীর পথ হয় প্রশস্ত। জীবন-যন্ত্রণার অকৃত্রিম অনুভবই শেষ পর্যন্ত মানুষের জীবনে এনে দেয় পরম অমৃত। কোন লোভ বা লাভের আকাঙ্ক্ষা নয়, অহেতুক মানব-প্রীতিই তখন মানুষের মনকে আকর্ষণ করে বৃহত্তর চেতনার জগতে। জীবনের প্রকৃত ধর্ম এই, প্রকৃত সার্থকতা এখানে।

কিন্তু এ আদর্শজগতে উত্তরণ যেমন মানব-জীবনে সত্য, তেমনি বিগত প্রিয়জনের স্মৃতি-গুঞ্জরণ নিয়ে মনের দুর্বলতাও কম সত্য নয়। জীবনের পরম আনন্দের মুহূর্তেও প্রিয়জনের স্মৃতি মানুষের মনকে ক্ষণেকের জন্য আনমনা ক'রে দেয়। এটাও জীবনের ধর্ম, দুর্মর রহস্য। এ প্রহেলিকা থেকে কী মুক্তি নেই? অনুভূতি-শীল কবি বলেন, যে স্মৃতি একদিন তোমার অন্তরলগ্ন ছিল, সে স্মৃতি আজ বিশ্বপ্রকৃতিতে প্রসারিত হয়েছে। তাই তো বিশ্বপ্রকৃতি এত শ্যামল-সুন্দর।

'আজি তাই শ্যামলে শ্যামল তুমি
নীলিমায় নীল,
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।'

এ অনুভূতি তো একান্তভাবে প্রকৃতি-তন্ময় কবির। স্মৃতি-পীড়িত সাধারণ মানুষ কি বিশ্ব-প্রকৃতির শ্যামল শোভায় চিরতরে হারিয়ে-যাওয়া তার প্রিয়জনের অস্তিত্বকে খুঁজে পাবে? হাস্যোজ্জ্বল প্রকৃতি কি তার ক্রন্দন-বিক্ষুব্ধ আত্মার ওপর শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিতে পারবে? পারবে কি দিতে তাকে হৃদয়ভার-মুক্তির কোন ইঙ্গিত?

কে দেবে সাধারণ মানুষের এ ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তর?

পাওয়া-হারানোর পারে বা সব-পাওয়ার রাজ্যে, দেহমনবুদ্ধির সীমার পারে বা সব-হওয়ার রাজ্যে নিজের অনুভূতিকে নিয়ে যেতে পারে যদি কেউ, তাহলে হয়ত মুক্ত হ'তে পারে সে এ ভার হ'তে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী নির্বেদানন্দ

[স্বপ্নসহায়ে নরেন্দ্রনাথ জানতে পারলেন যে, গার্হস্থ্য জীবন যাপন করার জন্য তিনি পৃথিবীতে আসেন নাই।]

গৃহত্যাগে কৃতসংকল্প হ'লেন তিনি; যেদিন বাড়ী ছেড়ে চলে যাবেন ব'লে সংকল্প করলেন, কলকাতায় এক ভক্তগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটল। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ ইচ্ছায় নরেন্দ্রনাথকে সেদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে রাত্রিবাস করতে হ'ল। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের মনের কথা সব জানতে পেরেছিলেন; কোন বই খুললে তার পাতায় কি লেখা আছে তা যেমন আমরা পড়ে দেখতে পারি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঠিক তেমনি ভাবেই অপরের মনের কথা জানতে পারতেন। নরেন্দ্রনাথকে তিনি বললেন, 'আমি যতদিন আছি, তুমি সংসারে থাক।' গুরুর কথায় নরেন্দ্রনাথের চোখে জল এসে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছামত পূর্বসংকল্প পরিত্যাগ ক'রে বাড়ী ফিরে গিয়ে চাকরির জন্য আবার তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কয়েকটি অস্থায়ী কাজ তাঁর জুটেছিল, কিন্তু পরিবারবর্গ

নির্ভর ক'রে থাকতে পারে, এখন কোন স্থায়ী কাজ তিনি জোগাড় করতে পারলেন না। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশমত একদিন বাড়ীর আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি পর পর তিনবার মা-কালীর কাছে প্রার্থনা করতে গেলেন। কিন্তু প্রতিবারেই মন্দিরে মার সম্মুখে যাওয়া মাত্র মায়ের জীবন্ত প্রকাশ প্রত্যক্ষ ক'রে বাড়ীর দুঃখকষ্ট জানাবার কথা ভুলে গিয়ে ভাবে, ভক্তিতে গদ্‌গদ হয়ে মার কাছে জ্ঞান-ভক্তি, বিবেক-বৈরাগ্যই প্রার্থনা করলেন; পরে শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্য তাঁকে আশ্বাস দেন যে, ভগবৎ-কৃপায় তাঁর মা ও ভাইদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব কখনো হবে না।

এই দিন থেকে নরেন্দ্রনাথ একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গেলেন, কার্যতঃ নতুন পথে চলতে শুরু করলেন তিনি। নাস্তিক্যভাবের প্রতি-ক্রিয়াগুলির চিহ্নমাত্র আর রইল না, মনের অতি গভীর প্রদেশে সঞ্জাত বিশ্বাসের রঙে ও প্রভাবে তাঁর সমস্ত চিন্তা, কথা ও কাজ রঞ্জিত ও প্রভাবান্বিত হয়ে উঠল। যেদিন তিনি মন্দিরে জগদম্বার অস্তিত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি ক'রে দিব্যভাবাবেশ, জ্ঞান ও আনন্দের আস্বাদ লাভ করেছিলেন, সেই দিন থেকে শুরু ক'রে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল— "হৃদয়ই লক্ষ্যে পৌছে দিতে পারে··· পবিত্র হৃদয়ই বুদ্ধির ওপারের খবর জানতে পারে···; হৃদয়ই দিব্যভাবে আবিষ্ট হয়; যুক্তি কখনো যার নাগাল পায় না, হৃদয় তারও খবর নিয়ে আসে···সত্যের প্রতিফলনের পক্ষে হৃদয়ই সর্বোৎকৃষ্ট দর্পণ···হৃদয় পবিত্র হয়ে যাওয়ামাত্র সেখানে সর্ববিধ সত্য প্রকাশিত হয়। আসলে আমাদের প্রয়োজন হৃদয় ও মস্তিষ্কের সমন্বয়।" বিশুদ্ধ যুক্তির পরম অনুগত পুজারী এরূপে পবিত্র-হৃদয়-সম্ভূত আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞার সঠিক মূল্য ও তাৎপর্য নির্ণয় ক'রে ফেললেন; একমাত্র এই স্বজ্ঞাই অদেখা সত্যের দ্বার খুলে দিতে পারে। বিশ্বাসের কাছে তাঁর যুক্তি আত্মসমর্পণ করল। তাঁর শুদ্ধ হৃদয়ের একজন অনুগত ও বিশ্বস্ত মিত্র হয়ে দাঁড়াল তাঁর অমিতপ্রভাব বুদ্ধিবৃত্তি। হৃদয় ও বুদ্ধির এই মিত্রতাই বিবেকানন্দকে বিবেকানন্দরূপে গড়ে তোলে।

এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করতে সর্বতোভাবে সহায়তা করে। তিনি যা চান তা আত্মাত্মিক স্বজ্ঞা সহায়ে নিশ্চিত লাভ করা যায় বুঝে, আর এই স্বজ্ঞা শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পূর্ণ করায়ত্ত জেনে, যে দৃঢ়মুষ্টিতে তিনি গর্বোন্নত বুদ্ধিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, তা শিথিল ক'রে দিতে লাগলেন; প্রেমাস্পদ শ্রীরামকৃষ্ণের সস্নেহ নির্দেশাধীন থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বার পরিপূর্ণরূপে উন্মুক্ত করার জন্য আত্মনিয়োগ করলেন অধ্যবসায় ও দৃঢ় সঙ্কল্প সহকারে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা পরীক্ষা ক'রে গ্রহণ করার দিন ফুরিয়ে গেল; শুদ্ধ হৃদয়ের স্বতঃ-উদ্ভাসিত ভাব প্রকাশের মুখে এখন আর 'চেক-ভাল্‌ব' বসিয়ে রাখাটা অনাবশ্যক ও হাস্যকর ব্যাপার ব'লে মনে হ'ল তাঁর। তাঁর হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে অধ্যাত্মিকতারূপ পয়োধারার বহিরাগমনের উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের খননকার্য চালিয়ে যাবার কাজে সানন্দে সোৎসাহে তিনি সম্মতি দিলেন। ইতিমধ্যেই অনেকখানি গভীরতায় তা পৌঁছে-ছিল, এবং নিম্নের বারিধারার কিঞ্চিৎ পূর্বাস্বাদও তিনি লাভ করেছিলেন। মর্মন্তুদ দারিদ্র্য ও স্বজন-প্রতিবেশীদের হৃদয়হীনতা তাঁকে চিরদিনের জন্য পিষ্ট ক'রে ফেলতে পারল না, পরিশেষে নিজেরই অজ্ঞাতসারে তাঁকে নিয়ে এসে হাজির করল আধ্যাত্মিক অনুভূতির রাজ্যে। তাঁর হৃদয় ভরে উঠলো, দারিদ্র্যের এবং প্রতিবেশীদের

হৃদয়হীনতার বেদনা প্রশমিত হ'ল; তাঁর বিষোদ্গীরণ রূপায়িত হ'ল জগতের দরিদ্র নির্যাতিত জনগণের প্রতি আকুল উচ্ছ্বসিত করুণা ও সহানুভূতিরূপ অমৃতক্ষরণে। নিদারুণ দুঃখকষ্টের আঘাতের সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁর হৃদয়ে মানবসেবাব্রতরূপ স্রোতস্বিনীর খাত আগেই কাটা হয়ে গিয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শিবজ্ঞানে দুর্গতজনগণের সেবা করার মর্মস্পর্শী বাণী শোনামাত্রই সেখানে দিব্যপ্রেমের খরপ্রবাহ বইতে শুরু করল আর স্বর্গাভিমুখে ছুটে চললো দুঃখজর্জরিত কৃপাপাত্র মানুষ থেকে শুরু ক'রে দেবভাবারূঢ় মানুষ পর্যন্ত সকলকেই অভিসিঞ্চিত ক'রে। দারিদ্র্যের সংস্পর্শের ফলে ক্রমবিস্তৃত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপ্রেরণায় আধ্যাত্মিকতায় স্নাত হৃদয়ের আবেগেই মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞান করা-রূপ তাঁর যুগান্তকারী বিশ্বাসের কথা তিনি জগতে ঘোষণা করেছিলেন—"সকলের আত্মার সমষ্টিরূপ যে ভগবান, একমাত্র সে-ভগবানেই আমি বিশ্বাসী। সর্বোপরি, আমি বিশ্বাস করি আমার দুষ্টরূপী ভগবানকে, আমার দুঃখিরূপী ভগবানকে, আমার সর্বজাতির দরিদ্ররূপী ভগবানকে।"

আমরা আগেই দেখেছি, দেহত্যাগের পূর্বে কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থানকালে নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর গুরুভাইরা কিভাবে আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। এই কালের কোন সময় এক দিব্যদর্শনের বিদ্যুচ্চমকের ফলে তাঁর মানবপ্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস শান্ত হয়ে আসে, কিছুদিনের জন্য মানুষের মাঝে ঈশ্বর-দর্শনের প্রভাও স্তিমিত হয়ে যায়, এবং নির্বিকল্প সমাধি সহায়ে জ্ঞানাতীত ভূমিতে উঠে চরম সত্যের সঙ্গে নিজের সত্তাকে একেবারে মিশিয়ে দিয়ে সে অবস্থায় চিরদিন নিমগ্ন থাকার জন্য তাঁর হৃদয়ে এক দুর্দমনীয় স্পৃহার উদয় হয়। এরূপ অবস্থালাভের জন্য তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানান; তারপর কিভাবে হঠাৎ একদিন তাঁর চেতনা সর্ববিধ সীমার পারে গিয়ে পরব্রহ্মের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল, এবং সে অবস্থা থেকে ব্যুত্থানের পর শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে তাঁর জীবনের ব্রত-উদ্‌যাপনের দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে তুলে দিয়েছিলেন তা দেখেছি আমরা। তিনি নরেন্দ্রনাথকে সজাগ ক'রে দেন যে, নিজে সমাধিভূমিতে উঠে সর্বক্ষণ ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে থাকার জন্য নরেন্দ্রনাথ আসেননি, মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে টেনে তোলার যন্ত্রস্বরূপ হয়ে মানুষের সেবা করাই তাঁর জীবনধারণের উদ্দেশ্য। নরেন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন, "গুরুদেব, সমাধিতে আমি আনন্দে ছিলাম। অসীম আনন্দের মাঝে জগৎ ভুল হয়ে গিয়েছিল। আমার আকুল প্রার্থনা,—আমায় থাকতে দিন সেই পরমানন্দে।" একথা শুনে ব্যক্তিগত আনন্দ-উপভোগ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দৃষ্টিকে এক কথায় ফিরিয়ে আনলেন পৃথিবীর সকল মানুষের দিকে, ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা থেকে বিশ্বজনীনতার দিকে; তিনি বললেন, "লজ্জা করে না তোর একথা বলতে! ভেবেছিলাম, কোথায় বহু লোকের জীবনের একটা বিশাল আশ্রয়স্থল হয়ে উঠবি, আর তা নয় তুই কিনা সাধারণ লোকের মতো নিজে আনন্দ সাগরে ডুবে থাকতে চাইছিস! ...মায়ের কৃপায় তোর জীবনে এ অনুভূতি এত সহজ হয়ে যাবে যে, সাধারণ অবস্থাতেই তুই সব কিছুর ভেতর সেই অদ্বিতীয় পরম সত্তাকে দেখতে পাবি; জগতে অনেক বড় কাজ করতে হবে তোকে—মানুষের কাছে

আধ্যাত্মিক চেতনা বয়ে এনে দিতে হবে, দরিদ্র ও দীনহীনের চোখের জল মোছাতে হবে।" শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অনুধাবন ক'রে নরেন্দ্রনাথ মানবজাতিকে আধ্যাত্মিকতা দিয়ে সেবা করার প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করলেন, এবং জ্ঞানাতীত ভূমিতে উঠে পরমাত্মার সঙ্গে নিজের একত্ব-বোধের অতি বিপুল আনন্দ-উপভোগকেও বলি প্রদান করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন এই মানবসেবাযজ্ঞের বেদীমূলে। কিন্তু অদ্বৈতানুভূতির আনন্দের আকর্ষণ এত প্রবল যে, নির্বিকল্প সমাধিতে লীন হয়ে থাকার জন্য তাঁর মনে সব সময় একটা অন্তর্মুখী গতি-প্রবণতা রয়েই গেল; গুরুর আদেশপালনার্থ মনের সে গতিকে বহির্মুখী করার জন্য প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হ'ল তাঁকে। প্রথম দিকে ভীষণ দোদুল্যমান অবস্থায় কিছু-কাল থাকার পর বাকী জীবন তাঁর মন এদুটি প্রচণ্ড আকর্ষণের মিলিত এক অদ্ভুত গতিপথ ধরে চলেছিল—তাঁর নিজের ভাষায় সে পথ হচ্ছে 'চিরপ্রশান্তির মাঝে প্রচণ্ড কর্মতৎপরতা'। আপেক্ষিক জগতের মাঝখানে থেকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-রূপ জনগণের জন্য তাঁর হৃদয় সর্বক্ষণ প্রেমে উদ্বেলিত হ'ত, আবার থেকে থেকে নিস্তরঙ্গ সরোবরের মতো স্থির হয়ে যেত; তখন জগৎ ও তদন্তর্গত সব কিছুই মুছে গিয়ে নিরাকার ব্রহ্মের জ্ঞানাতীত মহিমা প্রতিবিম্বিত হ'ত সেখানে। একদিকে মানুষের অন্তরস্থ ঈশ্বরের জন্য নিঃস্বার্থ প্রেম, অপর দিকে ভগবানের নির্গুণ সত্তার সঙ্গে একত্মানুভূতি—আধ্যাত্মিকতার এদুটি ভাবের সীমার মধ্যে তাঁর চেতনা সঞ্চরণ ক'রে বেড়াতো। গুরু তাঁকে যা আদেশ করেছিলেন, তার আধ্যাত্মিক মূল্য সম্বন্ধে নিজ অনুভূতি সহায়ে দৃঢ়বিশ্বাসী হয়েছিলেন ব'লে পরবর্তী-কালে রামকৃষ্ণ-সংঘের সন্ন্যাসীদের মূলমন্ত্র-রচনাকালে তিনি নিজের মুক্তি ও জগতের হিতসাধনরূপ দুটি আদর্শকে ('আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ') একসূত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন।

এভাবে প্রায় ছয় বৎসরকাল অধ্যবসায় সহকারে ধীর অদৃশ্য হস্তে নরেন্দ্রনাথের হৃদয়-রূপ কঠিন পাষাণ ভেদ ক'রে খননের কাজ চালাবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ অটল ভালবাসা ও সস্নেহ প্রসন্নতা সহায়ে সম্পূর্ণরূপে তা ভেদ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর গুরুর হৃদয়রূপ গগনস্পর্শী উচ্চতায় যে স্রোত এতদিন বয়ে চলেছিল, অনন্তের বুক ফুঁড়ে আধ্যাত্মিকতার সেই স্বচ্ছ, বেগবান, চিরন্তন ধারা হু হু ক'রে বেরিয়ে এল, আর নরেন্দ্রনাথ তা ধারণ ক'রে নিজ হৃদয় জুড়ে তা সঞ্চিত ক'রে রেখে দিলেন। শরীরত্যাগের প্রাক্কালে আধ্যাত্মিক শক্তির যে-প্রবাহ শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন, বোধ হয় তা পূর্বোক্ত ধারার সঙ্গে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে এই আধ্যাত্মিকতাই উদ্বেল হয়ে উঠে শিষ্যের হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে বাইরে এসে চতুর্দিকে প্রবাহিত হয়েছিল, সঞ্জীবনী ধারায় নীরস ধরণীকে অভিসিঞ্চিত ক'রে তার সাংস্কৃতিক সঙ্কীর্ণতা, বিরোধের উন্মত্ততা এবং অবিশ্বাসের মারাত্মক ব্যাধিগুলির কবল থেকে তাকে মুক্ত ক'রে দিতে।

সমালোচনা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমাঃ অক্ষয়কুমার সেন; **উদ্বোধন** কার্যালয়, কলিকাতা ৩; দ্বিতীয় **প্রকাশ**, ১৩৭৪, পৃঃ ১৩২+৬; মূল্য দুই টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যের অনুরাগীমাত্রেই ভক্তপ্রবর অক্ষয়কুমার সেনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি' প্রাচীন পাঁচালীজাতীয় ভঙ্গিমায় লেখা বলেই গণসাহিত্য হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের তথ্যরাজির দিক থেকে এই পুঁথি অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ। 'শাঁকচুন্নি মাষ্টারের' এই পুঁথিকে সবচেয়ে বড়ো অভিনন্দন জানিয়েছিলেন স্বামীজী স্বয়ং।

সর্বসাধারণের উপযোগী সরল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণলীলাকাহিনীবর্ণনার পাশাপাশি তাঁর আর একটি গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা' সাতান্ন বছর আগে ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই দীর্ঘকাল বইটির কথা পাঠকসমাজ প্রায়-অবিদিত ছিল। 'উদ্বোধন'-কর্তৃপক্ষের সহায়তায় এই অমূল্য গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত। নানা দিক থেকে এ বইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুঁথির সরল তত্ত্বভারমুক্ত স্বচ্ছ ভঙ্গী এখানে অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত। ভক্ত ও জিজ্ঞাসুর কথোপকথনের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের মূল বক্তব্য নিজস্ব দৃষ্টির আলোকে ফুটিয়ে তোলাই লেখকের উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, 'ভক্ত' স্বয়ং অক্ষয়কুমার প্রধানতঃ লীলাবাদী। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা ও বাণীর বিশ্লেষণে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তস্থাপনের এমন এক অনায়াস-নৈপুণ্য এ রচনায় পাওয়া যায়, যার দ্বারা অক্ষয়কুমারের মননশক্তির গভীরতায় মুগ্ধ ও বিস্মিত হ'তে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য বা অন্যান্য অবতার-পুরুষদের জীবনীচর্চায় অনেকসময়ই তাঁদের জীবনের ঘটনাবলীর মহত্ত্ব ও অলৌকিকতাই প্রাধান্য পায়। তার ফলে, আধুনিক কালের ঔপন্যাসিক প্রবণতা এজাতীয় মহাজীবনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের প্রতি মনোযোগী হ'তে চায় না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, বাণী ও সাধনার মর্মপ্রকাশের এই প্রয়াস, বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ পরিকরদেরই অন্যতম একজনের এই মনন-সাধনা এযুগের পাঠকদেরও পরম আনন্দ ও তৃপ্তির সন্ধান দেবে।

পাঠকসমাজের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য দু-চারটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক: "আমার শাস্ত্র—রামকৃষ্ণদেব; আমার জ্ঞান—রামকৃষ্ণদেব। শাস্ত্র দেখার মধ্যে রামকৃষ্ণদেবকে দেখা। আমি যা বলছি—যা তিনি দেখাচ্ছেন তাই বলছি। আমি কারও জায়গায় রামকৃষ্ণদেবকে বসাইনি। আমি রামকৃষ্ণদেবের জায়গায় রামকৃষ্ণদেবকেই বসাচ্ছি।" পৃঃ ২৮

"'অবতারবিশেষে রূপবিশেষ হয়। রাম-অবতারে রামরূপ, কৃষ্ণ-অবতারে কৃষ্ণরূপ, এবার রামকৃষ্ণ-অবতারে রামকৃষ্ণরূপ। সব অবতারে সমান বেশ হয় না ও সমান কাজও হয় না। অবতার দুই রকম। এক অবতার ভূভার-হরণের জন্য, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, আর দুষ্টদমনের জন্য। আর এক অবতার—তাঁকে আদর্শাবতার বলে। এই অবতারের কার্য—ধর্মসংস্থাপন করা, জীবকে শিক্ষা দেওয়া আর পতিতের উদ্ধার করা। আদর্শাবতারে ঐশ্বর্য ব্যক্ত থেকেও থাকে না, বেশভূষার আড়ম্বর

থেকেও থাকে না, থাকে কেবল মাধুর্য। আদর্শা-বতার নিরৈশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান ও অরূপে রূপবান।" পৃঃ—৩১-৩২

"'আমি'টি মরে গেলেই মানুষ মুক্ত হয়। ভগবান রামকৃষ্ণের কথা—'মুক্ত হব কবে, আমি যাবে যবে।' বদ্ধ ও মুক্ত—এ দুটি অবস্থা কে জানিয়ে দেয় জান? মন। মন যদি তোমাকে বুঝিয়ে দেয় তুমি বদ্ধ, তা হ'লে তুমি বদ্ধ; আর মন যখন মুক্ত ব'লে জানিয়ে দেয় তখন তুমি মুক্ত।·· মন যতদিন বদ্ধ থাকে, ততদিন সর্বদাই সংশয়যুক্ত। এ অবস্থায় মনের নাম সংশয়, আর মুক্তাবস্থায় মনের নাম চৈতন্য। ·· ভগবান্ মন-বুদ্ধির অগোচর হয়েও মন-বুদ্ধির গোচর, এর অর্থ—তিনি মনের সংশয়যুক্ত অবস্থার অগোচর, আর শুদ্ধ-মন শুদ্ধ-বুদ্ধির বা চৈতন্যাবস্থার গোচর।" পৃঃ ৭২

"যে ঠাকুর ত্যাগীর শিরোমণি—যাঁর ত্যাগ কায়বাক্যমনে একতানে বাঁধা, কামিনীকাঞ্চন-স্পর্শে যাঁর অঙ্গ-বিকার হ'ত, যিনি পার্থিব কোন বস্তুর প্রার্থী নন, সুতরাং যাঁর কোন বস্তুরই অভাব ছিল না,·· যাঁর সর্বদা মা-কালীর সঙ্গে কথা হ'ত, যিনি মনে করলেই তৎক্ষণাৎ তাঁয় তন্ময় হ'তেন, তাঁর লোকের দুয়ারে দীন ভিখারীর মতো সশঙ্কচিত্তে যাবার প্রয়োজন কি? এর কারণ যদি জানতে চাও, তাহলে আকাশপানে ঐ মেঘগুলিকে চেয়ে দেখ। এই বর্ষাকাল, মেঘগুলিকে ডাকতে হয় না, আপনি ব্যাকুল হয়ে চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে; কেন জান?—জল দিয়ে উত্তপ্ত ধরণীকে তাপ থেকে রক্ষা করার জন্য—শুধু ধরণীকে শীতল করা নয়, আবার তাকে শস্যশালিনী করবার জন্য। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবেরও এই মেঘের দশা—অপার করুণাসিন্ধু দয়াবতার—মেঘ যেমন জলভারে চঞ্চল, ঠাকুরও তেমনি করুণার ভরে চঞ্চল। ব্যাকুল প্রাণে দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে দুয়ারে দুয়ারে এখানে সেখানে ঘুরছেন—একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বরতত্ত্বরূপ শীতল শান্তিদানে ত্রিতাপ-সন্তাপ থেকে জীবকুলকে রক্ষা করা।" পৃঃ ১২০

উদ্ধৃতিনিচয় থেকে অক্ষয়কুমারের মনন-শীলতার একটি দিক স্পষ্ট তাঁর ভক্তিই তাঁর যুক্তি। অথচ সে যুক্তি বুদ্ধির স্তরপরম্পরাকে স্বীকার ক'রেই অগ্রসর এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপম প্রাঞ্জলতার অনুসরণে সহজ চলতি ভাষায় মহত্তম চিন্তাধারার সার্থক প্রকাশক। যাঁরা ভক্ত, সাধক—তাঁদের কাছে তো এ গ্রন্থের সমাদর হবেই, আবার যারা দার্শনিক বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণ-চিন্তাধারার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে চান, তাঁদেরও দিঙ্‌নির্দেশরূপে এ গ্রন্থ বহুমূল্য।

পরবর্তী সংস্করণে বিষয়সূচী অনুসারে 'মূল গ্রন্থটি'কে ভাগ ক'রে প্রতিটি বিষয়ের শিরোনামা স্বক্ষেত্রে স্থাপন করলে পাঠকদের আনুকূল্য হবে। তাছাড়া, প্রচ্ছদপটেই লেখকের নামটি থাকলে আগ্রহী পাঠকদের পক্ষে সুবিধা হয়। শোভন পরিচ্ছন্ন মুদ্রণে ও সঙ্গত মূল্য-নির্ধারণে প্রকাশনার সুরুচিবোধ প্রশংসনীয়। আশাকরি শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যের এই পুনরাবিষ্কৃত রত্নটি দেশময় যোগ্য সমাদর লাভ করবে।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় গুরুকুল-প্রথায় পরিচালিত এই বিদ্যার্থী আশ্রমে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণ সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে থাকিয়া বিভিন্ন কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা-লাভের সুযোগ পায়। আংশিক বা পূর্ণ ব্যয়বহনকারী নৈতিক-শিক্ষাগ্রহণেচ্ছু কিছুসংখ্যক ছাত্রও এখানে থাকে।

আহার-বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পুস্তকাদি—ছাত্রদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাত্রেরা এখানে পাইয়া থাকে। প্রাচীন গুরুকুল-প্রথার সহিত আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সমন্বয়ের আদর্শে গঠিত এই শিক্ষায়তনে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রগণের চরিত্রগঠনেরও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা, পূজা, গৃহাদি পরিষ্কার, রোগিসেবা প্রভৃতি কর্মগুলিও বিদ্যার্থীরা শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে নিজেরাই করিয়া থাকে; স্থানীয় জনসেবার অঙ্গ হিসাবে তাহারা একটি নৈশবিদ্যালয় পরিচালনা করে।

আলোচ্য বর্ষশেষে মোট ৯৬ জন আশ্রমিকের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে ছিল ৬৪ জন; ১৬ জন আংশিক এবং ১৬ জন পূর্ণ ব্যয় বহন করিয়াছে।

বিদ্যার্থী আশ্রমের সকল শ্রেণীর বিদ্যার্থী-দের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩ জন স্নাতকোত্তর পরীক্ষার্থীর মধ্যে সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে, একজন ফার্স্ট ক্লাস ও ২ জন সেকেণ্ড ক্লাস পাইয়াছে। ডিগ্রী-পরীক্ষার্থীদের ৭ জন ফার্স্ট ক্লাস ও ১৫ জন সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স লাভ করিয়াছে।

গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ে ৩,৫০০ খানি সুনির্বাচিত গ্রন্থ আছে। ১৮টি সাময়িক পত্রিকা এবং ৬টি দৈনিক সংবাদপত্র রাখা হয়। লাইব্রেরীর 'টেক্সট-বুক সেকশন'-এ ২,৫২৮ খানি পাঠ্যপুস্তক আছে, তন্মধ্যে ১,৬১১ খানি বই লইয়া আশ্রমের বিদ্যার্থীরা পড়াশুনা করিয়াছে।

আশ্রমে শ্রীশ্রীকালীপূজা, শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় ও ২৪শে ডিসেম্বর স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্মৃতি-উৎসব পালিত হয়। শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব, স্বামীজী প্রভৃতির এবং বুদ্ধ ও খৃষ্ট প্রভৃতির জন্মতিথি পালিত হয়। স্বাধীনতা-দিবস, প্রজাতন্ত্র-দিবস প্রভৃতিও যথোপযুক্ত মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

বিদ্যার্থী আশ্রমের আর একটি কর্মবিভাগ 'রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ'। সরকার-অনুমোদিত এই পলিটেকনিকে সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ তিন বৎসরের ডিপ্লোমা-কোর্সে শিক্ষাদান-কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। বর্তমান বৎসরে শিল্প-পীঠের ছাত্রসংখ্যা ৭২০। ছাত্রদের মধ্যে ২৭০ জন সিভিল, ৩৬০ জন মেকানিক্যাল, ৯০ জন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা করে।

সালেম রামকৃষ্ণ মিশন (রামকৃষ্ণ রোড, সালেম ৭, মাদ্রাজ) আশ্রমের ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে একটি সুপরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়

আছে; আলোচ্য বর্ষে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ৩৩,৬০৬, তন্মধ্যে নূতন ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ১৭,২৭৫ এবং ১৬,৩৩১। আশ্রমের গ্রন্থাগারে ইংরেজী, তামিল, তেলুগু, মালয়লম, কানাড়া এবং হিন্দী ভাষার সুনির্বাচিত পুস্তকাবলী রাখা হইয়াছে। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ১,২৭৫।

আশ্রমে দৈনন্দিন পূজা ও ভজনাদি এবং সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যান্য পুণ্য জন্মতিথিও যথারীতি উদ্‌যাপন করা হইয়াছে। দরিদ্র ও পুষ্টির অভাবজনিত রুগ্ণ বালক-বালিকাগণকে গো-দুগ্ধ বিতরণ করা হয়।

জামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রাঙ্গণে গত ১লা মার্চ, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ১৩৩তম শুভ আবির্ভাব-দিবস যথাবিহিত সমারোহে প্রতিপালিত হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে উক্ত দিবস সন্ধ্যায় সুধাকণ্ঠ শ্রীপ্রভাতকুমার ঘোষ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি পরিবেশিত হয়। ২রা মার্চ সন্ধ্যায় জনসভা আহূত হয়। টাটা ইস্পাত কারখানার অধিকর্তা শ্রী পি. অনন্ত সভাপতিত্ব করেন এবং স্বামী চিদাত্মানন্দ মহারাজ হিন্দীতে, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী বাংলা ভাষায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী-অবলম্বনে চিত্তাকর্ষক ও সুচিন্তিত ভাষণ পরিবেশন করেন। বীরভক্ত গিরিশ ঘোষের সহিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ-গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন শ্রীপ্রভাত ঘোষ। টাটা কারখানার ইঞ্জিনীয়ার শ্রীসন্তোষ কর সোসাইটির পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

উত্তর ক্যালিফর্নিয়া: স্যানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি: অধ্যক্ষ—স্বামী অশোকানন্দ; সহকারী—স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। নূতন মন্দিরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল:

জুন, ১৯৬৭: অবিচ্ছিন্ন ধ্যান; হিন্দুধর্মের তাৎপর্য, কেন আমরা বুদ্ধদেবের উপাসনা করি; ঈশ্বরের জন্য সফল অনুসন্ধান, চিন্তা, আদর্শ ও শক্তি; নিজেকে জানো এবং দুঃখের অবসান ঘটাও; বাস্তবতার অভ্যাস; প্রেম ও মুক্তি।

সেপ্টেম্বর, '৬৭: ঈশ্বর-সান্নিধ্যে; ধর্ম-সমন্বয়ের আচার্য শ্রীকৃষ্ণ, অদ্বৈতমতে ঈশ্বর, মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা; গুরু ও শিষ্য; ধর্মীয় চেতনা।

অক্টোবর, '৬৭: মৃত্যুর পূর্বেই যাহা করা কর্তব্য; মনকে কিভাবে সংযত করা যায়; ভগবানলাভের পর জীবনে আনন্দানুভূতি; মাতৃরূপে ঈশ্বর; সাধকের দিনচর্যা; ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ; ভারতে ও পাশ্চাত্যে ধর্মের ভবিষ্যৎ; প্রেয় ও শ্রেয়ের পথ; কিভাবে সমতাপূর্ণ ও সুখী মন লাভ করা যায়।

নভেম্বর, '৬৭: আমাদের ব্যক্তিত্বের গভীরতর তলদেশ; প্রজ্ঞার চারটি স্তম্ভ; আসক্তি ও অনাসক্তি; আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষণ, জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বালিত করা; কর্মশীল ও ধ্যানপ্রবণ জীবনকে সমন্বিত করিবার উপায়; ভারতের মহাপুরুষগণ; ঈশ্বরাস্তিত্ব-বোধের অভ্যাস; ধর্মের প্রকৃত দর্শন।

ডিসেম্বর, '৬৭: বহু যখন একত্বে পর্যবসিত হয়; দুঃখে আধ্যাত্মিক শিক্ষা; ভাব, আদর্শ ও শক্তি; আত্মার সম্পদ; পুনর্জন্ম ও ইহাতে

মনের ভূমিকা; অদৃশ্য ঈশ্বরের অনুসন্ধানে; খৃষ্টের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের প্রকাশ।

জানুআরি, ১৯৬৮: আধ্যাত্মিক জীবন-যাপনে প্রকৃত সংকল্প; অহমিকার জন্ম ও মৃত্যু; ছায়া হইতে সত্যে; মানুষের চরম লক্ষ্যে অভিযান, ভাবাবেগ সুসংহত করা; ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে আধুনিক মানুষের বিভ্রম; স্বামী বিবেকানন্দের উপাসনা; স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী; ধ্যানপ্রবণ জীবন।

পুরাতন মন্দিরে 'অবধূত-গীতা' আলোচিত হয়।

উত্তর ক্যালিফর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটি: স্যাক্রামেণ্টো কেন্দ্র: অধ্যক্ষ—স্বামী অশোকানন্দ, সহকারী—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। বিভিন্ন আলোচিত বিষয়:

জুলাই, ১৯৬৭: মুক্তি সম্বন্ধে বেদান্তের বাণী; ভারতীয় মহাপুরুষগণ, ধর্মসমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী।

সেপ্টেম্বর, '৬৭: ঈশ্বরের জন্য সার্থক অনুসন্ধান; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা; যোগাভ্যাসে জীবনের সমতা।

অক্টোবর, '৬৭: মানুষের সেবায় ঈশ্বর-সেবা; মাতৃভাবে ঈশ্বরের আরাধনা; ভাবাবেগকে ঠিকভাবে পরিচালিত করা; অন্তর্মুখতার অভ্যাস; মৃত্যুরহস্য।

নভেম্বর, '৬৭: আন্তর সাম্য; ধর্মের শক্তিরূপে বেদান্ত; মনকে বর্মভূষিত করা; ধর্মের সুপ্রতিষ্ঠিত দর্শন; প্রেয়ের পথ ও কল্যাণের পথ; জীবনগঠনে যোগমার্গ।

ডিসেম্বর, '৬৭: শান্তির সন্ধানে; বেদান্ত খৃষ্টকে নমস্কার করে।

সেবাকার্য

মহারাষ্ট্র: গত ফেব্রুআরি, ১৯৬৮ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মহারাষ্ট্রের কয়না এবং সাতারায় ভূমিকম্পবিধ্বস্ত জনগণের সেবাকার্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ বিতরিত হইয়াছে:

গম ৩,২৬৯ কুইণ্টাল ৪৯ কেজি, বিস্কুট ৪৯ টিন, মাল্টি-ভিটামিন ট্যাবলেট ৭৪,০০০টি, পুরাতন বস্ত্রাদি ১৬৬ খানি, কম্বল ৫৪ খানি, বাসনপত্র ৩০ সেট, লণ্ঠন ২২টি, পুলোভার ১৭টি, খাদ্যে ব্যবহার্য তৈল ২ টিন, মসলা ৭৫ কেজি, খালি টিন ৪৯টি।

ওড়িশা: গত ফেব্রুআরি (১৯৬৮) মাসে ওড়িশায় কটক জেলার পট্টমুণ্ডাই সেবা-কেন্দ্র হইতে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ৯টি গ্রামে বাত্যাবিপর্যস্ত জনগণের সেবাকার্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ বিতরণ করা হইয়াছে:

চাল ২,১১০ কেজি, চিড়া ১০০ কেজি, ধুতি ৫৭ খানি, শাড়ী ২০ খানি, শিশুদের পোশাক ১৪৯টি, তুলার কম্বল ৩০ খানি। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৮৯৫।

২৫,১৩৬টি শিশুকে ৩৭৫ কেজি গুঁড়া দুধ এবং ২৫,১৩৬টি মাল্টি-ভিটামিন ট্যাবলেট দেওয়া হইয়াছে। দুইটি গ্রামে পানীয় জলের জন্য দুইটি নলকূপ বসানো হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা

গত ১১ই মার্চ, ১৯৬৮ বৃন্দাবন শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

দিল্লী ঃ সরোজিনীনগর ও দক্ষিণ দিল্লীর সংলগ্ন অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে ২৫শে ফেব্রুআরি ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত ও তামিল ভাষায় আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রায় ৫০০ ছাত্রছাত্রী যোগদান করিয়াছিল। ৭৯ জন ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কার দেওয়া হয়। ৯ই মার্চ সন্ধ্যায় ভারত সেবক সমাজ প্রাঙ্গণে স্বামী স্বাহানন্দজীর সভাপতিত্বে এক সভা হয়। শ্রীঅমর নন্দী বাংলা ভাষায়, শ্রীমনোহরলাল সন্ধি হিন্দীতে, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর বিষয়ে সারগর্ভ ভাষণ দেন। সভাপতি ভাষণান্তে পুরস্কার বিতরণ করেন। সভায় সহস্রাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল।

আমেদাবাদ রামকৃষ্ণ সেবাসমিতি গত ১লা মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করিয়াছেন। ভজন, কীর্তন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। বিকাল ৫টায় রাজ্যমন্ত্রী (গুজরাট) শ্রীবাবুভাই জে. প্যাটেলের সভাপতিত্বে স্থানীয় 'স্বামী অখণ্ডানন্দ হল'-এ আহূত সভায় অধ্যক্ষ যশোবন্ত ভাই শুক্লা, অধ্যক্ষ এস আর. ভট্ট এবং অধ্যাপক অলক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

সকালে রামকৃষ্ণ আশ্রমে (মণিনগর) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

আরারিয়া রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৬ই হইতে ১০ই মার্চ পর্যন্ত পাঁচদিন ধরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ১০ই মার্চ স্বামী অনুপমানন্দজীর সভাপতিত্বে আহূত ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। উৎসবের কয়েক দিন প্রায় দুই হাজার ভক্তকে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আশ্রমের দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় হইতে গত বৎসর ৩৬,৯৮৫ জনকে ঔষধ বিতরণ করা হইয়াছে। আশ্রমের লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ৯১৮।

হুগলী ঃ হুগলী জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সংঘের উদ্যোগে প্রতিবারের ন্যায় এবারও সংঘের রথতলাস্থিত বিবেকানন্দ ভবনে গত ১লা মার্চ হইতে ১০ই মার্চ দশদিনব্যাপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি-উৎসব বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহে অনুষ্ঠিত হয়। পূজাপাঠাদি, আলোকচিত্র-প্রদর্শন, রামায়ণগান, বিবেকানন্দ শিশুশিক্ষা ভবনের ছাত্রছাত্রীগণকে পারিতোষিক বিতরণ, সভা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

৭ই মার্চ বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠিত সভায় সেবাসংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ভাইস প্রেসিডেণ্ট পরলোকগত নফরচন্দ্র সেন মহাশয়ের আলেখ্য উন্মোচিত হইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন হুগলী বার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১লা মার্চ ও ৭ই মার্চ সমাগত নরনারীগণের মধ্যে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

খড়িবেড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রমে গত ১লা মার্চ হইতে ৫ই মার্চ পর্যন্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ ও উপনিষদ্ পাঠ এবং ধর্মসভা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। উক্ত ধর্মসভাগুলিতে উপস্থিত ছিলেন স্বামী জয়ানন্দ, শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় ও প্রব্রাজিকা তপস্যাপ্রাণা।

ইহা ছাড়া কীর্তন, পালাকীর্তন, কণ্ঠসঙ্গীত ও বাঁশি, এবং সারদা বিদ্যাপীঠের ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক নাটকাভিনয় এবং বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ ও সারদা বিদ্যাপীঠের ছাত্রছাত্রীদের দুইদিনব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৩রা মার্চ দুপুরে প্রায় তিন হাজারের বেশী নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

খেপুত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৬ই ফাল্গুন হইতে তিনদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ১৬ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাত্রে আশ্রমস্থ ভক্তগণ কর্তৃক কালীকীর্তন ও শ্রীরামকৃষ্ণকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন বিশেষ পূজা পাঠ ভজনাদি হয়। পাঁচশত ভক্তের মধ্যে হাতে হাতে প্রসাদ-বিতরণ অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ ছিল। পরদিন ভাগবতের কথকতা পরিবেশন করেন ভাগবত-ভূষণ শ্রীপূর্ণেন্দু চক্রবর্তী।

পাঁচগ্রাম: মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচগ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মোৎসব ৯ই হইতে ১১ই মার্চ তিন দিন পালিত হইয়াছে। অধ্যক্ষ শ্রীঅমূল্যচরণ গুহ এবং বহরমপুর ও স্থানীয় অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তিন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দিয়াছেন।

উৎসবের প্রতিদিনেই ধর্মসভা ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী ছিল—বহরমপুর রামকৃষ্ণ ব্যায়াম সঙ্ঘের ব্যায়ামাদি-প্রদর্শন, নগরকীর্তন এবং প্রায় বারশত নরনারায়ণের সেবা।

পরলোকে কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২১শে মাঘ, ১৩৭৪ সন, বেলা ১টায় শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ঢাকা জেলার ধোপরাপাশা-নিবাসী কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

১৯১০ ইং সাল হইতে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বহু পার্ষদের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি সাদাসিধা ভাবেই থাকিতেন এবং পরোপকারী ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা তাঁহার বিদেহ আত্মার কল্যাণ করুন।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

পরলোকে উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বরিশাল (সিদ্ধকাঠী)-নিবাসী উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত গত ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৭৪, মঙ্গলবার, রাত্রি ৭ ঘটিকায় সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮১ বৎসর হইয়াছিল। তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সুদীর্ঘ ৪০ বৎসরকাল বরিশাল জেলার বিভিন্ন হাই স্কুলে হেড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত থাকিয়া ছাত্রগণকে সুশিক্ষা দিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি কঠোরনিয়মনিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ এবং পরোপকারী ছিলেন।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

উদ্বোধন

দিব্য বাণী

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্ ।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥২২
অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥২৭
মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহু মানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥৩৪

শ্রীমদ্ভাগবত—৩।২৯

ঈশ্বর আমি আত্মা সবার, রয়েছি ভুবন জুড়িয়া,
সেথায় আমারে অবহেলা করি প্রতিমায় শুধু পুজে যে
মূঢ় সেইজন—মরে সে কেবল ভস্মে আহুতি ঢালিয়া ॥

সকলেরই হৃদিমন্দিরে আমি বাস করি ইহা স্মরিয়া
সমদৃষ্টিতে সবারে দেখিবে, সকল জনারে পূজিবে
সাহায্য আর সম্মানরূপ পূজার অর্ঘ্য দানিয়া,
মৈত্রীর বাহু প্রসারি সবারে বক্ষের মাঝে টানিবে ॥

ঈশ্বর, তিনি অন্তর-বাসী সকলেরই ইহা জানিয়া
জীবেতে করিবে ভগবান-জ্ঞান, সর্বদা মনে মনে
প্রণতি জানাবে সবার চরণে বহু সম্মান করিয়া ॥

কথাপ্রসঙ্গে

যুগ-প্রয়োজন ও রামকৃষ্ণ-ভাবধারা

এক-পৃথিবী ও সাম্যের আদর্শ

আধুনিক যুগে সর্বাধিক প্রয়োজন পৃথিবীর মানুষের সমস্ত বাহ্যবিভেদ ভুলিয়া মানবজাতি হিসাবে একসূত্রে সকলে গ্রথিত হওয়া —সব দেশের সব বর্ণের সব সমাজের মানুষের সর্ববিধ সমস্যা সমবেতভাবে সমাধান করা, সমবেতভাবে সকলের সুখদুঃখের অংশীদার হওয়া; অপরকে পৃথক রাখিয়া কেবল নিজের দেশের বা নিজের জাতির বা নিজের ধর্মের লোকদের সুখসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা নয়। একথা আজ জগতের সর্বত্রই মানুষ অনুভব করিতেছে, কিভাবে ইহা করা যায় তাহার পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টাও করিতেছে। প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে গোটা পৃথিবীর মানুষের কথা চিন্তা করিয়াই আজ সমস্যা-সমাধানের চেষ্টাও শুরু হইয়াছে।

শুধু তাহাই নহে, আরও গভীর একটি চিন্তা আজ মানুষের মনে ক্রিয়াশীল। মানুষে-মানুষে দেহ, বর্ণ, সমাজচিন্তা, ধর্মচিন্তা প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ে বিপুল পার্থক্য সুস্পষ্ট থাকিলেও মূলতঃ সব মানুষই যে এক, তাহাদের দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজন মূলতঃ যে এক, ইহাও আধুনিক যুগের পৃথিবীতে মানুষের মন জুড়িয়া বসিতেছে এবং তাহারই পটভূমিতে প্রধানতঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যস্থাপনের—সকলের সমান অধিকারদানের চিন্তা এবং অংশতঃ সফল প্রচেষ্টাও আজ জগতের ইতিহাসে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছে। আজ জড়বিজ্ঞান জড়জগতের সব কিছুর মধ্যে একত্বের সন্ধান পাওয়ায় তত্ত্বের দিক দিয়া সাম্য সেখানে স্বতই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; রাষ্ট্র- ও সমাজ-চিন্তায় জগৎজুড়িয়া আজ মানুষের মনে সাম্যের সুর বাজিতেছে—সর্বত্রই বিভিন্ন আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে মানুষের সমান অধিকারের ভিত্তিভূমি হইতে উত্থিত বিভিন্ন প্রচেষ্টা বা বিক্ষোভ।

এক পৃথিবী বা পৃথিবীর সব মানুষকে লইয়া এক-পরিবার-গঠন এবং সাম্যস্থাপন- এই দুইটি বিষয়ে চেষ্টা আরম্ভ এবং কিছুটা সফল হইলেও উহা যে আংশিক মাত্র এবং উহার বিরোধী শক্তি এখনো যে ব্যষ্টি- ও সমষ্টি-মনে প্রবল-প্রতাপে ক্রিয়াশীল, ইহা আমরা সকলেই জানি। এ বাধার প্রধান উদ্ভবস্থল দেশ-জাতি-বর্ণ-ধর্ম-সমাজগত এমনকি মতবাদগত সংস্কার—চিন্তা ও আচরণের সুদীর্ঘকালের অভ্যাস এবং গর্ব বা হীনতাবোধ, সঙ্কীর্ণতা-প্রিয়তা। আমাদের এদুটি বিষয়ের প্রচেষ্টা তাই বহু ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ, অসফল, এমনকি কখনো কখনো 'ব্যর্থ পরিহাসে'ও পর্যবসিত হইতেছে। বিশ্ব-শান্তির, বিশ্বকল্যাণের, মানবপ্রেমের দূতরূপে কাজে নামিতেছেন অনেকেই কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে এ ভাবগুলি তাঁহাদের বহিরাবরণমাত্র; ভিতরকার আসল ভাবটি যখন আত্মপ্রকাশ করিতেছে তখন দেখা যাইতেছে ব্যক্তিগত, জাতিগত, বর্ণগত, দেশ- বা মতবাদগত স্বার্থসিদ্ধিই তাহার উদ্দেশ্য। যতক্ষণ স্বার্থে আঘাত না লাগে ততক্ষণ এই বহিরাবরণটি অটুট থাকে; স্বার্থে আঘাত লাগিবামাত্র উহা টুটিয়া যায়। ইহা আজ আমরা প্রায় সর্বত্রই দেখিতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি উদাহরণ

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে: কুকুরগুলি এমনি যখন থাকে পরস্পর গা-চাটাচাটি করে, দেখিয়া মনে হয় পরস্পর পরস্পরকে কত ভালবাসে! কিন্তু উহাদের সামনে চারটি ভাত ফেলিয়া দাও, দেখিবে অমনি কামড়া-কামড়ি শুরু হইয়াছে।

তবুও একথা নিশ্চিত যে, আধুনিক যুগের শুভলগ্নে মানবজাতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়াছে এক-পৃথিবী, এক মানবপরিবার গড়িয়া তুলিবার ও ও সাম্যস্থাপনের লক্ষ্যে। অবশ্য এ লক্ষ্যাভিমুখে চলিবার যোগ্যতা সে এখনো যথাযথরূপে লাভ করিতে পারে নাই। পৃথিবীর সব জায়গার মানুষের উচ্চচিন্তাগুলি এখনো সব মানুষের কাছে পৌছায় নাই—হয়ত বা ইচ্ছা করিয়াই সেগুলির প্রবেশপথে বাধা দেওয়া হইতেছে বা বিকৃতরূপে উহাকে উপস্থাপিত করা হইতেছে কোথাও কোথাও। সেগুলির বিস্তৃতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপক শিক্ষার পরিবেশও নাই অধিকাংশ অনুন্নত দেশগুলিতে। আবার লক্ষ্য স্থির হইলেও সেদিকে অগ্রসর হইতেছি ভাবিয়া আমরা বিপথেই বা চলিতেছি। তথাপি সারা পৃথিবী জুড়িয়া মানুষে মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, সমাজে-সমাজে, ধর্মে-ধর্মে বিপুল পার্থক্যের যে প্রাচীরগুলি এতদিন অনড় ছিল, সেগুলির ভিত্তিমূল আধুনিক যুগে শিথিল হইতেছে, সেগুলি ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে প্রতিদিন। যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিবেশের উপযোগী কল্যাণের জন্য 'মানুষ' বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে চিন্তাগুলি করিয়াছে, সেই 'মানুষের চিন্তা'গুলির ভিতর যাহা যাহা ভাল বলিয়া মনে হইতেছে, এতদিনের সংস্কার ও অন্যান্য গভীর বাধা উপেক্ষা করিয়া সেগুলিকে আপন করিয়া লইবার চেষ্টা চলিতেছে পৃথিবীর সর্বত্রই। যাহারা স্বচ্ছ দৃষ্টি লইয়া সেগুলির যথাযথ মূল্যায়ন করিয়া যেগুলি যথার্থই ভাল সেগুলিকে চিনিয়া লইতে পারিতেছেন হয়ত তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম। অধিকাংশ মানুষই হয়ত আজ সীমিত অস্বচ্ছ দৃষ্টি লইয়া সবকিছুর মূল্যায়ন করিয়া ভাল ভাবিয়া বিচারের ভুলে মন্দকেই গ্রহণ করিতেছেন এবং মানুষের পক্ষে পরম কল্যাণকর চিন্তাগুলিকে মন্দ ভাবিয়া পরিত্যাগও করিতেছেন। তথাপি সব মানুষের চিন্তা সকলের নিকট পৌছাইবার এই রাজপথটি যে খোলা হইয়াছে, পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ যে এপথে নামিতে শুরু করিয়াছে, ইহা মানবজাতির পক্ষে পরম শুভসূচক সন্দেহ নাই।

ইহা শুধু শুভকরই নহে, ইহা একান্ত প্রয়োজন আজ। এই রাজপথ যে এক-মানব-গোষ্ঠী, এক-পৃথিবীর লক্ষ্যের দিকে প্রসারিত, সেখানে না পৌছিতে পারিলে মানবজাতির, মানবসভ্যতার অস্তিত্বই থাকিবে কি না সন্দেহ। ধ্বংসের যে বিপুল শক্তি আজ মানুষের করায়ত্ত হইয়াছে এবং অতি অল্প সময়ে পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে উহা প্রয়োগ করিবার কৌশল সে শিখিয়াছে তাহাতে মানবজাতি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে খণ্ডিত করিয়া রাখিলে একদিন কোন একটি গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে সে উন্মত্ত হইয়া অপরের সহিত নিজের বিনাশও টানিয়া আনিবে। আর্নল্ড টয়েন্‌বী যথার্থই বলিয়াছেন, "মানবজাতির ইতিহাসের এমন এক অধ্যায়ে এসে আমরা পৌছেছি যেখানে এক-পৃথিবী ও খণ্ডিত-পৃথিবীর মধ্যে কোন্‌টি আমরা বেছে নিতে চাই, সে প্রশ্ন আর নাই; আজ প্রশ্ন হল, আমরা এক পৃথিবী চাই বা পৃথিবী বলে কিছু থাকবে না এইটা চাই।" আজ হয় আমাদের সকলে

মিলিয়া পৃথিবীজোড়া একমানবপরিবার গড়িয়া তুলিতে হইবে, অথবা ইহার অন্যথায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর অবশ্যম্ভাবী সংঘাতের ফলে মানবজাতিই চিরলুপ্ত হইবে।

জড়বাদের ভিত্তিতে এ আদর্শস্থাপন সম্ভব নয়

একবদ্ধতা ও সাম্যকে আমাদের লক্ষ্যরূপে স্থির করিয়াও কেন আমরা সে লক্ষ্যলাভের পথে ঠিকমত অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, বা কার্যতঃ উহার বিরোধিতাও করিতেছি? ইহার আসল কারণ হইল এই একবদ্ধতা ও সাম্যের মূল ভিত্তি যে একত্ব, যেখানে আমরা সকলেই এক, ঠিক সেখানে আমাদের দৃষ্টি এখনো যায় নাই; আমাদের দৃষ্টি যে বাহ্য একত্বের উপর নিবদ্ধ তাহার ভিত্তি শিথিল, বৈচিত্র্যই সেখানকার বৈশিষ্ট্য, একত্ব সেখানে পূর্ণভাবে নাই—মোটামুটিভাবে আছে মাত্র।

পূর্ণ একত্বের সন্ধান অবশ্য সারা পৃথিবীতেই মানুষ বিভিন্ন যুগে পাইয়াছে, সাক্ষাৎভাবে উহা উপলব্ধি করিবার বিভিন্ন পথের সন্ধানও অপরকে দিয়াছে। কিন্তু কোথাও উহা ব্যাপকভাবে কার্যপরিণত হয় নাই। আজ চিন্তার প্রসারের যুগান্তকারী সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে চিন্তাগুলি পৃথিবীর সব মানুষের কাছে পৌছাইতেছেও না। আজ পৃথিবী ছোট হইয়া আসিয়াছে সত্য, আজ পৃথিবীর একপ্রান্তে কোন মানুষ যে চিন্তা করিতেছে পৃথিবীময় অল্প সময়ের মধ্যে উহা ছড়াইয়া পড়িতেছে ইহাও সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই আজ নিজ চিন্তাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহার ইন্দ্রিয়-সীমিত প্রদেশেই—জড়- ও দেহ-সর্বস্বতাতেই। এ চিন্তা এবং তাহা হইতে উদ্ভূত আদর্শ ধারণা করিতে, গ্রহণ করিতে, জীবনে রূপায়িত করিতে সাধারণ মানুষকে কোন প্রয়াস করিতে হয় না, ইহা তাহার স্বাভাবিক ভোগমুখী বৃত্তির অনুগ যাহা 'পরিণামে বিষোপম' হইলেও 'অগ্রে অমৃতোপম' বলিয়াই মনে হয়। সেজন্য এই চিন্তাগুলিরই সর্বত্র প্রসার হইতেছে বেশী করিয়া। কিন্তু এই চিন্তার ভিত্তিতে গঠিত সাম্যের আদর্শ সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সর্বতোভাবে বাঞ্ছিত-ফলপ্রসূ বা সুদৃঢ়মূল কখনও হইতে পারে না, এই চিন্তাকে ভিত্তি করিয়া মানুষ একবদ্ধতাও আনিতে পারিবে না। কারণ দেহ এবং দেহ-উদ্ভূত মন ও চেতনা (জড়বাদিগণের মতে) লইয়া যেখানে মানুষের অস্তিত্ব সীমিত, সেখানে বিভিন্ন স্থানে ও পরিবেশে মানুষে মানুষে পার্থক্য বিপুল, পূর্ণ একত্ব সেখানে নাই। তাই এই পার্থক্য-বোধ-উদ্ভূত স্বার্থপরতা সেখানে থাকিবেই। এ ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া সব দেশের সব জাতির সব বর্ণের মানুষকে নিজের মতো করিয়া ভালবাসিতে, তাহার কল্যাণের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে মানুষ কখনও পারিবে না।

আমাদের স্বরূপ বা পূর্ণ একত্বের ধারণাই ইহার সুদৃঢ় ভিত্তি

কিন্তু দেহ-মনেরও অতীতে মানুষের যে অস্তিত্ব আছে, সেখানে সব মানুষই সত্যই এক—মোটামুটিভাবে এক নয়, পরিপূর্ণভাবে এক। যাহা মানুষে-মানুষে বিভেদকে প্রকট করে—দৈহিক গঠন ও বর্ণের বিভিন্নতা, চিন্তাশক্তি ও চিন্তাধারার বিভিন্নতা, মতামতের বিভিন্নতা, এ অস্তিত্ব তাহার ঊর্ধ্বে। ইহা রাষ্ট্রের ও সমাজের বিভিন্নতারও ঊর্ধ্বে, কারণ রাষ্ট্র-ও সমাজ-ব্যবস্থা যাহাকে লইয়া, সে দেহ-মনের অতীতে তাহা অবস্থিত। এই একত্বের প্রতি মানুষের দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলে, এই বোধের ভিত্তিতে তাহার জীবন প্রতিষ্ঠিত করিতে

পারিলে সাম্য দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইবে, এক পৃথিবী গড়িয়া তোলা সহজ হইবে, মানুষ কেবল মুখের কথায় নয় অন্তর হইতেই সকলকে ভালবাসিতে, অপরের কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগ করিতে পারিবে; নিজের আত্মীয়স্বজনকে, নিজের দেশের লোককে (মনেপ্রাণে স্বদেশ-প্রেমিক হইলে), নিজের ধর্মের লোককে যেভাবে 'আপনার' বলিয়া ভাবি আমরা, সেভাবেই সকলকে, সব দেশের সব বর্ণের সব সমাজের সব ধর্মের লোককেই 'আপনার' বলিয়া ভাবিতে পারিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাই পথের দিশারী

সব দেশের মানুষের মধ্যে মানুষের এই স্বরূপ, সব মানুষের মধ্যে একত্ববোধ এবং তাহা হইতে সঞ্জাত অতি উদার দৃষ্টি অল্পাধিক প্রকট হইয়াছে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভাবে। উহারই, ঐ সবগুলিরই পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে; সারা পৃথিবীর মানুষ যুগে যুগে আজ পর্যন্ত যত পথ ধরিয়া এই একত্বে পৌঁছিয়াছেন, তাহার সবগুলির সহিত তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন। সত্যান্বেষণ বা ভগবানলাভের সাধনার পথ ধরিয়া তিনি একত্বে পৌঁছিয়াছেন—কিন্তু সে সাধনা করিয়াছেন 'মানুষ' হিসাবে, কোন বিশেষ ধর্ম- বা সম্প্রদায়-ভুক্ত সাধক হিসাবে নয়—কেবল হিন্দু- বা শাক্ত-সাধক হিসাবে নয়। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে সাধনা করিয়া মা-কালীর দর্শনলাভের পর অন্য কোন হিন্দু সম্প্রদায়ের মতে, এবং বিশেষ করিয়া খৃষ্টান ও মুসলমান মতে সাধন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবই হইত না। একটি বিশেষ পথ ধরিয়া চলিয়া ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার পর মানবজাতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে যত বিভিন্ন প্রকারে সাধনা করিয়া ভগবানকে লাভ করিয়াছে, তাহার সবগুলির সহিত তিনি পরিচিত হইতে চাহিয়াছিলেন, একটি বিশেষ গণ্ডীতে নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে চাহেন নাই; তাই তিনি ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে আধুনিক যুগ-চিন্তারই অধীশ্বর, মানবজীবনের উপর এই অন্যতম প্রচণ্ড প্রভাবশালী শক্তির ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে এক-পৃথিবী গড়িবার পথপ্রদর্শক। আর ধর্মের পথেই মানুষ দেহ-মনের অতীতে অবস্থিত নিজ অস্তিত্বের একত্বরূপ মহাতীর্থের সন্ধান পায় বলিয়া এবং তাঁহার জীবনই সে মহাতীর্থ বলিয়া তিনি আধুনিক যুগচিন্তার সর্বোচ্চ সীমায় অধিষ্ঠিত। তাঁহার ভাবপ্রবাহ তাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সমাজগত সর্ববিধ বিভেদকে ভাসাইয়া লইয়া মানুষের জীবনকে সকলকে সমভাবে ভালবাসারূপ যথার্থ সাম্যের আশ্রয়স্থল পূর্ণ একত্বের মহার্ণব-অভিমুখী করে; সকল স্বার্থ, সকল বিভেদ চূর্ণ হইতে থাকে সে নবভাব-প্রবাহের প্রতি ছন্দে, সকল সঙ্কীর্ণতা ও গণ্ডীবদ্ধতারূপ মৃত্যু রূপান্বিত হইতে থাকে সম্প্রসারণরূপ জীবনে:

"তোমার চরণপাতে ধরণীর ধূলি
　　মণিলতা যায় ভুলি,
　　পলকে পলকে
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।"

বলপ্রয়োগ নহে, ব্যক্তি-জীবনের উন্নয়নই পথ

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের মধ্যে মুখ্যতঃ আমরা দেখিতে পাই ব্যক্তিজীবনকে এই একত্বের লক্ষ্যে, মুক্তির লক্ষ্যে—আত্মজ্ঞান বা ভগবান লাভের লক্ষ্যে লইয়া যাইবার বিস্তারিত নির্দেশ। কিন্তু তাহা স্পর্শ করিয়াছে আধুনিক যুগেরই একটি প্রধান বিষয়, আধুনিক যুগের একপৃথিবীকামী, সাম্যকামী মানবের উদ্দেশ্যসিদ্ধির একটি পরম

আকাঙ্ক্ষিত ধন—সব মানুষকে সমভাবে ভালবাসা : "মায়া কাকে বলে জান ? বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র, ভাগিনা-ভাগিনী, ভাইপো-ভাইঝি, এই সব আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা। আর দয়া মানে সর্বভূতে ভালবাসা।" "আমার জিনিস, আমার জিনিস ব'লে—সেই সকল জিনিসকে ভালবাসার নাম মায়া। সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া। শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি, কি শুধু পরিবারদের ভালবাসি, এর নাম মায়া। শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসা—এর নাম মায়া, সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোকদের ভালবাসা, এটি দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়। মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বরলাভ হয়।" হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া বিশ্বপ্রেমের সাধনা এখানে ব্যষ্টিজীবনে ভগবানলাভেরই একটি পথরূপে স্পষ্টত: নির্দেশিত। ভগবদ্ভক্তিই যে মানুষকে আধুনিক যুগচিন্তার শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী করে তাহাও এখানে অভিব্যক্ত। কেন করে তাহাও তিনি বলিয়াছেন—যাঁহাকে ভগবান বলি তিনিই আমাদের স্বরূপ; ঈশ্বর শুদ্ধবোধস্বরূপ এবং আমাদের সকলেরই স্বরূপ। এই স্বরূপবোধের দিকে, পূর্ণ একত্ববোধের দিকে অগ্রসর হওয়ারই নাম ভগবদারাধনা।

বলা বাহুল্য, ব্যক্তিজীবনকে লক্ষ্যাভিমুখী না করিতে পারিলে তাহারই সমষ্টিভূত রাষ্ট্র- বা সমাজ-জীবনকে সে লক্ষ্যাভিমুখী করা সম্ভবই নয়। আর, এই ভালবাসার পথই একপৃথিবী গড়িবার, সাম্য স্থাপন করিবার একমাত্র নিশ্চিত পথ। জোর করিয়া মানুষকে পরার্থে আত্মত্যাগ করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহার ভিত্তি বালির ভিত্তি—ছিদ্রপথ পাইবামাত্র এ ভিত্তি সরিয়া যায়।

একই ছাঁচে সকলকে ঢালা নয়, বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনই উপায়

আরো একটি কথা। মানুষ এই দেহ-মনাতীত অস্তিত্ব উপলব্ধির লক্ষ্যে নিবদ্ধদৃষ্টি হইলে তবেই সে জাতি-ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতিগত সর্ববিধ বিভিন্নতার সহিতই সব মানুষকে এক বলিয়া ধারণা করিতে পারে। ইহা প্রকৃতির নিয়মানুমোদিতও—বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য। একত্বের সূত্রে সব গ্রথিত থাকা সত্ত্বেও বাহিরের বৈচিত্র্য থাকেই। স্বরূপে আমরা সকলেই এক হইলেও দেহের স্তরে দুজন মানুষ যেমন ঠিক একইরূপ হয় না, মনের স্তরেও তেমনি দুজন মানুষ ঠিক একইভাবে চিন্তা করে না। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি থাকার প্রয়োজনও তাই অনিবার্য। একমানব-গোষ্ঠী গড়িবার বা সাম্যস্থাপনের পরিকল্পনায় যদি আজ আমরা জোর করিয়া সব মানুষকে একটি মাত্র বিশেষ ধারায় চিন্তা করাইয়া, একটি মাত্র বিশেষ সামাজিক বা সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে আনিয়া ফেলিতে চাই, তবে পরিণামে উহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। সবগুলির প্রতি সহানুভূতি লইয়া, সবগুলির প্রয়োজনের অনিবার্যতায় আস্থাবান হইয়া পূর্ণ একত্বলাভের পরিপ্রেক্ষিতে সবগুলির ভিতর সামঞ্জস্যবিধানের পথই এ প্রচেষ্টার যথার্থ পথ।

মানুষের সর্বোচ্চ চিন্তার ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ প্রত্যক্ষানুভূতি ও ধর্মসাধনার বিশ্বপ্রসারী জীবন সহায়ে এই পথই দেখাইয়া গিয়াছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই আজ আমাদের কেবল ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রেই নয়, রাষ্ট্র-চিন্তা সমাজ-চিন্তা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই মানুষের সব চিন্তাগুলিকে সমমর্যাদা দিয়া, সমান সহানুভূতি লইয়া বিশ্লেষণ করিয়া সেগুলির দোষসমূহকে বর্জন এবং গুণগুলিকে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং সবগুলির বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই সেগুলিকে আধুনিক রূপ দিয়া একসূত্রে গ্রথিত করিতে হইবে। অবশ্য ইহা যেন আমরা না ভুলি, ইহাতে সফলকাম হইতে হইলে আমাদের পূর্ণ একত্বের লক্ষ্যে নিবদ্ধদৃষ্টি হইতেই হইবে এবং সেই একত্বকেই গ্রন্থনের সূত্র হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।'

স্বামী প্রেমানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে লিখিত]

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

Ramakrishna Math
Balur P. O., Howrah
25 12. 1915

পরমপূজ্যপাদেষু—

আপনার এক-একখানি পত্র পাই আর আনন্দসাগরে ডুবে যাই। কি মধুর, কি অমিয়মাখা চিঠিগুলি! কৃপা করে মাঝে মাঝে এই দয়া করতে কৃপণতা করবেন না। কৃপা করতে এসেছেন, দয়া করতেই হবে, মহারাজ! আমি আপনার করুণাসাগরে তলিয়ে যাচ্ছি যেন, মহারাজ, থাই পাচ্ছি না, থাই পাচ্ছি না।

আজ বড়দিন, বড়ই ভিড়। গতকল্য ভক্তসমাগম বেশী হওয়ায় আর চিঠি সমাপন করিতে পারি নাই। প্রতিদিন ভক্ত বেড়ে যাচ্ছে। নিত্য উৎসব চলেছে। এ বাড়ীতে আর স্থান হচ্ছে না। তাই গিরীশবাবু ও কালীবাবুর স্মরণার্থ গৃহ শীঘ্র শেষ করবার জন্য মহারাজ খুব লেগেছেন। জানবেন এবার দুর্বৎসর। লোকের বড়ই অভাব, তবু ঠাকুরের দোহাই দিয়ে চলে যাচ্ছে এই বৃহৎ প্রভুর সংসার, আমি দেখছি সব ঠাকুরই চালাচ্ছেন। যত শাকপাতা, ফলমূল আসছে সবই উঠে যাচ্ছে, আবার ভর্তি হচ্ছে দেখছি। এখন প্রভু কৃপা করে ভক্তিবিশ্বাস দিয়ে ভাসিয়ে দিন, এই নিবেদন।

রামের মা প্রভৃতি এখন বাগবাজারে আছেন। তাঁরা অনেক বড়ি এখানে পাঠিয়েছিলেন, বোধহয় তাই থেকে আপনাকে দেওয়া হয়েছিল। সেই দেখে আপনার শান্তিকে মনে পড়েছিল, তাহারা ভাল আছে। শান্তির সঙ্গে দেখা হইলে আপনার আশীর্বাদ জানাইব। শান্তির ও রামের এক এক দৌহিত্র সম্প্রতি হয়েছে। এই ছুটিতে ভগবানকে মহারাজ মঠে রেখেছেন; তার এক সহচর জুটেছে, সেটি বেশ বুদ্ধিমান, ভগবানের অপেক্ষা ছোট, কিন্তু I. A. পড়ে। ব্রাহ্মণ-কুমার, সুন্দরস্বভাব। এরা দুটি মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। মহারাজ আপনাকে ভক্তিপূর্ণ নমস্কার ও ভালবাসা জানাচ্ছেন।

আপনি থাকিলে কত যে আনন্দ হইত তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিবার নয়। ওখানে এক কুটিরা হইতেছে শুনিয়া মহারাজও আনন্দিত। আপনাদের সঙ্গে ঠাকুর সত্ত্বের খেলাই খেলবেন। সত্ত্বে মগ্ন হওয়ার জন্য যে খেলার আয়োজন তাতে রজঃ—প্রভু আসতে দেবেন না।

আপনার শরীররক্ষা আমাদেরই মঙ্গলের জন্য। এ কারণ আমাদের ঐ শরীরের প্রতি কৃপা করে একটু যত্ন করিবেন, ইহা আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।

সাজির সকল কথা মহারাজের সঙ্গে হইল। তিনি সাজির জন্য অতিশয় দুঃখিত। এলাহাবাদের অবিনাশবাবুকে মহারাজ বলে রেখেছেন, সিদ্ধদাস পাস হলে ডেপুটীগিরির জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করবেন। ভক্তের প্রতি মহারাজের কতই ভালবাসা! আপনি সবই

জানেন। আপনার ও মহারাজের ইচ্ছায় কালীভায়াকে আবার চিঠি লিখেছি।···আপনিও তাঁর জন্য একটু প্রার্থনা করবেন, এই অনুনয়।

আপনারা পাতালদেবী দর্শনে আনন্দ করিয়াছেন শুনে আমরাও আনন্দিত। আপনার সঙ্গে তুলনায় আমরা ত পাতালেই পড়ে আছি। তবে দেবীদর্শন আর ঘটে না আমাদের ভাগ্যে।

আপনাকে পাঠাবার পর এখানে অনেক বড়ি আসছে। চাইতে হয় না, আপনা-আপনিই আসছে। আপনারা সকলেই বড়ি খাবেন, কৃপণতা ঐ বিষয়ে করবার দরকার নাই। দয়া করে জানাবেন কি কি পাঠাতে হবে। কৃপা করে কৃতার্থ করতেই হবে, মহারাজ, এ-যাত্রা।

শিবানন্দ স্বামী এখনও আসেন নাই। আমরা নিত্যই তাঁর আশায় আছি, শীতে মৌরাট যাব না। আহা! মৌরাটের সেই ভক্ত কিরণবালা ২০।২৫ দিন হল মারা গেছে কলিকাতায়! মৌরাটে উইল করে গিছিল তার সব বিষয় কাশীর অদ্বৈতাশ্রম ও ইটিলির অর্চনালয়ে। কিন্তু তার সতীন-পো সব সম্পত্তি শেষে নাকি নিজের নামে উইল করাইয়া লইয়াছে, আর অতি তাড়াতাড়ি করে probate নিয়ে নিয়েছে।···ঠাকুর ঐশ্বর্য ভালবাসেন না আর আমরাও সহ্য করতে পারবো না বলে হাতছাড়া করে দিচ্ছেন মনে হয়।

আপনি দয়া করে মাঝে মাঝে স্বামীজীর পুণ্যস্মৃতি যদি লেখেন তবে ধন্য হয়ে যাব জানবেন। সকলে পড়ে মহা আনন্দিত। আবার কবে ঐরূপ পুণ্যস্মৃতি দয়া করে পাঠাবেন, এই অপেক্ষায় আছি। সব অনুমান করতে পারছি, মহারাজ, আপনাদের কৃপায়। সে মাগুর-মাছের ঝোলের কথা কি ভুলিবার, মহারাজ! সে যে অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায় গাঁথা আছে। বুঝে নিয়েছি সে মধুর কাঁটি-কাবাব কেমন সুন্দর।

মহারাজ, আমারও ঐ দশা। আপনাদের স্মৃতিই আমার ধ্যানভজন, জপতপ। মনে করি বুঝি কি কচ্ছি আপনার ইচ্ছায়। কিন্তু আপনার নিকট থেকে শুনলে বিশ্বাস হয় বিপথে যাচ্ছি না; পুণ্যস্মৃতিরূপ জলের ছিটে মাঝে মাঝে পাঠাইয়া বাঁচাবেন।

একটা বিরাট প্লাবন যেন আসছে। তার সূচনা বোধ হয় দেখতে পাচ্ছি, মহারাজ।

আপনাকে দেখিবার খুবই ইচ্ছা। এখন ঠাকুর দয়া করে নে গেলেই হয়। আজও মঠে বিস্তর ছেলে এসেছে। আপনি আমার অসংখ্য অসংখ্য প্রণাম এবং হৃদয়ের ভালবাসা জানবেন। আর অতুল, ক্ষুদু, সীতাপতি, কানাই, সাজিদের সকলকে ভালবাসা স্নেহ সম্ভাষণাদি জানাইবেন।

শরৎ চক্রবর্তীর ভাই বরিশালের অশ্বিনীবাবুর কলেজের রসায়নের অধ্যাপক। বেচারা সেখানে নেয়ার জন্য ধরেছে। সব স্থানেই যেতে ইচ্ছা হচ্ছে কিন্তু প্রভু না নে গেলে কোথাও যাবার জো নাই দেখছি। আবার মূর্খ্য বলে ভয়ও হয়।

আমি যেন যন্ত্র হয়ে যেতে পারি। মহারাজ, মান-ইজ্জৎ সম্ভ্রম হজম করতে পারবো না। ওসব যেন ভুলেও না আসে, এই আশীর্বাদ করবেন। ইতি—

দাসানুদাস

বাবুরাম

শ্রীশ্রীভবতারিণীস্তোত্রম্

অধ্যক্ষ জ্যোতির্ময় নন্দ

স্বপ্নাদেশকৃপাং প্রলভ্য মহতীং শ্রীরাসমণ্যা শুভাং
যা স্নানোৎসবপূর্ণিমাবরতিথৌ ভক্ত্যা প্রতিষ্ঠাপিতা।
শৈলীং তাস্তু কৃপাসুধাজননিধিং লীলাময়ীং চিন্ময়ীং
গঙ্গারোধসি দক্ষিণেশ্বরপুরে কালীং ভজে দক্ষিণাম্ ॥১

মায়া নৈব পরেশ্বরস্য মহিষী ব্রহ্মাত্মিকা যা পরা
সা তস্যাস্তনুভেদমাত্রমুদিতাঽবিদ্যা চ বিদ্যা দ্বয়ম্।
বন্ধো মুক্তিরহো যয়া চ বিহিতঃ শক্ত্যা মহামায়য়া
তাং দেবীং খলু দক্ষিণেশ্বরপুরে কালীং ভজে দক্ষিণাম্ ॥২

মাধুর্য্যঞ্চ বিচিত্রতামুপগতা লীলা যদীয়া ক্ষিতৌ
লব্ধা তত্র নরাকৃতিঞ্চ পরমং শ্রীরামকৃষ্ণং তদা।
যস্যাঃ সোঽর্চ্চনপুণ্যকর্ম্ম কৃতবান্ পূজাদ্ভুতা শ্রূয়তে
তাং বন্দে হৃদি দক্ষিণেশ্বরপুরে শ্রীকালিকাং দক্ষিণাম্ ॥৩

যস্যাঃ সন্নিহিতে গৃহে স্থিতমমুং দেবং মহাসাধকং
যোগজ্ঞানসুভক্তিকোবিদমহো দ্রষ্টুং মহাতাপসম্।
নানাদেশবিদেশতোঽভিমিলিতা লোকাঃ সদা লক্ষশঃ
পূতা তন্মুখসৎকথামৃতধুনী লোকেষু বৈ দুর্লভা ॥৪

কৃত্বা ধর্ম্মসমন্বয়ং যতিপতিঃ পত্নীসকাশেঽপ্যয়ং
সত্যং ধর্ম্মমতেষু সদ্গুরুবরঃ প্রোক্তা নিজাচারতঃ।
সংস্থাপ্যার্য্যসুধর্ম্মমদ্ভুতকৃতির্গ্লানিং নিরস্যাখিলাং
কল্যাণং কৃতবান্ কলৌ নিরুপমং যস্যাঃ সমীপে স্থিতঃ ॥৫

শম্ভুদ্বাদশমন্দিরৈঃ সুরসরিত্তীরস্থিতৈঃ শোভিতং
রম্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিসঙ্ঘমুখরং যস্যা মহন্মন্দিরম্।
সানন্দাং করুণাসহাস্যবদনাং তন্মধ্যসংরাজিতাং
তাং বন্দে হৃদি দক্ষিণেশ্বরপুরে শ্রীকালিকাং দক্ষিণাম্ ॥৬

শুদ্ধাং সন্নিধিমেত্য সংশয়যুতঃ শ্রীমান্ নরেন্দ্রঃ সুধীঃ
শ্রদ্ধাং জ্ঞানমথাপি ভক্তিমমলাং দেবীং যযাচে চ যাম্।
সঞ্জাতো যুগনায়কোঽখিলনুতঃ স্বামী বিবেকো মহান্
বন্দে তাং হৃদি দক্ষিণেশ্বরপুরে শ্রীকালিকাং দক্ষিণাম্ ॥৭

মাতা পুণ্যপুরে বিচিত্রঘটনাঃ শ্রীরামকৃষ্ণাশ্রিতা
দৃষ্ট্বানন্দময়ী মুদা পরময়া যুক্তালসল্লীলয়া।
তাং দেবীং ভবতারিণীং ভবমহাসিন্ধৌ সদা তারিণীং
বন্দে সুন্দরদক্ষিণেশ্বরপুরে শ্রীকালিকাং দক্ষিণাম্ ॥৮

তীর্থে বিশ্বধরাসুবিশ্রুতযশঃশুভ্রে পরং শোভিতাং
পদ্মাস্তুঃ শিববক্ষসি স্থিতপদাং সর্ব্বেশ্বরীং কালিকাম্।
বন্দে তামনুরক্তকল্পলতিকাং নিত্যাং জগন্মাতৃকাং
বন্দে কল্পতরুঞ্চ হৃদ্যফলদং শ্রীরামকৃষ্ণাভিধম্ ॥৯

(বঙ্গানুবাদ)

গঙ্গার তীরে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থিতা শ্রীশ্রীদক্ষিণাকালিকাদেবীকে আমি ভজন করিতেছি। রাণী শ্রীরাসমণি মায়ের মহতী কৃপা—স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া স্নানযাত্রার পুণ্যতিথি পূর্ণিমাতে ভক্তি সহকারে এই মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মায়ের মূর্তিটী পাষাণনির্মিতা বটে, কিন্তু চিন্ময়ী ও লীলাময়ী এবং রূপামৃতের সমুদ্র।১

আমি দক্ষিণেশ্বরস্থিতা দক্ষিণাকালীর ভজন করিতেছি। এই পরমা দেবী মায়া নহেন, কিন্তু ব্রহ্মময়ী ও পরমেশ্বর-মহিষী মহামায়া। মায়ার দুই ভেদ—বিদ্যা ও অবিদ্যা। এই দুইটী মহামায়ার শক্তি ও দুই প্রকার মূর্তি। আহা! এই দুই শক্তির দ্বারা মহামায়া জীবের মুক্তিপ্রদা ও বন্ধনকারিণী।২

আমি দক্ষিণেশ্বরপুরে অবস্থিতা শ্রীদক্ষিণাকালিকার বন্দনা করিতেছি। তৎকালে দক্ষিণেশ্বরে নরাকৃতি পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নিকটে পাইয়া পৃথিবীতে মায়ের বিচিত্র ও মাধুর্যপূর্ণ লীলা সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ পবিত্র কর্ম মায়ের পূজা করিতেন এবং সেই পূজার কাহিনীও অদ্ভুত।৩

দক্ষিণেশ্বরে মায়ের সন্নিকটে একটী গৃহে মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণদেব থাকিতেন। যোগ, জ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তিতে বিচক্ষণ এই মহাতাপসকে দর্শন করিবার জন্য নানা দেশবিদেশ হইতে লক্ষ

লক্ষ লোক দক্ষিণেশ্বরে সমবেত হইত। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যে পবিত্র সৎকথামৃতের নদী প্রবাহিত হইয়াছিল, সমগ্র জগতে তাহা অতীব দুর্লভ।৪

দক্ষিণেশ্বরে মায়ের সমীপে থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব পত্নীযুক্ত হইয়াও শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতেন। এই সদ্গুরুশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ সমস্ত ধর্মের সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকটী ধর্ম নিজে আচরণকরতঃ ধর্মের মধ্যে নিহিত সত্য ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি ধর্মের গ্লানিসমূহ দূর করিয়া সনাতন হিন্দুধর্মের পুনঃসংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত কার্যই বিস্ময়জনক। কলিহত জীবের মঙ্গলের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই।৫

আমি মনে মনে দক্ষিণেশ্বরাধিষ্ঠাত্রী শ্রীদক্ষিণাকালিকাকে বন্দনা করিতেছি। গঙ্গাতীরে অবস্থিত দ্বাদশ শিবালয়ের নিকট মায়ের বিশাল মন্দিরের কি অপূর্ব শোভা! মায়ের দর্শনার্থী সহস্র সহস্র যাত্রীর কোলাহলে মন্দির মুখরিত হইতেছে। মন্দিরের মধ্যে বিরাজিতা আনন্দময়ী মাতার করুণা সহাস্যবদনে প্রকাশ পাইতেছে।৬

আমি মনে মনে দক্ষিণেশ্বরস্থিতা শ্রীদক্ষিণাকালিকার বন্দনা করিতেছি। মায়ের বিশুদ্ধ সান্নিধ্যে আসিয়া বিদ্বান্ ও সংশয়ান্বিতচিত্ত শ্রীমান্ নরেন্দ্র মায়ের নিকট শ্রদ্ধা, জ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি পাইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন এবং তিনিই পরে বিশ্ববন্দিত মহান্ যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ হইলেন।৭

মনোরম দক্ষিণেশ্বরপুরে অবস্থিতা শ্রীকালিকা মাতা ভবতারিণীকে আমি বন্দনা করিতেছি। দুস্তর ভবার্ণব হইতে মা-ই সর্বদা উদ্ধার করেন। তাঁহার পুণ্যক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রকটকালে যে-সমস্ত বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়াছিল, আনন্দময়ী তাহা দেখিয়া পরম আনন্দ লাভকরতঃ কত লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।৮

পুণ্যক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরের কীর্তি সমগ্র পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছে। এই ভাস্বর ধামে পদ্ম-মধ্যে অবস্থিত শবরূপমহাদেবের বক্ষের উপর পাদপদ্ম রাখিয়া সুশোভমানা সেই নিত্যা জগজ্জননী, সর্বেশ্বরী ও ভক্তজনকল্পবল্লী শ্রীশ্রীদক্ষিণাকালিকা দেবীকে আমি বন্দনা করিতেছি। তৎসহ অভীষ্টফলদাতা শ্রীরামকৃষ্ণ নামক কল্পতরুকেও আমি বন্দনা করিতেছি।৯

মহানায়ক বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক সাম্য

অধ্যাপক পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান বিশ্ব পরস্পর-বিবদমান দুইটি বিশিষ্ট মতবাদ-কবলিত। উহাদের মধ্যে ধনতন্ত্র বৈষম্যের প্রসূতি এবং সমাজতন্ত্র সাম্যের জনক বলিয়া কথিত। ধনিক-সম্প্রদায় শাসক ও শোষক এবং শ্রমিক-সম্প্রদায়—শাসিত ও শোষিত বলিয়া বহুল-প্রচারিত। ধনিক-শ্রেণীর অন্তর্গত অনেকে ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাসী আবার অনেকে ইহসর্বস্ব ও নিরীশ্বরবাদী। শ্রমিক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কেহ কেহ আস্তিক ও পরলোকে বিশ্বাসী আবার কেহ কেহ ইহসর্বস্ব ও নাস্তিক। বর্তমানে প্রায় সমস্ত সাম্যবাদী দেশ ও রাষ্ট্র ঈশ্বর, আত্মা ও পরলোকে অবিশ্বাসী। অধিকাংশ সাম্যবাদীর ধারণা—ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক, অদৃষ্ট, কর্মফল ইত্যাদি বুদ্ধিজীবী ধনিক-শ্রেণীরই উদ্ভাবিত, শ্রমজীবিগণকে বঞ্চনা করিবার অমোঘ অস্ত্র। তাহাদের মতে সকল বৈষম্যের জন্য অত্যাচারী ধনিক প্রভুরাই দায়ী, যাহারা হীন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ধরাকে ক্লেদাক্ত করিয়া তুলিয়াছে! অতএব শোষণের অবসানপূর্বক যথার্থ শ্রমমূল্যে সুষম ধনবণ্টন ও ব্যাপক শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠাই সাম্যবাদী শ্রমিক-সম্প্রদায়ের লক্ষ্য।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক, অদৃষ্ট, কর্মফল ইত্যাদির ধারণাসমূহ প্রচলিত মতবাদগুলির সূচনার বহু পূর্বেই এই ধরামণ্ডলে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, দৃঢ়মূল হইয়াছিল। ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন সুদূর অতীতের কোন কোন বিশেষ মুহূর্তে ঐ ধারণাগুলি প্রসূত হইয়া জনজীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল বলিয়াই বহু মনীষীর অভিমত। তাঁহারা মনে করেন, ঐগুলি বিশেষ-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বিভ্রান্তিকর কল্পনামাত্র নহে, পরন্তু প্রকৃত বস্তুসংবাদী এবং উহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই সর্বকালে মানুষের ধর্মচেতনা উদ্ভূত, লালিত, বর্ধিত ও সার্থকতায় পর্যবসিত হয়!

আধুনিক সাম্যবাদিগণ প্রভুত্ব-ও শোষণ-মূলক ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সামাজিক অসাম্য ও অব্যবস্থার জন্য দায়ী বলিয়া মনে করেন। সুতরাং শ্রমমূলক সুষম ধনবণ্টন-ব্যবস্থার দ্বারা সমাজতন্ত্র-প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের কাম্য। সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়—সকল স্তরের মানুষ শিক্ষা ও জীবিকা-অর্জনের সম্ভাব্য সকল সুযোগ লাভ করিবার অবশ্যই অধিকারী। কিন্তু অধুনা কি ধনতান্ত্রিক স্বৈরশাসনে, কি ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক গণশাসনে পূর্বোক্ত ঈশ্বরাদির ধারণাসমূহ অধিকাংশ জনজীবনে কুসংস্কারজ্ঞানে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যক্ত হইবার মুখে। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ইহসর্বস্বতা ও জড়বাদের রাজত্ব বর্তমানে স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের দেশে—ভারতবর্ষে এখনও অধিকসংখ্যক মানুষ কিন্তু উক্ত ধারণাগুলি সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই মনে করেন।

অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া যেন বিজ্ঞের ন্যায় বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষে এখনও বিজ্ঞানের আলোক ভাল করিয়া প্রবেশ না করিবার ফলে অধিকাংশ লোক কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী বলিয়া ঈশ্বরাদির ধারণা তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। কালক্রমে সুষ্ঠু বিজ্ঞানচর্চার ফলে অবশ্যই তাহারা পুরোহিততন্ত্র ও গুরুবাদের কবলমুক্ত হইয়া

উক্ত ধারণাসমূহ পরিত্যাগপূর্বক যথার্থ বস্তুবাদ আশ্রয় করিবে। তাঁহারা যদি সুস্থচিত্তে স্থির-মস্তিষ্কে প্রসিদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের মতগুলির ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক আলোচনা করেন, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, ঐগুলির মূল বা উৎস হইল—চিরন্তন সত্য। উহা সত্যদ্রষ্টাগণের অতীন্দ্রিয়- ও দিব্য-অনুভূতি-ভিত্তিক। বেদ এরূপ চিরন্তন সত্য; বৈদিকতত্ত্ব-সমূহ কেবল কতকগুলি শুষ্ক মতবাদমাত্র নহে, কিন্তু অপরোক্ষ অনুভূতি- ও অতীন্দ্রিয়প্রজ্ঞা-লব্ধ সত্যে প্রতিষ্ঠিত। ঐরূপ অতীন্দ্রিয়- ও দিব্য-তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ নিজ নিজ আবির্ভাবের দ্বারা অতীতে ভারতভূমিকে বহুবার ধন্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূতসান্নিধ্যে আসিয়াই বর্তমান ভারতবাসীদিগের অধিকাংশ পূর্বপুরুষ উক্ত তত্ত্বসমূহে বিশ্বাসী ও আস্থাসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেইজন্য বর্তমান ভারতবাসী-দিগের অনেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের ধারানুসরণ ও মতানুবর্তন করিয়া চলিতেছেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, অধিকাংশ ভারতবাসীই যদি সনাতনধর্মনিষ্ঠ, তবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বর্তমানে তাহাদের যেরূপ অধঃপতন লক্ষ্য করা যাইতেছে, তাহার জন্য দায়ী কে? সনাতন ধর্ম অনুসরণের ফলে যদি তাহারা সর্বতোভাবে অধঃপতিত ও হীনদশাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে সেই ধর্ম অনুশীলনের সার্থকতা কি? উত্তরে বলা যাইতে পারে সনাতনধর্মোক্ত তত্ত্বগুলি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেও জীবনে সেগুলির যথাযথ অনুশীলনের অভাব এবং কালক্রমে পাশ্চাত্যের ইহসর্বস্বতা বা জড়বাদ প্রথমে কতিপয় ও পরে অধিকাংশ ভারতীয়ের মনোরাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ধর্মবিশ্বাসে ও নিষ্ঠায় শিথিলতা আনয়ন করিয়াছে। যে-কোন কারণবশতঃ হউক, যখন ইহসর্বস্বতা ও ভোগবাদ ত্যাগের আদর্শকে গ্রাস করে, তখন সনাতন ধর্ম এবং তাহা হইতে উদ্ভূত ধর্মমাত্রই, এমন কি যে-কোন সদ্ধর্ম অনুশীলন-শৈথিল্যে, বিশ্বাসরাহিত্যে, কদর্থী-করণে, দৌর্জন্যসম্পাতে, বকধার্মিকতাশ্রয়ে হীনপ্রভ ও গ্লানিগ্রস্ত হইয়া জনজীবনকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়। অবশ্য সনাতন ধর্ম সাময়িকভাবে গ্লানিগ্রস্ত হইলেও চিরবিনষ্ট হইবে না। নিখিল বেদরাশিই সনাতন ধর্মের মূল। বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য অধিকারিভেদে নির্গুণ অথবা সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং প্রসঙ্গতঃ আত্মা, পরলোক ইত্যাদি তত্ত্ব। মানবজীবনের চরম লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান, ঈশ্বরলাভ বা আত্মস্বরূপের যথার্থ অনুভূতি। সেই লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিলে পৃথিবীর যাবতীয় কর্মসম্পাদন কালে ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়। বেদমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের মতে ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রত্যেক মানুষকে তাহার স্বভাব ও অধিকার অনুসারে একনিষ্ঠভাবে কর্তব্য সাধনপূর্বক সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। সনাতন ধর্ম ঈশ্বরলাভ বা আত্মানুভূতিরূপ লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য অধিকারিভেদে প্রবৃত্তি- ও নিবৃত্তি-মার্গ অনুসরণের বিধান দিয়াছেন। প্রবৃত্তিপন্থিগণ শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান এবং শাস্ত্রবিগর্হিত কর্মের পরিহারের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া ক্রমশঃ ঈশ্বরলাভ বা আত্মানুভূতিরূপ লক্ষ্যে অগ্রসর হন। নিবৃত্তিপন্থিগণ পুত্র, বিত্ত ও লোকৈষণারূপ মৌল জৈব ও মানসিক প্রবৃত্তির তাড়না একেবারে অনুভব না করায় বা অত্যল্প-মাত্র করায় স্বার্থাভিসন্ধিমূলক কোন কর্মের অনুষ্ঠান করেন না। তাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত

থাকিয়া আত্মরতি, আত্মারাম হইয়া বসন্ত ঋতুর ন্যায় লোকহিত আচরণ করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকেন অথবা একস্থানে দীর্ঘদিন সাধনভজন ও তত্ত্বপিপাসুদিগকে অধিকারিভেদে যথার্থ ধর্মোপদেশদান করিয়া থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগবত জীবনে নিবৃত্তিধর্ম অপূর্ব পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার দিব্য প্রেমপূত স্পর্শ ও সাহচর্যে একদা নাস্তিকভাবাচ্ছন্নপ্রায়, সংশয়বাদী, পাশ্চাত্য-শিক্ষিতম্মন্যদিগের প্রতিভূ নরেন্দ্রনাথ নিজ সত্তার পরমোৎকর্ষ ও সারবত্তায় ধীরে ধীরে যুগাচার্য মহানায়ক বিবেকানন্দরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তিনি যেন তাঁহার শ্রীগুরু দক্ষিণেশ্বরের শ্রীমন্দিরে ৺ভবতারিণীর পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণের কোমল কমলহস্তে সন্ধ্যারতি-সমাপ্তির গম্ভীর নিনাদ, দীর্ঘারাবী কম্বুরূপে নিখিল বিশ্বের দিগ্‌দিগন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বিচিত্রভাবঘন সমগ্র সত্তাই যেন নরেন্দ্রনাথে বিলীন হইয়া তাঁহাকে রামকৃষ্ণময় করিয়া তুলিল। তিনি সনাতনধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা বলিয়া চিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে তথা সমগ্র পাশ্চাত্যভূখণ্ডে অভিনন্দিত ও পূজিত হইলেন। সমগ্র বিশ্বকে তিনি আত্মার অমরত্বের বাণী শুনাইলেন, সর্বভূতে প্রেমময় ঈশ্বরের ওতপ্রোত অবস্থানের তত্ত্ব প্রচার করিলেন, প্রতি জীবে অনন্ত সম্ভাবনা ও দিব্যধর্মিতা বিদ্যমান এবং মনুষ্যমাত্রেরই নিজ আত্মার দিব্য স্বরূপের অনুভূতিলাভই জীবনের উদ্দেশ্য—এই বার্তা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন। উক্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য জনসেবামূলক নিষ্কাম কর্ম, ঈশ্বরে পরানুরক্তিরূপে ভক্তি, তত্ত্ববিচার ও বিশ্লেষণাত্মিকা জ্ঞানচর্চা এবং প্রাণনিয়মনাদি যোগের রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে যে-কোন একটি, দুইটি, তিনটি বা সবগুলির সম্মিলিত অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বহুবার বলিয়াছেন। তিনি ভারতবাসীদিগকে পরানুবাদ ও পরানুকরণের মোহ ত্যাগপূর্বক ধর্মকেই জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডজ্ঞানে ধর্মানুশীলনের সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চার সমন্বয়সাধন করিয়া পৃথিবীতে ধর্মদানের ব্রতে উদ্বুদ্ধ হইতে আহ্বান করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে সর্বপ্রকার ভয়, জড়তা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা পরিহার করিয়া রজোগুণসম্পন্ন হইতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অজ্ঞ, মূর্খ, দরিদ্র ভারতবাসীকে, মেথর ও চণ্ডাল ভারতবাসীকে 'ভাই' বলিয়া সম্বোধন ও তদুপযুক্ত মর্যাদা দান করিতে তিনি ভারতীয়মাত্রকেই শিখাইয়া গিয়াছেন। তিনি নারীগণকেও সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি প্রাচীন মহীয়সী সতী ভারতীয় ললনাদিগের জীবনাদর্শ অনুসরণ করিতে প্রেরণা দান করিয়াছেন। নরনারীনির্বিশেষে সকল মনুষ্যকে তিনি বেদান্তের মর্মবাণী—আত্মার সচ্চিদানন্দ ভূমা ও অদ্বয় স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে বিশেষভাবে বলিয়াছেন। পাশ্চাত্যকে তিনি বারংবার নিরীশ্বরবাদ বা জড়বাদ পরিহার করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহসর্বস্ব ভোগবাদ ত্যাগপূর্বক আধ্যাত্মিকদৃষ্টিসম্পন্ন না হইলে সমগ্র পাশ্চাত্য আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণজনিত ধ্বংসের তাণ্ডবলীলার ন্যায় এক মহতী বিনষ্টির সম্মুখীন হইতে পারে—এইরূপ সাবধান বাণীর দ্বারা প্রতীচীর মানুষকে তিনি সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। সর্ব ব্যাপারে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করিলে ভারতবর্ষেরও যে অনুরূপ দুর্দশা ঘটিতে পারে—এই কথা তিনি ভারতবাসিমাত্রকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে বলিয়াছেন।

বিবেকানন্দের মতে শিক্ষা বলিতে বুঝায়

প্রতি মনুষ্যে যে পূর্ণতা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান, প্রণালীবদ্ধ সাধনার দ্বারা তাহার বিকাশসাধন এবং ধর্ম বলিতে বুঝায় অজ্ঞান-আবরণ উন্মোচন-পূর্বক প্রতি মনুষ্যে অন্তর্নিহিত দিব্যসত্তার উপলব্ধি বা অপরোক্ষ অনুভূতি। ঐ অনুভূতি-প্রাপ্তির জন্য পূর্বোক্ত কর্ম ভক্তি জ্ঞান ও যোগমূলক সাধনপদ্ধতির স্বকীয় রুচিপ্রবণতা ও অধিকার অনুযায়ী পৃথক্ মিশ্র বা সম্মিলিতভাবে দীর্ঘকালব্যাপী একনিষ্ঠ অনুশীলন অপরিহার্য। তাঁহার মতে লৌকিক শিল্পকলা ও বিজ্ঞান-অনুশীলনেরও মৌল লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রতি ব্যক্তিনিষ্ঠ পূর্ণতার আস্বাদন বা বোধে বোধ। যাবতীয় শিক্ষা ও ধর্মানুশীলন তাঁহার মতে পরিশেষে দেবত্ব, দিব্যভাব বা দিব্যসত্তার পরিপূর্ণতার মহাসাগরে অবগাহন করিয়াই পরিসমাপ্ত ও চিরবিশ্রান্ত হইবে, তাহার পূর্বে নহে। অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে, বিবেকানন্দ-কথিত লক্ষ্য ও আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অথবা উহা গ্রহণ না করিয়া আমরা যতই শিক্ষা ও ধর্মের অনুশীলন করি না কেন, তাহা প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কলহ, জিঘাংসা, সঙ্কীর্ণতা, নীচতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি নানা অনর্থ প্রসব করিয়া বিশ্বের শান্তিভঙ্গ করিবে, এমন কি পরিশেষে সর্বগ্রাসী ধ্বংসও ডাকিয়া আনিতে পারে! বর্তমান পৃথিবীতে কি ধনতান্ত্রিক, কি সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় পূর্বোক্ত লক্ষ্য ও আদর্শভ্রষ্টতা সুপ্রকট হইয়াছে; সুতরাং তথাকথিত বহুল-প্রচারিত ও অনুশীলিত ধনতান্ত্রিক বৈষম্যবাদ অথবা সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদ পৃথিবীতে আত্যন্তিক মঙ্গল ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে কখনও সমর্থ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বার্থাভিসন্ধিকে সকল কর্মপ্রেরণার উৎস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আবার ব্যক্তিস্বার্থের সিদ্ধি ও পরিরক্ষণে আনুকূল্য করে বলিয়াই সাধারণতঃ সমষ্টি-স্বার্থের মর্যাদা বহুল পরিমাণে স্বীকৃত হয়। কিন্তু স্বার্থটি যদি জৈবিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক—এই ত্রিবিধ স্তরকে অতিক্রম করিতে না পারে, তবে তাহা পুনঃ পুনঃ পর্যায়ক্রমে স্বৈরাচার ও গণপ্রাধান্যের অভ্যুত্থান ঘটাইবে। স্বৈর শাসনের প্রভুত্ব ও উচ্ছৃঙ্খলতায় জর্জরিত হইয়া সমষ্টিশাসন বা গণশাসন কেবল বর্তমানেই নহে, অতীতেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতেও হইবে। পুনশ্চ গণশাসনের শিথিলতায় বা নির্বুদ্ধিতায় মাৎস্যন্যায় প্রবর্তিত হইবার ফলে প্রবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করিতে থাকিলে পৃথিবীতে বারংবার রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহা সম্ভবতঃ একটি প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে করেন। পক্ষান্তরে স্বার্থটি যদি উক্ত ত্রিবিধ স্তর অতিক্রম করিয়া যথার্থ আত্মস্বরূপের অনুসন্ধিৎসায় নিরত থাকে, তবে তাহার মূলে থাকে ত্যাগ, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা প্রভৃতি দিব্যভাবসমূহ। সনাতন ধর্মের প্রতিভূ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার শ্রেষ্ঠ বার্তাবহ ও ভাষ্যকার আচার্য বিবেকানন্দ অতীতের ধর্মচেতনায় বর্তমান বিশ্বে সামগ্রিক কল্যাণপ্রতিষ্ঠার জন্য একটি উদার, সর্বজনীন, যুগোপযোগী চিন্তা ও কর্মসূত্রের সংযোজনা করিলেন। স্বরূপানুভূতির জন্য ত্যাগের সঙ্গে সেবা 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। এই অভিনব চিন্তা ও কর্মসূত্রটিকে আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক সাম্যের ভিত্তি বলা যাইতে পারে। এই অপূর্ব সূত্রটি কেবলমাত্র সন্ন্যাসী বা অত্যাশ্রমীর পক্ষেই যে প্রযোজ্য তাহা নহে, পরন্তু যে-কোন বর্ণাশ্রমীর পক্ষেই কি ঐহিক কি পারত্রিক সর্ববিধ কল্যাণলাভের জন্য প্রযোজ্য। ইহাতে একাধারে তিনটি বিষয়

রহিয়াছে—আত্মমুক্তি, ত্যাগ ও সেবা। স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে মনুষ্যমাত্রই এই তিনটির অনুশীলনের দ্বারা নিজের ও সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে এবং সামাজিক রাষ্ট্রিক তথা বিশ্বজনীন শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন। ত্যাগ ও সেবা আত্মমুক্তি বা ঈশ্বরানুভূতিলাভের অনুকূল না হইলে যথার্থভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না এবং তাহারা সাময়িক কল্যাণ সাধন করিলেও পরিশেষে বহুবিধ অনর্থ প্রসব করিবেই। আত্মস্বরূপানুভূতিরূপ লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইলে পরিণামে দম্ভ, দর্প, ঈর্ষা, সঙ্কীর্ণতা, প্রভুত্বস্পৃহা, যশোলিপ্সা প্রভৃতি আসিয়া মানুষকে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির সেবার অনুশীলন-বর্জিত আত্মমুক্তিপ্রয়াসও নিষ্ফল। আত্মমুক্তি-রূপ লক্ষ্যে মনঃস্থির করিয়া ত্যাগ ও সেবার অনুশীলন না করিলে চিত্তমল বিদূরিত হইবে না। চিত্তের মালিন্য দূরীভূত না হইলে আত্মস্বরূপাবধারণ দুঃসাধ্য হইবে।

বিবেকানন্দের অধ্যাত্মচেতনায় সেবার আদর্শটি অভিনব ও পরমশ্রেয়োভাব-বিমণ্ডিত হইয়াছে। পূর্বে অত্যাশ্রমিগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে আত্মমুক্তির সহায়করূপে জনকল্যাণ-মূলক সেবাবৃত্তির অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা তাদৃশ অনুভূত হয় নাই। তাঁহারা ভজন-পূজন, জপ-তপঃ, ধ্যান-ধারণা, তীর্থসেবন, শাস্ত্রের শ্রবণ-মনন, ভাগবত-ভক্ত সেবন প্রভৃতিকেই ভগবল্লাভ বা আত্মমুক্তির প্রকৃষ্ট উপায় মনে করিতেন। "যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্"—এই তত্ত্বসিদ্ধান্তটি ব্যবহারিকভাবে সর্বসাধারণ্যে পরিপালিত হইবার সুযোগলাভ করে নাই। মনুষ্যচেতনায় ঈশ্বরপূজন ও জনকল্যাণমূলক কর্মসমূহ পৃথক্‌স্তরীয় বলিয়াই পরিগণিত হইত। "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম-সমাধিনা"॥—এই ক্রিয়া-কর্ম-অধিকরণ-কর্তা প্রভৃতিতে ব্রহ্মকর্মসমাধিযোগে ব্রহ্মদৃষ্টির কর্তব্যতাজ্ঞাপক শ্রীভগবদ্‌বাক্য প্রকৃতপক্ষে সর্বসাধারণ্যে ব্যবহারিক ও সামাজিক মর্যাদা লাভ করে নাই। কর্মে উপাসনাবুদ্ধির আরোপ বা কর্ম ও উপাসনায় অভেদবুদ্ধি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত হইলেও সমাজের সর্বস্তরে প্রতিকার্যে উহার ব্যবহারিক প্রয়োগের সবিশেষ উপযোগিতার কথা বিবেকানন্দ ভিন্ন কেহই দৃঢ়তার সহিত প্রচার করেন নাই। ইহাই তৎ-প্রচারিত কর্মপরিণত বেদান্তসিদ্ধান্ত। কোনও মতবাদ কর্মপরিণত না হওয়া পর্যন্ত সার্থক হয় না। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই সর্বব্যাপক শ্রুতি-বাক্যটিকে অপরোক্ষবোধে বিশ্রান্ত বা সমাপ্ত হইতে হইলে সর্বজীবের ও মনুষ্যের প্রত্যেক আচরণে আত্মদৃষ্টি বা ব্রহ্মধ্যানপরায়ণতার নিরন্তর অভ্যাস অপরিহার্য। এই জন্য বিবেকা-নন্দের মতে নরে নারায়ণবুদ্ধিতে, জীবে শিববুদ্ধিতে রুচিপ্রবণতা ও সামর্থ্য অনুসারে সেবা মনুষ্যমাত্রেরই অশেষকল্যাণপ্রদ এবং স্বীয় দিব্যস্বরূপানুভূতিলাভের একান্ত সহায়ক। প্রশ্ন উঠিতে পারে, স্বামীজী কর্তৃক বিঘোষিত শিক্ষা ও ধর্মলক্ষণের অন্তর্ভুক্ত পূর্ণত্ব ও দেবত্ব মনুষ্যমাত্রে পূর্ব হইতেই কি বিদ্যমান অথবা ঐ দুইটি প্রকৃতপক্ষে শূন্যগর্ভ হইয়াও তাহাকে শিক্ষা ও ধর্মে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কি আহার্য-ভাবনামাত্র? আরও প্রশ্ন এই, স্বামীজী-কথিত পূর্ণত্ব ও দিব্যত্ব কি তাৎপর্যতঃ ভিন্ন অথবা অভিন্ন? পুনশ্চ প্রশ্ন, ঐ দুইটি যদি পূর্ব হইতেই মনুষ্যে বিদ্যমান, তবে উহাদের অভিব্যক্তি বা প্রকাশের দ্বারা কোন্ পরমার্থ সিদ্ধ হইবে?

উত্তরে বলা যাইতে পারে অদ্বৈতবেদান্ত-দৃষ্টিতে জীবমাত্রে পূর্ব হইতেই পূর্ণত্ব ও দিব্যত্ব সুপ্ত অবস্থায় থাকে, সুতরাং মনুষ্যমাত্রে উহাদের পূর্ব হইতে বিদ্যমানতা অদ্বৈতবেদান্ত সম্মত; কিন্তু উহারা শূন্যগর্ভ হইলে উহাদের আহার্য ভাবনা স্থায়িফলপ্রসূ হইতে পারিত না। বস্তুতঃ বিবেকানন্দ-কথিত উক্ত শিক্ষা ও ধর্ম লক্ষণাক্রান্ত পদার্থদ্বয় চিরকালই তাত্ত্বিকগণের স্বসংবেদ্য সত্যরূপে নিঃসন্দেহে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। উক্ত পূর্ণত্ব ও দিব্যত্ব তাৎপর্যতঃ ভিন্নও নহে! অদ্বৈতবেদান্ত দৃষ্টিতে জীব ও ব্রহ্মে পারমার্থিক ভেদ নাই। ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়া সমরস, স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত তত্ত্ব। অতএব তাঁহাকে পূর্ণ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। যাহা পূর্ণ তাহা স্বরূপতঃ সর্ববিধমালিন্যরহিত বলিয়া দিব্যও বটে, এবং একমাত্র ব্রহ্মই তদ্রূপ, সুতরাং পূর্ণত্ব ও দিব্যত্ব তাৎপর্যতঃ অভিন্ন।

অধুনাপ্রচলিত সাম্যবাদ জড়ভিত্তিক; ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক প্রভৃতির ধারণা ভীতি- ও ভ্রান্তি-মূলক বলিয়া আধুনিক সাম্যবাদিগণ মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের স্বীকৃত ও ব্যাখ্যাত মতবাদে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ ধনতন্ত্রের প্রতি ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, বিদ্বেষ প্রভৃতির দ্বারা সঙ্কুচিত ও কলুষীকৃত! সকল মনুষ্যের পৃথক্ পৃথক্ রুচিবোধ, প্রবণতা, স্বাধীন চিন্তাধারা ও স্বাধীন মতামত-প্রকাশের ক্ষেত্রে বহু বিধি-নিষেধ আরোপিত হওয়ায় প্রচলিত সাম্যবাদ যান্ত্রিকতায় ও তদনুসারিগণ যন্ত্রে পর্যবসিত। সকল মনুষ্যের সমান সুযোগ, সমান অধিকার কেন প্রাপ্য, একজন কেন অপরকে অত্যাচার ও শোষণ করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করিবে না, ইত্যাদি প্রশ্নের সদুত্তর প্রচলিত সাম্যবাদ দান করিতে অপারগ

সর্বকালে সর্বত্র, সকল পদার্থে ও জীবে বেদান্তোক্ত এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বা আত্মা ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান—এই তত্ত্বটি স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার অননুকরণীয় বাগ্‌ভঙ্গী ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন। ব্যবহারিক দশা অতিক্রম করিয়া পারমার্থিক দশায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত আলোক-অন্ধকার, শীত-উষ্ণ, জ্ঞান-অজ্ঞান, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বান্দ্বিক বিষয়সমূহ এবং উহাদের অনুভূতিগুলি সত্য বলিয়াই প্রায়শঃ সকলে মনে করিয়া থাকেন। নানাবৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বচরাচর পরমার্থতঃ সত্য না হইলেও ব্যবহারতঃ অনৃত বলিয়া কেহই মনে করেন না। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সনাতন, পূর্ণ, দিব্য, চেতন, অদ্বয় আত্মা বা ব্রহ্মে অধ্যস্ত বা কল্পিত হইয়াও ব্যবহারদশায় সত্য বই মিথ্যা বলিয়া কখনও প্রতীয়মান হয় না। জন্ম মৃত্যু, ইহলোক-পরলোক, বন্ধন-মুক্তি, পাপ-পুণ্য ব্যবহারিকভাবেই সত্য, পারমার্থিকভাবে নহে—ইহাই বৈদিক সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তে যে সত্য তাহা স্বামীজীও প্রত্যক্ষ ও অখণ্ডনীয় যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ব্যবহারিক দশা হইতে পারমার্থিক দশায় উপনীত হইবার সম্ভবতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় স্বামীজীর মতে প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে—যেহেতু তাহারা পরিনিষ্পন্ন অদ্বৈত-তত্ত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত নহে—তাত্ত্বিক জীবব্রহ্মের অভেদানুভূতিলাভের অঙ্গীভূত কর্ম-পরিণত বেদান্তবাদের আশ্রয়-গ্রহণ। তাত্ত্বিক জীবব্রহ্মাভেদজ্ঞান নারায়ণ-জ্ঞানে নরের বা শিবজ্ঞানে জীবের সেবা বা পূজার মধ্য দিয়া কোনও এক শুভ মুহূর্তে অবশ্যই সকল কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া সাধকের নিকট সুপরিস্ফুট হইবে। প্রতিটি মানুষ আপনাতে নিগূঢ় ঔপনিষদ আত্মস্বরূপ অনুসন্ধানের জন্য স্বামীজী-প্রবর্তিত ও ব্যাখ্যাত

কর্ম-পরিণত বেদান্তবাদের নিরলস ও অকৃত্রিম অনুশীলনে যত্নবান হইলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটি অনবদ্য শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য গড়িয়া উঠিবে, যাহার ফলে এক-নীড়াবস্থিত পক্ষিশাবকদিগের ন্যায় বিশ্বের অন্তর্গত সকল মনুষ্যের—এক পরম নির্ভয়, শান্তিময়—দৈহিক ও মানসিক ক্রম-বিকাশের প্রকৃষ্টতম সুযোগ-প্রাপ্তির একান্ত অনুকূল পরিবেশ ও আশ্রয় রচিত হইবে। জড়বাদমূলক সাম্যবাদ প্রতিপক্ষীয় ধনতান্ত্রিক বৈষম্যদূরীকরণের নিমিত্ত প্রয়োজন হইলে বলপ্রয়োগের আশ্রয়গ্রহণও নীতিগতভাবে স্বীকার করে। পক্ষান্তরে ধনতন্ত্রমূলক স্বৈরাচার সকল মনুষ্যের আত্মবিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক দাবিগুলিকে মর্যাদা ও স্বীকৃতিদান না করিয়া নিজ প্রভুত্ব ও স্বার্থকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য দুর্বল অসহায় সাধারণ মানুষ-দিগের উপর নির্যাতন ও উৎপীড়ন চালাইতে দ্বিধাবোধ করে না। প্রচলিত সাম্যবাদ ও ধনতন্ত্র জৈবিক মানসিক ও বৌদ্ধিক স্তর-সমূহে আপনাদিগকে অর্গলরুদ্ধ করিয়া রাখে বলিয়া এবং ঐরূপ রাখা ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর নাই বলিয়া সর্বসুখনিলয়, সর্ব-সংশয়চ্ছেদী, সর্ববাসনার পরিনির্বাণরূপ ও সর্ববন্ধনবিদ্রাবক অতীন্দ্রিয় সেই পরাবর পুরুষের পরম পদের সন্ধান প্রদান করিতে, জীবনের চরম লক্ষ্য দেখাইতে একান্তই অক্ষম।

“একমেবাদ্বিতীয়ম্”, “সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অনুপম ও অচিন্তনীয় সাম্যপ্রতিষ্ঠার দ্বার অবারিত করিয়া দিয়াছে। বর্তমানযুগোপযোগী শিববোধে জীবসেবারূপ কর্ম-পরিণত বেদান্ত প্রচার করিয়া মহানায়ক স্বামী বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতার পথে সকলের সঙ্গে নিজের একত্ববোধের মাধ্যমে সাম্যের ভিত্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। একমাত্র ইহার আশ্রয়েই ক্রমশঃ বিশ্বের সকল মানুষই নিজ নিজ দিব্য ও পূর্ণ স্বরূপের উপলব্ধি করিয়া সর্বমানবের চির-বাঞ্ছিত শাশ্বত আনন্দ ও শান্তি লাভ করিতে এবং সামগ্রিক ভাবে মানবজাতিকে উহা লাভের প্রচেষ্টায় সহায়তা করিতে সমর্থ হইবে।

ব্যাকরণ-কথা

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীকালীজীবন চক্রবর্তী

খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের মধ্যভাগে সুপদ্ম ব্যাকরণ প্রণীত হয়। প্রণেতা দ্বিজ পদ্মনাভ দত্ত ছিলেন মিথিলার ভোর গ্রামের অধিবাসী। পাণিনির ভিত্তিতে রচিত এই ব্যাকরণ অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রাদিরই সরলীকৃত রূপায়ণ-স্বরূপ। ইহাতে অনুসৃত সংজ্ঞা বিজ্ঞানও অষ্টাধ্যায়ীর অনুরূপ। অন্য অনেক ব্যাকরণের তুলনায় ইহাতে ভাষ্য-বার্তিকের মতানুগত্য অধিক লক্ষিত হয়। সূত্রসংখ্যা ন্যূনাধিক ২৮০০। বিভিন্ন সংখ্যা ২৭৯৮ হইতে ৮৪৪ পর্যন্ত পাওয়া যায়। বিষয়-বিন্যাস ভাষা-শিক্ষার অনুকূল। কারক, বিভক্তি, সমাস ও তদ্ধিতপ্রকরণ অতিশয় প্রাঞ্জল ও পরিপাটী। মিথিলায় রচিত হইলেও বঙ্গদেশের খুলনা, যশোহর, নৈহাটি ও ভাটপাড়াতেই ইহার প্রচলন সীমাবদ্ধ। পদ্মনাভ স্বয়ং ইহার বৃত্তিকার। সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা বিষ্ণু মিশ্র। তাঁহার ব্যাখ্যার নাম সুপদ্ম-মকরন্দ। ইহা ৭টি বিন্দুতে (অর্থাৎ বিভাগে) বিভক্ত। পদ্মনাভ ব্যাকরণের সম্প্রদায়-নিষ্পত্তি করিয়া গিয়াছেন।

১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের নির্দেশে পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য বিদ্যাবাগীশ প্রয়োগ-রত্নমালা নামক ব্যাকরণ রচনা করেন। ইহাতে উত্তম প্রয়োগ-রূপ রত্নসমূহের সমাবেশ ঘটায় এইরূপ নাম। পাণিনি ও কাতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত এই ব্যাকরণে কাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যই বেশী। কয়েক স্থানে চান্দ্র-মতও গৃহীত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থাদি হইতে উদ্ধৃতি-প্রদানেও পুরুষোত্তমের সবিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। এই ব্যাকরণের আরও একটি বৈশিষ্ট্য পদ্যময়তা। সমগ্র সূত্রপাঠ মূলতঃ বিভিন্ন ছন্দে নিবদ্ধ কতকগুলি শ্লোক বা কারিকার সমষ্টি। এই শ্লোকগুলিকে নানা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অংশে বিভক্ত করিয়া এক একটি পৃথক সূত্র কল্পিত হইয়াছে। কেবল সূত্রাংশই নয়, ইহার বৃত্তি ভাগও অনেক স্থলে শ্লোকাত্মক। বর্তমানে ইহাই সর্ববৃহৎ ছন্দোবদ্ধ ব্যাকরণ। বিষয়-বিন্যাস সংস্কৃত-শিক্ষার্থীর সবিশেষ অনুকূল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের পূজ্যপাদ 'ছয় গোসাঁই'-র অন্যতম শ্রীজীব গোস্বামী (১৫১১—১৫৯৬) খৃষ্টীয় ১৬শ শতকের শেষ দিকে 'হরিনামামৃত' ব্যাকরণ রচনা করেন। ইনি বিখ্যাত রূপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অদ্বিতীয় বৈষ্ণব পণ্ডিত। পরম ভাগবত সনাতন গোস্বামী সর্বপ্রথম এই ব্যাকরণের যে একটি সংক্ষিপ্ত রূপ প্রস্তুত করেন তাহারই অবলম্বনে শ্রীজীবের এই ব্যাকরণ রচিত হয়। ইহার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য সূত্র এবং উদাহরণাদিতে, বিশেষতঃ সংজ্ঞারচনায় যতদূর সম্ভব হরি এবং তদানুষঙ্গিক দেব-দেবীর নামের ব্যবহার। ব্যাকরণের পাঠ নেওয়ার সুযোগেও যাহাতে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই পরিকল্পনা। মোট সূত্রসংখ্যা ৩১৯২। মূলতঃ পাণিনি এবং কলাপের অনুসরণে রচিত হইলেও ইহাতে পাণিনির প্রত্যাহার গৃহীত হয় নাই। তৎ-পরিবর্তে কলাপের সিদ্ধবর্ণপাঠই ইহাতে অনুসৃত। স্থলবিশেষে পাণিনি-সূত্রই অবিকল এবং কোথাও বা সামান্য পরিবর্তনসহ উদ্ধৃত।

পাণিনি হইতে আরম্ভ করিয়া সুপদ্ম পর্যন্ত বিস্তৃত ব্যাকরণ-ক্ষেত্রের যাবতীয় প্রধান গ্রন্থ ও বিশিষ্ট মতাদির আলোচনাপূর্বক রচিত হইলেও ইহার বৃহদংশ অতি প্রাঞ্জল ছবিনামাত্মক সংজ্ঞার সমাবেশ করিয়াও প্রায় প্রত্যেক স্থলেই সেই সব সংজ্ঞার কাতন্ত্রীয় এবং পাণিনীয় সংজ্ঞা নামও প্রদত্ত হইয়াছে। ফলে নূতন সংজ্ঞার ব্যবহারবর্জিত অসুবিধার সম্ভাবনা এখানে খুবই কম। নূতন সংজ্ঞার ক্ষেত্রে সংজ্ঞার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংজ্ঞা নির্দেশক নামের অধিকারী দেব দেবী বা বস্তুর চরিত্রগত এবং ক্রিয়াকলাপ-ঘটিত সাদৃশ্যের প্রতি যতদূর সম্ভব লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। নিতান্ত নিরুপায়ে কেবল দেব দেবীর নাম ব্যবহার করা হয় নাই।

অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রগুলিকেও সহজে ভাষা-শিক্ষার উপযোগী বিষয়-বিন্যাস-ক্রমে সজ্জিত করিবার একটা প্রচেষ্টাও যে এই যুগেই আবদ্ধ হইয়াছিল তাহার প্রথম প্রমাণ ধর্মকীর্তির 'রূপাবতার' ব্যাকরণ। ইহার অধ্যায়গুলির নাম 'অবতার'। প্রথমে সংজ্ঞাবতার, পরে ক্রমে সংহিতাবতার, বিভক্ত্যবতার, অব্যয়াবতার ইত্যাদি। খৃষ্টীয় ১২শ শতকের শেষভাগ অথবা ১৩শ শতকের প্রারম্ভ ইহার রচনা-কাল। এই-জাতীয় প্রচেষ্টার পরবর্তীফল বিমল সরস্বতীর 'রূপমাল ব্যাকরণ', রামচন্দ্রের 'প্রক্রিয়াকৌমুদী', ভট্টোজি দীক্ষিতের 'বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদী' এবং নারায়ণভট্টের 'প্রক্রিয়া-সর্বস্ব'। রূপমালা এবং প্রক্রিয়া-কৌমুদী প্রায় একই সময়ে (খৃষ্টীয় ১৫শ শতক) রচিত। রূপমালার প্রকরণগুলির নাম 'মালা', যেমন -সংজ্ঞামালা, অজন্তমালা ইত্যাদি। কাহারও মতে ইহার রচনা-কাল ১৩৫০ খৃষ্টাব্দের পরে নয়। রূপাবতার ও রূপ-মালার তুলনায় প্রক্রিয়া-কৌমুদী অধিকতর প্রসিদ্ধ এবং প্রামাণিক। পরবর্তী সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর ভিত্তি এই প্রক্রিয়াকৌমুদী। ইহার একাধিক টীকা বর্তমান। অন্ধ্রদেশে এক বিখ্যাত পণ্ডিত-বংশে রামচন্দ্রের জন্ম।

এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু পাণিনির সমস্ত সূত্র আদৃত হয় নাই। প্রয়োজনবোধে সুবিধা-নুসারে অনেক সূত্র বাদ দেওয়া হইয়াছে। ভট্টোজির সিদ্ধান্তকৌমুদীই এইজাতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে কিন্তু অষ্টাধ্যায়ীর কোন সূত্রই বাদ দেওয়া হয় নাই, পরন্তু ত্রিমুনি ব্যাকরণের সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য একাধারে সম্মিলিত করা হইয়াছে। প্রক্রিয়া-সর্বস্বেও অষ্টাধ্যায়ীর সমস্ত সূত্র প্রক্রিয়া-নিবদ্ধ করা হইয়াছে। ২০ খণ্ডে বিভক্ত এই প্রক্রিয়া-গ্রন্থের রচয়িতা মালাবারের চন্দনকবুগ্রাম নিবাসী নারায়ণ ভট্ট (১৫৬০-১৬৬৬ খৃঃ অব্দ)। সিদ্ধান্তকৌমুদীর পরে রচিত হইলেও গুণগরিমায় ইহা সিদ্ধান্তকৌমুদীকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।

বারাণসী-বাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লক্ষ্মীধর ভট্টের ঔরসে ভট্টোজির জন্ম। তাঁহার জীবৎকাল একমতে ১৫৫০—১৬৩০ খৃঃ অঃ, অন্যমতে ১৫৭০ হইতে ১৬৩৫। তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। ব্যাকরণে তিনি শব্দকৌস্তুভ, প্রৌঢ়মনোরমা (সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর টীকা), ধাতুপাঠ-নির্ণয়, লিঙ্গানু-শাসনবৃত্তি, ক্রিয়াপদ নিঘণ্টু, প্রভৃতি রচনা করেন। শব্দ-কৌস্তুভ অষ্টাধ্যায়ীর ক্রমানুযায়ী সূত্র-ব্যাখ্যা। তাঁহার দক্ষিণভারতীয় ছাত্র বরদরাজ সিদ্ধান্তকৌমুদীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ-স্বরূপ 'লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী', 'মধ্যসিদ্ধান্তকৌমুদী' এবং 'সার-সিদ্ধান্তকৌমুদী' রচনা করেন।

ভট্টোজির ব্যাকরণ-চর্চাকে কেন্দ্র করিয়া তদীয় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এবং তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্য ও গ্রন্থাদির টীকা-টিপ্পনীকার সহ যে বিরাট ব্যাকরণ-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে,

তাহার প্রভাব অদ্যাপি বিদ্যমান। ইহাকে সংক্ষেপে পাণিনীয় 'কৌমুদী-সম্প্রদায়' বলা যায়। ভট্টোজির পৌত্র হরিদীক্ষিতের ছাত্র ১৭শ-১৮শ খৃঃ শতাব্দীয় নাগেশভট্ট এই সম্প্রদায়ের শেষ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। ইনিও মারাঠী ব্রাহ্মণ। সাতারা জেলার তাসগাঁও নামক স্থানে ইঁহার জন্ম। প্রয়াগের নিকটে শৃঙ্গবের-পুরের রাজা রামবর্মা ছিলেন নাগেশের শিষ্য। ইঁহারই প্রধান সভাপণ্ডিতরূপে নাগেশ নানা বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। শেষ বয়সে কাশীতে ক্ষেত্রসন্ন্যাস অবলম্বন-পূর্বক অবস্থান-কালীন তাঁহার দেহত্যাগ হয়। ইহা ১৮শ খৃঃ শতকের প্রথম পাদের ঘটনা। কোনও স্বতন্ত্র ব্যাকরণ রচনা না করিলেও তিনি ব্যাকরণের নানা বিষয়ে এবং ব্যাকরণ-দর্শনে বিশালকায় একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা। ইহাদের মধ্যে মহাভাষ্য-প্রদীপের 'উদ্দ্যোত'-টীকা (এক কথায় 'মহাভাষ্য-প্রদীপোদ্দ্যোত') সিদ্ধান্তকৌমুদীর বৃহৎ ও লঘু ভেদে 'শব্দেন্দু-শেখর'-টীকা, 'পরিভাষেন্দুশেখর' এবং ব্যাকরণ-দর্শনে বৃহৎ ও লঘু ভেদে 'বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্ত-মঞ্জুষা', 'পরমলঘুমঞ্জুষা' এবং 'স্ফোটবাদ' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বহুদর্শী ভট্টোজির বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত-কৌমুদী পূর্ণাঙ্গতা এবং বিষয়-বিন্যাসের দিক্ দিয়া পূর্ববর্তী সমস্ত ব্যাকরণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও সরলতায় শ্রেষ্ঠ নয়। ইহা অনেক স্থলে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে তো বটেই, অনেক পণ্ডিতের পক্ষেও দুর্বোধ্য। স্থানে স্থানে তিনি এমন সব বিষয়ের বা আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন যাহা বুঝিতে হইলে পরবর্তী সূত্রের এমন কি অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র-বিন্যাস-ক্রম সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা দরকার। কোথাও স্বীয় অভিপ্রায় তিনি এত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাহার ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত-ময়তা তীক্ষ্ণবুদ্ধি বহুদর্শী ভিন্ন অপরের নিকটে নিষ্ফল। সমগ্র ব্যাকরণ-সমুদ্র মন্থন করিয়া তিনি যে অমৃত আহরণ করিয়াছেন, বলা বাহুল্য তাহা তিনি সর্বত্র সকলের নিকটে অনায়াসলব্ধ রূপে উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ কলাপ, মুগ্ধবোধাদি অন্য ব্যাকরণের তথা ন্যায়-দর্শনাদি শাস্ত্রের জ্ঞান ব্যতীত সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধান্তকৌমুদীকে অধিগত করা অসম্ভব বলিলে এমন কিছু অত্যুক্তি হয় না। মোট কথা ইহা যেমনটি হইতে পারিত ঠিক তেমনটি হয় নাই, অর্থাৎ বহু-আকাঙ্ক্ষিত চরম উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। তাই ইহার পরে আবার ইহারই সংক্ষিপ্ত রূপায়ণ লঘুকৌমুদী প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। কারণ এই যুগের বাস্তব লক্ষ্য সরল সংক্ষিপ্ত অথচ সমগ্র ব্যাকরণ-রচনার দিকে।

পাণিনির পরবর্তী বৈয়াকরণদের মধ্যে কেহই শব্দবিজ্ঞান-বিষয়ে পাণিনি-নিরপেক্ষ বিশেষ কোনও মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তবে কেহ বিষয়-বিন্যাসে, কেহ বা নূতন নূতন সংজ্ঞাবিধানে, আবার কেহ বা সূত্রের সরলীকরণ ইত্যাদিতে কিছু কিছু অভিনবত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। শব্দ-ঘটিত মৌলিকতার অভাবের প্রধান কারণ পাণিনির পরে সংস্কৃত ভাষা নানা কারণে নিজের স্বাভাবিক জীবনীশক্তি হারাইয়া ফেলে। আর পাণিনিও স্বীয় অলৌকিক প্রতিভাবলে এই ভাষার এমন সর্বগ্রাসী ব্যাকরণ রচনা করিলেন যে, উহার পরে নূতন করিয়া বলিবার মধ্যে বিশেষ কিছুই আর বাকী রহিল না। পাণিনি-তন্ত্রের দ্বারা শিষ্ট ভাষা চিরতরে সর্বতোভাবে বিধিবদ্ধ হইয়া রহিল। এই অবস্থায় পরবর্তী বৈয়াকরণদের পক্ষে

উহারই ভিত্তিতে নূতন নূতন সরলতর ব্যাকরণ রচনা করিয়া সংস্কৃতভাষা-শিক্ষার পথ সুগম করা ভিন্ন অন্য কিছুই করণীয় ছিল না। এই কারণে কত অল্প সময়ে এবং কত সহজ উপায়ে এই কার্য সমাধা করা যায় তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেই ইহাদের সমস্ত বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভা নিয়োজিত হইয়াছে। পাণিনি-পরবর্তী ব্যাকরণ ধারার ইতিহাস মূলতঃ এই প্রচেষ্টারই ইতিহাস, যাহার শেষ পরিণতি বিদ্যাসাগর মহাশয়-রচিত ব্যাকরণ কৌমুদী-জাতীয় গ্রন্থে।

অবারিত দ্বার

শ্রীকালিদাস রায়

দুয়ার রেখেছি খুলে অবারিত দ্বারে
যার খুশি সেই যেন প্রবেশিতে পারে।
এ ঘরে দুদণ্ড রহি মোরে সঙ্গ দিয়া
মরমের কথা তার যায় সে বলিয়া।
পশিবে ঝড়ের ঝাপ্টা ধূলিবালি বহি
সেই ভয়ে দ্বার রুধি' কেমনে বা রহি।
আসিবে কখন কোন অবাঞ্ছিত জন
সেই ভয়ে রুধি নাহি দ্বার-বাতায়ন
আসে শাস্ত্রী আসে মিস্ত্রী, শিল্পী কবি কুলি
সকলেরই তরে আমি দ্বার রাখি খুলি।
ধৈর্য ধরি শুনি আমি সবার ভাষণ
সকলেরে দিই আমি সমান আসন।
দুদণ্ডের অতিথিরা কোথা চলে যায়
পদচিহ্ন রেখে যায় মোর আঙিনায়।

নিবেদিতার সমাজচিন্তা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

নিবেদিতার মতে এই সমন্বয়েই বিবেকানন্দের জীবনের গভীর তাৎপর্য। নিবেদিতার মতে ধর্ম-মহাসভায় বিবেকানন্দ যে অদ্বৈত মতবাদের প্রচার করেছিলেন তার মুখ্য বাণী হ'ল এই যে, বহু ও এক—একই সত্যের প্রকাশ। এ বাণীর নিবেদিতার মতে যুগান্তকারী তাৎপর্য আছে। এই বাণীই বিবেকানন্দের সমন্বয়-সাধনের স্বর্ণসূত্র। নিবেদিতা এই বাণীর যে ভাষ্য রচনা করলেন তা হ'ল—"If the many and the one be indeed the same Reality, then it is not all modes of worship alone, but all modes of work, all modes of struggle, all modes of creation, which are paths of realisation."[১] জীবনে যে-কোন পথই সত্যানুভূতির পথ—যে-কোন উপাসনাবিধি, যে-কোন কর্মবিধি, যে কোন সংগ্রাম, সর্বপ্রকার সৃজনমূলক কর্ম মানুষকে একই লক্ষ্যে উত্তীর্ণ করবে। তাহ'লে আর কোন কিছুই লৌকিক থাকে না, কোন কর্মই secular নয়। সকল কর্মই আধ্যাত্মিক। বিবেকানন্দের ভাষায়—"God is everything, where else shall we go to find Him? He is already in every work, every thought, in every feeling!" নিবেদিতার ভাষ্য: "No distinction henceforth between sacred and secular. To labour is to pray. To conquer is to renounce. Life is itself religion."[২] তখন শ্রম করা এবং প্রার্থনা করা—এ উভয় কার্যের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। যে কোন কর্মই পুণ্যকর্ম। কর্ম আর উপাসনা তখন এক ও অভিন্ন হ'য়ে দাঁড়ায়। মানুষের সেবা আর শিবের পূজায় কোন পার্থক্য থাকে না। সেজন্য সাধুর কুঠিয়ার মতো, দেবালয়ের মতো কারখানা আর খামার ভগবৎ-পূজার মন্দির হ'য়ে দাঁড়ায়। নিবেদিতার ভাষায়—"To him the workshop, the study, the farmyard and the field are as true and fit scenes for meeting God with man as the cell of the monk or the door of the temple."[৩] বিবেকানন্দের কাছে এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে ভগবানের মন্দির নেই। মানুষের সকল কর্ম, জীবনের যে-কোন ক্ষেত্র, মানুষের সকল চিন্তা-ভাবনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, তার সমাজ-সংসার-গৃহ সকলই পবিত্র পুণ্য, সব পুণ্যতীর্থ।

আর এই যে সারা জগৎময় পবিত্র তীর্থ তার দেবতা হ'ল মানুষ। বিবেকানন্দের ভাষায় মানবপ্রকৃতির মহিমার অন্ত নেই—"Never forget the glory of Human Nature! We are the greater Gods·· Christs and Budhas are but waves on the boundless Ocean which I am." বুদ্ধ এবং খৃষ্ট প্রভৃতি দেবমানবগণ সেই অনন্ত মহিমা সাগরের এক একটি তরঙ্গমাত্র।

---

১ Complete Works of Swami Vivekananda—Vol. I, Introduction.

২ Complete Works of Swami Vivekananda—Introduction. ৩ Ibid.

এ এক অপূর্ব বিশ্বজনীন প্রসাদযুক্ত নূতন জীবনবাদ। প্রকৃতপক্ষে এ হ'ল অপূর্ব এক মানবতাবাদ বা মানব ধর্ম। এ ধর্মশাস্ত্র-পুরোহিত- মন্দির-নিরপেক্ষ এক জীবনধর্ম, যেখানে মানবের মর্যাদা সর্বাধিক। সেজন্য এ ধর্ম সকল মানুষের, জীবনের সর্বাবস্থায় অবস্থিত সকল মানুষের ধর্ম— সন্ন্যাসীর আবার গৃহস্থের, ধর্ম শ্রমী মানুষের আবার কর্মীর, শিল্পীর, শ্রমিকের, কৃষকের। সেজন্য এ ধর্মে কোন বিশেষ সুবধার স্থান নেই, ধর্মের ক্ষেত্রে বিশেষ অধিকারের বাণী এখানে অচল। এ ধর্মে আছে সকল মানুষের সমান অধিকার, আর এতে আছে সকল মানুষের সমান প্রয়োজন। এ ধর্মের বাণী হ'ল—"কেউ ছোট নয়, কেউ তুচ্ছ নয়, কেউ পাপী নয়,—সকলেরই বড় হবার এবং মহৎ হবার অনন্ত সম্ভাবনা আছে।" এর চেয়ে বড় আশার বাণী মানুষের কাছে আর কি আছে? যে সামান্য মানুষ দিন আনে দিন খায়, যে ভুল করে, প্রলোভনে প্রলোভিত হয়, সেও জানবে তার সামনে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াবার অনন্ত সম্ভাবনা আছে, তার সামনে অনন্ত আশা। সে মুক্তির স্বপ্ন দেখে না, বৈরাগ্যসাধন-পথ তার পথ নয়, কিন্তু সেও দেখবে সেজন্য সে ছোট নয়। তার সামনে যে কর্ম, তাই তার জীবনকে অনেক বড় ক'রে তুলতে পারে, জীবনের সব মহিমা, সকল ঐশ্বর্য তার সামনে তুলে ধরতে পারে—সেই পথই তার শ্রেয়ের পথ। সাধারণ মানুষের পক্ষে এর চেয়ে বড় আশার বাণী আর কোন ধর্মে, আর কোন জীবনবাদে নেই। সেজন্য এ ধর্ম এক সর্বজনীন কল্যাণ-ধর্ম। এর লক্ষ্য বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়, এর লক্ষ্য বৃহতের কল্যাণ, বৃহতের মহৎ কল্যাণ।

সেজন্য সকল অত্যাচার, শোষণ, বৈষম্য, বিশেষ সুবিধা-অবসানের একটি ইঙ্গিত এতে আছে। এ ধর্ম নির্বেদের ধর্ম নয়, এর ফলশ্রুতি মানবসমাজের 'আমূল পরিবর্তন।' সেজন্য এ একটি আহ্বান– কর্মের, শক্তির, রূপান্তর-সাধনের, নূতন জীবনগঠনের। প্রকৃতপক্ষে বিবেকানন্দ জগৎকে এই রূপান্তর-সাধনের কথা, নূতন জীবনগঠনের বাণী শোনাতেই আবির্ভূত হয়েছিলেন—তিনি সুস্পষ্ট বলেছেন: "I have a message for the world, which I will deliver without fear and without care for the future. To the reformers I will point out that I am a greater reformer than any one of them. They want to reform only little bits. I want root-and-branch reform.'[৪] মানবিক অধিকারের ভিত্তিতে এক নূতন সমাজ চেয়েছেন তিনি, চেয়েছেন এক 'মানবতার মহানগরী'।

এই যে নূতন সমাজ চেয়েছেন তিনি সেখানে শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মুক্তিই প্রাপ্য হবে না, প্রাপ্য হবে সর্বাপেক্ষা অধিক ভাবনৈতিক বা মানস স্বাধীনতা। কারণ মানসক্ষেত্রে চরম স্বাধীনতা-বিকাশের সর্বাঙ্গীণ সুযোগ—এ হ'ল তাঁর জীবনবাদের মুখ্য কথা। নবযুগে নূতন পৌরোহিত্যের প্রসার লক্ষ্য করেছিলেন নিবেদিতা এবং সে সম্বন্ধে আমাদের সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন—এ কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। বিবেকানন্দও সর্বপ্রকার পৌরোহিত্য এবং মানসক্ষেত্রে যান্ত্রিকতা ও regimentation-এর বিরোধী ছিলেন। এরকম সমাজের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠ তুলে একস্থানে তিনি বলেছেন:

---

৪ Vivekananda—My Plan of Campaign

"Can that be called a society which is formed by an aggregate of men who are like lumps of clay, like lifeless machines, like heaps of pebbles ? How can such society fare well ?" যে সমাজে মানুষ যন্ত্রের মতো সে সমাজে কোন কল্যাণ হ'তে পারে না। কারণ যন্ত্রের ভাল-মন্দ কোন চেতনাই নেই। তাঁর দৃঢ় অভিমত—"It is more blessed, in my opinion, even to go wrong impelled by one's own free will and intelligence than to be good as an automation."[৫] সেজন্য তাঁর নির্দেশ "...literate, undo the shackles of people as much as you can." সুতরাং একপ্রকার মুক্তির শর্ত হিসাবে অপর প্রকার দাসত্বের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেননি। সেজন্য মানুষের সবপ্রকার মুক্তি, সর্বাঙ্গীণ মুক্তির আশ্বাস তাঁর বাণীতে আছে। এরই জন্য আজ মানুষের সংগ্রাম তীব্র হ'য়ে উঠেছে। এদিক দিয়ে আমরা একটি ঐতিহাসিক মহামুহূর্তে রয়েছি। আমাদের মানস-মুক্তিকে ধ্রুবতারাস্বরূপ সম্মুখে রেখে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমরা লাভ করতে পারি কি না—এ প্রশ্নের সমাধানের উপর আজ আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আজ রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা অনেক ক্ষেত্রে অর্জন করেছি, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কিছু কিছু লাভ করেছি। কিন্তু ভাবনৈতিক বা মনের স্বাধীনতা আজ বিপন্ন হ'য়ে উঠছে ব'লে অনেক মনীষীই মনে করেন। সাম্যবাদী রাষ্ট্রে বিবেকের স্বাধীনতা স্বীকৃত নয়, সে-সকল দেশে আজ একনায়কতন্ত্রের আধিপত্য। ধনতান্ত্রিক দেশে যন্ত্র-উৎপাদনকারী একচেটিয়া ব্যবসাদারদের আধিপত্য আজ ব্যক্তির রুচি পছন্দ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। সেজন্য আজ মানুষ একটি নূতন পথ খুঁজছে যার মাধ্যমে সে সাম্যবাদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্মিলন ঘটিয়ে এমন সমাজ গঠন করতে পারবে, সেখানে মানুষের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ভাবনৈতিক স্বাধীনতা মিলবে। এই সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার ভিত্তিতে বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ গঠিত। সেজন্য ভবিষ্যতের মানুষ একদিন না একদিন এই মুক্তির বাণীকে খুঁজে নেবে। অন্ততঃপক্ষে যেদিন তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম শেষ হবে, যেদিন মনের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার জন্য তার সংগ্রাম তীব্র হবে, সেদিন যুক্তকরে সে এই বাণীকে বরণ করবে।

নিবেদিতা তাঁর দূরপ্রসারী গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এসব দেখতে পেয়েছিলেন। সেজন্যই তিনি বিবেকানন্দকে "Pioneer and prophet of a new world order" ব'লে ঘোষণা ক'রে গেছেন। এ কেবল তাঁর গুরুপূজা বা ভক্তির আতিশয্যের দরুন বলা অতিশয়োক্তি নয়। গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। একথা আমাদের উপরের আলোচনায় প্রমাণিত। নিবেদিতা আধুনিক কালের প্রবণতা-বিশ্লেষণ সহায়েই সুস্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন যে, বিবেকানন্দের মধ্যে এই নূতন কাল আর এক নব-পর্যায়ে পৌছে গিয়েছে। তাঁর চোখে বিবেকানন্দ সেজন্য ইতিহাসের মহানায়ক, যাঁর মধ্যে ইতিহাসের এক যুগ হ'তে আর এক যুগে আবর্তন ঘটেছে। সেদিক দিয়ে একা বিবেকানন্দ ইতিহাসের এক মহাক্রান্তি-কালের এক মহা-ইতিহাস। এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে নিবেদিতা সুস্পষ্ট বলেছেন—

[৫] এ বিষয়ে কয়েক বৎসর পূর্বে মনীষী Aldous Huxley ভারতের দৈনিক Amrita Bazar Patrika-য় বিশদ আলোচনা করেছিলেন।

"Indeed, it might be urged that the Swami's name represents a transition from one period, as it were, to the other." বিবেকানন্দকে তিনি দেখেছিলেন দু'টি যুগকে, অতীত আর বর্তমানকে, নিজের মধ্যে সমানভাবে ধারণ করতে। সেজন্য তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল যে, বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন ক'রে ভবিষ্যতের আগমন ঘটবে সুশৃঙ্খলার সঙ্গে। শান্তিপূর্ণভাবে ক্রান্তি কি ক'রে সম্ভব হ'তে পারে তার নির্দেশ বিবেকানন্দের সমন্বয়বাণীর মধ্যে ছিল। আজ অবশ্য এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ জাগে। মনে হয় এখনও বিভ্রান্তি আছে। এবং এজন্য আমাদের অনেক সংগ্রাম এখনও বাকী। মনে হয় অনেক পথবিপথ ঘুরে, অনেক সংগ্রাম-শেষে তবেই মানুষ বিবেকানন্দের মধ্যে উত্তীর্ণ এই নূতন ইতিহাসকে খুঁজে পাবে। জানি না, খণ্ডকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ আমাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি দিয়ে এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব কিনা।

অতীত ইতিহাসের যুগ-বিচার

নিবেদিতার মতে কোন যুগকে বুঝতে হ'লে তার পূর্ববর্তী যুগগুলিকে মূর্ত ক'রে দেখা চাই। আমাদের এই আধুনিক যুগের পূর্ববর্তী তিনটি যুগ হ'ল পাশ্চাত্যে প্রাচীন মধ্য ও নব জাগরণের যুগ, ভারতে বৌদ্ধ, পৌরাণিক এবং মুসলমান যুগ। এ সকল যুগেও উদার মানবিক ভাবধারা-প্রচারের প্রয়াস হয়েছে। খ্রীষ্টের প্রেমধর্ম, বুদ্ধের করুণার ধর্ম, ইসলামের ভ্রাতৃত্বধর্ম, পুরাণের ভাগবত ধর্ম—এ সকল তারই প্রমাণ। হিন্দুযুগে ব্রাহ্মণের বিশেষ সুবিধা স্বীকৃতি পেয়েছে। বৌদ্ধধর্ম নূতন কিছু নয়, বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের সঙ্গে যুক্ত সাম্যভাব বা গণতন্ত্রভিত্তিক হিন্দুধর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতে সর্বজনীন ভাবধারা বৌদ্ধ এবং মুসলমান যুগে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়েছে। সেদিক দিয়ে ভারতে এই দুইটি হ'ল জাতীয়তার দুইটি যুগ। ("India has known two great periods of Nationality, the Budhist and the Mahommedan.") কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এই সকল পূর্ববর্তী যুগে ধর্মীয় কুসংস্কার বারবার জয়ী হয়েছে এ সকল উদার ও মহৎ মানবিক ভাবধারাকে প্রতিহত ক'রে। কিন্তু আজকের যুগ ধর্মীয় কুসংস্কার হ'তে মহামুক্তির যুগ, আজকের যুগ সকল ধর্ম, সকল শাস্ত্র, সকল বিধিবিধানের উপর মানবতার প্রাধান্যের যুগ। এখানে নিবেদিতা 'সেকুলারবাদের' জয়গানে মুখর। ধর্ম যাঁর জীবনের প্রধান উপজীব্য তাঁর মুখে সেকুলারবাদের এই প্রশস্তি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। নিবেদিতার মতে বর্তমান যুগ সেকুলারবাদের জয়যাত্রার যুগ, কারণ সেকুলার-বাদ মানুষের মানস-মুক্তির উপায়, মানবতাকে জীবনের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠার সহায়। সেজন্য আজ আমরা সেকুলারবাদের নিন্দা করব না, এই সেকুলারবাদের অতি প্রয়োজন। নিবেদিতা এ প্রসঙ্গে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আবেগের সঙ্গে বলেছেন, "And to day the last trace of religious and social prejudice is to be swept away and the idea of nationality itself, pure, radiant and fearlessly secular, is to emerge in triumph giving meaning and consistency to the whole of the preceding evolution." আজকের দিন জাতীয়তাবাদের দিন, সেজন্য সামাজিক কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা যা জাতীয় সংহতিকে বাধা দিচ্ছিল সেগুলি পরাস্ত করবে সেকুলারবাদ। আজকের জাতীয়তার ভিত্তি ইহবাদ।

নিবেদিতার মতো ধর্ম ভিত্তিক জীবন যাঁর, তাঁর পক্ষে এপ্রকার ইহবাদের জয়গান কি ক'রে সম্ভব? এর মধ্যে কি যৌক্তিক অসঙ্গতি নেই? এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে উঠতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই এজন্য যে, তিনি বেদান্তে বিশ্বাসী, এবং বেদান্তমতে 'secular' এবং 'spiritual'—ঐহিক এবং আধ্যাত্মিকে কোন পার্থক্য নেই। এ প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা 'নবযুগাচার্য বিবেকানন্দ' অধ্যায়ে করেছি এবং 'ভারতের সমাজাদর্শ' শীর্ষক পরবর্তী অধ্যায়ে আমাদের এ বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনার প্রয়োজন হবে। (ক্রমশঃ)

মার্টিন লূথার কিংগ্

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

একটি মানবসেবাব্রত মহৎ জীবন বিনষ্ট হইল। মহামতি এব্রাহাম লিঙ্কনের মতো বিশ্বপ্রেমিক মহাত্মা গান্ধীর মতো উদারহৃদয় নিগ্রো নেতা ডক্টর মার্টিন লূথার কিংগ্ গুপ্ত আততায়ীর গুলিতে নিহত হইলেন। এমন অমায়িক মানব-বন্ধু লোকসেবককেও পাশবিক হিংসার কবলে পড়িয়া চরম নির্যাতন ভোগ করিতে হয়, ইহা সত্যই বিস্ময়কর। গত ৪ঠা এপ্রিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে মেম্ফিস শহরে সংঘটিত এই নিষ্ঠুর হত্যার সংবাদে সারা পৃথিবী যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। নির্যাতিত মেম্ফিস শহরের মেথরদের প্রতি অন্যায় অবিচারের প্রতিকার-কল্পে অহিংস সংগ্রাম চালাইতে তিনি তথায় আসিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড কিংগ্ ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহ নীতির একজন একনিষ্ঠ অনুসারী। এই নীতি অবলম্বন করিয়া তিনি বহু স্থানে বহু বিজয় লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল এবারও তিনি জয়লাভ করিবেন। কিন্তু সে জয় জীবিত থাকিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন না। হয়তো তাঁহার জীবন-ব্রতের সম্যক্ সিদ্ধির জন্য তাঁহার এই আত্মা-হুতির প্রয়োজন ছিল। বিধির বিধান বড় দুর্বোধ্য! সত্য, সততা, ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং নিঃস্বার্থ মানবসেবা হইতে যে শক্তি বিকশিত হয়, তাহা এই ৩৯ বৎসরবয়স্ক ধর্মযাজকের চরিত্রকে বিশেষিত করিয়াছিল। জীবনে তিনি অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, অনেক নিপীড়নের সম্মুখীন হইয়াছেন, কিন্তু কখনও ভয় পান নাই, নিজের আদর্শ হইতে পিছাইয়া আসেন নাই। দেশ-বিদেশে তাঁহার শত শত অনুরাগী বন্ধু ছিল। আমেরিকার নিগ্রোজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার তিনি ছিলেন বহুজনস্বীকৃত প্রতীক। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানরাও তাঁহার চরিত্র-শক্তিকে অস্বীকার করিতে পারিত না। তাঁহার মতবিরোধী যে কেহ ছিল না এমন নয়—শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে ছিল, কৃষ্ণকায় তাঁহার স্বজাতীয়গণের ভিতরও ছিল। 'ব্ল্যাক মুসলিম' দল তাঁহার অহিংস নীতিকে পছন্দ করিত না। কিন্তু এসকল সত্ত্বেও মার্টিন লূথার কিংগ্ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে একটি কল্যাণশক্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১৯৬৪ সালে তিনি যে নোবেল শান্তি-পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই যোগ্য ব্যক্তিতেই সমর্পিত হইয়াছিল।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া রাজ্যের অ্যাটলান্টা শহরে একশতবৎসর পুরাতন নিগ্রো ক্রীতদাস আমলের কবরস্থানে তাঁহার শেষকৃত্য গত ৮ই এপ্রিল দেড়লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে সমাধা হয়। রেভারেণ্ড কিংগ্-এর মাতামহের কবর এই স্থানেই রহিয়াছে। আমেরিকার সকল অঞ্চল হইতে সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধিরা তাঁহার অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে ঐ দিন অ্যাটলান্টায় আসিয়াছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তাঁহার প্রতি শোকপ্রকাশের জন্য আমেরিকার উড্ডীন জাতীয় পতাকা অর্ধাবনমিত করিবার আদেশ দেন। ইহার আগে মাত্র দুই জন অ-সামরিক আমেরিকান নাগরিকের মৃত্যুতে এই সম্মান দেখানো হইয়াছে। ১৯৫৯ সালে

আমেরিকান সিভিল ওয়ারের শেষ জীবিত সৈনিক অতিবৃদ্ধ ওয়ালটার উইলিয়মস্ মারা গেলে জাতীয় পতাকাকে আধাআধি নামানো হইয়াছিল। ১৯৬২ সালে মিসেস ইলিনর রুজভেল্টের মৃত্যুতেও ঐরূপ করা হয়। দুই জন সুপ্রসিদ্ধ বৈদেশিককেও আমেরিকান সরকার এইভাবে সম্মান দেখাইয়াছেন। ইঁহারা ছিলেন ১৯৬১ সালে ইউনাইটেড নেশনস্-এর সেক্রেটারী-জেনারেল দাগ হ্যামারশোল্ড্ এবং ১৯৬৫ সালে ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সার উইন্স্টন চার্চিল।

মার্টিন লুথার কিং্ জর্জিয়া রাজ্যের অ্যাটলান্টা শহরে ১৯২৯ সালের ১৫ই জানুআরি নিগ্রো পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একটি স্থানীয় নিগ্রো ব্যাপটিস্ট্ গির্জার ধর্মযাজক ছিলেন। অ্যাটলান্টার স্কুল ও কলেজে মার্টিন শিক্ষালাভ করেন। ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার ভিতর ধর্মানুরাগ অনুপ্রবিষ্ট হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শ প্রেসিডেন্ট মহাপ্রাণ এব্রাহাম লিঙ্কন একশত বৎসর আগে আমেরিকার দাসপ্রথা তুলিয়া দিয়া নিগ্রো-জাতিকে যে স্বাধীনতা দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তী কালে নিগ্রোগণের অগ্রগতিকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে নাই, দাসপ্রথা নিষিদ্ধ হইবার পরেও ১০০ বৎসর ধরিয়া শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানরা নিগ্রোগণের অগ্রগতির পথ নানাভাবে অপ্রশস্ত করিয়া রাখিয়াছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক উন্নতি, রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতি সব বিষয়েই কালা-আদমীরা সাদাচামড়ার মানুষের চেয়ে পিছাইয়া আছে। মাঝে মাঝে কোনও কোনও নেতা এই শোচনীয় অন্যায়ের প্রতীকার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বৃহৎ জনমণ্ডলীর অসহানুভূতির চাপে সে চেষ্টা তেমন ফলপ্রসূ হয় নাই। অবশেষে ধীরে ধীরে নিগ্রোজাতির মধ্যে আত্মানুসন্ধান আসিয়াছে, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস জন্মাইয়াছে, নিজেরা নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছে। তরুণ কালেই মার্টিনের প্রাণে স্বজাতির জন্য মমতা ও সেবার আগুন জ্বলিয়া উঠে। ১৯৪৭ সালে তিনি তাঁহার পিতার গির্জায় একজন প্রচারক-রূপে নিযুক্ত হন। এই গির্জা হইতেই কয়েক বৎসর পরে তিনি কম্বুকণ্ঠে সমগ্র আমেরিকা-জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন:

"আমেরিকা, তুমি পথভ্রান্ত হইয়াছ। তুমি তোমার ১ কোটি ৯ লক্ষ ভাইকে পদদলিত করিয়াছ। ভগবান সকল মানুষকেই সমান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন শুধু এক নির্বাচিত গোষ্ঠীকে নয়, শুধু শ্বেতকায় মানুষকে নয়—সকল মানুষকে। আমেরিকা, জাগো—নিজের লক্ষ্যে ফিরিয়া এস।"

কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া মার্টিন কিছু-কালের মধ্যেই ডক্টরেট্ লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে জনসেবা এবং ধর্মপ্রচারও চলিতেছিল। তাঁহার ভাষণগুলি ছিল যেমন চিন্তাপূর্ণ তেমনি আবেগ- ও উদ্দীপনা-ময়। তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল জলদগম্ভীর, মৃতপ্রায়কেও উহা সঞ্জীবিত করিত। ১৯৫৪ সালে ডক্টর কিংগ্ অ্যালাবামা রাজ্যের মণ্টগোমারি শহরে একটি গির্জার ধর্ম-যাজক হন। ১৯৫১ সালে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্মিণী করেটা (Coretta) ছিলেন সর্বভাবে তাঁহার জীবন ও আদর্শের অনু-গামিনী। ডক্টর কিংগের শোচনীয় মৃত্যুর দুই দিন পরে টেলিভিশনে সাংবাদিকগণের নিকট বিবৃতি দিবার সময় তাঁহাকে যাহারা দেখিয়াছে তাহারা এই মহীয়সী নারীর নম্র প্রশান্ত মূর্তি কখনো ভুলিতে পারিবে না। প্রেসিডেন্ট কেনেডির

মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী জ্যাকুইলিনের ধীর স্থির চেহারার কথা মনে পড়ে। জ্যাকুইলিন কেনেডি ডক্টর কিংগের শেষকৃত্যের দিন অ্যাটলাণ্টায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। করেটা ও জ্যাকুই-লিনের পরস্পর সাক্ষাতের ছবি সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছিল। বড় হৃদয়স্পর্শী।

ডক্টর কিংগ্ ১৯৫৯ সালে অ্যাটলাণ্টায় ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহার পিতার গির্জায় সহকারী ধর্মযাজকের কাজে ব্রতী হন। ১৯৬০ সালে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-নীতির আদর্শে তিনি একটি ধর্ম- ও সেবা প্রতিষ্ঠান গঠিত করেন। ইতিমধ্যে তিনি কয়েকটি বইও লিখিয়াছিলেন। বইগুলি বহু সমাদর লাভ করিয়াছে। আমেরিকান নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার হইতে নানাভাবে বঞ্চিত নিগ্রো-জাতিকে তুলিবার জন্য ডক্টর কিংগ্ অনবরত অহিংস সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন।

ডক্টর কিংগ্ আমেরিকার বাহিরে নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং সমাদরও লাভ করিয়াছেন। ভ্যাটিকানে পোপ হইতে আরম্ভ করিয়া দেশ-বিদেশের বহু মনীষীর সহিত বিভিন্ন সময়ে তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হইয়াছে। জাতি-বৈষম্য ও বর্ণবিদ্বেষ দূর করিয়া কি শ্বেতকায়, কি কৃষ্ণকায় সকল আমেরিকান সত্য ন্যায় ও সেবার আদর্শে এক সম্মিলিত কল্যাণময় সমাজ গঠন করিয়া তুলুক, ইহাই ছিল রেভারেণ্ড মার্টিন লুথার কিংগের জীবন স্বপ্ন।

ডক্টর মার্টিন লুথার কিংগ্ গত ফেব্রুআরি মাসে গির্জায় ভাষণ দিবার সময় প্রসঙ্গতঃ নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে কয়েকটি উক্তি করেন। উহা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। তিনি বলিয়াছিলেন :

"আমার মনে হয় কখনও কখনও আমাদের প্রত্যেকেরই চিত্তে ভবিষ্যতের সেই দিনটি সম্বন্ধে একটি বাস্তব চিন্তা জাগে—যেদিন আমরা সকল জীবনের অপ্রতিরোধ্য মৃত্যু নামক ব্যাপারটি দ্বারা নিপীড়িত হইব। আমি মাঝে মাঝে আমার মরণের কথা ভাবি, আর মানসচোখে ভাসে আমার দেহসৎকারের ছবি। একটা বিকৃত অস্বাভাবিক ভাবে যে এই ভাবনা মনে জাগে তাহা নয়।

"কখনও কখনও নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, আমার মৃত্যুবাসরে আমার বন্ধুদের কাছে আমার সম্বন্ধে আমি কি কথা প্রত্যাশা করিব। আজ উহাই তোমাদের শুনাইয়া যাইব।

"আমার সেই চরম দিনে যদি তোমাদের কেহ উপস্থিত থাকো তো জানিয়ো যে, আমি কোনও আড়ম্বরপূর্ণ সৎকারকৃত্য চাই না। আমার উদ্দেশে কিছু বলিবার জন্য যদি কাহাকেও পাও তো তাঁহাকে বলিয়ো যে, তিনি যেন কোনও লম্বা বক্তৃতা না করিয়া বসেন।

"তাঁকে বলিয়ো যে, আমি যে নোবেল শান্তি-পুরস্কার পাইয়াছি, তাহা যেন উল্লেখ না করেন। উহা প্রয়োজনীয় নয়। আমি যে আরও তিন চার শত পুরস্কারাদি লাভ করিয়াছি তাহাও বৈশিষ্ট্যময় নয়।

"আমি যে লেখাপড়া জানি তাহার উল্লেখও অনাবশ্যক। আমার আকাঙ্ক্ষা এই যে, কেহ যেন সেই দিনটিতে বলেন যে মার্টিন লুথার কিংগ্ অপরের সেবায় তাহার জীবন নিয়োজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, মানুষকে ভালবাসিতে চাহিয়াছিল।

"সেই দিনটিতে তোমরা যেন বল যে, আমি সর্বদাই ন্যায়ের পথে ভগবানকে ধরিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছি। সেই দিনটিতে আমার সম্বন্ধে তোমরা এইটুকু যেন বলিতে পার যে, আমি আমার জীবনে ক্ষুধার্তকে

খাদ্য এবং বস্ত্রহীনকে বস্ত্র যোগাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

"বলিয়ো যে, কারাগারে গিয়া দণ্ডিতদের সহিত সাক্ষাৎ করা ছিল আমার জীবনের এক অন্যতম প্রচেষ্টা। মানুষকে ভালবাসিতে এবং সেবা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। হঁ্যা, আমি ছিলাম একজন ঢাকী—সত্য ও ন্যায়ের ঢাক বাজানো ছিল আমার গৌরব। শান্তির জন্য ঢাক বাজাইতে কখনও নিরুৎসাহ হই নাই।

"না, আমি টাকাকড়ি কিছু রাখিয়া যাইব না। বিলাস ও আড়ম্বরের সামগ্রী কিছু রাখিয়া যাইতে পারিব না। একটি উৎসৃষ্ট জীবন মাত্র রাখিয়া যাইতে চাই।

"পথে চলিতে চলিতে যদি কাহাকেও একটু সাহায্য করিতে পারি, একটি গান গাহিয়া যদি কোনও শোকার্তকে সান্ত্বনা দিতে পারি, কোনও পথভ্রান্তকে যদি তাহার ভুল শুধরাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবন সার্থক।"

পথ-সন্ধান

শ্রীঅটলচন্দ্র দাশ

পিছিয়ে পড়েছি এই জীবনের দুর্গম পথ চলিতে,
কণ্টকময় কাননে এসেছি কনক-আলোক হইতে।
তুমি তো আমায় আপনার হাতে—
রেখে দিয়ে গেলে রাজার সভাতে,
আমি ভীরু বুকে সরিয়া এসেছি অন্তরালের গলিতে।

যখন সকলে পরমানন্দে ভরিয়ে তুলেছে মন,
তখন পারিনি যোগ দিতে তায়, ছিনু যে অন্যমন!
ভেবেছি সকাল, ভেবেছি বিকাল—
এই গান থেমে যাবে বুঝি কাল,
এখন বুঝেছি এই-ই পথ—চির-জীবনের পথে মিলিতে।

আলমোড়া-যাত্রীর ডায়েরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

১০ই অক্টোবর, ১৯৬১। আজ বেড়াইতে বাহির হইয়া সার্কিট হাউস, ক্যান্টনমেন্ট ও স্থানীয় ক্যাথলিক চার্চ দেখিয়া আসিলাম। উহারা সবই বড় রাস্তার পূর্বদিকের পাহাড়ের মধ্যে। ক্যান্টনমেন্টে এখন আর সৈন্যাবাস নাই। উহা রানীক্ষেতে উঠিয়া গিয়াছে। সার্কিট হাউসেরও আজ সে গৌরব নাই। চার্চটি প্রাচীন হইলেও সযত্নে রক্ষিত। এক কালে উহা যে বেশ জমকাল ছিল, তাহা উহার আকার ও আয়তন দেখিলেই বুঝা যায়। পাহাড়ীদের মধ্যে যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে, তাহারা এই চার্চেরই অনুগত। এখন নূতন করিয়া এদিকে আর কাহাকেও খ্রীষ্টান হইতে বড় একটা দেখা যায় না।

১১ই অক্টোবর, ১৯৬১। বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজা আসিয়া পড়িল। শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটিরে উহার উদ্যোগ-আয়োজন চলিয়াছে। প্রতি সন্ধ্যায় ঠাকুর-পূজা ও আরতির পর প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া গানের আসর বসিতে লাগিল। আগমনী গানই প্রাধান্য পাইল। শ্যামা-সঙ্গীত এবং অন্য ভক্তিমূলক গান ও ভজন চলিতে লাগিল। দুই-এক দিন পাহাড়ী ভক্তেরা আসিয়াও ভাল ভাল গান শুনাইলেন। প্রতিদিন সকালে চণ্ডীপাঠ আরম্ভ হইল।

১২ই অক্টোবর, ১৯৬১। শেষরাত্রি হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। উহার বিরাম নাই। মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। পাহাড়গুলি মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে। চারিদিকে মেঘ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। বৃষ্টির ঝুপঝাপ শব্দ শুধু কানে শুনা যায়। আর অবিরাম বৃষ্টি পড়িতেছে দেখা যায়। বাঙ্গলা-দেশের বৃষ্টির এক রূপ, হিমালয়প্রদেশের বৃষ্টির অন্য রূপ। এখানকার বৃষ্টি আকাশ হইতে পড়ে না। মনে হয় হাতের কাছেই একখানি মেঘ গলিয়া চতুর্দিকে জল ছড়াইয়া দিল। ঠাণ্ডাও ধীরে ধীরে তীব্রতর অনুভূত হইতে লাগিল। স্নান করা তো গেলই না। গায়ের জামা ছাড়াও দুষ্কর হইল।

সমস্ত দিন ঘরে বসিয়াই কাটিল। দুপুর-বেলা কোন রকমে আশ্রমে নামিয়া গিয়া প্রসাদ পাইয়া আসিলাম।

২০শে অক্টোবর, ১৯৬১। শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজা শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটীরে বিশেষ নিষ্ঠার সহিত সম্পূর্ণ হইল। একখানি সুন্দর পটে পূজা হইল। প্রতি বৎসরই এই পটখানিতে ষোড়শোপচারে পূজা হইয়া থাকে। অষ্টমী-পূজার দিন বিধিমত কুমারীপূজাও নিষ্পন্ন হইল। নবমী-পূজার দিন তিন চারি শত ভক্ত প্রসাদ পাইলেন। পূজার কোনরূপ ত্রুটি রহিল না। ৺বিজয়োৎ-সবও বিপুল আনন্দের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইল।

২৫শে অক্টোবর, ১৯৬১। আজ শুনিলাম বাজার হইতে এক ফার্লং দূরে নন্দাদেবীর মন্দির আছে। নন্দাদেবী আলমোড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আলমোড়ার রাজবংশ এখনও এই দেবীর নিয়মিত পূজা দিয়া থাকেন। দুর্গানবমী হইতে এখানে নয়দিনব্যাপী একটি মেলা বসে।

সকালেই সকলে মিলিয়া নন্দাদেবী-দর্শনে বাহির হইলাম। সেখানে গিয়া দেখি মন্দিরটি প্রাচীন। মূর্তিটি যে কোন্ দেবীর মূর্তি তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। অন্যান্য দেবদেবীর

মূর্তিও সেখানে রহিয়াছে দেখিলাম। পূজা দিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিতে বেলা ১১টা বাজিয়া গেল।

২৭শে অক্টোবর, ১৯৬১। আজ আলমোড়া হইতে বিদায় লইয়া বেলা ৯টার বাসে নৈনীতাল অভিমুখে যাত্রা করিলাম। নৈনীতাল পৌছিতে বেলা ১টা বাজিয়া গেল। অশোক হোটেলে জিনিসপত্র রাখিয়া নৈনীতাল হ্রদ পার হইয়া নৈনীদেবী দর্শন করিতে গেলাম। হোটেলের লোকেরাই একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া দিল।

চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা বৃহৎ স্বাভাবিক হ্রদ। দৈর্ঘ্যে প্রায় ২½ মাইল, প্রস্থে কোন কোন জায়গায় ১ মাইল, কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই ½ মাইল। পাহাড়ের গায়ের গাছ-পালার প্রতিচ্ছবি পড়িয়া হ্রদের জল ঘন সবুজ। জলের গভীরতা প্রায় ১০০ ফুট। এই হ্রদের ধারেই নৈনীতাল শহর প্রতিষ্ঠিত।

নৈনীতাল দেবীর একটি স্থান। নৈনীদেবী শক্তিমূর্তি। তাঁহার পার্শ্বেই আর একটি মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্তি। এখানে একজন বাঙ্গালী সাধুর দর্শন মিলিল। তীর্থযাত্রীদের দানেই তাঁহার কোন রকমে চলিয়া যায়।

হোটেলে ফিরিয়া কিছু জলযোগ করা গেল। তাহার পর আবার বাসে উঠিলাম। কাঠগুদাম রেলওয়ে স্টেশনে গিয়া রাত্রি ৮টার ট্রেন ধরিলাম।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬২। এক বৎসর পরের কথা। আলমোড়া যাইবার আবার সুযোগ ঘটিল।

দুইটি স্লিপিং বার্থ রিজার্ভ করিয়া কলিকাতার শিয়ালদহ স্টেশন হইতে পাঠানকোট মেলে বেলা সাড়ে এগারটার সময় রওনা হইয়া পরের দিন ২৭শে সেপ্টেম্বর সকাল ৯-৩০ মিঃ-এর সময় লক্ষ্ণৌ স্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানেই সমস্ত দিন কাটাইয়া রাত্রি ৮টার ট্রেনে কাঠগুদাম যাত্রা করিতে হইল।

২৮শে সেপ্টেম্বর সকালেই কাঠগুদামে আসিয়া ট্রেন থামিল। এ পথের ইহাই শেষ রেলওয়ে স্টেশন। গত বৎসর যে-পথে আল-মোড়ায় গিয়াছিলাম, সে পথ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় রানীক্ষেতের পথ ধরিতে হইল। পাহাড়-কাটা পথ ধরিয়াই বাস চলিল। গরমপানিতে প্রথম বাস থামিল। সেখানে একটি দোকানে আমরা গরম পুরি, তরকারী ও এদেশী কিছু মিষ্টান্ন খাইয়া লইলাম। বাস আবার পাহাড়ে কুটিল পথ ধরিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে রানীক্ষেতে আসিয়া পড়িলাম। পাহাড়ের মধ্যে ইহা বেশ একটি ছোট শহর।

জনশ্রুতি আছে—এস্থানের প্রমোদ-ভবনের অনতিদূরে কয়েকটি গৃহের যে ভগ্নাবশেষ আছে, সেই স্থানেই কোন এক রানীর প্রাসাদ ও দুর্গ ছিল। তাঁহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম রানীক্ষেত হইয়াছে। শহরটি সম্পূর্ণ ইংরেজদিগের সৃষ্টি। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে উহার পত্তন হয়। তৎকালীন সর্বাধিনায়ক সার্ উইলিয়ম ম্যান্সফিল্ড পার্বত্যস্থান নির্বাচনের জন্য মেজর ল্যাঙ্‌কে আদেশ দেন। তদনুসারে তিনি রানীক্ষেতই মনোনয়ন করেন। তিনটি পল্লী— আলমাব্যারাক, ছোবাটিয়া ও ধুলিক্ষেত লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে রানীক্ষেত। এ স্থানের কালিকাদেবীর মন্দির প্রসিদ্ধ। মাইল তিনেক দূরে আলমোড়ার পথে একটি ছোট পাহাড়ের চূড়ায় এই মন্দির।

মনে হইল আলমোড়া অপেক্ষা রানীক্ষেতে সমতলভূমি কিছু বেশী, এবং উহার উচ্চতাও কিছু অধিক। তাহার পরই পাহাড়ে-পথ ধরিয়া বাস নামিতে লাগিল। কৌশীতে

আসিয়া আবার গাড়ী থামিল। সেখান হইতে বাহির হইয়া বেলা ২টার সময় আলমোড়া বাজারের নিকট বাস-স্ট্যাণ্ডে আসিয়া গাড়ী থামিল। শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীর এ স্থান হইতে প্রায় দুই মাইল। সেই বাসে করিয়াই আশ্রমের সম্মুখে আসিয়া নামিলাম।

শ্রীবশীশ্বর সেন এবং তাঁহার সুযোগ্যা পত্নীর সহিতও সংক্ষিপ্ত আলাপ হইবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। সেন মহাশয় 'বিবেকানন্দ ল্যাবোরেটরী' নাম দিয়া একটি কৃষি-গবেষণাগার নিপুণভাবে পরিচালনা করিতেছেন আলমোড়াতেই। তাঁহার সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে নিকটবর্তী গ্রামে নানাবিধ শস্যের উৎকর্ষ-সাধনের চেষ্টা চলিতেছে। ভারত সরকার এ বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহৃত কিছু কিছু জিনিস- দণ্ড, জপের মালা, পর্যটকের দীর্ঘ যষ্টি প্রভৃতি দেখিবার সুযোগ মিলিয়াছিল। পূজনীয় সত্য মহারাজই তাঁহাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন।

১৫ই অক্টোবর, ১৯৬২। গত বৎসর এখানে আসিয়া পাতালদেবীর মন্দির দেখা হয় নাই, শুনিয়াছিলাম আশ্রম হইতে ৭।০ মাইল দূরে। কিন্তু এখন জানা গেল যাতায়াতে ৬২ মাইল মাত্র।

শ্রীদেবীদাস বাকৃচি মহাশয়কে পথের দিশারী করিয়া আমরা আজ পাতালদেবী-দর্শনে বাহির হইলাম।

মঠ হইতে বাহির হইয়া সোজা উত্তরমুখে যাইতে হইল। প্রায় ২২ মাইল পথ চলার পর জাখমদেবীর মন্দির পথিপার্শ্বেই দেখা গেল। বাহিরের দিকের প্রাচীরগাত্রে বৃহদাকার মহাবীরের মূর্তি। তাহারই পার্শ্বে আঁকা রহিয়াছে ষড়্ভুজা ব্যাঘ্রবাহিনীর মূর্তি। গ্র্যানাইট পাহাড়ে যে ষড়্ভুজা মূর্তি দেখিয়াছিলাম, ইহা তাহারই অনুরূপ, তবে পাথরে উৎকীর্ণ নয়, প্রাচীরগাত্রে রঙ ও তুলি দিয়া আঁকা। পথ হইতে বামদিকে অল্প নামিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরটি ছোট, তাহার ভিতর একটি চ্যাপটা অথচ গোলাকৃতি পাথরের গায়ে দেবীমূর্তির শুধু চোখ নাক আর মুখ আঁকা। প্রতিদিন পূজা হয় বুঝা গেল। শুনিলাম স্থানীয় পাঞ্জাবীরা এই দেবীর বেশী ভক্ত এবং তাঁহারাই এই মন্দির সংরক্ষণ ও বিগ্রহ-পূজার সকল ব্যয় বহন করেন।

সেই স্থান হইতে প্রায় আধ মাইল উপরে উঠিয়া আবার খানিক পথ নামিলে পাতাল-দেবীর মন্দির। ছোট একটি মন্দির। একটি গহ্বরের মধ্যে দেবীর অধিষ্ঠান। জাখমদেবীর মতোই একখানি শিলাতে কিছু আঁকা আছে মনে হইল। অন্ধকারে ভাল দেখা গেল না। সেই গহ্বরের সম্মুখেই একখানি বড় প্রস্তরশিলা, তাহার উপর বসিয়া পূজার্চনা করা চলে। স্থান অতি সঙ্কীর্ণ, তাই একে একে বসিয়া আমরা দেবীর পূজা করিলাম। বেশ শান্ত পরিবেশ।

মন্দিরের দক্ষিণে আরও একটু নীচু জায়গায় একটি কুণ্ড। কুণ্ডটি বাঁধানো ছোট চৌবাচ্চার মতো। সেই চৌবাচ্চাটির মধ্যে কোন গুপ্ত প্রস্রবণ হইতে অবিরাম জলধারা প্রবাহিত হইতেছে। উহার বহির্দেশে প্রকাণ্ড আর একটি চৌবাচ্চার মতো গাঁথা আছে। আমরা সেইখানে নামিয়া ছোট চৌবাচ্চাটির ধারে বসিয়া মাথায় জল দিলাম। পার্শ্বেই মন্দির-রক্ষক বাস করে। সে লোটা লইয়া আসিতে চাহিল, যাহাতে আমরা কুণ্ডে বসিয়া স্নান করিতে পারি। আমরা নিষেধ করিলাম।

গুপ্ত উৎসমুখে যে-জলধারা উৎসারিত

হইতেছে, তাহার যদি বাহিরে চলিয়া যাইবার ব্যবস্থা না থাকিত, তাহা হইলে বড় চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হইয়া একটি বৃহৎ পুষ্করিণীতে পরিণত হইত। শুনিলাম এই কুণ্ডে স্নান করিলে মানুষ রোগমুক্ত হয়।

আমরা আরও শুনিলাম বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ এই মন্দিরে আসিয়া একরাত্রি তপস্যা করিয়া গিয়াছিলেন। পূজনীয় স্বামী শিবানন্দ মহারাজ এই মন্দিরের সন্নিকটে কুটীর বাঁধিয়া কিছুদিন তপস্যা করিয়াছিলেন।

১৮ই অক্টোবর, ১৯৬২। আজ সকালেই একখানি বাস রিজার্ভ করিয়া কয়েকজন সাধু মহারাজ আমাদের ১৮।১৯ জনকে লইয়া কৌশানী যাত্রা করিলেন। শীলাদেবীর মন্দিরেই প্রথমে যাইবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু পথে তাঁহাদের মতের পরিবর্তন ঘটে। সমস্তদিন পথে পথে মন্দির ও দেব দর্শন করিয়া কৌশানী হইয়া সন্ধ্যার পর সকলে আশ্রমে ফিরিলেন। আশ্রম হইতে ৩২ মাইল দূরে কৌশানী। মোটরে যাইবার পাকা রাস্তা আছে। উচ্চতা ৬২০০ ফুট। তুষারধবল হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এই স্থান হইতে বেশ উপভোগ করা যায়। সাময়িকভাবে থাকিবার এইখানে তিনটি জায়গা আছে—সরকারী বাংলো, পি. ডব্লিউ. ডি. ইন্সপেক্সন গৃহ এবং জেলা পরিষদ ডাকবাংলো।

মহাত্মা গান্ধী কিছুকাল কৌশানীর জেলা পরিষদ ডাকবাংলোতে বাস করিয়াছিলেন এবং এই স্থানে বসিয়াই তিনি গীতার ভাষ্য লেখেন। এই পাহাড়ের অপর দিকে গান্ধী শিষ্যা সরলা বেনের আশ্রম। পূর্বাশ্রমে ইঁহার নাম ছিল মিস্ ক্যাথারিন মেরি হেলমেন (Miss Katherire Mary Heilmen)।

কুমায়ুন উপত্যকায় শিব ও শক্তির অনেক মন্দির আছে। কৌশানীর পথে এমন একটি মন্দির দেখা গেল যাহা দুইটি নদীর মধ্যে একটি দ্বীপের মতো স্থানে অবস্থিত এবং শিব ও দুর্গা একই মন্দিরমধ্যে থাকিয়া পূজা পাইতেছেন। ইহা ব্যতীত সোমনাথ নামে শিব-মন্দির এবং গরুড়গঙ্গার পারে বিষ্ণুমন্দির দেখা গেল। পাহাড়ে নদীগুলিতে জল অল্প, হাঁটিয়াই পার হওয়া যায়, তবে স্রোত খুব বেশী।

ছোটখাট আরও অনেক মন্দির পথে পড়িল। একমন্দির-সংলগ্ন একটি কুণ্ড—পাণ্ডব কুণ্ড নামে পরিচিত। সেই কুণ্ড হইতে অবিশ্রাম জল উৎসৃত হইতেছে। সেই কুণ্ডের জন্যই সে অঞ্চলে জলের কোন অভাব নাই এবং লোকেরও সেখানে বসতি আছে।

২২শে অক্টোবর, ১৯৬২। আজ আলমোড়া হইতে বিদায় লইতে হইল।

সন্ধ্যার পর কাঠগুদামে ট্রেন ধরিলাম। পরের দিন সকালে আমরা নির্বিঘ্নে লক্ষ্ণৌ স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম।

ডুন এক্সপ্রেসে জুড়িয়া দিবার জন্য একখানি গাড়ী একপার্শ্বে সরানো ছিল। কুলীরা সেই গাড়ীতে আমাদের তুলিয়া দিল। আলমোড়ার পুণ্যস্মৃতি লইয়া যথাসময়ে বাড়ী পৌঁছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার ব্যাপকতা

ডক্টর যামিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক সাধনার মহাক্ষেত্র। এখানে যুগে যুগে বহু সাধকের আবির্ভাব হ'য়েছে যাঁরা সমগ্র মানবজাতির জন্য রেখে গেছেন অমূল্য বাণী। তাঁদের বাণী আমাদের জীবনকে পুষ্ট করেছে নানাভাবে। তাঁরাই ছিলেন আমাদের প্রকৃত শিক্ষাগুরু। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদেরই অন্যতম।

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।"

বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যেন ছিল বহু নদীর মিলনক্ষেত্র সাগরসম। তাই বোধ হয় এখানে ছিল সর্বকালের সর্বধারার স্বীকৃতি।

শিক্ষাগুরু হিসাবে ঠাকুরের বিষয় যখন আমরা চিন্তা করি তখন যে দিকটা আমাদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে তা হ'ল তাঁর গভীর হৃদয়স্পর্শী ভাব। এর মূলে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের নিরভিমান ব্যক্তিত্ব, সিদ্ধান্তের সরলতা, সুস্পষ্ট ভাব এবং গভীর উদারতা। আশ্চর্যের বিষয় হ'ল এই যে, ঠাকুর নিজেকে কখনও গুরু ব'লে দাবি করেননি। বরং কেউ তাঁকে গুরু কি কর্তা ব'লে ডাকলে তিনি ব্যথা পেতেন। এই ব্যথা যেন হৃদয়ের অহমিকাশূন্যতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সূতায় যেমন সামান্যতম ফেঁসো থাকলে তা ছুঁচের গর্তে প্রবেশ করে না, সেইরূপ অহমিকার বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব ঈশ্বরের অনন্ত আনন্দঘন ভাবের মধ্যে প্রবেশ করতে দেয় না। ঠাকুর বলতেন, "ঈশ্বরই একমাত্র গুরু, পিতা ও কর্তা—আমি হীনের হীন, দাসের দাস, তোমার গায়ের একগাছি ছোট রোমের সমান—একগাছি বড়র সমানও নই।"[১] বস্তুতঃ ঠাকুর ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও মিষ্টভাষী এবং তাই তিনি তাঁর শিষ্যদের মন জয় করেছিলেন। মহাকবি গিরিশচন্দ্র যখন প্রথমবার ঠাকুরকে দেখেন তখন তিনি ঠাকুরকে গুরুরূপে মেনে নিতে পারেননি, তার কারণ তাঁর মনে ছিল এমনি এক অহমিকা যা মানুষকে গুরু ব'লে স্বীকার করতে বাধা দিত। কিন্তু সেই গিরিশচন্দ্র যখন দেখলেন যে, দেখা হ'লেই সবার আগে ঠাকুরই তাঁকে হাত তুলে নমস্কার করছেন, তখন তাঁর সব অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে গেল এবং তিনি ঠাকুরের চরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলেন। ঠাকুরের এই নিরহঙ্কার আচরণে তাঁর গুরুভাবের প্রকৃত বিকাশ হয়েছে। তিনি নিজেকে জগন্মাতার যন্ত্র ছাড়া আর কিছু মনে করতেন না। তিনি বলতেন, "মার কাজ মা করেন; আমি জগতে কাজ করবার, লোক-শিক্ষা দেবার কে?"[২] জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল। এই জন্যই তিনি কখনও আচার্য-পদবী গ্রহণ করেননি, কারণ তাতে অহঙ্কার প্রকাশ পেতো। এই নিয়ে জগদম্বার সাথে তিনি শিশুর মতো কলহ করতেন। অসুস্থাবস্থায় যখন দক্ষিণেশ্বরে

---

১ স্বামী সারদানন্দ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৩য় খণ্ড; পৃঃ-১০২

২ লীলাপ্রসঙ্গ, ৩য় খণ্ড

বহু লোকের সমাগম হ'ত, ঠাকুর তখন একদিন ভাবাবেশে জগদম্বাকে বলেছিলেন, "কচ্ছিস কি? এত লোকের ভিড় কি আনতে হয়? আমার নাইবার খাবার সময় নেই! এটা তো ভাঙ্গা ঢাক! এত ক'রে বাজালে কোন্ দিন ফুটো হ'য়ে যাবে যে! তখন কি করবি?"[৩] এই নিরভিমান ব্যক্তিত্ব ছাড়া ঠাকুরের সাফল্যের প্রধান কারণ ছিল তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি। ঠাকুর নিজের উপদেশ প্রচার করার জন্য সাধারণ সভায় কখনও বক্তৃতা দেননি। তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতেন ছোট ছোট উদাহরণ, গল্প বা কথোপকথনের মাধ্যমে এবং এর দ্বারাই যুবকদের মন গড়ে উঠতো তাঁর আদর্শে। তাঁর বাণীর মধ্যে দুর্বোধ্য বিষয় কিছু থাকতো না, তার কারণ ঠাকুর ঐগুলি অত্যন্ত সহজ ভাষায় প্রচার করতেন এবং উপমাদির দ্বারা অথবা দৈনন্দিন জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। একটি নিরক্ষর লোকও ঠাকুরের উপদেশগুলি ভালভাবে বুঝতে পারতো। ঈশ্বর সম্বন্ধে ঠাকুরের মতামত আলোচনা করলে এই ভাবটি খুব সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। তিনি বলছেন, "ঈশ্বর এক বই দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। কেউ বলে God, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব আর কেউ বলে ব্রহ্ম। যেমন পুকুরে জল আছে—এক ঘাটের লোক বলছে জল,...আর এক ঘাটের লোক বলছে পানি—হিন্দু বলছে জল, খৃষ্টান বলছে water, মুসলমান বলছে পানি—কিন্তু বস্তু এক।"[৪] ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার জন্য ঠাকুর কোনও একটা জটিল দর্শন প্রচার করেননি। তিনি বলেছেন—ঈশ্বরকে পাবার জন্য যে কোনও একটা পথ অবলম্বন করা যেতে পারে। কোনও একটা নির্দিষ্ট পথই যে সকলকেই অবলম্বন করতে হবে তা নয়। "যত মত তত পথ"—এই ছিল তাঁর বাণী। এই ভাবটি তিনি একটি খুব সুন্দর উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন: ছাদে ওঠা নিয়ে বিষয়—কেউ সিঁড়ি দিয়ে ওঠে আবার কেউ কেউ মই লাগিয়ে ওঠে।[৫] ঠাকুর তাঁর নিজের জীবনের সাধনার দৃষ্টান্তে এই তত্ত্বটি প্রমাণ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি সর্ব-ধর্মের সমন্বয় স্থাপন করেছেন। তিনি বলতেন যে, সকল ধর্মই সত্য; কোনও ধর্ম ভুল বলা অন্যায়, তার কারণ প্রত্যেকেরই লক্ষ্য এক—অর্থাৎ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। ঠাকুরের এই উপদেশগুলিতে ছিল একটা সর্বজনীন আবেদন—তাই এই সিদ্ধান্তগুলি তাঁর শিষ্যবৃন্দকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এ ছাড়া অন্যকে নিজের ভাবধারা দিয়ে প্রভাবিত করার অদ্ভুত ক্ষমতাও ছিল ঠাকুরের। এ যুগে ইউরোপীয় শিক্ষা-সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে আমাদের দেশে এমন একটা দল গড়ে উঠেছিল যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে হ'য়ে উঠেছিল ঘোর সংশয়বাদী। এই আবহাওয়ায় ঠাকুর দ্বিধাহীন উক্তিতে প্রচার করলেন যে, ঈশ্বর আছেন এবং তাঁকে উপলব্ধি করাই হ'ল মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। তিনি তাঁর বক্তব্যগুলি এত সহজ-ভাবে ও সরল যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন যে, সংশয়বাদী যুবকরা পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারতো না। নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) যখন ঠাকুরকে জিজ্ঞেস

৩ লীলাপ্রসঙ্গ, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ-২০৪-৫

৪ কথামৃত, ৩য় ভাগ, ৪র্থ খণ্ড

৫ কথামৃত, ৫ম ভাগ, ২য় খণ্ড

করেছিলেন, "আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?" ঠাকুর বলেছিলেন, "হ্যাঁ দেখেছি · তোকেও দেখাতে পারি।" বিবেকানন্দ ঠাকুরের এই কথায় মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন। এই মতবাদ প্রচার ক'রে ঠাকুর যুবক সম্প্রদায়ের মন থেকে নাস্তিকতার ভাবটি দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। এর দ্বারাই সেদিন হিন্দুধর্মের লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল—জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল আধ্যাত্মিক জীবনের মহত্ত্ব। বস্তুতঃ ঠাকুরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সর্বসাধারণের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি একটা অনুরাগ সৃষ্টি করা। তিনি বলতেন, "আমি তর্ক ভালবাসি না ঈশ্বর সকল তর্ক-বুদ্ধির ওপরে।" কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের ওপর প্রভুত্ব করতে চেষ্টা করেননি। তাঁর শিষ্যদের তিনি কোনও বিষয় অন্ধের মতো মেনে নিতে বলেননি বা নিজের মতটা জোর ক'রে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেননি। এখানে তিনি একটা উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ছিলেন এবং তাঁর শিষ্যদের প্রত্যেকটি বিষয় বিচারবুদ্ধি দিয়ে পরীক্ষা ক'রে নেবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি সকল সময়েই সত্যকে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই ক'রে নেবার উপদেশ দিতেন। তাই স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের বিছানার নীচে টাকা রেখে তাঁকে পরীক্ষা করেছেন, এ কথা জেনেও ঠাকুর ক্ষুব্ধ হননি, বরং বলেছিলেন যে, কিছু স্বীকার ক'রে নেবার আগে যাচাই ক'রে নিবি।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের আর একটি দিক আমরা দেখতে পাই; তিনি কখনও জাগতিক ভোগসুখে আসক্ত কোনও ব্যক্তিকে সর্বস্ব ত্যাগ করার উপদেশ দেননি। স্বামীজীর কথায়—তিনি একতাল কাদা নিয়ে মূর্তিগড়ার মতো মানুষের মনকে যেমন-খুশি গড়তে পারতেন। গিরিশবাবু সুরাপানাসক্ত ছিলেন, কিন্তু একটিবারের জন্যও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে মদ্যপান থেকে বিরত হ'তে বলেননি। দানাকালীর জীবনেও অনুরূপ ঘটনা দেখি। সংসারে আর পাঁচজনের মতো আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ বিষয়রসবিবর্জিত, সম্পূর্ণ ত্যাগী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি সাংসারিক দুঃখ এবং বিয়োগ-ব্যথাও অনুভব করেছেন। ভাগনে হৃদয়ের দুঃখকষ্টে তিনি ব্যথিত হ'য়েছেন। ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুতে গভীরবেদনাহত হ'য়ে ঠাকুর বলেছিলেন, "অক্ষয় মলো—তখন কিছু হ'ল না। কেমন ক'রে মানুষ মরে, বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম।···তার পরদিন ঐখানে দাঁড়িয়ে আছি আর দেখছি কি যেন প্রাণের ভিতরটায় গামছা যেমন নেঙড়ায় তেমনি নেঙড়াচ্ছে, অক্ষয়ের জন্য প্রাণটা এমনি কচ্ছে!"* সন্ন্যাসী হ'য়েও ঠাকুর জীবনের শেষ পর্যন্ত মাতার প্রতি যা কর্তব্য সব পালন ক'রে গেছেন। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, ঠাকুর ছিলেন গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয়েরই আদর্শ। তিনি ছিলেন সবভাবের সমন্বয়। যে সব ভক্ত ঠাকুরের কাছে আসতো তিনি তাদের কথাবার্তা শুনে ও চালচলন দেখে তাদের মনের ভাবটি অতি সহজেই বুঝে নিতেন এবং সেই অনুযায়ী তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পথ নির্দেশ করতেন। ঠাকুর কখনও কাহারও ভাব নষ্ট করেননি। তিনি পাত্র বুঝে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ঈশ্বর-উপলব্ধির জন্য বিভিন্ন রকমের পথ দেখিয়েছেন। শুধু এই কারণেই তিনি মহাকবি গিরিশচন্দ্রকে কখনও মদ্যপান বা অভিনয় করতে নিষেধ করেননি। এমন কি তাঁকে জপধ্যান থেকেও অব্যাহতি দিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্রকে ঠাকুর

---

* লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ—পৃঃ ২৫

বলেছিলেন, "সংসার করো অনাসক্ত হ'য়ে— পাঁকাল মাছের মতো। কলঙ্ক-সাগরে সাঁতার দেবে—তবু গায়ে কাদা লাগবে না।"[৭] এই রকম শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে ঠাকুর পেয়েছিলেন সম্পূর্ণ সফলতা। ভবিষ্যৎ জীবনে গিরিশচন্দ্র ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ ভক্তদের মধ্যে গণ্য হ'য়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ' প্রবন্ধে লিখেছেন, "তাঁর (ঠাকুরের) শিক্ষাদানের এক আশ্চর্য কৌশল। বাল্যকাল হইতে আমার প্রকৃতি এই যে, যে কার্য কেহ নিবারণ করিবে, সেই কার্য আগে করিব। পরমহংসদেব একদিনের নিমিত্ত আমার কোনও কার্য করিতে নিষেধ করেন নাই। সেই নিষেধ না করাই আমার পক্ষে চরম নিষেধ হইয়াছে। অতি ঘৃণিত কার্য মনে উদিত হইলে, আমার পুরুষ-প্রকৃতিকে প্রণাম আসে, সে স্থলে পরমহংসদেবের উদয়।"

পাপীদের প্রতিও ঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল খুব উদার। এই শ্রেণীর লোকদিগকে ঠাকুর ঘৃণা করতেন না, তিনি তাদের নৈরাশ্য দূর ক'রে তাদের মধ্যে আশার আলো সঞ্চার করার চেষ্টা করতেন। তিনি বলতেন: পাপ কিসের? আমি পাপী, আমি পাপী বলতে বলতে পাপী হ'য়ে যায়। আমি মুক্ত, আমি মুক্ত—এ অভিমান রাখলে মুক্ত হ'য়ে যায়। সর্বদা মুক্ত অভিমান রাখো—পাপ স্পর্শ করবে না। গিরিশচন্দ্র যখন অনুশোচনা ক'রে ঠাকুরকে বলেছিলেন, "আমার কি হবে, মশাই—আমি যে মহাপাপী?" ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, "যে সব সময় পাপ পাপ করে, সে-ই মহাপাপী হ'য়ে যায়।" ঠাকুরের এই বাণী গিরিশচন্দ্রের অবসাদ-গ্রস্ত জীবনে সেদিন দেখিয়েছিল আলো।

শিক্ষাগুরুরূপে ঠাকুরের ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে বড় গুণ যা আমরা দেখতে পাই, সেটা হ'ল তাঁর শিষ্যদের সাথে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার। এটা ছিল সত্যকারের অপত্যস্নেহ। তার কারণ ঠাকুর পিতার মতো শিষ্যদের সকল আবদার সহ্য করতেন। তাদের আপাতদৃষ্ট রূঢ় আচরণে তিনি ছিলেন চির-ক্ষমাশীল। স্বর্গত রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত 'পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' নামক গ্রন্থে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে, যাতে এই ভাবটি বেশ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠে। ঘটনাটি এইরূপ, "একবার ঠাকুর গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখতে গেলে, গিরিশচন্দ্র প্রথমে ঠাকুরকে খুব অভ্যর্থনা করেন, পরে মদের নেশায় ঠাকুরের কাছে আবদার ধরে বললেন, 'তুমি আমার ছেলে হও।' ঠাকুর বললেন, 'তা কেন? আমি তোর ইষ্ট হ'য়ে থাকবো—আমার বাপ অতি নির্মল ছিলেন। আমি তোর ছেলে হব কেন?' এই সময় গিরিশচন্দ্র ঠাকুরকে অকথ্য ভাষায় গালি দেন। এতে ঠাকুর এতটুকু বিচলিত হন-নি, বরং অন্য ভক্তেরা গিরিশচন্দ্রকে শাস্তি দিতে উদ্যত হ'লে ঠাকুর তাদের বাধা দেন এবং বিনা প্রতিবাদে সেই স্থানটি পরিত্যাগ ক'রে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন। শুধু তাই নয়, পরের দিন আবার গিরিশচন্দ্রের বাড়ী গিয়ে তাঁকে স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে জড়িয়ে ধরেন।" এই ঘটনাটি উল্লেখ ক'রে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, "জন্মদাতা পিতা যে অপরাধে ত্যাজ্যপুত্র করেন, সে অপরাধ আমার পরম পিতার নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল না। তিনি আমার বাড়ী আসিলেন —দর্শনলাভে চরিতার্থ হইলাম।"[৮] বস্তুতঃ শিষ্যদের প্রতি ঠাকুরের ছিল গভীর ভালবাসা। কয়েকদিন শিষ্যদের না দেখতে পেলেই তাঁর

৭ কথামৃত—৩য় ভাগ, চতুর্দশ খণ্ড

৮ গিরিশচন্দ্র—'পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ'

হৃদয় ব্যাকুল হ'য়ে উঠতো। কখনো বা ঠাকুর নিজে গিয়েই শিষ্যদের খবর নিয়ে আসতেন। দক্ষিণেশ্বরে যে সব শিষ্য তখন ঠাকুরের কাছে আসতেন ঠাকুর কখনও তাদের অভুক্ত ফেরাতেন না। তারা যা খেতে ভালবাসতো ঠাকুর তাদের তা-ই খাওয়াতেন। এর জন্য দিবারাত্র শ্রীশ্রীমা নহবতখানায় রান্নার কাজে লিপ্ত থাকতেন। শুধু তাই নয়, কখনো আবার ঠাকুর নিজের হাতে ক'রে তাঁর ভক্তদের খাইয়ে দিতেন। গিরিশচন্দ্র 'পরমহংসদেবের শিষ্য-স্নেহ' প্রবন্ধে লিখেছেন, "একদিন আমি দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছি, ঠাকুরের ভোজন শেষ হইয়াছে; তিনি বলিলেন, 'পায়েস খা' এবং আমিও খাইতে বসিলাম। ঠাকুর বলিলেন, 'আয় তোকে খাওয়াইয়া দি।'—মা যেমন চেঁচে পুঁচে খাওয়াইয়া দেন, সেইরূপ চেঁচে পুঁচে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন; আমি যে বুড়োধাড়ি তাহা আমার মনে হইল না নগ্ন বালকের ন্যায় হইলাম, মা খাওয়াইয়া দিতেছেন—মনে হইল।"

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আচার্য ও আধ্যাত্মিক শিক্ষকের ভূমিকায় যে কয়টি জীবন আমরা দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের সকলের ঊর্ধ্বে একটি বিশেষ স্থানে রয়েছেন। তিনি গতানুগতিকতা, ধারাবাহিকতা প্রভৃতিকে বর্জন করেননি। তিনি এ সমস্তের ভেতর থেকে মূল সুরটি নিয়ে নিজ প্রতিভায় সৃজন করেছেন এক অনবদ্য মাধুর্য।

শেষ বসন্তে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

জলন্ত আকাশের তপ্তকটাহতলে
পৃথিবীটা মনে হয় জ্বলছে।
ভাতুর আতার গাছে ছাতারে পাখীর দল
এলোমেলো কত কি যে বলছে!
দিগন্তবিস্তারী চৈত্রের প্রান্তর
দুর্বাসা ঋষি যেন ক্রুদ্ধ!
বাবলার ডালে ব'সে ফিঙে একা গান গায়,
রুদ্রের সুষমায় মুগ্ধ!
নূতনের চিতানলে পুরাতন পুড়ে যায়!
ঘাসে ঘাসে মৃত্যুর স্পর্শ!
বসন্ত যায়-যায়, করিবনা আফশোষ,
এসো এসো তুমি নব বর্ষ!
ফাগুনের ছাই ওই বোশেখী বাতাসে ওড়ে,
বাঁধ-ভাঙা অশ্রুর সিন্ধু
আমার মরমে দোলে! হতাশার কালো মেঘে
লুপ্ত আশার শেষবিন্দু!
চিন্ময়, প্রেম-ঘন তোমাতেই শক্তির
পূর্ণতা, বলে সাধুসন্ত।
তবে কেন দিকে দিকে বেদনার পারাবার
উথলিছে নাহি যার অন্ত?
অলঙ্ঘ্য নিয়মের বন্ধনে বাঁধা ওই
গগনের শশী-তারা-সূর্য!
সেই নিয়মের বশে বিশ্বের ঘরে ঘরে
মৃত্যুর বাজে জয়-তূর্য!
দস্যুর মতো এসে কেড়ে লয় প্রিয়জনে,
জীবনেরে করে দেয় নিঃস্ব!
তুমি যদি প্রেমময় কেন তবে ব'সে ব'সে
হেরিতেছ এ নিঠুর দৃশ্য?
সীমিত জ্ঞানের মোর এক-সেরা ঘটি হায়,
চার সের দুধ তাতে ধরবে?
বুদ্ধির কসরতে ভেবেছো কি কোনকালে
সন্দেহ যবনিকা সরবে?
তর্কে মেধায় নয়, জীবন্ত বিশ্বাসে
সত্যের দ্বার তুই খুলবি,
আনন্দ ঘন সেই জ্যোতির জ্যোতিরে হেরি
জীবনের সব ব্যথা ভুলবি!

মহাকাব্য হিসাবে মংগলকাব্যের স্থান

শ্রীসুখরঞ্জন চক্রবর্তী

বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে মংগল-কাব্যসমূহ এক উল্লেখ্য এবং আশ্চর্য সংযোজনা। বাংলা কাব্যের অন্ধকারময় যুগে মংগলকাব্যের আবির্ভাব এক বিপুল আলোর উৎস অবারিত করেছে। বাঙালীমানস নংালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মংগলকাব্যের কাব্যরস পান ক'রে। এই মংগলকাব্যের আবেদন তাই বাঙালী পাঠকের কাছে অপরিসীম মূল্যাঙ্কে উন্নীত। বাঙালী পাঠক এই কাব্যে লৌকিক কাব্যের আস্বাদ গ্রহণ করেছে। করেছে গীতিকাব্যের সুললিত সুরঝংকার। আবার কেউ কেউ এতে মহাকাব্যের উৎস-সন্ধানেও ব্রতী হয়েছেন।

মহাকাব্য হিসাবে মংগলকাব্যের স্থান সম্বন্ধে কোন বক্তব্যকে রাখতে গেলেই সর্বাগ্রে আমাদের মহাকাব্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে সচেতন হ'তে হবে। মহাকাব্য বলতে আমরা সাধারণতঃ রামায়ণ এবং মহাভারত—এই দুখানি গ্রন্থকেই ভারতীয় সাহিত্যের আদি ও শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য ব'লে বুঝি। আর কোন কাব্যের কথা আমাদের তেমন মনে আসে না। এর কারণ কি? কারণ যথেষ্টই আছে এবং তা যথার্থই সুচিহ্নিত।

দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণের কথা উল্লেখ ক'রে মহাকাব্যের রূপ সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট ধারণাকে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর মতে—

(১) মহাকাব্যে সর্গবিভাগ থাকবে; (২) মহাকাব্য আশীর্বাদ, নমস্কার বা বস্তু-নির্দেশের দ্বারা আরম্ভ হবে; (৩) ইতিহাস বা কোন সত্য ঘটনাকে নির্ভর ক'রেই মহাকাব্য গড়ে উঠবে; (৪) মহাকাব্যে চতুর্বর্গফল লাভ হবে; (৫) মহাকাব্যের নায়ক চতুর ও উদাত্ত হবেন; (৬) এতে চন্দ্র-সূর্য-উদয়, জলক্রীড়া, মধুপান, বিপ্রলম্ভ, বিবাহ ইত্যাদির বর্ণনা থাকবে (৭) মহাকাব্য রসভাব ও অলঙ্কার সংবলিত হবে; (৮) সর্গ-সংখ্যা আটটির কম ও ত্রিশটির অধিক থাকবে না এবং সর্গগুলি পরস্পর রসাপেক্ষ হবে।

পরিশেষে তিনি আরও বলেছেন যে, উল্লিখিত লক্ষণগুলির দু'-একটি মহাকাব্য থেকে বাদ গেলেও বিশেষ ক্ষতি নেই যদি তা বিদগ্ধজনের রসবোধকে পরিতৃপ্ত করতে পারে।

এক্ষণে উল্লিখিত লক্ষণগুলির আলোকে মংগলকাব্যগুলিকে বিচার ক'রে দেখতে হয়।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠে সর্গ বিভাগের বা সন্ধির উপরে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে মহাকাব্যের মতো আটটি সর্গ হয়তো মংগল-কাব্যে নেই। কিন্তু ত্রি-সন্ধিতে প্রায় সকল মংগলকাব্যই বিন্যস্ত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মংগলকাব্যগুলির আরম্ভ বন্দনা বা নমস্কার দিয়ে হওয়াতে তাতে মহাকাব্যের রীতি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এই কাব্যগুলি যদিও সাম্প্রদায়িক উৎস থেকে জন্মলাভ করেছে, তথাপি বন্দনা-অংশে এক অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাব বর্তমান।

তৃতীয়তঃ যে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন ক'রে মংগলকাব্যগুলি রচিত হয়েছে, তা বহুপূর্ব

থেকেই জনগণের মনে ছড়া পাচালী ইত্যাদির মাধ্যমে সাড়া জাগিয়ে আসছিল। মংগল-কাব্যকারগণ সেই সব পৌরাণিক কাহিনীকেই গ্রহণ ক'রে তাকে রূপে রসে সঞ্জীবিত ক'রে বিদগ্ধ জনের আসরে পরিবেশন করেছেন। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, মহাকাব্য যেমন একটি যুগের প্রতিচ্ছবি হ'য়েও আপনগুণে যুগোত্তীর্ণ হ'য়ে অম্লান শাশ্বত মহিমায় বিরাজ করে, মংগলকাব্যগুলি তেমনটি হ'তে পারেনি। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীর আবেদন যেমন দেশকালের সীমাকে অতিক্রম করেছে, মনসা বা চণ্ডীমংগলের আবেদন সেইরূপ করতে পারেনি। এরা যুগেই শেষ হয়েছে। কোন বিরাট সত্যকে এরা তুলে ধরতে পারেনি সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের কাছে। এক-একটি বিশেষ যুগের (?) রসপিপাসাকে পরিতৃপ্ত ক'রেই যেন দেউলে হ'য়ে গিয়েছে মংগলকাব্যগুলি— চিরকালের রসের ভাণ্ডারে রসের যোগান দিতে সমর্থ হয়নি।

তথাপি কতকগুলি বিশেষ দিক দিয়ে মংগলকাব্যগুলিতে মহাকাব্যীয় লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়েছে। মহাকাব্যের পরিসর বিস্তৃতি মংগল-কাব্যগুলিতে বর্তমান রয়েছে। মংগলকাব্য-গুলিও মহাকাব্যের ন্যায় সুবিশাল সুদীর্ঘ। মংগলকাব্যগুলি মহাকাব্যের মতোই শ্রব্যকাব্য, কানে শুনেই একে উপভোগ করা হয়। মহাকাব্য যেমনভাবে পৌরাণিক, মংগলকাব্যও তেমনিভাবে পৌরাণিক এবং ইতিহাস-চেতনা-সমন্বিত— ইতিহাসেরই ছায়াতপে রচিত মহাকাব্যের এবং মংগলকাব্যের যুগল কাহিনী। অ্যারিস্টটল বলেছেন,—"In the epic poem, owing to its length, each part assumes its proper magnitude." এর ফলেই মহাকাব্যের আকৃতি হয় বৃহত্তর আর প্রকৃতি হয় মহত্তর। মহাকাব্য দেহে বিরাট, আত্মায় মহান। মংগলকাব্যও সুবিশাল হ'তে পারে। মনসামংগলও রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় সুবিশাল না হ'লেও সুদীর্ঘ সন্দেহ নেই।

মহাকাব্যের নায়কের মতন মংগলকাব্য-সমূহের নায়কও চতুর এবং উদাত্ত। এক কথায় তাকে ধীরোদাত্ত বলা যায়। নারায়ণদেব-অঙ্কিত চাঁদ সদাগরের চরিত্র একটি অনিন্দ্যসুন্দর চরিত্র। তার চরিত্রে অভিনবত্বের চরম প্রকাশ দেখা যায়।

মহাকাব্যের পরিসর যতই দীর্ঘ হউক না কেন, তাতে যত চরিত্রই ভিড় করুক না কেন, প্রতিটি চরিত্র কোন না কোন প্রয়োজনে এসেছে। অপ্রাসংগিক চরিত্রের স্থান মহাকাব্যে নেই। কিন্তু মংগলকাব্যে চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা সর্বদা সুচিহ্নিত নয়।

মহাকাব্যে লোককথার স্থান আছে, কিন্তু তা ব্যাপক নয়। মংগলকাব্যে লোককথার ব্যাপক ও বিস্তৃত স্থান দেখা যায়। মহাকাব্যের অঙ্গী রস- শৃংগার, বীর ও করুণের সমারোহে গঠিত। মংগলকাব্যের অঙ্গী রস—করুণ। চণ্ডীমংগল ও মনসামংগলকাব্য দুটি সুগভীর কারুণ্যে বিন্যস্ত। এতে বারমাস্যার বর্ণনা আমাদের মনকে গভীর কারুণ্যের প্রবাহে উন্মোচিত করে। মহাকাব্যে বারমাস্যার বর্ণনা নেই।

মহাকাব্যের নায়ক প্রতিনায়ক higher type। মহাকাব্যের মতন মংগলকাব্যের নায়কও higher type।

মহাকাব্য জাতীয় কাব্য। একটা গোটা-জাতির সভ্যতা সংস্কৃতি ও সমাজের প্রতিচ্ছবিই মহাকাব্যে ফুটে ওঠে। জাতীয় কাব্যের এইরূপের পটভূমিতে আদিযুগের মংগলকাব্য-

গুলিকে কোনক্রমেই জাতীয় কাব্যের দিগন্তে ফেলা যায় না। কেননা প্রথম দিকের মংগলকাব্যগুলিতে সামগ্রিক জাতীয় চেতনার অভিব্যক্তি অপেক্ষা প্রধান হ'য়ে উঠেছে সাম্প্রদায়িক রূপালেখ্য। বাঙালীর জাতীয় জীবনের উদ্ঘাটন এবং রসসৃষ্টি অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক দেবতার সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান তখন এই শ্রেণীর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ফলে প্রথমদিককার মংগলকাব্যগুলি একান্ত-ভাবেই communal poetry-র অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক তীব্র ভেদবুদ্ধি দীর্ঘদিন মংগলকাব্যগুলিকে শাসন করতে পারেনি। কারণ, এই দেশের এই-সকল সংকীর্ণতামূলক সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের উপর দিয়ে বৈষ্ণব-সাহিত্যের কূলপ্লাবিনী বন্যা প্রবাহিত হ'য়ে গেছে। তার ফলে এই সমাজের প্রায় সাম্প্র-দায়িক সাহিত্যের মূল শিথিল হ'য়ে গেছে। জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণীতে চৈতন্যোত্তর যুগের মংগলকাব্যগুলির পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। ধর্মমংগল এবং বিশেষ ক'রে চণ্ডীমংগল তার সার্থক উদাহরণ। চৈতন্যোত্তর যুগের মংগলকাব্যগুলি সার্থক জাতীয় কাব্য হ'য়ে উঠেছে। এতে বাঙালী জাতির সার্থক রূপায়ণ হয়েছে। মহাকাব্য ভয় ও শোচনার উদ্রেক করে। মংগলকাব্যও করে। তবে একটু মাত্রাতিরিক্ত ভাবেই করে।

মহাকাব্যের মতন মংগলকাব্যেও চন্দ্রসূর্যের উদয়, জলক্রীড়া, বিবাহ ইত্যাদির বর্ণনা আছে। মনসামংগলকাব্যে বেহুলা ও লখীন্দরের বিবাহ-বর্ণনা আছে। কিন্তু মহাকাব্যে যে মহান ভাবের প্রকাশ আছে, মংগলকাব্যে তা অনুপস্থিত। মংগলকাব্য প্রধানতঃ ঈর্ষা ও দ্বন্দ্বের ইতিহাস। কোন elements of wonderful নেই মংগলকাব্যে। মংগলকাব্য মানুষে-দেবতায়, দেবতায়-দেবতায় সংগ্রামকে রূপায়িত করেছে। মহাকাব্য মানুষে-মানুষে দ্বন্দ্বকেই মুখ্য করেছে। দেবতা এসেছে প্রসংগ-ক্রমে। মহাকাব্যে মানবতারই জয়ধ্বনি। মংগল-কাব্যের পরিণামে মানবতার পরাজয় দেবদেবীর কাছে। মংগলকাব্য স্বতঃসম্ভাবী, কেবলমাত্র epic growth এর। আর মহাকাব্য একই সময়ে literary ও epic। মহাকাব্যে মানুষ দেবতায় উন্নীত হয়েছে আর মংগলকাব্যে দেবতা মানুষের পর্যায়ে নেমে এসেছে। অন্নদামংগল, কালিকামংগল ইত্যাদি মংগলকাব্যে দেবতাদের মানুষের পর্যায়ে নেমে আসতে হয়েছে। মহা-ভারত মহাকাব্যে মানুষ ভীষ্ম দেবতার চেয়েও বড়, যুধিষ্ঠিরের শাস্ত্রজ্ঞানের কাছে মহাজ্ঞানবান যমরাজও পরাজয় স্বীকার করেন। শ্রীকৃষ্ণ তথা এই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দেব দয়াময় হরি নরনারায়ণ পাণ্ডবদের পরম সখা। রামায়ণেও দেবদেবী শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ ইত্যাদির পরম সুহৃদ। দেবতা মানুষের সাথে অকপটে মিশে যাওয়াতে এই মহাকাব্যদ্বয়ে দেবতারা কোনপ্রকার ছদ্মবেশ গ্রহণ করেননি। বরং মহাকাব্যরচয়িতাদের লেখনীগুণে মনে হয় যেন মানুষের সঙ্গে মিশতে পেরে দেবতাকুল পরম আনন্দিত হয়েছেন। এভাবে মানবমহিমাই মহাকাব্যের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় মর্মরিত হয়েছে। গ্রীক মহাকাব্যেও দেখি জীয়ুস, এথেনা প্রভৃতি দেবদেবী মানুষের সঙ্গে মিশতে পেরে যেন পরম তৃপ্তি লাভ করেছেন।

মহাকাব্যের দ্বন্দ্ব বাহির ও ভিতরের দ্বন্দ্ব। ভিতরের চেয়ে বাহিরের দ্বন্দ্বই যেন মুখ্য। একটা অমোঘ শক্তির সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করতে করতে মহাকাব্যের নায়ক আপন পরাজয় (?) বরণ করতে বাধ্য হন। গ্রীক

মহাকাব্যে এই শক্তিকেই nemesis বলেছে। মহাকাব্যের নায়কের দ্বন্দ্ব সর্বসময় প্রত্যক্ষ-গোচর বা positive নয়। মংগলকাব্যের নায়কের দ্বন্দ্ব অধিকাংশ সময়ই প্রত্যক্ষগোচর বা positive। চাঁদ সদাগরের জীবনে যে দ্বন্দ্বের সূচনা বা লাউসেনের জীবনে যে দ্বন্দ্ব ভাঁড়ু দত্তের জীবনের যে বিপদ—সব কিছুই অত্যন্ত প্রত্যক্ষগোচর। Negative দ্বন্দ্বের কোন আভাষ মঙ্গলকাব্যে নেই।

রবীন্দ্রনাথের মতে : 'মহাকাব্য বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা এবং সেই শ্রেণীর কবির রচনা, যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে।' রবীন্দ্রনাথের মতে মহাকাব্যের অন্যতম লক্ষণ ব্যাপকতা।

বাংলার মংগলকাব্যগুলি বৃহৎ-সম্প্রদায়ের কথা ব'লে দাবি করতে পারে না। বৃহৎ ভারতীয় জনসম্প্রদায়ের কথা মংগলকাব্যে অনুপস্থিত। মংগলকাব্য একান্তভাবে সাম্প্রদায়িক কাব্য—sectarian কাব্য। মহাকাব্যের ব্যাপকতা নেই মংগলকাব্যে। চিরন্তনতার দাবি এর অত্যন্ত সীমিত।

মহাকাব্যের সকল রসকেই শেষ পর্যন্ত অদ্ভুতরসের বিশালতার সঙ্গমে মিলতে হয়। মংগলকাব্যসমূহে করুণ রসই প্রধান। চণ্ডীমংগল, মনসামংগল, অন্নদামংগল ইত্যাদি উল্লেখ্য মংগলকাব্যগুলির অঙ্গী রস করুণ।

বিশাল হওয়ার দরুন মহাকাব্য এবং মংগলকাব্য উভয়েই শ্লথগতি; নাটকের ক্ষিপ্রতা এদের কোনটিতেই দর্শনীয় নয়।

মংগলকাব্যে মহাকাব্যের কয়েকটি গুণ থাকা সত্ত্বেও মংগলকাব্যকে মহাকাব্যের আসরে স্থান দেওয়া সঙ্গত ব'লে বোধ হয় না। মহাকাব্য মহাজীবনের প্রতিচ্ছবি · অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের একটা মহান ভাবকেই সমন্বিত করে মহাকাব্য, যার আবেদন কাল ও সাম্রাজ্যের পরিখা ডিঙিয়ে মহাকাল ও মহামানবের বিষয়বস্তু। মহাকাব্যে যে মহামানবের মহাকল্লোল ধ্বনিত তার ভগ্নাংশ হয়তো মংগলকাব্যে শোনা যেতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যের অতলস্পর্শী বিশালতার কাছে মংগলকাব্য অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়তন ব'লেই গৃহীত হবার যোগ্য। মংগলকাব্যের মংগল নামটির মধ্যে এর একটা সহজ সীমা নির্ধারিত। মহাকাব্য বিশাল ও বিপুল। কত বিশাল, অলংকারশাস্ত্রে তার সঠিক ধারণা নেই। মহাকাব্য একটা মহাদেশের বার্তাবহ, আর মংগলকাব্য তারই মধ্যস্থিত একটি দেশের মংগলকীর্তনিয়া।

মহাকাব্য সময়ের শাসন বড় একটা মানে না। তাই সুদীর্ঘ একটা যুগ মহাকাব্যের দর্পণে হয় প্রতিবিম্বিত আর মংগলকাব্য বিশাল হ'য়েও সময়ের কাছে নিদারুণভাবে বাঁধা।

মহাকাব্য যদি হয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির সুবিশাল সৌধ, তবে মংগলকাব্য তারই মধ্যকার ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠ।

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত 'বেদান্তকেশরী'

(কাব্যানুবাদ)

অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য

মানব সকলে ভুঞ্জি বহুবিধ সুখ
তারপরে হয় সবে সুষুপ্তি-মগন,
তার মাঝে নিবিড় আনন্দময় ধাম
'আনন্দের কোশ' শোভে রহস্যে গহন,
তাহে নিমজ্জিত হয়ে অগাধে বিলীন
সুখমাঝে আত্মহারা সীমার অতীতে;
জাগরিত হলে পুনঃ দুঃখ অনুভবে,
বিচক্ষণ নাহি তাই জাগায় নিদ্রিতে ॥ ৬৫

অন্তরে গ্রহণ করি ইন্দ্রিয়-নিচয়
চক্ষু আদি, ভোগে করি তর্পিত সবায়,
সকলের উপকারী প্রথিত সে ব্রহ্ম
পেলে ফুল্ল হয় জীব সুষুপ্তের প্রায়।
উদর-ভরণ তরে, ব্রহ্ম ত্যজি হয়ে
বহির্মুখ, পাপভাগী হয় এ সবার,
দৃষ্টি, স্পর্শ, শ্রবণ, আঘ্রাণ, জিহ্বা লোভী,
শোক-মোহে বিজড়িত গতি হয় তার ॥ ৬৬

জাগরণে অন্তরাত্মা বিষয়-লালসে
নানা চেষ্টা সম্পাদন করি নিরন্তর
শ্রান্ত হয়ে, ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে লভি সুখ,
ক্ষণে তায় বিস্মরিয়া, হয় নিদ্রাপর
স্বরূপে বিশ্রাম তরে, অতীব সুলভ
তাহে জানি, ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ-রহিত,
অন্তিমে বিরস ইন্দ্রিয়জ সুখ হ'তে,
সর্বোত্তম আনন্দের প্রবাহে মজ্জিত ॥ ৬৭

দুই পক্ষ করিয়া চালন, উৎপাদিয়া
বায়ু, উচ্চে পক্ষী যায় উড়ি তারি বলে,
সেথা পেয়ে উন্মুক্ত বাতাস, দুটি পক্ষ
মেলি হের আপনার শ্রম দূর করে;
বিষয়ের অন্বেষণে সেইমত নানা
সংকল্প-বিকল্পে চিত্ত পরে ক্লান্ত হ'লে,
হস্ত পদ করিয়া বিস্তার নিদ্রা যায়
জীব অতি সুখে নিত্য বিশ্রামের তরে ॥ ৬৮

আলিঙ্গিয়া আত্মায় আত্মাকে নাহি জানে
সহসা আন্তর কিংবা বাহ্য কোন সুখে,
যথা কেহ ফিরি গৃহে বিদেশ হইতে
নিজ প্রিয়জনে ধরে জড়াইয়া বুকে
আত্মহারা —লোক-ব্যবহার পুণ্য পাপ
সেই কালে যতেক ঝঞ্ঝাট পাসরিয়া,
শোক মোহ ভয় আর সম বা বিষম
সব কিছু ভোলে সেই বিমোহিত হিয়া ॥ ৬৯

স্থূল-সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের লয়, ইন্দ্রিয়ের
উপশান্তি, আনন্দানুভব তাহে হয়,
এসব জীবন্মুক্তি আর সুষুপ্তিতে
সাধারণ। তবু দুয়ে ভেদ এই রয় –
সুপ্ত জীব জাগরিত হয়ে পুনবায়
পূর্বের সংস্কার মাঝে করে অবস্থান;
সংস্কারনাশহেতু বিমুক্ত পুরুষ
পূর্বভাবে নাহি করে পুনরাবর্তন ॥ ৭০

অশেষ ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ নরপতি
সকল আনন্দ যাহা অনুভবে পায়,
একক আনন্দ বলি গণ্য তাহা হয়;
তার শতগুণ পিতৃলোকে উপজয়;
দেবলোক হ'তে আর ব্রহ্মলোকাবধি,
প্রতিস্তরে আনন্দের হয় উপচয়,
ব্রহ্মানন্দে চরম পূর্ণতা বিরাজিত।
বিষয়জ সুখ তার কণামাত্র হয় ॥ ৭১

যেথা আছে সমূহ আনন্দ তথা নর-
পিতৃ- কিংবা দেবলোক-আনন্দ নিচয়,
তৃপ্ত যেথা সর্ব কাম, আর অখিলের
বিরতিতে বিরাজিত একান্ত অদ্বয়।
'হে সোম! সে সুনিবিড় আনন্দ-অমৃতে
কর মোরে স্নাত!'—তাই শ্রুতিবাক্য কয়—
'সেই পীযূষের ধারা কর বরিষণ
জীবাত্মায়'—ভ্রূ যুগের মধ্যে যাহা রয় ॥৭২

আত্মা অকম্পন সুখময় স্ফূর্তি তার;
বিপরীত প্রকৃতি, পৃথক স্ফূর্তি তার,
স্থিরত্ব ও চঞ্চলতা মনোমাঝে দেখা
যায়. কার্য হয় এই উভয় প্রকার।
চঞ্চলতা তত কাল দুঃখের কারণ,
যে পর্যন্ত নাহি উহা ইষ্টবস্তু লভে,
লব্ধ হলে যে স্থিরত্ব অন্তরে বিরাজে
বিষয়জ সুখ তাহা মন অনুভবে ॥৭৩

সম্ভোগান্তে যে-প্রকার রসাবেশে হয়
একাগ্র অন্তরে সুখবোধ ক্ষণতরে,
গাঢ় নিদ্রা রহে যতকাল তদবধি
সুখরাশি - সুষুপ্তিতেও অনুভব করে
প্রশান্ত হৃদয়ে নিত্যানন্দ, দেখি তাই
স্থিরত্ব ও সুখাস্বাদ একত্র মিলিত।
অতএব উক্তি সুসঙ্গত—নিত্যানন্দ-
অংশমাত্র হয় সুখ বিষয় জনিত ॥৭৪

বাহ্য ব্যাপারের চক্রে ঘুরি শ্রান্ত মন
ভিতরে সকল ক্রিয়া আকর্ষিয়া লয়
আর যত সংস্কারের রাশি; উপরন্ত,
অন্তর্মুখী নিদানের অন্বেষণে রয়;
পূর্বতন সংস্কারে সঞ্জাত স্বপ্নদেহে
উপভুক্ত, স্বপ্নদৃষ্ট সকল বিষয়
পরিহরি, পরম বিশ্রাম অনুভবি
হেন অবস্থায় অন্তরাত্মামুখী হয় ॥৭৫

স্থূল দেহ স্বপ্নে রহে অচেতন তবু
কেমনে তা সুখাদির হয় উপভোগী?
যদি বল জন্মে অভিনব অন্যদেহ
স্বপ্নে, তবে তার সেই জন্ম উপযোগী
উপাদান সমুদয় নাহি পায় তবু
কেমনে উদ্ভব? যদি সে কর্মে উদয়,
তাহা হলে স্বপ্নে দেখা সুখাদির ফলে
সুপ্ত দেহমাঝে কেন প্রতিক্রিয়া হয়? ৭৬

ভীতিবশে করে সে রোদন কহে কথা,
হাসে, স্পর্ধা করে; তাই ইহা সুনিশ্চিত—
নিদ্রাগত অচেতন দেহে অন্তরাত্মা
সহসা না ত্যজে নিজ সঙ্গ পরিচিত;
পূর্বে যাহা অনুভূত এই দেহখানি,
রমণী তুরঙ্গ ব্যাঘ্র স্থান সমুদয়—
এই সব সংস্কারই ত্যজে পুনর্বার
সংস্কার-শরীর পুনঃ করিয়া আশ্রয় ॥৭৭

জাগ্রত ও সুষুপ্তির সন্ধিস্থলে, দুই
হ'তে ভিন্ন স্বপ্ন যথা হয় বা গোচর।
সেথা থাকে আত্মজ্যোতি যে পুরুষ
আকর্ষি বিষয় হ'তে ইন্দ্রিয়নিকর,
সে সময় স্থূল দেহে উন্মে শয্যায়
কবায়ে শয়ান, অন্তরাত্মা স্বপ্রভায়
ঈপ্সিত বিষয় হেরি সংস্কার-আকারে
আপনি সেমত ভুঞ্জে অন্যত্র কোথায় ॥৭৮

নিঃশ্বাস প্রশ্বাসরূপ প্রাণমাত্র শুধু
সমর্পিয়া, রক্ষি সেই শয্যাগত দেহ,
যাহে উহা মৃতপ্রায় আকার ধরিলে
ভক্ষণ না করে কুক্কুরাদি জীব কেহ,
নিদ্রাকালে নিজশক্তিবলে অশ্বরথ
সরিতাদি কত কিছু করে সে সৃজন—
বন্ধু, পত্নী, পুত্র, মিত্র আদি রূপে যত
নানাবিধ আপনার ক্রীড়া-নিকেতন ॥৭৯

সমালোচনা

বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-চেতনা : ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার। পৃঃ ১৮০+২৮ দাম—ছ'টাকা। প্রকাশক : রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ১২।

প্রথাগতভাবে স্বামী বিবেকানন্দ বিজ্ঞানী ছিলেন না। কিন্তু শুধু ল্যাবরেটরীতে কাজ করিলেই বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না, বরং তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধিই বিজ্ঞানী মনের পরিচায়ক। সেই অর্থেই স্বামীজীর বিজ্ঞান চেতনার বিভিন্ন দিক অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন গ্রন্থকার।

স্বামীজীকে সমগ্রভাবে বুঝা কঠিন। সাধারণ মানুষের কাছে তাঁহার জীবনচরিতের কোন একটা দিকই মাত্র প্রতিভাত হয়। ধর্মপিপাসু দেখে তাঁহার দর্শন-চিন্তার দিক, সমাজসেবী তাঁহার শিক্ষা- ও সমাজ-চিন্তার দিক, ঐতিহাসিক তাঁহার ইতিহাস-চেতনার দিক; কেহ বা তাঁহার দেশপ্রেমের দিক দেখে। আলোচ্য গ্রন্থটিতে স্বামীজীর জীবন ও বাণীর মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রবাহ বর্তমান সেগুলিকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিবার এই প্রয়াস প্রশংসনীয়।

স্বামীজীর মতো পূর্ণ জ্ঞানীর যে "বিশেষ জ্ঞানের" উপর অধিকার থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু এই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষগুলি স্বামীজীর চিন্তাধারায় ধর্মভাবের দিকটিই বড়ো করিয়া দেখেন, তাঁহার অন্যান্য পরিচয়—বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক পরিচয়ের দিকটি আদৌ ভাবিতেই চান না। তাই বৈজ্ঞানিকের চক্ষু দিয়া তাঁহার চিন্তন প্রয়োজন। আশা করা যায়, আলোচ্য গ্রন্থ তাহা অনেকটা মিটাইতে পারিবে।

পুস্তকের পূর্বলেখ হিসাবে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার কথা পাঠককে আত্মবিশ্বাসী করিবে ও স্বামীজীর বিজ্ঞান-চিন্তার উৎসের সন্ধান দিবে। প্রাক্-বৈদিক, বৈদিক ও বেদোত্তর যুগেও যে চিকিৎসাবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতির অনুশীলন চলিত তাহা সুবিশ্লেষিত।

স্বামীজীর অনুসন্ধিৎসা, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া গ্রহণ না করা ও বিচারশীলতাকে 'বৈজ্ঞানিক মেজাজ' আখ্যা দিয়া প্রথম অধ্যায়টি লিখিত। বাল্যকালে অন্য জাতির হুঁকো খাওয়া ও পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীঠাকুরকে নানাভাবে পরীক্ষা করা প্রভৃতিকে বৈজ্ঞানিকী বৃত্তির সূচনারূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে যে, স্বামীজী পাঠ্যাবস্থা হইতে শেষ জীবন পর্যন্ত গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও কারিগরি শিক্ষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। স্বামীজীর কার্যে কথাবার্তায় ও চিঠি-পত্রে তাহার অজস্র উল্লেখ লক্ষণীয়। Pathology বা Zoology-ও স্বামীজীর আলোচনার আওতা হইতে বাদ পড়ে নাই। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য স্বামীজী শিল্পোন্নতি, বাণিজ্যপ্রসার ও তদনুযায়ী শিক্ষার সংস্কার চাহিয়াছিলেন। লেখক সে-সব দিকই উপযুক্ত উদ্ধৃতি সহযোগে আলোচনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞান ও দর্শনের বা ধর্মের মধ্যে আপাত বিভেদ অদ্বৈতবাদের দ্বারা স্বামীজী কিরূপে বিদূরিত করিয়াছিলেন চতুর্থ অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। স্বামীজীর মতে বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়েরই উদ্দেশ্য—একত্বের সন্ধান ও দাসত্ব থেকে মুক্তি। পদার্থবিদ্যা চায় এমন একটি শক্তি আবিষ্কার করিতে, সকল শক্তি যাহার প্রকাশ-মাত্র; ধর্ম চায় মৃত্যুর জগতে এক অমর সত্তা আবিষ্কার করিতে। বেদে সৃষ্টির অনন্তত্ব ও

বিজ্ঞানে বিশ্বশক্তির সর্বদা সমপরিমাণত্বের মধ্যে তিনি সমতা দেখিয়াছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী যে বিভিন্ন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের দ্বারা সমর্থিত, লেখক তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদ সম্বন্ধে স্বামীজীর মত বিজ্ঞান-জগতে সত্যই এক মৌলিক অবদান। তিনি বলিতেন, ক্রমবিকাশের সঙ্গে ক্রমসঙ্কোচও মানিয়া লইতে হইবে—সব ধরনের উন্নতিই তরঙ্গাকারে হইয়া থাকে। আর মানুষের ক্ষেত্রে মনের বিকাশ লইয়া আলোচনা করিতে হইবে, শরীরের নহে। এর কিছুটা সমর্থন লেখক হাক্স্‌লি প্রভৃতি পরবর্তী লেখকদিগের মধ্যে পাইয়াছেন। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ যে 'বিগ্‌ ব্যাং থিওরী' (Big bang theory) ফেলিয়া 'পালসেটিং থিওরী' (Pulsating theory) অথবা প্রসারণ-সঙ্কোচন তত্ত্বের দ্বারা জগৎসৃষ্টি বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহাও স্বামীজীর মতবাদের এক সমর্থন বলিয়া লেখক মনে করেন।

স্বামীজী কিভাবে বিজ্ঞানের সাহায্যে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের বিশ্লেষণ করিয়া সাধারণের সহজবোধ্য করিয়া গিয়াছেন, লেখক ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহা বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা অনুধাবন করিলে বিজ্ঞানে তাঁহার গভীর অনুরাগ ও দক্ষতা প্রত্যক্ষ হয়।

বর্তমানে মনোবিজ্ঞানও বিজ্ঞানের একটা শাখা। সপ্তম অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে মনের শক্তিসম্বন্ধীয় বিভিন্ন বক্তৃতায় স্বামীজী মনোবিজ্ঞানের প্রসঙ্গ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মনোবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞানের মধ্যে সারাংশে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বর্তমান তাহাও তিনি বলিয়াছেন।

নৃতত্ত্ব সম্পর্কেও স্বামী বিবেকানন্দ বেশ ওয়াকিবহাল ছিলেন, এ বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব মতবাদ ছিল। পৃথিবীর প্রাচীন জাতিগুলির সম্বন্ধে বা ভারতে জাতিভেদ সম্বন্ধে যে সুন্দর ব্যাখ্যা স্বামীজী দিয়াছিলেন, লেখক তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহা যে ক্রমেই আদৃত হইতেছে তাহাও দেখাইয়াছেন।

বিজ্ঞানীদের প্রতি তাঁহার অনুরাগের কথা লিখিতে গিয়া স্বামীজী যে আমেরিকায় ও ইউরোপে Maxim, Tesla, Lord Kelvin, Helmholtz প্রভৃতি অনেক বৈজ্ঞানিকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কিছু কিছু লেখক পরিবেশন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্বদেশে তখন বিজ্ঞানচর্চা বেশী ছিল না, তাই জগদীশ বসুকে স্বনামে প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি বা ভগিনী নিবেদিতা যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে।

পরিশেষে স্বামীজীকে বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিসম্পন্ন সন্ন্যাসী আখ্যা দিয়া গ্রন্থকার স্বামীজীর চিন্তাজগতে বিজ্ঞানের স্থান কোথায়, তাহার স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, স্বামীজী চাহিয়াছিলেন ধর্ম ও বিজ্ঞান একত্র মিলিত হউক এবং এক সর্বকালীন ধর্ম গড়িয়া উঠুক, যে ধর্ম বিজ্ঞানীদের কাছেও সমান স্বীকৃতি লাভ করিবে এবং যাহার দ্বারা এক শান্তির সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

উপরি-লিখিত আলোচনার দ্বারা লেখকের সাফল্যই সূচিত হয়, কিন্তু কয়েকটি ত্রুটির সংশোধন বাঞ্ছনীয়—যেমন, বিভিন্ন স্থানে একই বিষয়ের অবতারণা, বিষয়বস্তুর প্রয়োজনাতিরিক্ত স্ফীতি, অতিরিক্ত উদ্ধৃতি, ও সর্বশেষে সূচীপত্রে ভুল পৃষ্ঠাসংখ্যা। লেখক এসব ত্রুটির দিকে লক্ষ্য রাখিলে আলোচ্য বইখানি বিজ্ঞানী পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

—ডক্টর শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

Souvenir (1967)—Ramakrishna Mission Seva Pratisthan (A General Hospital), 99 Sarat Bose Road, Calcutta 26. Published by Swami Gahanananda, Secretary Ramakrishna Mission Seva Pratisthan, Pp. 68, Price Re. 1/-.

বিশ্ববিশ্রুত রামকৃষ্ণ মিশনের একটি উল্লেখযোগ্য কার্য আর্তনারায়ণসেবা। দক্ষিণ-কলিকাতার শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান আজ সর্বজন-পরিচিত রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান। সেবাপ্রতিষ্ঠান বর্তমানে কলিকাতা মহানগরীর সুবৃহৎ হাসপাতালগুলির অন্যতম। এখানে আর্তনারায়ণসেবা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

সেবাপ্রতিষ্ঠানের ৩৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এই স্মরণিকা প্রকাশিত হইয়াছে। স্মরণিকাটির বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। কতকগুলি উচ্চকোটির মূল্যবান্ ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধ এবং চিত্র থাকায় ইহা বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছে। প্রতিষ্ঠা, ক্রমবিকাশ, বর্তমান অবস্থার পরিচিতি ইংরেজী ও বাংলা নিবন্ধে অভিব্যক্ত। স্মরণিকাটি সংরক্ষণযোগ্য।

সেবাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষজয়ন্তী সভায় সভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উপাধ্যক্ষ স্বামী ওঙ্কারানন্দজী যে সুচিন্তিত ভাষণ প্রদান করেন তাহার সারাংশ 'স্বামীজীর বাণী' শিরোনামে স্মরণিকাটিতে লিপিবদ্ধ হওয়ায় ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই স্মরণিকার বিক্রয়লব্ধ মূল্য দরিদ্র রোগিগণের সেবায় ব্যয়িত হইবে। ইহা ক্রয় করিলে একদিকে আর্তনারায়ণের সেবায় যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করা হইবে, অপরদিকে একটি মূল্যবান্ স্মরণিকা সংরক্ষণ করা যাইবে।

দীপ-শিখা (১৯৬৭)—আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়, আসানসোল, জেলা বর্ধমান। পৃষ্ঠা—৮৮ + ১৯ + ৫।

আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এই পত্রিকাখানি ষোড়শ-সংখ্যক 'দীপ-শিখা'। 'দীপ-শিখা' নামের সার্থকতা সপ্রমাণ করিতে পরিচালক ও সম্পাদকমণ্ডলীর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করিবার মতো। ছাত্রদের রচিত লেখাগুলিতে সাহিত্যানুরাগের পরিচয় আছে। শিক্ষকমহাশয়গণের রচনাগুলি সুচিন্তিত ও সময়োপযোগী। 'আমাদের কথা' প্রবন্ধে বিদ্যালয়ের আদর্শ, বর্তমান রূপ, পড়াশুনা, খেলাধুলা প্রভৃতির একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।

যুগশঙ্খ (১৯৬৭)—বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির পত্রিকা, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মালদহ। পৃষ্ঠা—৫৪।

'যুগশঙ্খ' চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। পত্রিকাটির পূর্বমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে। ছাত্রদের লেখা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আনন্দ হয়। 'স্বামী অভেদানন্দ স্মৃতিচয়ন'টি সুন্দর। 'বিদ্যামন্দির সংবাদ-পরিক্রমা'য় সারা বৎসরের কর্মধারা বিজ্ঞাপিত।

কল্যাণ (হিন্দী) : ৪২তম বর্ষের প্রথম সংখ্যা—**উপাসনা-অঙ্ক**। সম্পাদক—শ্রীহনুমান-প্রসাদ পোদ্দার ও শ্রীচিম্মনলাল গোস্বামী। গীতা প্রেস, গোরখপুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৭০০ + ২২ ; মূল্য ৯৲ টাকা।

ধর্মপত্রিকা হিসাবে হিন্দী ভাষায় 'কল্যাণ' মাসিক পত্রিকা বহুল-প্রচারিত ও ভারতে সর্বত্র সমাদৃত। ইহার শোভন মুদ্রণ, সুচিন্তিত রচনাসম্ভার আকর্ষণীয়। 'কল্যাণের' সুযোগ্য পরিচালকমণ্ডলী প্রতি বৎসর একখানি করিয়া

সুন্দর ও মূল্যবান্ সচিত্র বৃহদায়তন বিশেষাঙ্ক প্রকাশ করিয়া থাকেন, এইজন্য তাঁহারা পাঠকগণের ধন্যবাদভাজন। ইতঃপূর্বে 'মানবতা অঙ্ক', 'শিবপুরাণাঙ্ক', 'ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণাঙ্ক', 'ধর্মাঙ্ক', 'তীর্থাঙ্ক', 'শ্রীরামবচনামৃতাঙ্ক' প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্তমানে দেশে ধর্মহীনতার ভাব অনেক ক্ষেত্রেই সুপ্রকট; প্রকৃত ধর্মাদর্শ সম্বন্ধে অজ্ঞতা জনসাধারণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে; এই অবস্থায় 'উপাসনা-অঙ্ক'-প্রকাশ বিশেষ অভিনন্দনযোগ্য।

উপাসনা-সম্বন্ধীয় এই বিশেষাঙ্কটিতে উপাসনার লক্ষ্য, স্বরূপ, অর্থ, তত্ত্ব, মাধুর্য, বিচার, ধারা, আবশ্যকতা, রহস্য, মহিমা, মহত্ত্ব, ভূমিকা, ফল প্রভৃতি বিভিন্ন সুচিন্তিত প্রবন্ধে বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসনাপদ্ধতি উপযুক্ত ব্যক্তিগণের লেখনীমুখে বিবৃত হইয়াছে। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে প্রদত্ত উদ্ধৃতিগুলি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বহু রঙের অনেকগুলি সুন্দর চিত্রে এবং বহু রেখাচিত্রে সমস্কৃত নানাতথ্যপূর্ণ সংরক্ষণযোগ্য এই বিশেষাঙ্কখানি পূর্ব-প্রকাশিত বিশেষাঙ্কগুলির ন্যায় জনসাধারণের সমাদর লাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয় পত্রিকা (১৩৭৩-৭৪)—শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়, ১০৬ নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৮০।

বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের লেখাগুলিতে সাহিত্যচর্চার আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ছবিগুলিতে পত্রিকাটির আকর্ষণ বাড়িয়াছে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শিক্ষালয়ের কার্যাবলীর মনোজ্ঞ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীপ্রাণেশ চক্রবর্তীর 'মানা অভিযান' কাহিনীটি চমৎকার, লেখাটিতে পর্বতারোহণের অভিজ্ঞতা সুন্দরভাবে বিবৃত।

বানপ্রস্থ (ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৭৪)—বশিষ্ঠ বানপ্রস্থ আশ্রম, পি ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলিকাতা ৩২। পৃষ্ঠা—৫২; মূল্য ৫০ পঃ।

কর্মক্ষেত্র হইতে অবসরপ্রাপ্ত মানুষ যাহাতে সুন্দরভাবে ধর্মজীবন যাপন করিতে পারে, ইহাই 'বানপ্রস্থ' পত্রিকা-প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য। পত্রিকা-পরিচালকগণের উদ্দেশ্য সাধু, কারণ বর্তমান সময়ে এইরূপ পত্রিকা-প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে। এই সংখ্যায় কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সুচিন্তিত প্রবন্ধ আছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব স্মরণিকা (১৩৭৪)—সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, ৭৬বি, কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা ৫০ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৭৫।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরের স্মরণিকাটিও সুচিন্তিত রচনাসম্ভারে অলঙ্কৃত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। লেখাগুলি পাঠক-বর্গের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে। প্রচ্ছদপটটি মনোরম। প্রবন্ধগুলিতে কিছু কিছু ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। প্রুফ-দেখায় আরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব স্মরণিকা (১৩৭৪)—শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপ, চেতলা, ১৬এ, পরমহংসদেব রোড, কলিকাতা ২৭ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত এই স্মরণিকাটি ক্ষুদ্রায়তন হইলেও সুন্দর-রচনা-সমৃদ্ধ। স্মরণিকা-প্রকাশে কর্মিগণের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

যে যথা মাং প্রপত্থন্তে—শ্রীদেবল। যোগদা প্রকাশন কার্যালয়, পোঃ আড়িয়াদহ, ২৪ পরগনা হইতে শ্রীইন্দ্রনাথ শেঠ কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৫৪; মূল্য ১'৭৫।

পুস্তকখানিতে ভক্তি ও জ্ঞানের বিষয় যুক্তিপূর্ণভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। তথাকথিত আধুনিক ভক্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ এমনভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে যে, উভয়ের পার্থক্য পাঠকের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী ভক্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা লেখকের গভীর চিন্তাশীলতার পরিচায়ক।

উপাসিকা—গ্রন্থকার ও প্রকাশক শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, ৪৩ ললিত মিত্র লেন, কলিকাতা ৪। পৃষ্ঠা—৭০; মূল্য এক টাকা।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সুধী লেখকের প্রবন্ধনিচয় 'উপাসিকা' গ্রন্থ-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অনেকগুলি প্রবন্ধ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সহজ সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ জপযোগ', 'মুক্তিযোগ', 'প্রশান্তির পরিবেশ' প্রভৃতি প্রবন্ধ আধ্যাত্মিক পথে প্রেরণাদায়ক। 'প্রাচীন ভারতের শ্রমিক' নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধটি তথ্যপূর্ণ। উল্লেখযোগ্য যে, এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ আয় বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে ঠাকুরসেবায় ব্যয়িত হইবে।

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী-লীলামৃত—শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত, শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালী-মন্দির ট্রাষ্ট, 'ভক্তিতীর্থ', ১৪০ নং ঋত্বিক জাঙ্গাল রোড, পোঃ ভদ্রকালী, জেলা হুগলী। পৃষ্ঠা—১০৪; মূল্য দুই টাকা।

'শ্রীশ্রীআনন্দময়ী-লীলামৃত' গ্রন্থখানি কতকগুলি সুন্দর সঙ্গীত ও স্তোত্রের মাধ্যমে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালীমাতার চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য-স্বরূপ। ভক্তিনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ নরনারী সঙ্গীত ও স্তোত্রগুলি পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যকৃত সুদীর্ঘ স্তোত্র 'সৌন্দর্যানন্দ-লহরী' এবং শ্রীশ্রীমহাকাল-বিরচিত 'স্বরূপাখ্য-কর্পূরাদি' স্তবের মূল সংস্কৃত হইতে সুললিত কাব্যানুবাদ গ্রন্থখানির বিশেষ আকর্ষণ।

সরল হিন্দুধর্ম—শ্রীদাশরথি সোম। প্রকাশক: শ্রীজানকীনাথ বসু, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা—৪৫; মূল্য এক টাকা।

সনাতন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সরল ভাষায় আলোচনা পুস্তকখানির বৈশিষ্ট্য। কর্ম, উপাসনা, চণ্ডীমাহাত্ম্য ও দেবতারহস্য বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আলোচিত। শাস্ত্রের দৃষ্টিতে ও যুক্তির সহায়তায় উপস্থাপিত লেখকের বক্তব্য সময়োপযোগী।

মাতৃদর্শন—সম্পাদক ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার, সুদর্শন কার্যালয়, ৩ নং অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা—৬৩+৩২; মূল্য ৫০ পয়সা।

পকেট সাইজ এই 'মাতৃদর্শন' পুস্তকখানি শ্রীশ্রীচণ্ডীর চারিটি প্রসিদ্ধ স্তবের অনুবাদ সঙ্কলন। স্তবগুলির সরল পদ্যানুবাদ মূলানুগ। দেবীসূক্তের অনুবাদটিও সুন্দর। প্রারম্ভে কয়েকটি প্রবন্ধে মাতৃতত্ত্ব সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। নিত্য স্বাধ্যায়ের উপযোগী পুস্তকখানি সঙ্গে রাখিবার যোগ্য।

পঞ্চদশী—শ্রীদাশরথি বিশ্বাস। গ্রাম—দক্ষিণবনগড়, ডাকঘর—আলিদা, জেলা ২৪ পরগনা হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৪৬; মূল্য এক টাকা।

'পঞ্চদশী' একখানি কাব্যগ্রন্থ। ১৫টি পর্বে শিল্প, জগৎ, জীবন, সমাজ, সভ্যতা, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, ঈশ্বর, শিক্ষা, সাধনা প্রভৃতি বিষয়ে বিচিত্র চিন্তাধারার ছন্দোবদ্ধ বাণীরূপ। পাঠকবৃন্দ এই পুস্তকপাঠে নূতনত্বের আস্বাদ পাইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

পেরিয়ানায়কেনপালয়ম্ (কোয়েম্বাতুর) রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের কার্যবিবরণী (১৯৬৬-'৬৭) প্রকাশিত হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যে রামকৃষ্ণ মিশনের এই শাখাটি একটি সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র। ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুল্য-মর্যাদাসম্পন্ন।

কোয়েম্বাতুর হইতে ১১ মাইল দূরে উতাকামণ্ড রোডের পার্শ্বে ৪০০ একর ভূমির উপর নিম্নলিখিত শিক্ষায়তনগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে:

বহুমুখী বিদ্যালয়, বেসিক ট্রেনিং স্কুল, স্বামী শিবানন্দ হাই স্কুল, সিনিয়র বেসিক স্কুল, বি টি. কলেজ, শারীর শিক্ষা কলেজ, প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় আর্টস কলেজ, সমাজ-শিক্ষা-সংগঠক শিক্ষণকেন্দ্র গ্রামীণ শিক্ষা কলেজ, কৃষিশিক্ষা বিদ্যালয়, কর্মনিলয়, ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল, শিল্প বিদ্যালয়, গবেষণা-ভবন, টিচার্স কলেজ এক্সটেনশন সারভিস প্রভৃতি। এখানে একটি কেন্দ্রীয় বৃহৎ গ্রন্থাগার আছে; পুস্তকসংখ্যা ৩০,২৩২, ইহা ছাড়া অধিকাংশ শিক্ষায়তনের স্বতন্ত্র লাইব্রেরী আছে।

আলোচ্য বর্ষে ডিসপেন্সারীতে ২৩,৮৮৫ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে; তন্মধ্যে ১৫,৬২০ জন পুরুষ, ৩,০২৩ জন স্ত্রীলোক এবং ৫,১৪২টি শিশু।

আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব যথাযথ মর্যাদাসহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসবের অনুষ্ঠানসমূহে ২৫,০০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল।

১৯৬৬, ডিসেম্বর মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ এই কেন্দ্রে শুভাগমন করিয়া দুই দিন অবস্থান করেন।

টাকী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে ৩৭তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে এবং ৩১ বৎসর যাবৎ রামকৃষ্ণ মিশনের শাখারূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ইহার ১৯৬৫-৬৬ ও ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দের বাৎসরিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

জনসাধারণের সেবা এবং যথার্থ শিক্ষাবিস্তার এই আশ্রমের মূল উদ্দেশ্য। আশ্রম কর্তৃক বালকদিগের জন্য একটি সর্বার্থসাধক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বালিকাদিগের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। গত ৩১.৩.৬৭ তারিখে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৭০। এতদ্ব্যতীত টাকী পৌরপ্রতিষ্ঠানের ৪নং অঞ্চলে আশ্রম কর্তৃক একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়।

আশ্রমের পরিচালনায় একটি বিদ্যার্থী ভবন আছে। আলোচ্য বর্ষে এই ভবনে ৫০ জন বিদ্যার্থী ছিল। বিদ্যাশিক্ষা, মুক্ত বায়ুতে খেলাধুলা, প্রার্থনা ও ভজনাদির মাধ্যমে আশ্রম বালকগণ স্বাস্থ্যবান ও সৎ নাগরিক হইবার সুযোগ লাভ করিতেছে।

আশ্রম-পরিচালিত হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে ৭৩,৯৮৯ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে।

আশ্রমে নিয়মিতভাবে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের

জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গীতা- ও চণ্ডী-পাঠ, নরনারায়ণসেবা, বিশিষ্ট সঙ্গীতাচার্যগণের সঙ্গীত, আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক নাটকাভিনয়, ছায়াচিত্র-প্রদর্শন, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

কনখল সেবাশ্রম হরিদ্বারের নিকটে সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশে অবস্থিত। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন সেবাশ্রমগুলির অন্যতম এই আশ্রম যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবৎ-কালেই ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইহা রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকেন্দ্ররূপে অন্তর্ভুক্তি লাভ করে। এই সেবাশ্রমের ৬৬তম বর্ষের (এপ্রিল, '৬৬—মার্চ, '৬৭) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ৪৭টি শয্যাযুক্ত আন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে ১,৪১৪ জন রোগী ভরতি হয় এবং ১,২৬৮ জন আরোগ্যলাভ করে। অন্তর্বিভাগে ১১৬টি অস্ত্রচিকিৎসা করা হয়।

বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৬৬,১২১ (নূতন ৩০,৯০০); অস্ত্রচিকিৎসা ১,৪২৩, দন্তচিকিৎসা ৮৭।

ল্যাবরেটরিতে ৫,৯৫৫টি নমুনা পরীক্ষিত হয়। ইলেক্‌ট্রোথেরাপি বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৩৬২। ৮১৭টি এক্স রে তোলা হয়।

গ্রন্থাগারে ৫,৩২৩ খানি পুস্তক আছে; পাঠাগারে ৩৩টি সাময়িক এবং ৬টি দৈনিক সংবাদপত্র লওয়া হয়। রোগীদের জন্যও একটি লাইব্রেরী করা হইয়াছে।

প্রতিষ্ঠা-সময় হইতে কনখল সেবাশ্রম জাতিধর্মনির্বিশেষে আর্ত মানবসাধারণের অকুণ্ঠ সেবা করিয়া আসিতেছে। দেবতাত্মা হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত কনখল হরিদ্বার হৃষীকেশ প্রভৃতি তপঃক্ষেত্রের সাধুসন্তগণও পীড়িত অবস্থায় এখানে সুচিকিৎসা ও সেবাযত্ন লাভ করিয়া থাকেন; যুগাচার্য স্বামীজীর নির্দেশে কনখলে সেবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল।

অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী (আলমোড়া): এই আশ্রমের ১৯৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া তাঁহার দুইজন ইংরেজ শিষ্য ক্যাপ্টেন জে. এইচ. সেভিয়ার ও মিসেস সেভিয়ার ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্রমটি সৌন্দর্যের লীলানিকেতন হিমালয়ে অবস্থিত। এখানে বনরাজির নীরবতা ও দিগন্তবিস্তৃত তুষারমৌলী হিমাদ্রির মনোরম দৃশ্যাবলী বিশেষভাবে উপভোগ্য।

আলোচ্য বর্ষের কর্মধারা নিম্নরূপ:

ইংরেজী পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর সম্পাদকীয় বিভাগে পত্রিকার ৭২তম বর্ষের কাজকর্ম যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

আশ্রমের গ্রন্থাগারে সাড়ে সাত হাজারের অধিক গ্রন্থ আছে। আশ্রম-পরিচালিত ২৩টি শয্যাসমন্বিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে অন্তর্বিভাগে ৬৩৮ জন এবং বহির্বিভাগে ১৬,১৭৫ (নূতন ১০,৩৭৫) জন রোগী চিকিৎসিত হয়।

'মাদারস্ বাংলো' (মিসেস সেভিয়ার এই গৃহে থাকিতেন বলিয়া এই নামকরণ) পুনঃ-সংস্কৃত হইয়াছে। 'চম্পাবতী হাইডেল প্রোজেক্ট' হইতে মায়াবতীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে। আশ্রমের এবং হাসপাতালের গৃহগুলিতে বৈদ্যুতিক আলো লওয়া হইয়াছে।

অদ্বৈত আশ্রমের কলিকাতা শাখা (৫, ডিহি ইণ্টালী রোড, কলিকাতা ১৪): পুস্তক-প্রকাশন বিভাগ হইতে আলোচ্য বর্ষে ১৫টি পুরাতন পুস্তক পুনর্মুদ্রিত এবং একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

আশ্রমে ধর্ম সম্বন্ধে ৪৪টি ক্লাস করা হয়, শ্রোতৃসংখ্যা গড়ে ২০০; আশ্রমের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং বিদেশেও অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছিল। লাইব্রেরীতে ৭,২০৫টি গ্রন্থ রাখা হইয়াছে; পাঠাগারে ৮৪টি সাময়িকী পত্রিকা, ৫টি দৈনিক সংবাদপত্র লওয়া হয়। পাঠাগারে গড়ে দৈনিক পাঠক সংখ্যা ২২। লাইব্রেরীর ৮,৫৭০ খানি বই ১১৬ জনকে পড়িবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল।

উৎসব-সংবাদ

গড়বেতা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ৭ই এপ্রিল হইতে দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব বিভিন্ন কার্যসূচীর মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। প্রথম দিন পূজাপাঠাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং মধ্যাহ্নে প্রায় চারহাজার ভক্ত নরনারী ও দরিদ্রনারায়ণ বসিয়া প্রসাদ ধারণ করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় স্বামী জীবানন্দজীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি মহারাজ ও অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবধারা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। দ্বিতীয় দিবস সকালে স্থানীয় কলেজে একটি ছাত্রসভায় শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ সিংহ মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্বামী জীবানন্দ, অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ এবং গড়বেতা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বদেবানন্দ 'স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ' সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দান করেন। দুইদিন সন্ধ্যায় বেতারশিল্পী শ্রীদ্বিজরাম বন্দ্যোপাধ্যায় রামরসায়নগান পরিবেশন করেন।

বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২১শে মার্চ হইতে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত তিনদিন-ব্যাপী ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৩তম জন্মোৎসব মনোজ্ঞভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ২১শে ডঃ রাসমোহন চক্রবর্তী সকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং বিকালে ভাগবত ধর্মপ্রসঙ্গে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। পরে শ্রীজিতেন্দ্রমোহন ডাকুয়া ও তাঁহার সহশিল্পিবৃন্দ 'অর্জুনমিত্র' উপাখ্যান অবলম্বনে পদাবলীকীর্তন পরিবেশন করেন। ২২শে মার্চ পূর্বাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা পাঠাদি অনুষ্ঠিত হয়। পরে প্রায় পাঁচশত শ্রোতার সম্মুখে শ্রীশ্রী৺জগদ্ধাত্রীপূজার তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়। দুপুরে প্রায় আড়াই হাজার ভক্ত নরনারীর মধ্যে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে আশ্রম-প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন মহকুমা-প্রশাসক মাননীয় এম. কে. আলি (ই. পি. সি. এস) সাহেব। আশ্রমের কার্যবিবরণী পাঠ করেন আশ্রমাধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী সুকুমার মহারাজ। পরে প্রধান অতিথি ডঃ রাসমোহন চক্রবর্তী, অধ্যাপক বিনোদবিহারী দাস, অধ্যাপক রামপ্রসাদ দেবনাথ ও প্রধানশিক্ষক শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ বক্তাগণ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী' অবলম্বনে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন। সভাপতি তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ভাষণান্তে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। পূর্বপাকিস্তানের জনপ্রিয় গায়ক শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সরকার ও শ্রীবিনয়-কুমার সরকার সারারাত্রি শ্রীরামকৃষ্ণ- ও স্বামী বিবেকানন্দ-চরিত্রের ভূমিকাগ্রহণে 'কবিগান' পরিবেশন করেন। ২৩শে মার্চ অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় জগতের মহাপুরুষগণের জীবনচরিত আলোচনা করেন ডঃ রাসমোহন চক্রবর্তী। ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীনিরাপদ দত্ত ও স্থানীয় শিল্পিবৃন্দ।

আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম-প্রাঙ্গণে গত ১১ই এপ্রিল হইতে ১৫ই এপ্রিল

পর্যন্ত পাঁচদিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের বার্ষিক জন্মোৎসব এবং আশ্রম বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কারবিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই কয়দিন বিশেষ পূজা, পাঠ, লীলাকীর্তন, শোভাযাত্রা, জনসভা, চলচ্চিত্রপ্রদর্শন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

এই উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক এবং বর্তমান সমস্যাসঙ্কুল জীবন-যাত্রায় তাঁহাদের জীবন ও বাণীর স্মরণ মনন ও অনুধ্যানের প্রয়োজনীয়তায় গুরুত্ব আরোপ করিয়া আলোচনা করেন ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য, স্বামী চিদাত্মানন্দ, অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, অধ্যক্ষ শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় এবং অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি ও পালাকীর্তন করেন ব্রহ্মচারী অরূপ-চৈতন্য এবং তাঁহার সহশিল্পিবৃন্দ। ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীনিতাই সান্যাল।

১৫ই এপ্রিল বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় পৌরোহিত্য করেন বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীতরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বৈদিক স্তোত্রপাঠ এবং বিভিন্ন বিষয়ে কৃতী ছাত্রেরা আবৃত্তি, বক্তৃতা ও সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করে। আশ্রমের সহ সম্পাদক স্বামী হৃদানন্দজী আশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ ও আলোচনা করিয়া আশ্রমের বহুমুখী পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য জনসাধারণের কাছে সবিনয় আবেদন জানান। সভাপতি এবং প্রধান অতিথি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শিক্ষা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। শ্রীমতী বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানশেষে ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের স্থানীয় শাখার সাহায্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থি-আশ্রমে গত ৬ই এপ্রিল মৃন্ময়ী মূর্তিতে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা মহানন্দের ভিতর দিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐদিন আশ্রমে শতাধিক সাধুসমাগম হইয়াছিল। তিন সহস্রাধিক ভক্ত পূজাদর্শন ও প্রসাদগ্রহণ করেন।

এই উপলক্ষে স্থানীয় দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে শতাধিক শাড়ী বিতরণ করা হইয়াছে।

সেবাকার্য

ওড়িশা: গত মার্চ (১৯৬৮) মাসে ওড়িশায় কটক জেলার পট্টমুণ্ডাই সেবাকেন্দ্র হইতে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বাত্যাবিপর্যস্ত জনগণের সেবাকার্যে চাল ৬৪৩.৫ কেজি, আটা ৩৬০.২ কেজি, ১৮ খানি ধুতি ও ২৪টি জামা ৩৮৭ জনকে দেওয়া হইয়াছে। ২৫,৯৮৫টি শিশুকে ৫.০ কেজি গুঁড়া দুধ দেওয়া হয়। ১৬,০০ মাল্টি-ভিটামিন ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়। নিমাপুর গ্রামে একটি নলকূপ বসানো হইয়াছে।

মহারাষ্ট্র: গত ৫ই মার্চ হইতে ১২ই এপ্রিল, ১৯৬৮, রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মহারাষ্ট্রের কয়না এবং সাতারায় ভূমিকম্পবিধ্বস্ত জনগণের সেবাকার্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ বিতরিত হইয়াছে:

গম ৯৩৯.৬১ কুইন্টাল, বিস্কুট ৯৪ টিন, কম্বল ২ খানি, ৭২টি পুলোভার, ১,০৯,০০০ মাল্টি ভিটামিন ট্যাবলেট। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—২৯,৪৮২।

বিবিধ সংবাদ

হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের স্বর্ণজয়ন্তী

হাওড়ার প্রাচীন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান আশ্রম-প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসভায় ১৮ই মার্চ পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। বক্তৃতা করেন মিশনের সহ সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী ওঁকারানন্দজী এবং মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী। সভায় বহু প্রবীণ সন্ন্যাসী এবং হাওড়ার বিশিষ্ট নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং প্রদর্শনীর সাহায্যে আশ্রমের ইতিহাস রূপায়িত করা হয়।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী তাঁহার ভাষণে বলেন: স্বামী বিবেকানন্দ চাহিয়াছিলেন এই ধরনের প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হউক, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা সংস্কৃতি শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিবে। প্রধান অতিথি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ স্বামী ওঁকারানন্দজী ভারতে ধর্মসংঘের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া যে-সংঘ গঠিত হইয়াছে, তাহার প্রাণশক্তি বহু বৎসর অব্যাহত থাকিবে—তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজী পূর্বতন ধর্মাচার্যদের ভাবসমূহ কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সমাহিত হইয়া যুগ-প্রয়োজন সাধন করিয়াছে, তাহা ব্যাখ্যা করেন।

স্বর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জন্মোৎসব এবং ভগিনী নিবেদিতা শতবার্ষিকীও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৯ই মার্চ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্বামী তেজসানন্দজী। নিবেদিতার ফরাসী জীবনীকার শ্রীমতী লিজেল রেমঁর সংগ্রহ হইতে প্রাপ্ত কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি ও তথ্য প্রদর্শনীতে রাখা হইয়াছিল।

১০ই মার্চ নিবেদিতা শতবার্ষিকী সভায় ডঃ ভূদেব চৌধুরী, ডঃ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত এবং ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নিবেদিতার জীবন ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন। সভানেত্রী প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা স্বীয় ভাষণে নিবেদিতার জীবন-সঙ্গীতের মূল সুরগুলির কথা বলেন। ১৪ই মার্চ সন্ধ্যায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আয়োজন করা হয়।

১৬ই মার্চ জন্মোৎসব-সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ভূতেশানন্দজী এবং বক্তৃতা করেন শ্রীনীলবিহারী ঘোষ এবং অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার। ১৭ই মার্চ নিবেদিতা শতবার্ষিকী সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী পুণ্যানন্দজী। ভাষণ দেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ডঃ সুবিমলকুমার মুখোপাধ্যায়; তিনি বিশ্বের সমাজতাত্ত্বিকদের পার্শ্বে ভগিনী নিবেদিতাকে স্থাপন করিয়া তাঁহার উচ্চাঙ্গের মনীষার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেন। অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ মাতৃরূপিণী নিবেদিতার চরিত্র বিশ্লেষণ করেন।

উৎসব-সংবাদ

নাটশালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৮, ৯ ও ১০ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৯ই মার্চ প্রায় পনর হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। প্রতিদিন সকালে পূজা-পাঠাদি, বিকালে এক ধর্মসভা এবং রাত্রে রামায়ণগান হয়।

স্বামী বিশোকাত্মানন্দ, স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ, শ্রীহিরণ্ময়কুমার মাইতি, শ্রীতারাপদ মাইতি প্রভৃতি দুইদিন জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

তেলোভেলো শ্রীশ্রীসারদালীলামহাপীঠে গত ১৪ই হইতে ১৬ই মার্চ পর্যন্ত চতুর্থ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজা, পাঠ, শ্রীশ্রীসারদা মেলা ও ধর্মসভা উৎসবের অঙ্গ ছিল। ধর্মসভায় স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করেন।

বনগ্রাম ললিতমোহন বাণীভবনে স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক গত ১৬ই ও ১৭ই মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব প্রতিপালিত হইয়াছে। প্রথমদিন জনসভায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী দেবানন্দজী; দ্বিতীয় দিন জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন সভাপতি শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ। প্রায় পাঁচসহস্র নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

চাকদহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে গত ১৭ই মার্চ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যজীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সন্ধ্যারতির পর প্রায় চারহাজার নরনারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব স্থানীয় শক্তিসংঘ-প্রাঙ্গণে গত ২৪শে ও ২৫শে মার্চ উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ২৪শে মার্চ ছাত্র-সম্মেলন ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় প্রধান অতিথি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী মহারাজ ও সভাপতি অধ্যক্ষ অময়কুমার মজুমদার স্বামী বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধ ও শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

২৫শে মার্চ সভান্তে নববারাকপুর ব্যায়াম-সমিতির পরিচালনায় ব্যায়াম-প্রদর্শনী হয়। সভাপতি ডক্টর মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার ও প্রধান অতিথি শ্রীনীলমণি দাস (আয়রন-ম্যান্) স্বামীজীর ভাবধারা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন।

সিঁথি রামকৃষ্ণ সংঘে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর শুভ আবির্ভাব উৎসব ২৬শে মার্চ হইতে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত পালিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রতি সন্ধ্যায় ধর্মসভা, রামায়ণগান, বাউলসঙ্গীত ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর লীলা-কীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন-দিবসে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজী উপস্থিত থাকিয়া অনুষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করেন। স্বামী অপূর্বানন্দ, স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা প্রভৃতি বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন। শ্রীরথীন ঘোষ শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলাকীর্তন এবং শ্রীপূর্ণদাস বাউল বাউল-সঙ্গীত করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন বিভাগের, হাওড়া মায়ের মন্দিরের এবং শ্রীঅনাথবন্ধু অধিকারী প্রভৃতি শিল্পিগণের অনুষ্ঠান এবং শেষ দিবসে সংঘ বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রগণ কর্তৃক দুইটি নাটকাভিনয় উৎসবের অঙ্গ ছিল।

নূতনপুকুর- গত ৩১শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজাদির পর মধ্যাহ্নে পাঁচশতাধিক ব্যক্তি বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় শ্রীরাধানাথ অধিকারী শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও কীর্তন করেন, তারপর স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও অধ্যাপক পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

বাথাটি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি কর্তৃক ৩১শে মার্চ হইতে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

৩১শে মার্চ পূর্বাহ্ণে পূজা, পাঠ, প্রসাদ-বিতরণাদি এবং অপরাহ্ণে স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজীর পৌরোহিত্যে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণনামসংকীর্তন হয়। দুই রাত্রি যাত্রাভিনয় হইয়াছিল।

উদ্বোধন

দিব্য বাণী

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩য় অঃ

(কর্মে চিত্ত শুদ্ধ হয় ; চিত্ত শুদ্ধ হলে হয় জ্ঞানের উদয়
দেহ মন-বুদ্ধি-আদি করমের যন্ত্র হতে সম্পূর্ণ পৃথক্
নিষ্ক্রিয় চৈতন্যরূপে আপনার স্বরূপের উপলব্ধি হয় ;)

কর্ম না করিয়া কেহ এই আত্মজ্ঞান কভু পারে না লভিতে,
(লইয়া অশুদ্ধ চিত্ত) শুধু কর্ম ত্যাগ করি
এই সিদ্ধি-দ্বার কেহ পারে না খুলিতে ॥
ভগবৎ-পূজাজ্ঞানে যাহা কিছু করা যায়
(তাই হয় আত্মজ্ঞানলাভের উপায়)
তাহা ছাড়া সব কর্ম কেবল বন্ধন আনে—
ফলাসক্তিরূপ পাশে কেবলি জড়ায়।
ঈশ্বর-উদ্দেশ্যে তুমি অনাসক্ত হয়ে সদা
হে কৌন্তেয়, কর্ম কর তাই ॥

কথাপ্রসঙ্গে

'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'

অন্ধ অনুকরণ পথ নহে

আমরা আজিও কি জাতীয় জীবনগঠনে সর্ববিষয়ে বিদেশকে অন্ধভাবে অনুকরণ করিয়া চলিব? বিদেশাগত ভাবগুলি কেবল তাহারা ভাল বলিতেছে বলিয়াই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিব এবং স্বদেশের কতকগুলি ভাবকে তাহারা মন্দ বলিতেছে বলিয়াই সেগুলি ত্যাগ করিব? ভালমন্দ-নির্ণয় আজিও কি আমরা নিজেদের বিচার-বিবেক দ্বারা করিতে শিখিব না? যদি তাহাই করি, তাহা হইলে আধুনিক যুগের সঙ্কট-মুহূর্তে মানবসভ্যতাকে দিবার মতো কিছুই আর থাকিবে না আমাদের, জাতি হিসাবেও আমরা নিজস্বতা হারাইব।

বর্তমানে আমরা জাতীয় উন্নতিবিধানের পরিকল্পনায় ভারতীয় ভাবকে প্রায় সর্বত্রই অবহেলা করিয়া চলিতেছি। এই ভাবটি হইল, এককথায় বলা যায়, মানুষকে কেবল পার্থিব উন্নতির ক্ষেত্রে নয়, মানসিক উন্নতির ক্ষেত্রেও অগ্রসর করিয়া দেওয়া। মানুষকে কেবল জড়নিয়ন্ত্রিত জন্মমৃত্যুসীমিত সত্তাবিশেষ মাত্র না ভাবিয়া তাহার জড়নিয়ামক অবিনাশী চেতন সত্তাকে প্রাধান্য দিয়া জাগতিক উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গেই সেই সত্তার শক্তি এবং জ্ঞানের উন্মেষের দিকেও, যাহাকে আধ্যাত্মিক উন্নতি বলি তাহার দিকেও নজর রাখিয়া জীবনপরিকল্পনা করা। ইহার অর্থ এই নয় যে, আধুনিক কালের বিদেশের কোন রাজনীতি, সমাজনীতি বা অর্থনীতি আমরা জাগতিক উন্নতির সহায়ক জানিয়াও গ্রহণ করিব না; ইহার অর্থ, আমরা আমাদের মতো করিয়া প্রয়োজনীয় সব কিছুই গ্রহণ করিব, কিন্তু অন্ধভাবে কোন কিছুরই অনুকরণ করিব না, উহার সহিত আমাদের নিজস্বতাকে সংযুক্ত করিয়া নিজেদের মতো করিয়া লইব, নিজেদের ছাঁচে উহাকে ঢালিয়া লইব, যাহাতে উহা 'ভারতীয়' হইয়া উঠে। বিদেশাগত ভাবের অন্ধ অনুকরণে তাহা কখনো হইতে পারে না; আধুনিক যুগের পৃথিবীজোড়া ভাববিস্তারের সুব্যবস্থার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে "দেশদেশান্তরের ভাবরাশি বলপূর্বক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে", কিন্তু ঐ সব ভাবের মধ্যে "কতকগুলি অতি কল্যাণকর, কতকগুলি অমঙ্গলস্বরূপ, আর কতকগুলি পরদেশবাসীর—এদেশের যথার্থ কল্যাণনির্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক।"

আমাদের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় বিদেশের ভাবগুলির মধ্যে আমরা আমাদের পক্ষে যাহা কল্যাণকর সেগুলির সঙ্গে যাহা আমাদের পক্ষে অকল্যাণকর এবং যাহা কোন দিনই ভারত স্থায়িভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে না, সেগুলিকেও গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছি; কিন্তু সেগুলি কখনও স্থায়ী হইবে না। আমরা যদি অন্ধভাবে চলি তাহা হইলে বর্তমান কালে যতটুকু ভুগিতেছি তাহা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক দুর্ভোগ ভুগিবার পর আমাদের চক্ষু খুলিবে। আর সজাগ হইয়া চলিলে যথার্থ উন্নতির পথে আমরা অগ্রসর হইতে পারিব দ্রুততর গতিতে, এবং তাহাতে সমগ্র মানবজাতিকে দিবার মতো একটা আদর্শও গড়িয়া তুলিতে পারিব।

ধর্মহীন সভ্যতার পরমায়ু অল্প

আধুনিককালে জগতে যেসব রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক মতবাদ রহিয়াছে বা গড়িয়া উঠিতেছে, সেগুলির কোনটিই যে এককভাবে মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সহায়ক নয়, তাহা আমরা জানি। উহাদের মধ্যে সমাজবাদই বর্তমান জগতের মানসে ক্রমশঃ দৃঢ়বদ্ধ হইতে চলিয়াছে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে কমবেশী পরিমাণে পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষের মনে, বিশেষ করিয়া তরুণচিত্তে পুরাতন ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাব মাথা তুলিয়াছে। এই বিদ্রোহজাত আক্রোশ ধর্ম ও মানুষের শুভবৃত্তি-ভিত্তিক বহু নীতির উপরও পড়িতেছে, কারণ সেগুলিও নাকি মানুষের অধিকার-ও ভোগ-সাম্য প্রতিষ্ঠার পথে পরিপন্থী! সত্তর বৎসর পূর্বে গভীর ও ব্যাপক ঐতিহাসিক জ্ঞানের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া এবং অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানলব্ধ ভবিষ্যৎ-দর্শনের দৃষ্টি লইয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছিলেন যে, জগতের প্রায় সব দেশেই দেখা যায় ক্রমান্বয়ে পুরোহিতশক্তি (ব্রাহ্মণ্য শক্তি), রাজশক্তি (ক্ষাত্র শক্তি) এবং বৈশ্যশক্তি (ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের শক্তি) রাষ্ট্র ও সমাজ নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছে; বর্তমান যুগ বৈশ্যযুগ; ইহার পরই আসিতেছে শূদ্র- বা শ্রমিক-যুগ– শ্রমিকগণই সর্বদেশে রাষ্ট্র ও সমাজ নিয়ন্ত্রণ করিবে—শূদ্র হইতে বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়ে পরিণত হইয়া নহে, "শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে" "শূদ্রকর্মের সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।" ইহার সূচনা চীন বা রাশিয়া হইতে হইবে, ইহারও ইঙ্গিত তিনি সত্তর বৎসর পূর্বে দিয়া গিয়াছেন, যখন ইহা তৎকালীন চীন ও রাশিয়াকে দেখিয়া বিশ্বাস করাই কঠিন ছিল। তিনিই আবার বলিয়া গিয়াছেন, মানবসভ্যতাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতাকে জাগতিক উন্নতি-প্রচেষ্টার সহিত সমন্বিত করিতেই হইবে, নতুবা অদূর ভবিষ্যতে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কাজেই, তাঁহার মতে ধর্মকে বাদ দিয়া গঠিত কোন আদর্শই মানবজাতির পক্ষে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণপ্রদ আদর্শ হইতে পারে না। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের সময়ের ইঙ্গিতও তিনি দিয়াছিলেন, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন, "আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য—দেশমাতৃকাই তোমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা হউন"; ইংরেজরা ভারত হইতে চলিয়া যাইবার পর চীনকর্তৃক ভারত-আক্রমণের ইঙ্গিতও তিনি দিয়াছিলেন। মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর আদর্শ, ধর্ম ও জাগতিক কর্মের সমন্বিত আদর্শ যে আধুনিক যুগে ভারতবর্ষই দেখাইবে, তাহাও তিনিই বলিয়া গিয়াছেন: "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।" তাঁহার এই সব ভবিষ্যদ্বাণীর প্রায় সবগুলিরই সত্যতা ইতোমধ্যে আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ হইয়াছে। কাজেই বর্তমানে আমাদের জাতীয় জীবন যত পঙ্কিলতালিপ্তই থাকুক না কেন, তাহারই মধ্যে লুক্কায়িত যে যুগযুগান্ত-সঞ্চিত রত্ন স্বামীজী দেখিয়াছেন এবং যাহাকে বাহিরে আনিয়া ভারত একদিন তাহার বিভায় জাতীয় জীবনকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে ও আধুনিকযুগের মানবজাতির আদর্শরূপে নিজেকে জগৎসভায় উপস্থাপিত করিবে বলিয়াছেন, তাহা সত্য এবং তাহা ঘটিবেই— "ঋষির নয়ন মিথ্যা হেরে না, ঋষির রসনা মিছে না কহে।"

ধর্ম ও কর্মের মিলনই পথ

এই আদর্শই হইল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মিলন, জীবনের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রেই

কর্মের সহিত ধর্মকে মিলিত করা বা প্রত্যেকটি কর্মকেই ধর্মসাধনারূপে লওয়া।

এই মিলন শুরু হইয়া গিয়াছে। ভারত সুদীর্ঘকালের জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া ধর্ম ও জাগতিক কর্মকে পৃথক করিয়া ফেলিয়া নিজস্ব আধ্যাত্মিক সম্পদ এবং পার্থিব সম্পদ উভয়ই হারাইতে বসিয়াছিল, এমন সময় পাশ্চাত্য ভাবের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। কিন্তু ভারত উভয় ভাবের মিলন ঘটাইবার প্রচেষ্টা না করিয়া নিজস্ব ভাব যেটুকু জীবনে অবশিষ্ট ছিল তাহাও ত্যাগ করিয়াই পাশ্চাত্য ভাবকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ইহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের, আধ্যাত্মিকতার সহিত পার্থিব বিদ্যার, মিলন না হইয়া পাশ্চাত্য ভাবের বিজয় ও ভারতীয় ভাবের বিলুপ্তি ঘটিত। এই সঙ্কটের সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনপ্রচেষ্টায় কেহ কেহ অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে উহাদের মূল ভাবের মিলন হয় নাই, যেটুকু হইয়াছিল, সেটুকু উভয় ভাবেরই মূল হইতে বহুদূরের, প্রায় প্রত্যন্ত প্রদেশের কয়েকটি বিষয় লইয়া। রামকৃষ্ণভাবধারার বাহক স্বামী বিবেকানন্দই এই সঙ্কটকালে ভারতের নিজস্বতাকে শুধু যে বাঁচাইলেন তাহাই নহে, ভারতের আধ্যাত্মবিদ্যার সহিত পাশ্চাত্যের পার্থিব বিদ্যার যথার্থ মিলন ঘটাইবার রাজপথও তিনি খুলিয়া দিয়া গেলেন। তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে, আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মের সহিত জাগতিক কর্মের কোন বিরোধ তো নাই-ই—জাগতিক কর্মকেই, জীবনের প্রতিটি কর্মকেই ঈশ্বরারাধনায় রূপায়িত করা যায় এবং তাহাই আমাদের করিতে হইবে। না করিতে পারিলে আমাদের ধর্মলাভও হইবে না—কর্মত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরচিন্তায় ডুবিয়া থাকিবার লোকের সংখ্যা কয়জন? যাঁহারা আছেন, "সমগ্র ভারতের লোকের তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।—আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটি কোটি নরনারীকে সামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে?" ইহা করিতে যাইয়া, সকলকেই মহাপুরুষ তৈরি করিতে যাইয়া আজ আমরা কোথায় আসিয়াছি?—"যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজ অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে।" ইহা ধর্ম নহে, ধর্মের নামে আত্মপ্রবঞ্চনা এবং ইহাই ধর্মকে বিচারশীল লোকের চক্ষে উপহাসের বস্তু করিয়া তোলে। স্বামীজী পরিষ্কার করিয়া বলিলেন যে, ধর্ম মানুষকে কখনও অবনত করে না, তাহাকে অধিকতর শক্তিমান, অধিকতর হৃদয়বান করিয়া তোলে—"ধর্ম এমন একটি ভাব যাহা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে", "অন্তরস্থ দেবত্বের বিকাশের নামই ধর্ম", "শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম", "পরোপকারই ধর্ম", "অভেদদর্শনই ধর্ম"। যথার্থ ধর্মলাভের পথে তামসিকতা একটি মস্ত বড় প্রতিবন্ধক যাহা 'অধর্মকেও ধর্ম বলিয়া' মনে করায়। স্বামীজী তাই সকলকে প্রচণ্ডভাবে কর্ম করিতে বলিয়াছেন, যাহাতে তামসিকতা কাটিয়া যায়; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মিলন-প্রসঙ্গে তাই বলিয়াছেন, চাই পাশ্চাত্যের "সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতি-তৃষ্ণা।" কিন্তু তামসিকতা কাটাইয়া উঠিলেই যে মানুষ ধার্মিক হইবে, দেবত্ব লাভ করিবে, তাহা নহে; সে অমিতবীর্য দানবও হইতে পারে। তাই আমরা শুধু পাশ্চাত্যের

কল্যাণকর ভাবগুলির অনুকরণমাত্র করিলেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন তাহাতে হইবে না, প্রচণ্ডভাবে কর্মশীল হইবার সঙ্গে সঙ্গে কর্মকে পূজায় পরিণত করিবার প্রচেষ্টাও আমাদের করিতে হইবে, ঈশ্বর বিশ্বাস ও -চিন্তা, পবিত্রতা, মানবপ্রেম, নিঃস্বার্থপরতা, সেবা প্রভৃতি ধর্মের মূল ভাবগুলিকে ভিত্তি করিয়াই কর্মশীল হইতে হইবে; কেবল পূজা-জপ-ধ্যানাদি কর্মই নহে, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি যে-কোন বিষয়ক কর্মই আমাদের এভাবে ঈশ্বরারাধনাজ্ঞানে করিতে হইবে। এরূপ করিবার প্রচেষ্টায় আমাদের কর্মোদ্যম কমিয়া যাইবার বা কর্ম ভণ্ডুল হইবার প্রশ্ন নাই, কারণ ইহা ভাবের পরিবর্তন মাত্র, কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন নহে; সর্বসাধারণের কল্যাণকর বলিয়া যাহা বিবেচিত হইবে, সর্বক্ষেত্রেই পূজাজ্ঞানে আমরা সেই কর্মপদ্ধতিরই অনুসরণ করিতে পারি। কি ভাব লইয়া কর্ম করিতেছি, তাহাই মানুষকে দেবতা বা দানব করে, কর্মপদ্ধতি নয়। ধর্মব্যাধ ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন, তবু ব্যাধের কর্ম অপরের মতোই সমান উদ্যমে করিয়া গিয়াছেন; অর্জুন দুর্যোধনের মতোই সমান উদ্যমে যুদ্ধ করিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞ জনক-রাজা অপর রাজার মতোই সমান উদ্যমে রাজ্যপালন করিয়াছেন। আধুনিক যুগে স্বামীজী স্বয়ং ইহা নিজ জীবনেই দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার গুরুভ্রাতা ও পদানুসারীদের জীবন অবলম্বনে ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ বাহিনীর অধিনায়কত্ব করিবার কালেও অবসর সময়ে ধ্যান করিতেন, ইহাতে তাঁহার যুদ্ধোদ্যম কি কমিয়াছিল না স্বদেশসেবা ব্যাহত হইয়াছিল?

ভারতকে এই মিলনের পথ দেখাইতে হইবে

আমাদের আজ ইহাই করিতে হইবে—ইহাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মিলন। তীর্থ বা মন্দিরাদিতে মাঝে মাঝে গমন করিয়া বা দায় সারার মতো অল্পকিছুক্ষণ ভগবচ্চিন্তা করিয়াই ধর্ম করা হইয়া গেল—কর্মকালে ঐ ধর্মকে একপাশে সরাইয়া রাখিয়া এমন ভাব লইয়া কর্মানুষ্ঠান করিলাম যাহাতে অন্তরস্থ শক্তি ও দেবত্বের বিকাশ হওয়া তো দূরের কথা বরং উহাকে আরো চাপা দিবার ব্যবস্থা করিলাম—ধর্মের এই বহিরাবরণমাত্রে আবৃত হওয়াকে তিনি প্রাচ্যভাব বলেন নাই; আবার পাশ্চাত্যের অনুকরণে আহারবিহারাদি করিলাম বা পোশাকপরিচ্ছদ পরিলাম বা কতকগুলি সামাজিক প্রথার অনুকরণ করিতে যাইয়া আমাদের সমাজের কল্যাণকর কতকগুলি প্রথাকে নষ্ট করিলাম, ইহাকেও তিনি পাশ্চাত্যভাবগ্রহণ বলেন নাই—সিংহের মতো তেজবীর্য লাভ না করিয়া "সিংহচর্মাবৃত হইলেই কি গর্দভ সিংহ হয়?"

প্রাচ্যের দেবত্বের সঙ্গে পাশ্চাত্যের তেজবীর্য ও কর্মোদ্যমের মিলনই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। আমাদের আজ তাহাই করিতে হইবে। রাজনীতি বা সমাজসেবা করিতে হইলে বিদেশের অনুকরণে আমাদের যে পবিত্রতা, সত্য, ঈশ্বরচিন্তা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া তাহা করিতে হইবে, নতুবা হইবে না, একথা ভিত্তি-হীন। এ ভাব বিদেশাগত ভাব। সামাজিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথার্থ কল্যাণকর কর্মপদ্ধতি আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু তাহা করিতে যাইয়া যদি আমরা অপরেরই মতো ধর্মভাবকে বিসর্জন দিই, তাহা হইলে

নিজস্বতা হারাইয়া ভারত পাশ্চাত্যের অন্যান্য জাতিগুলির অন্যতম হইয়া জাগতিক বিষয়ে হয়ত খুবই উন্নত হইতে পারিবে, কিন্তু উহাদেরই মতো সে নিজেকেও "আগ্নেয়গিরির মুখের উপর" স্থাপিত করিবে, যাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম অগ্ন্যুৎপাতের ফলে একদিন চূর্ণীকৃত হইয়া যাওয়া। শুধু নিজেই চূর্ণীকৃত হওয়া নয়, মানবসভ্যতার উন্নত অবস্থাকেই চূর্ণীকৃত করিয়া ফেলা; কারণ ভারত যদি মরিয়া যায়, "তাহা হইলে জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হইবে, সমগ্র ধর্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব লুপ্ত হইবে; তাহার স্থলে দেব-দেবীরূপে কাম ও বিলাসিতা যুগ্ম রাজত্ব চালাইবে; অর্থ সে পূজার পুরোহিত, পাশববল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহার পূজাপদ্ধতি আর মানবাত্মা তাহার বলি।"

আজ শিল্পবিজ্ঞানের বিপুল উন্নতির বলে বলীয়ান ও তাহাতে উন্নত সভ্যতার অধিকারী বলিয়া গর্বিত বোধ করিলেও মানবজাতি তো আসলে এই পরিণামের দিকেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছে—ধর্মকে বিসর্জন দিয়া বা জীবনের কর্মক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া মন্দিরে বা সাধুর আবাসস্থলে আবদ্ধ রাখিয়া, পাশববল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা লব্ধ অর্থের দ্বারা 'কাম ও বিলাসিতা'র সেবাকেই জীবনের চরম লক্ষ্য করিয়া তাহারই অভিমুখে চলিতেছে। যতই কিছু মতবাদ বা ব্যাখ্যা বা অন্য কোন বহিরাবরণ আমরা ইহার উপর চাপাই না কেন, আসলে ইহাই বর্তমান মানবসভ্যতার রূপ; মানবাত্মা সেখানে বলিপ্রদত্ত হইতে চলিয়াছে—জড়ের কারাগারে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহার মুক্তিপ্রচেষ্টার, এমনকি ঊর্ধ্বদৃষ্টিরও পথ অবরুদ্ধ করা হইতেছে। আজ তাই আধুনিক কালের কোন সমস্যারই সুষ্ঠু সমাধানের পথ আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না; কারণ সমস্যার মূল যেখানে, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কর্মোদ্যম সব কিছুর, জীবনেরই উৎস যেখান হইতে উচ্ছলিত, সেদিকে সমস্যার সৃষ্টিকারী বা সমাধানকারী কাহারই দৃষ্টি ফিরিতেছে না—হৃদয়ের অন্তরস্থ মানবাত্মার দিকে কেহই ফিরিয়া চাহিতেছে না, কেবল তাহার বাহ্য অভিব্যক্তিগুলির উপরই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ। জীবনের গভীরতায় প্রবেশ করিবার শক্তিও যেন আমরা হারাইয়াছি, অন্তর্দৃষ্টিহীন ও অস্থিরচিত্ত হইয়া সদাপরিবর্তনশীল বর্তমান-মাত্রকে ভিত্তি করায় দাঁড়াইবার মতো কোন স্থির ভূমিও পাইতেছি না।

ভারতকেই এই স্থির ভূমির উপর দাঁড়াইয়া জগৎকে পথ দেখাইতে হইবে। জগতের আর কোন জাতি তাহা পারিবে না। কারণ ধর্ম-জীবনে ভারতও আজ অবনত আছে সত্য, কিন্তু ধর্ম তাহার অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া আছে, সামান্য চেষ্টাতেই "যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।"

বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্যই ভারতের ভাগ্যবিধাতা ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া পাশ্চাত্যের পার্থিব বিদ্যার সহিত উহার মিলনের রাজপথ খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। আমাদের আজ বাঁচিতে হইলে, মানবসভ্যতাকে বাঁচাইতে হইলে সে পথে চলিতেই হইবে, ধর্মকে জীবনের ভিত্তি করিতে হইবে, এবং ধর্ম ও জাগতিক কর্মের মধ্যে কল্পিত পার্থক্যরেখাটি মুছিয়া ফেলিতে হইবে। ইহাই যুগধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ এরূপ কর্মই নিজজীবনে করিয়াছেন, এরূপ কর্মই করিতে বলিয়া গিয়াছেন; নিবেদিতার ভাষায়, সেই মহান্ প্রচারকের কর্ম "জ্ঞান ও ভক্তি হইতে

বিচ্ছিন্ন নয়, পরন্তু উহাদের প্রকাশক; তাঁহার নিকট কারখানা ও পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেত—সাধুর কুটিয়া ও মন্দিরদ্বারের মতোই সত্য এবং মানুষের সহিত ভগবানের উপযুক্ত মিলন-ক্ষেত্র। তাঁহার নিকট মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোন প্রভেদ নাই।" এই প্রভেদ আমাদেরও ভুলিয়া যাইতে হইবে। রাজনীতি, সমাজনীতি, খামার ও ক্ষেত, কারখানা, পাঠগৃহ—সর্বত্রই আমাদের কাজ করিতে হইবে ধর্মকে, ভগবদ্‌বুদ্ধিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া, উহা ত্যাগ করিয়া নহে—এসব বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মপদ্ধতি আমাদের যাহাই হউক না কেন।

এই পথেই ভারত যুগধর্মকে জীবনে রূপায়িত করিয়া অন্যান্য দেশগুলিকে তাহাতে অনুপ্রাণিত করিতে এবং তাহা দ্বারা সমগ্র মানব-সভ্যতাকে বাঁচাইতে, তাহাকে অধিকতর উন্নত করিতে পারিবে এবং করিবেও। 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'—একথার ইহাই অর্থ।

তাই নিজের কল্যাণের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য এবিষয়ে সচেষ্ট হওয়া আমাদের প্রয়োজন। এবিষয়ে অন্ধ হইয়া চলিলে বহু দুর্ভোগ ভুগিয়া পরিশেষে স্বামীজী-নির্দেশিত পথে আমাদের আসিতেই হইবে। ধর্ম-নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়া ধর্মের সহিত ক্ষেত খামার বিদ্যালয় প্রভৃতিকে পৃথক করিয়া রাখার ফলেই আজ বহু দুর্ভোগ আমাদের ভুগিতে হইতেছে। এখনো সজাগ হইয়া সাহিত্য, প্রেক্ষাগৃহ, রেডিও, শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি ভাবপ্রচারের সর্ববিধ মাধ্যম অবলম্বনে স্বামীজী-নির্দেশিত দেবত্ব ও কর্মোদ্যমের সমন্বিত ভাবকে সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট করাইবার প্রচেষ্টাই আমাদের পরম কল্যাণের নিদান হইবে। জাতি ইহাতে দুর্বল বা নিরুৎসাহ হইবে না, অধিকতর সবল, অধিকতর উদ্যমশীল হইবে, সংহতি ইহাতে ব্যাহত হইবে না, অধিকতর দৃঢ় হইবে; ব্যষ্টিজীবন ইহাতে বঞ্চিত হইবে না, যে কাচখণ্ড লাভের জন্য সে আজ প্রলোভিত হইয়া লালায়িত, তাহার স্থলে সে হীরকখণ্ডই পাইবে।

অবতার

'আনন্দ'

ভক্ত কহে, 'মনবাক্য-অগোচর তুমি,
কেমনে তোমার কাছে যাব বল আমি?'
ভগবান কহে, 'জানি, কত নামে তাই
কত রূপে বারে বারে দেখা দিয়ে যাই।
কাছে আসি হাতে ধরি আত্মীয়ের বেশে
তোমাদের নিয়ে আসি অরূপের দেশে।'

পরলোকে স্বামী সুন্দরানন্দ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, 'উদ্বোধন' পত্রিকার অন্যতম ভূতপূর্ব সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ১১ই মে সন্ধ্যা ৬-২৬ মিনিট সময়ে ৭৯ বৎসর বয়সে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত তিন বৎসর অসুস্থ অবস্থায় তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন।

সুন্দরানন্দজীর পূর্বনাম রাধিকামোহন গোস্বামী। ঢাকা জেলার বালিয়াটি গ্রামে বিখ্যাত গোস্বামী বংশে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম যজ্ঞেশ্বর গোস্বামী।

বাল্যকাল হইতেই তিনি সবলদেহ, সাহসী ও নির্ভীক ছিলেন এবং সমাজসেবার কাজে সর্বদা অগ্রণী হইতেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি ছিলেন বিপ্লবী, 'অনুশীলন সমিতি'র একজন সক্রিয় সদস্য। এইজন্য কিছুকাল তাঁহাকে অন্তরীণ হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। এই কালে প্রায় সর্বক্ষণ পাঠে মনোনিবেশ করিয়া তিনি বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠ ও উদ্বোধনে আগমন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তানগণের সংস্পর্শে আসেন; শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করেন ১৯১২ খৃষ্টাব্দে। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি বালিয়াটিতে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে আশ্রমটি রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্ররূপে গৃহীত হয়।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করিয়া স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা এবং তাঁহারই নিকট হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন।

দীর্ঘকাল বালিয়াটি আশ্রমে কাজ করিবার পর তিনি রেঙ্গুন সেবাশ্রমে গমন করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে কলম্বো যান। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলম্বোতে ছিলেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে (১৩৪২) তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়া ১৯৫২ খৃঃ পর্যন্ত (চৈত্র, ১৩৫৮) ষোল বৎসর সাফল্যের সহিত এই কাজ করিয়া গিয়াছেন। এই বৎসরই তিনি রাঁচি মোরাবাদী আশ্রমের কর্মসচিবের পদ গ্রহণ করিয়া তথায় গমন করেন এবং ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সেখানে থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অসুস্থতার জন্য এই কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শেষ তিন বৎসর তিনি বেলুড় মঠে ছিলেন।

'যোগচতুষ্টয়', 'জাতীয় সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ', 'Hinduism and Untouchability' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদকরূপে কলিকাতায় থাকাকালীন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা-প্রচারের অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'র সহাধ্যক্ষরূপে তিনি দশ বৎসরকাল ঐ সমিতির সেবা করেন।

দৃঢ়চরিত্র, সদালাপী, অনাড়ম্বরজীবন এই সন্ন্যাসীকে সকলে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিতেন, সকলের প্রিয় ছিলেন তিনি। তাঁহার দেহত্যাগে সঙ্ঘ একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাইল।

তাঁহার আত্মা শ্রীভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

স্বামী বিরজানন্দের সহিত কথোপকথন*

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

প্রশ্ন। আশাভঙ্গ এবং অতীতের নানা দুঃখকষ্টের স্মৃতি মনের একাগ্রতার বিঘ্ন ঘটায়। এরূপ ক্ষেত্রে মনকে শান্ত করা যায় কিভাবে ?

উত্তর। অপমান, স্বজনবিয়োগ প্রভৃতি আঘাতে চিত্তের শান্তি ব্যাহত হয় সত্য কথা। সকলকেই এসব সহ্য করতে হয়। ওদের হাত থেকে একেবারে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন। তবে এই সব আঘাতকে সাধ্যমত কমাবার চেষ্টা করতে পারা যায় এবং যাতে আমরা ওদের দ্বারা একেবারে মুষড়ে না পড়ি সেই চেষ্টাও বিধেয়। নিজেদের মনের বল যদি বাড়াতে পার তাহলে ঐ সব আঘাতে আর তত অভিভূত হবে না। ভগবানে আত্মসমর্পণই হ'ল শ্রেষ্ঠ উপায়। তাঁর কাছে প্রার্থনা কর যাতে তিনি সংসারের সকল আঘাত সহ্য করবার শক্তি দেন।

মনে অবসন্নভাব এলে আত্মবিশ্লেষণ ক'রে অবসাদের কারণ খুঁজে বের করা উচিত। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, শরণাগতি এবং অনাসক্তি-অভ্যাস দ্বারা মানসিক নৈরাশ্যভাবকে জয় করা যায়। তখন বিপদ আপদ এলেও মন ভেঙ্গে পড়বে না।

প্রশ্ন। উপাসনার সময় আফিসের বা সংসারের নানা কাজের ভাবনা মনকে চঞ্চল করে। ঐ সব ভাবনা-চিন্তার জন্য কখনও কখনও উপাসনার সময়ই পাওয়া যায় না। ভগবানের নামচিন্তা এবং সংসারের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন—এই দুটিকে মিলানো যায় কি উপায়ে ?

উত্তর। সাংসারিক চাহিদা মেটাবার জন্য তোমায় আফিসের বা ঘরকন্নার কাজ করতে হয়। কিন্তু মানুষের আধ্যাত্মিক চাহিদাও তো সত্য। আধ্যাত্মিক চাহিদাগুলির চেয়ে সাংসারিক চাহিদাকে বড় ক'রে দেখার জন্যই আমরা ধর্মজীবনে এগুতে পারি না। যদিও আমাদের আধ্যাত্মিক অভাব সাংসারিক চাহিদার মতো বাহিরে স্থূলভাবে চোখে পড়ে না, আমাদের নিজেদের হৃদয়ে উহা অনুভব করতে হয় কিন্তু তা ব'লে আধ্যাত্মিক অভাবের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। কথায় বলে—"ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।" আফিসের বা ঘর-সংসারের কাজকে তোমরা বাধ্যতামূলক ব'লে মনে কর। ইচ্ছা না থাকলেও যেন ওগুলি করতেই হবে। কিন্তু এটা তো জানা কথা যে বাহিরের এই সব দাবী সাময়িকমাত্র, বরাবর ওরা থাকে না। পক্ষান্তরে ধর্মজীবনের প্রয়োজনগুলিই হ'ল আমাদের শাশ্বত প্রয়োজন। ধর্মবিষয়ে প্রীতি যত বাড়বে ধর্মানুশীলনের জন্য আকাঙ্ক্ষাও তত দৃঢ় হবে। তখন আধ্যাত্মিক অভাবগুলি মিটাবার চেষ্টাই প্রথম স্থান অধিকার করবে। বৈষয়িক চাহিদা চিত্তকে আর তত বিক্ষিপ্ত করতে পারবে না। পরে

* মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ১৯৩৯ সালের ২৩শে এপ্রিল একটি ভক্তসম্মিলনে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ প্রেসিডেণ্ট স্বামী বিরজানন্দজী সাধু ও ভক্তদের সহিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নানা ধর্মপ্রসঙ্গ করেন। ঐ আলোচনাটি Vedanta Kesari পত্রিকার ১৯৩৯ সালের মে সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমান প্রবন্ধটি ঐ মূল ইংরেজী আলোচনার বঙ্গানুবাদ।

দেখতে পাবে মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হ'ল আধ্যাত্মিক সম্পূর্তি। উপাসনা-অভ্যাসের সময় না পেলে ভগবানের কাছে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করতে পার। ধীরে ধীরে দেখবে যে ধর্মজীবনে এগিয়ে যাচ্ছ।

প্রশ্ন। ভগবানের কাছে আমরা অনেক সময়ে ছোটখাটো জিনিসের জন্য প্রার্থনা করি। এটা উচিত কি অনুচিত?

উত্তর। ঈশ্বর হলেন আমাদের পিতা ও মাতা। তাঁর কাছে তুচ্ছ জিনিসের জন্য কেন যাবে? তাঁকে টাকাকড়ির জন্য না জানিয়ে ভক্তি মুক্তি চাও। যখন তোমার বড় বড় বস্তুর প্রয়োজন রয়েছে তখন ক্ষুদ্র অভাব আগে মিটাতে চাইবে কেন? ঐরূপ চিন্তা এলে মনে বল এনে বলবে, "না, আমার অনেক উচ্চ বস্তু চাইবার আছে। অকিঞ্চিৎকর জিনিসের জন্য প্রার্থনা এখন থাক্।"

প্রশ্ন। হিরণ্যকশিপুর মতো অধিকাংশ অসুর তপস্যা দ্বারা ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করেছিলেন শোনা যায়। কিন্তু পরে তাঁরা দুষ্ট ও অত্যাচারী হয়ে পড়েন এবং ভগবানকে ঘৃণা করতে থাকেন। তপস্যা বা মনঃসংযম পুণ্যকে যেমন বাড়ায় তেমন পাপকেও বাড়াতে পারে কি?

উত্তর। হাঁ, মানুষের সংস্কারানুযায়ী তপস্যা শুভ বা অশুভ দুই-ই সাধন করতে পারে। ঠিক বিজ্ঞানের মতো। বিজ্ঞান যেমন ভাল বা মন্দ দুই-ই ঘটাতে পারে। অসুরদের মনে যে সব বস্তু কাম্য ছিল তাই তারা পেয়েছিল। তারা পৃথিবীকে শাসন করবার শক্তির জন্য প্রার্থনা করেছিল। তবে ঈশ্বরকে শত্রুভাবে দেখাও ভগবানকে লাভ করবার একটি পথ। ভগবানের শত্রু হয়ে অসুরদের নিরবচ্ছিন্ন ভগবানকে চিন্তা করতে হয়েছিল।

প্রশ্ন। আমরা নিজেদের চরিত্রে অনেক দোষ দেখতে পাই। আগে ভগবদ্দর্শনের জন্য প্রার্থনা করা উচিত, না, সচ্চরিত্রলাভের জন্য?

উত্তর। আমাদের অশুভ প্রবৃত্তি দূর হয়ে যাতে চরিত্র সৎ হয় সে জন্যে অবশ্যই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হবে। তাঁকে আকুল ভাবে জানাতে হবে—"হে প্রভু, আমার মন্দ সংস্কারগুলি নষ্ট ক'রে আমার মন তোমার অভিমুখে চালিত কর।" তাহলে ধীরে ধীরে সৎস্বভাব, পবিত্রতা, ঈশ্বরভক্তি এসব আসবে।

প্রশ্ন। সাধুদের নিকট বসলে চরিত্র সদ্‌ভাবাপন্ন হয় কি এবং কতটা হয়?

উত্তর। আগুনের কাছে বসলে তাপ লাগবে। সেইরূপ সাধুদের সান্নিধ্য ধর্মানুভূতির সাহায্য করে। পবিত্রতা এবং ভগবদনুভূতির জন্য সাধুসঙ্গের কার্যকারিতার কথা শ্রীরামকৃষ্ণ খুব জোর দিয়ে বলতেন। যখন সাধুসঙ্গ করছ, তখন সঙ্গে সঙ্গে তার ফল হয়তো দেখতে না পার, কিন্তু তোমার অজ্ঞাতে ওর প্রভাব তোমার স্বভাবের উপর পড়বেই। ধীরে ধীরে বিষয়-বাসনা দূর হতে থাকবে এবং নিম্ন প্রবৃত্তিও বদলে যাবে।

প্রশ্ন। যদি এমনিতেই মহাপুরুষের ভালবাসা পাই তা হ'লে আনুষ্ঠানিক দীক্ষা দ্বারা তিনি অতিরিক্ত কি সহায়তা করেন?

উত্তর। কোনও সাধুপুরুষের ভালবাসা ধর্মজীবনে খুব সাহায্য করে, সন্দেহ নেই। কিন্তু দীক্ষা দ্বারা তিনি তোমাকে তোমার উপযুক্ত সাধনপথে চালিত করেন এবং তাঁর উপদেশ অনুসরণ ক'রে তুমি উত্তরোত্তর নির্মল হও। দীক্ষা দ্বারা একটা বিশেষ শক্তিও আসে, হয়তো তুমি নিজে নিজে বেছে নিয়ে কোনও সাধন ক'রে যাচ্ছ কিন্তু তোমার ঐ নির্বাচন ঠিক হয়েছে কিনা কে বলবে? হয়তো তুমি বৎসরের

পর বৎসর উহা ক'রে যাচ্ছ কিন্তু কোনও বিশেষ উন্নতি হচ্ছে না। তুমি হয়তো জানও না যে তোমার ভুল পথে চলা হচ্ছে। গুরু তোমার ঐ ভুল শুধরে দেন। তোমারও ধ্রুব বিশ্বাস জন্মায় যে তুমি ঠিক পথে চলছ। এই বিশ্বাসের ফলে প্রথমে একটা শক্তি আসে। তারপরে আসে পবিত্রতা ও মনের স্থৈর্য। গুরুবাক্যে গভীর শ্রদ্ধা রাখা দরকার। তাছাড়া সাধনাবস্থায় কোনও প্রতিবন্ধক এলে তুমি তাঁর নিকট পরামর্শ নিয়ে উহা দূর করতে পার। তাঁর উপদেশে অনেক কাজ হয়। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের তো হরদম অভিজ্ঞ জনের নির্দেশ নিতে হয়। সাংসারিক বিষয়েই যদি গুরুর প্রয়োজন থাকে তো সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিষয়ের জ্ঞানের জন্য গুরুর দরকার যে আরও অনেক বেশী তা বলাই বাহুল্য।

প্রশ্ন। অনেক অবতারের কথা শোনা যায়। তাঁদের ভিতর কাকে অনুসরণ করব?

উত্তর। তা নির্ভর করে তোমার মানসিক ঝোঁকের উপর। সব অবতারের জীবন এক এক ক'রে পড়। দেখবে স্বতই একজনের উপর প্রাণ আকৃষ্ট হচ্ছে। যুগপ্রয়োজনে অবতাররা আসেন। একজন হয়তো জ্ঞানপথের নির্দেশ দেন, অপর একজন শিক্ষা দেন ভক্তি। এক অবতার হতে অন্য অবতারে যে বেশী পার্থক্য আছে তা নয়। এক একজন কাল এবং অবস্থা অনুসারে এক একটি বিষয়ের উপর ঝোঁক দিয়ে যান। নিজের মনের রুচি কি তা প্রথমে বুঝে নাও, তারপর যে অবতারকে তোমার সবচেয়ে পছন্দ হয় তাঁকে অনুসরণ কর।

প্রশ্ন। আত্মজ্ঞান হয় কি ক'রে?

উত্তর। বৈরাগ্য এবং বিবেক দ্বারা। আত্মা এবং অনাত্মার পার্থক্য জানতে হবে। শুদ্ধ আত্মার ভাবনা করলে মলিন বদ্ধ আত্মা নস্যাৎ হয়ে যায়।

প্রশ্ন। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন, "আমি চব্বিশ ঘণ্টা সমাধিস্থ হয়ে থাকতে চাই।" তাতে শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দেন, "ধিক তোকে। সমাধির চেয়েও উঁচু অবস্থা তোর জন্যে আছে।" ঐ অবস্থাটা কি?

উত্তর। স্বামীজীর কথা আলাদা। তিনি ছিলেন আচার্যকোটি থাকের—জগৎকে শিক্ষাদানের ব্রত নিয়ে জন্মেছিলেন। হাজার হাজার লোককে মুক্তির পথ দেখাবার জন্য ঐ সব জগদ্‌গুরুরা আসেন। তাঁরা নিজের মুক্তি চান না। তাই স্বামীজী যখন চব্বিশ ঘণ্টা সমাধিতে ডুবে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন ঠাকুর বললেন, "তুই এই ছোট জিনিসের কথা ভাবছিস। তোকে হতে হবে বিরাট বটবৃক্ষের মতো, তুই হাজার হাজার সংসারতপ্ত লোককে আশ্রয় দিবি।" কিন্তু আমাদের কাছে ঐ ছোট জিনিসটিই (অর্থাৎ সমাধি) মস্ত বড় জিনিস।

প্রশ্ন। কিছুক্ষণ ধ্যান করবার পর মন চঞ্চল হয়। কি কি উপায় তখন অবলম্বন করা উচিত?

উত্তর। গীতাতে যেমন আছে সর্বদা অভ্যাসযোগ চালাতে হবে। অভ্যাস আর বৈরাগ্য, যতটা পার ধ্যান চিন্তা করবে এবং অনাসক্তি অভ্যাস করবে। মনটা যদি একশ'টা জিনিসের উপর ঝোঁকে তাহলে মনকে অন্তর্মুখ করা কঠিন। হতাশ হতে নেই। কয়েকদিন বা কয়েক মাস ধ্যান করবার চেষ্টা ক'রে ছেড়ে দিলাম এরূপ হলে চলবে না। বৎসরের পর বৎসর লেগে থাকতে হবে। এমনকি দু মিনিটের জন্যও যদি মনকে একাগ্র করতে পার তো অনেক উপকার পাবে। এক সময়ে আমার খুব

ধ্যান-ধারণা করবার ঝোঁক হয়। স্বামীজী ঐ সময়ে আমাকে কর্মযোগ নিয়ে থাকতে বলেছিলেন। আমি নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান জপ করতে চাই শুনে তিনি আমাকে তিরস্কার ক'রে বললেন, "যদি মনকে এক মিনিটের জন্য একাগ্র করতে পারিস তাহলে যথেষ্ট।" কয়মিনিট ধ্যান করবে সেটা বড় কথা নয়। দু-মিনিটের জন্য হলেও নিষ্ঠা নিয়ে নিয়মিত বসাটাই হ'ল প্রয়োজনীয়।

প্রশ্ন। ধ্যানে কি চিন্তা করা উচিত?

উত্তর। শ্রীভগবানের চিন্তা করবে—তাঁর গুণ, তাঁর অবতারচরিত্র, শিক্ষা ইত্যাদি।

প্রশ্ন। কেউ কেউ বলেন শুধু ভগবানের নাম জপ দ্বারা মুক্তি লাভ হতে পারে। তা কি সম্পূর্ণ সত্য?

উত্তর। ভগবানের নামে বিপুল শক্তি নিহিত। সর্বদা তাঁর নাম জপ করলে মন ক্রমশঃ ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ ধারণা করতে পারে। জপ দ্বারা একাগ্রতা ও ভক্তি দুই-ই হয়।

প্রশ্ন। আমরা যা কিছু করি তা যদি আমাদের অতীত কর্মের দ্বারা চালিত হয় তাহলে অশুভ কর্মকে জয় করব কি ক'রে?

উত্তর। আমাদের চরিত্রে প্রাক্তন কর্মের প্রভাব রয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু তা বলে আমরা তো যন্ত্র নই। অতীত কর্মকে যদি রোধ না করা যায় তা হলে তো মুক্তিই সম্ভবপর নয়। বস্তুতঃ আমাদের মধ্যে যে আত্মা রয়েছেন তিনি কর্মকে যেমন সৃষ্টি করেন তেমনি উহা বিলয়ও করেন। সৎ কর্ম দ্বারা অতীতের অশুভ সংস্কার ক্ষীণ করতে হবে। আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ কর। অতীতের সংস্কার ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে আসবে।

প্রশ্ন। অতীত জন্মের কর্মকে না জানলে শুধরাবো কি ক'রে?

উত্তর। না, অতীত জন্মের কর্মকে জানার প্রয়োজন নেই। অতীতের সব কর্ম যদি স্মরণে আসে তো পাগল হয়ে যাবে।

প্রশ্ন। ভক্তি ও জ্ঞান কি সম্পূর্ণ আলাদা পথ? অথবা প্রত্যেককেই সমবেতভাবে ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম প্রভৃতি সাধতে হবে?

উত্তর। প্রথম প্রথম ভক্তি ও জ্ঞান আলাদা পথ বটে। কিন্তু পরে ওরা মিলে যায়। তখন একটি থেকে অপরটিকে পৃথক করা কঠিন। এ কথা আদৌ ভাববে না যে তুমি নিজে জ্ঞান বা ভক্তি পথ অনুসরণ করছ বলে অপরে যদি আলাদা কিছু করে তো তারা ভুল করছে। বরং বল আমার পথ এই, অমুকের পথ ঐ। তবে তুমি যদি সব পথগুলি সমন্বিত করতে পার তো তোমার জীবনও তদনুপাতে সমৃদ্ধ হবে। নিজের ধাত অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পথকে বিশেষভাবে অনুসরণ করতে হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে অপর পথের সাধারণ নিয়মগুলি আচরণ করা চলে। সব পথের সমন্বয়ই ছিল স্বামীজীর আদর্শ।

প্রশ্ন। কেউ কেউ সাধন করতে করতে পাগল হয়ে যায়। এর কারণ কি সূক্ষ্ম ভোগবাসনা বা ভুল প্রাণায়াম-অভ্যাস অথবা মন্ত্রের মধ্যে কোনও ভুল?

উত্তর। এ সব কিছুই ঐ উন্মাদ অবস্থার কারণ হতে পারে। গুরুর উপদেশ যথাযথ অনুসরণ না করলে পাগল হওয়া বিচিত্র নয়। বিশেষতঃ যোগ অভ্যাস করতে হলে গুরুর নির্দেশ কঠোরভাবে পালন করা দরকার। আহারের নিয়ম, ব্রহ্মচর্য এবং আরও নানা সংযম ছাড়া যোগাভ্যাস সুফলদায়ক হয় না। মাথা খারাপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

প্রশ্ন। কেউ কেউ ধ্যানের সময় নানা রকম আলো দেখে বা শব্দ শোনে। ঐরূপ

ঘটলে কি করা উচিত ?

উত্তর। ওদিকে নজর না দেওয়াই ভাল। ওগুলি এমন কিছু উঁচু অবস্থা নয়। নিজের আধ্যাত্মিক আদর্শ অনুসরণ ক'রে চল। ক্রমশঃ ঐ সব আর আসবে না।

প্রশ্ন। ঈশ্বর যদি প্রত্যেকের হৃদয়ে বাস্তবিকই থাকেন তবে তিনি প্রত্যেককে সৎপথে নিয়ে যান না কেন? আমরা কি তাঁর ছেলেমেয়ে নই ?

উত্তর। উহা তিনি পারেন এবং তিনি নিয়ে যাবেনও - যদি তাঁর পুত্রকন্যারা তাঁকে স্বীকার করে।

প্রশ্ন। যদি কোনও দর্শন উপস্থিত হয় তো কি ক'রে জানবো ওটা খাঁটি দর্শন, কল্পনা নয় ?

উত্তর। দর্শনটির ফলে যদি চিত্তপ্রসাদ এবং মনের বল আসে তো বুঝতে হবে উহা খাঁটি। পক্ষান্তরে যদি ঐ দর্শনের ফলে তুমি দুর্বল ও বিভ্রান্ত হয়ে পড় তা হলে জানবে উহা ঠিক বস্তু নয়। তা ছাড়া যথার্থ আধ্যাত্মিক অনুভূতি কখনো যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না। এমন যদি কিছু দেখ যা যুক্তির সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ বাধায় অথবা শাস্ত্রে বা গুরুবাক্যে যার উল্লেখ নেই তাহলে ওকে আমল দিও না।

প্রশ্ন। গুরুর অন্বেষণ আবশ্যক কি, অথবা গুরু নিজেই হাজির হন ?

উত্তর। দুই-ই হতে পারে। তোমার যদি আকুল আকাঙ্ক্ষা থাকে তো ভগবান উপযুক্ত গুরু পাঠিয়ে দেবেন। গুরুর কথা ও কাজে যদি মিল দেখতে পাও তো জেনো সদ্‌গুরু। এমন ব্যক্তিকে গুরুরূপে মেনে তাঁর উপদেশ পালন করতে পার।

প্রশ্ন। ঈশ্বর কি চাক্ষুষ দর্শনের বিষয়? তাঁর কথাও কি কানে শোনা যায়? ভগবান যদি চৈতন্যস্বরূপ হন তাহলে তাঁকে স্থূলভাবে দেখা বা তাঁর বাণী শোনা কি ক'রে সম্ভবপর ?

উত্তর। তাঁকে দেখা বা তাঁর কথা শোনা বাস্তবিক বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপার নয়। উহা আমাদের অন্তশ্চেতনায় ঘটে। ঈশ্বরের রূপ বস্তুত: জড়রূপ নয়। উহা চৈতন্যের অভিস্ফূর্তি। আমরা তাঁকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দ্বারা দেখি, স্থূল চোখে নয়।

ধ্যানের দ্বারা একপ্রকার তৃতীয় চক্ষুর উদ্ভব হয়। ওর নাম জ্ঞানচক্ষু। সেইরূপ ভগবানের কথাও আন্তর চেতনায় শোনা যায়। ধ্যান গভীর হলে দেহের জ্ঞান থাকে না কিন্তু চৈতন্যের স্তরে দিব্য দর্শন, শ্রবণ ও অনুভব হতে পারে।

প্রশ্ন। দূর থেকে গুরুর কৃপা কাজ করতে পারে কি? অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের সাক্ষাৎ ব্যতীতও পত্রালাপের মাধ্যমে গুরুকরণ সম্ভবপর কি ?

উত্তর। না, পত্রালাপের মাধ্যমে গুরুকে জানা যায় না।

প্রশ্ন। অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত কি একই আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছুবার আলাদা আলাদা পথ, না ওরা আধ্যাত্মিক বিকাশের বিভিন্ন ধাপ ?

উত্তর। এরা বিভিন্ন পথ ঠিকই। তবে লক্ষ্যে পৌঁছুলে বোঝা যায় যে এই সমস্ত পথ একই উদ্দেশ্য সাধন করে। তখন একটা সহিষ্ণুতা আসে; বুঝা যায় যে অপরের পথও আমাদের নিজের পথের মতোই ভাল। উচ্চতম লক্ষ্যে পৌঁছুলে দেখতে পাওয়া যায় সকল মত ও সাধনা একই কেন্দ্রে সমন্বিত।

নিবেদিতার সমাজ-চিন্তা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

ভারতের সমাজ-সমীক্ষা: সহস্র সহস্র বৎসর ধরে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভারতের সমাজ—যে সমাজ নবযুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দকে ধারণ পালন ও লালন করেছে—নিবেদিতার বিশেষ অনুশীলনের বস্তু হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি যে, একটি জাতির মর্মমূল পর্যন্ত দেখতে হ'লে যে প্রজ্ঞাদৃষ্টির প্রয়োজন তা নিবেদিতার বিশেষভাবেই ছিল। নিবেদিতার ভারত-আবিষ্কার তাই একান্ত সত্য আবিষ্কার। অপর প্রজ্ঞাদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নক্রমে "নিবেদিতা ভারত সম্বন্ধে একান্ত সত্যসকল উদ্ঘাটিত করেছেন"—"She has stated the vital truths about India."

নিবেদিতার ভারতীয় সমাজাদর্শ-আলোচনার পশ্চাতে অভিপ্রায় ছিল দু'টি। প্রথম—ভারতের প্রাচীন জীবনধারাকে ঠিক ঠিক চিনে নিয়ে জগতের সম্মুখে তুলে ধরা এবং তার দ্বারা আত্মবিস্মৃত পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত ভারতীয়দেরও আত্মপরিচয় লাভ করতে সহায়তা করা। ভারতীয় সমাজ-জীবন সম্বন্ধে তাঁর অনন্য গ্রন্থ "The Web of Indian Life"-এর সম্পর্কে এক বান্ধবীকে তিনি এক পত্রে একথা সুস্পষ্ট ক'রেই লেখেন—"Anyway I hope, in Swamiji's name it will (a) end zenana missionaries, (b) clear misconceptions about India; (c) teach India to think truly about herself, this is the most important of the ends I hope for…"[১] ভারতবাসিগণ যে ভারতবাসী হয়েও আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন মহিমময় ঐতিহ্যের মূল্য সম্বন্ধে সীমাহীন অজ্ঞতা পোষণ ক'রে চলেছে, এটা নিবেদিতার কাছে অত্যন্ত বেদনার বিষয় ছিল। নিপুণ সমাজবিজ্ঞানী নিবেদিতা জানতেন যে, কোন জাতি যদি তার প্রাচীন ঐতিহ্য হ'তে চ্যুত হয়, তাহ'লে তার অগ্রগতিও বিপন্ন হয়ে পড়ে, কারণ পায়ের তলার মাটি হারিয়ে কখনও কেউ টিকে থাকতে পারে না। সেজন্য আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীর মনে তার অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে চেতনা এনে দেওয়ার কাজকে তিনি তাঁর জীবন-ব্রতের অন্যতম মুখ্য লক্ষ্য ব'লে মনে করে-ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ এই জীবনাদর্শকে আধুনিক যুগোপযোগী ক'রে তাকে নবরূপ দান করা তাঁর ভারত-সমীক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। পুরাতন মূল্যবান জীবনাদর্শকে নূতন ক'রে না তুলতে পারলে তা তো আধুনিক মানুষের নিকট গ্রহণীয় হবে না। নূতনতর ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ ক'রে ধর্মে, কর্মে, জ্ঞানে, প্রেমে, সাম্যে, ধনে, ঐশ্বর্যে এক অধিকতর মহিমময় নূতন ভারত গঠন করা তাঁর ভারত-সমীক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। নিবেদিতা যাঁর বার্তাবহ ছিলেন সেই স্বামী বিবেকানন্দই তাঁকে এ বিষয়ে সচেতন করেছিলেন। 'The Master As I Saw Him' গ্রন্থের একস্থানে নিবেদিতা বলছেন—"How to nationalise the modern and modernise the old, so as to make the two one, was a puzzle that occupied much of his time and thought."[২] আধুনিক যুগকে ভারতের মর্মে

১ C. W.—Vol. II, P. XII

২ The Master As I Saw Him—P. 311

স্থাপন ক'রে তার জাতীয়করণ এবং প্রাচীনকে নবীন ক'রে তোলা—এইটি যখন সম্পন্ন হবে তখনই বিবেকানন্দের মতে আজকের যুগোপযোগী যথোপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাও আবিষ্কৃত হবে। কাজটি কিন্তু আদৌ সহজ নয়। নিবেদিতা বা বিবেকানন্দ যে-কেউই এ কাজকে সহজ মনে করেননি, তার প্রমাণ নিবেদিতার নিম্নোক্ত উক্তি—"He (Vivekananda) never made the mistake of thinking this reconciliation of old and new an easy matter"[৩] কোন দুরূহ কাজকে সহজ মনে করার চেয়ে বড় ভুল আর নেই। বিবেকানন্দ বা নিবেদিতা কেউই সে ভুল করেন-নি। কিন্তু কোন কাজ দুরূহ ব'লে তাকে পরিত্যাগ করাও কখনও তাঁদের স্বভাব ছিল না। সেজন্য গুরু-নির্দেশে নিবেদিতার ভারত-অনুসন্ধানের মূল লক্ষ্যই হয়েছিল "to modernise the old"—প্রাচীনকে নবীন ক'রে তোলা, নবীনের মর্মে তাকে স্থাপন করা। এই দুরূহ ব্রত তিনি কত কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন, তার পরিচয় তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে মিলবে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ধর্মের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একস্থানে তিনি মন্তব্য করলেন, "Religion is not confined to Sadhanas. Tapasya is not a matter of Thakur-ghar alone. Every great idea that presents itself in the secular sphere is a form of God calling for our worship." ধর্মের এ এক অভিনব যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা, যার আধুনিক মনের কাছে এক বিশেষ আবেদন আছে।

এমনি ক'রে আত্মবিস্মৃত খণ্ড ছিন্ন এক বিপুল জনসমষ্টির একাত্মতা নূতনরূপে আবিষ্কার ক'রে তাকে এক অখণ্ড মহাজাতিরূপে রূপ দিতে চেয়েছেন তিনি। এক কথায় ভারতকে ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ, স্বমহিমায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, আত্ম-সচেতন এক বলিষ্ঠ জাতি হিসাবে চিনে নিতে তিনিই শিখিয়ে গেলেন আমাদের। এই দিক দিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনে এই দক্ষ রূপকারের ভূমিকা যুগান্তকারী—প্রায় ঐতিহাসিক।

ভারতীয় জীবনধারা : ভগিনী নিবেদিতার ভারতের সমাজাদর্শ সম্বন্ধে অনুপম গ্রন্থ 'The Web of Indian Life' এজন্য বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল দেশে বিদেশে সর্বত্র। ভারতকে চিনতে হ'লে এ গ্রন্থ অপরিহার্য। যাদের মনে পূর্বপোষিত ধারণার দরুন ভারত সম্বন্ধে অকারণ বিরূপতা ছিল, তাদেরও মনে এ গ্রন্থ দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তা বিরূপতার আকারেই প্রকাশ পেয়েছে। পূর্বপোষিত ধারণার উপর আঘাত পড়লে তাই-ই ঘটে থাকে। এই প্রতিক্রিয়া গ্রন্থখানির সাফল্যের পরিচয় বহন করছে। সন্দেহ নাই যে, ভারতের সত্য রূপ এই গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বষ্ঠু প্রকাশ লাভ করেছে। এবিষয়ে দু-একটি অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে—London-এর 'Queen' পত্রিকা ২৮শে আগস্ট ১৯০৪ তারিখে লিখলেন—"It is seldom that a Western-born author succeeds as absolutely as Miss Noble in her 'The Web of Indian Life' in penetrating the Eastern mind and heart.[৪] Detroit Press জুলাইয়ের ২৪ তারিখে এই একই বছরে লিখলেন[৫]—"...'The Web of Indian Life' by the Sister Nivedita comes as a revelation ; it is

৩ Ibid

৪ C. W. Vol. II, P. X

৫ Ibid—P. XI

attracting immediate attention ; it is being regarded as an epoch-making book. For in it the inner life of the Indian woman, the life below the surface, the ideals, the mainsprings of action, the aspirations, hopes and all the mysticism of the East, and the reality of the Unseen, are set forth, as has never been done before…"

ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ ও ভারতীয় সমাজ :

ভারতের জীবনধারা যে-সকল শক্তি দ্বারা নিরূপিত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হ'ল ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ। নিবেদিতার মতে "The foundation-stone of our knowledge of a people must be an understanding of their region." নিবেদিতার এ মত নিয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। সমাজবিজ্ঞানে এই বিশিষ্ট মতবাদকে নিবেদিতা ভারতের সমাজ-সংস্কৃতি-বিশ্লেষণে অতি নিপুণতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন।

নিবেদিতার মতে ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশই ভারতের মানুষকে অন্তর্মুখ ক'রে তুলেছে। ভারতের এই ভৌগোলিক পরিবেশকে নিবেদিতা একটি কাব্যময় প্রকাশ দিয়েছেন—"Around her feet the saphire seas, with snow-clad mountains behind her head, she sits enthroned." নীল-সিন্ধুজল-ধৌতচরণতল, শুভ্রতুষারকিরীট-শীর্ষ ভারতের একটি অখণ্ড ভৌগোলিক সত্তা আছে। এই অপারসৌন্দর্যময় ধ্যানগম্ভীর পরিবেশ ভারতের মানুষকে জীবন-সত্যের অনুসন্ধানী ক'রে তুলেছে। এ বিষয়ে সারা ভারতে এক অপূর্ব ঐক্য দেখা যায়। জীবনাদর্শ ও ধ্যান-ধারণায় ভারত এক ও অখণ্ড জাতি।

এই গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি সহায়ে তিনি দেখেছেন, এখানে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেরই বিশ্বাস যে, মানবজীবন হ'ল এক কথায় বিবেক ও বাসনার সংগ্রাম। সর্বক্ষেত্রে তাই ভারতীয়ের জীবনে শ্রেয়ের স্থান প্রেয়ের উর্ধ্বে। সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে এই আদর্শকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য। ফলে চিন্তা ও চরিত্রের উৎকর্ষের ক্ষেত্রে ভারত পৃথিবীর অপরাপর দেশ অপেক্ষা অনেক এগিয়ে যেতে পেরেছে। প্রাচীন মিশর যখন পিরামিড-নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেছে, ঠিক সেই সময়ে ভারত অনুরূপ শক্তি বিনিয়োগ ক'রে বেদ ও উপনিষদের মহান তত্ত্বসকল উপস্থাপন করেছে। আর বহু প্রাচীনকাল হ'তে সহস্র সহস্র বৎসর ধরে অব্যাহত ধারায় উচ্চ চিন্তানুসারে জীবন-অনুশীলনে ব্রতী হওয়ায় ভারতে এক অতি উচ্চমানের নৈতিক জীবন গড়ে উঠতে পেরেছে ব্যাপকভাবে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে। ভারতীয় সভ্যতা তাই প্রধানতঃ নৈতিক মানদণ্ডে এক অতি উন্নত সভ্যতা—হয়ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতা। নিবেদিতা গভীর বিশ্লেষণ-সহায়ে তাঁর এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌছোন যে, চিন্তার সূক্ষ্মতায়, অনুভূতির ক্ষমতায়, হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষে ভারতের দক্ষতা অতুলনীয়। ভারতের সমাজ-জীবন এরই ফলশ্রুতিতে হয়েছে পৃথিবীর সেরা সভ্যতার বাহক ও ধারক।*

নিবেদিতার মতে যে-কোন জাতির বাহ্য-জীবন-সংগঠনের পশ্চাতে থাকে এক ভাব-জগতের সংগঠন। ভাবজগতের সংগঠনই বাহ্য-সংগঠনের রূপ নির্দেশ করে—"There is a self-organisation of thought that

* Civic And National Ideals—p. 41

precedes external organisation".[৭] ভারতের সকল চিন্তার উদ্ভব মহান-সত্যানুসন্ধান-প্রয়াস হ'তে। চিন্তাজগতের এই একটি অখণ্ড উৎস ভারতের বাহ্য সমাজজীবনকে একটি বিশিষ্ট ভৌল এনে দিয়েছে। ভারতে এই বিশিষ্ট চিন্তাধারা প্রথমে আর্যজনগোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও ক্রমে তা অপরাপর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে অনুস্যুত হয়। ফলে এখানকার বহু বিচিত্র জনগোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণা, কর্মপ্রয়াস, সমাজ-বিন্যাস বহুল বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি অখণ্ড বৈশিষ্ট্য পেয়েছে। সকল বিভেদ, বৈষম্য ও বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় জীবন তাই এক ও অখণ্ড।

ঐক্যের অভিজ্ঞান: নিবেদিতার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি শুধু বাহ্যজীবনে আবদ্ধ থাকেনি, তা প্রধানতঃ ভাবজগতের গভীরে প্রবেশ করেছে। শুধু সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান বিধি-নিয়ম প্রভৃতির আলোচনা ক'রেই তিনি ক্ষান্ত হননি, প্রথা-প্রতিষ্ঠান বিধিনিয়মের পশ্চাতে যে চিন্তার উৎস আছে তাকে গভীর অনুসন্ধানী আলোক সহায়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে প্রয়াসী হয়েছেন ব'লেই সম্পূর্ণ ভারতকে তিনি দেখতে পেয়েছেন। ভারতের দেহ-মন-প্রাণ-আত্মা নিয়ে তার সমগ্র সত্তা সেজন্য তিনি যেমন দেখেছেন এমন ভাবে আর কেউই দেখেননি।

পরিবার-সাংগঠনিক উৎকর্ষ: পরিবার সমাজের ভিত্তিস্বরূপ। একদা ভারতে পরিবার অতি সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। এখানে গৃহ যেন একটি আশ্রম হয়ে উঠেছে যেখানে সকল সদস্য আত্মসুখ নয়, অপরের সকল সুখ ও কল্যাণের জন্য সকল কর্ম অনুষ্ঠান করেছে। সেজন্য গার্হস্থ্য-জীবনকেও ভারতীয়রা একটি তপশ্চরণ বা ধর্মবিধিপালন ব'লে মনে করতে পেরেছে। আর সমগ্র পারিবারিক জীবনে, প্রতিটি কর্মের কেন্দ্রে আছেন ঈশ্বর। তাদের সকল কর্ম দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পিত অর্ঘ্য— স্নান, ভোজন প্রভৃতি সাধারণ ও তুচ্ছ, পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে একান্ত ব্যক্তিগত কর্মও যেন "আচাররূপ মনোহর স্তোত্রগান।"[৮]

ভারতের বহু বিচিত্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে একই মানের পরিবার-সংগঠন দেখা যায়। এ বিষয়ে হিন্দু-মুসলমান বা অপরাপর গোষ্ঠীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তা ছাড়া, হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায়— পরিবারে সকল সদস্যেরই একটি স্বকীয় মর্যাদা আছে—এমনকি পরিবারে দাসদাসীদেরও একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বয়োবৃদ্ধগণ পরিবারে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে থাকেন, পারিবারিক জীবনে তাঁরা অপরিহার্য। এটি ভারতীয় যৌথ জীবন-সংগঠনের একটি অতি সুন্দর দিক। পাশ্চাত্য এদিক দিয়ে কত অভিশপ্ত, তা আমরা জানি। বয়োবৃদ্ধদের সেখানে পারিবারিক কোন স্থানই নাই, একাকীত্বের অভিশাপে অভিশপ্ত তাদের জীবন। ভারতে পরিবারে তাঁরা যে একটুকু স্থান অধিকার ক'রে আছেন তাই নয়, তাঁদের বহু বৎসরের জীবনের অভিজ্ঞতা পরিবারের অমূল্য সম্পদ ব'লে বিবেচিত হয়। সেজন্য তাঁরা বিশেষ সম্মানভাজন ব'লে বিবেচিত। পারিবারিক জীবন তাঁদের নির্দেশে পরিচালিত।[৯]

---

৭ Civic And National Ideals—p. 41

৮ C. W.—Vol. II p. 508—"All the forms and tasks of the Indian home—the rising at dawn, bathing, preparation and eating of food—were sacramental".

৯ Civic And National Ideals—Chapter on Indian Unity

ভারতীয় সমাজে নারী: গত কয়েক শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্য যে সামাজিক সংহতি হারিয়ে ফেলেছে, ভারত তা দীর্ঘকাল ধরে রাখতে পেরেছিল। নিবেদিতার মতে ভারতে এই সংহতি-সংরক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে তার নারীগণের দ্বারা। তাঁর আরও মত: "জগতের সর্বত্রই মানবজাতির নৈতিক আদর্শের রক্ষয়িত্রী নারী"।[১০] নারী মা হয়ে শুধু সন্তানের দেহমনই গড়ে না, তার হাতে তুলে দেয় পূর্বতন সংস্কৃতির দীপটি। সেদিক দিয়ে নারীই সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ দূত। দীপ হ'তে যেমন দীপ জ্বলে ওঠে, ঠিক তেমনি ক'রে মায়ের নিকট হ'তে সন্তানের মনে সঞ্চারিত হয় অতীত ঐতিহ্যের আলো। এই ভাবেই যুগের পর যুগ ধরে বংশপরম্পরায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয় জাতীয় সংস্কৃতি। ঠিক এই ক্ষেত্রে নিবেদিতার মতে ভারতীয় নারী অতুলনীয় দক্ষতা প্রদর্শন করেছে। নিজের জীবনে যুগ যুগ ধরে জাতীয় ভাবধারাকে জীবন্ত ক'রে রেখেছে ভারতীয় নারী।

অতীত ভারতের নারীর সামাজিক জীবনে স্থান নিয়ে নিবেদিতার সময়ে প্রচুর বিভ্রান্তি ছিল। শুধু পাশ্চাত্যে কেন, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে এ বিষয়ে প্রচুর বিভ্রান্তি তখনও ছিল, আজও আছে। আজ বোধ হয় এ বিষয়ে আমাদের বিভ্রান্তি সর্বাধিক পর্যায়ে উঠেছে। এবং সেজন্য আজ ভারতীয় নারীসমাজের মধ্যে দেখা দিয়েছে পাশ্চাত্যকে অন্ধভাবে অনুকরণ করার প্রয়াস। আজ মূল্য-বোধের ক্ষেত্রের সঙ্কট হ'তে পরিত্রাণ পেতে হ'লে এ বিষয়ে নিবেদিতার মূল্যায়নের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। তাঁর মতে প্রাচীন ভারতীয় নারীকে বুঝতে হ'লে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, "ভারতীয় নারী নৈতিক সভ্যতার পরিণাম।" এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই তার অপার সহিষ্ণুতা ও অসামান্য আত্মবিলুপ্তি, তার কঠোর অবরোধ, অত্যাজ্য সতীধর্ম, নির্মম বৈধব্যের কঠোর শুচিতার আদর্শ—এ সকলেরই গূঢ় তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিবেদিতার দৃষ্টিতে—"আদর্শের দিক দিয়ে একজন ভারতীয় নারীর জীবন ভারতভূমির কাব্যস্বরূপ।" অর্থাৎ ভারতীয় নারীর জীবনই ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শের বাস্তব রূপ। ভারতের উচ্চ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শ যে নিছক কল্পনা নয়, অবাস্তব আদর্শবাদ বা ভাবালুতা নয়, বাস্তব সত্য, তার প্রমাণ নিবেদিতার মতে[১১] ভারতীয় নারীর জীবনে মিলবে।

(ক্রমশঃ)

১০ ভারত-তীর্থে নিবেদিতা—পৃঃ ১১৮

১১ The Web of Indian Life—গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

আধুনিকতার অগ্রদূত রাজা রামমোহন

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

"তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটি সুবিস্তর মনোরাজ্য অধিকার করিয়া রহিয়াছ।"

সমসাময়িক দিল্লীশ্বরের বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত উপাধিটিই পরবর্তীকালে রাজা রামমোহনের সমগ্র ব্যক্তিসত্তার প্রতীক হয়ে উঠেছে মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের উদ্ধৃত বন্দনায়। ইতিহাসের অঙ্গনে কেউ পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে নেতা হয়ে ওঠেন, কেউ বা বিধিদত্ত নেতৃত্বের রাজটীকা ললাটে নিয়ে আবির্ভূত হ'ন। তরুণ বঙ্গ ও নবীন ভারতের আধুনিক চিন্তার জগতে তেমনি অগ্রনায়কের ভূমিকা নিয়ে রামমোহন এসেছিলেন, একথা আজকের দিনের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে ক্রমে সুস্পষ্ট তাৎপর্যে প্রকাশমান। এই স্বীকৃতির অর্থ এই নয় যে, জাতীয় জীবনের স্বরূপ-উপলব্ধিতে বা ভবিষ্যতের পন্থানির্ধারণে কোনো অভ্রান্ত ছক তিনি আমাদের সামনে রেখে গেছেন। অগ্রনায়কের কাজ পথের ইঙ্গিত দেওয়া, পরবর্তীকালের মানুষ সেই পথের নব নব দিগন্ত উন্মোচন ক'রে দেশ ও কালের, অতীত ও ভবিষ্যতের স্বর্ণসূত্র রচনা করবেন, তবু কখনো প্রেরণার প্রথম স্পন্দনটির কথা ভুলবেন না।

আধুনিক ভারতবর্ষের নবজীবনের সূচনায় রামমোহনের চিন্তাধারা সেই প্রথম অরুণাভাস, যার মধ্যে মহত্তর সূর্যোদয়ের নিশ্চিত সম্ভাবনা। আলোয়-অন্ধকারে তখনো হয়তো সত্যের সমগ্র রূপটি স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়নি, কিন্তু রামমোহনের মনন থেকেই নবযুগের আলোকে আমাদের যাত্রার সূচনা।

মোগল সাম্রাজ্যের বিপুল ধ্বংসাবশেষের পাশে ইংরেজ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ তখন ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। একদিকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকার, আর একদিকে আরবী ফারসী সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, আর একটু পরিণত বয়সে ইংরেজীর মাধ্যমে য়ুরোপীয় মননের সহমর্মিতা—রামমোহনের আবির্ভাব বিশ্বচিন্তাধারার এই ত্রিবেণীসঙ্গমে। পাণ্ডিত্যের বিশেষ কোনো শাখায় কেউ না কেউ সেকালে রামমোহনের চেয়ে বড়ো পণ্ডিত ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু মননের যে বিপুল বিস্তারে রামমোহন সেই যুগে সমগ্র বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছিলেন, সেই উদারপ্রাণতায়ই রামমোহন আধুনিক যুগের প্রথম চিন্তানায়ক।

ভারতের প্রথম বিশ্বনাগরিক রামমোহনের মানবপ্রীতিময় রচনাংশ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ১৮২৩-এর মার্চ মাসে প্রকাশিত রামমোহনের 'প্রার্থনাপত্র' রচনাটিতে তিনি স্বদেশ ও বিদেশের সব ধর্মের আন্তরিক সত্যানুসন্ধীদের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বিদেশীদের সম্বন্ধে লিখেছেন—'বিদেশীয়দের অন্তঃপাতি ইউরোপীয়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরকে সর্বথা এক জানেন ও মনের শুদ্ধভাবে কেবল তাঁহারি উপাসনা করেন এবং দয়ার বিস্তীর্ণতাকে পরমার্থ-সাধন জানেন, তাঁহাদিগ্যেও উপাস্যের ঐক্যানুরোধে অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা কর্তব্য হয়। তাঁহারা যিশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বরের প্রেরিত ও আপনাদের আচার্য কহেন, ইহাতে পরমার্থ-বিষয়ে আত্মীয়তা কিরূপে হয় এমত আশঙ্কা

উচিত নহে; যেহেতু উপাস্যের ঐক্য ও অনুষ্ঠানের ঐক্য উপাসকদের আত্মীয়তার কারণ হইয়া থাকে।'[১] মানবজীবনের পরম লক্ষ্যের এই নিগূঢ় ঐক্যবোধ থেকেই রামমোহন বিদেশী প্রচারকদের মূঢ়তাকেও ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে বলেছেন—"...ইউরোপীয়েরা যখন আপন মতে লইতে ও অদ্বৈতবাদ* হইতে বিমুখ করিতে আমাদের প্রতি যত্ন করেন তখনও তাঁহাদিগ্যে দ্বেষভাব না করিয়া বরঞ্চ তাঁহাদের স্বীয় দোষ জানিবার অজ্ঞানতা নিমিত্ত কেবল করুণা করা উচিত হয়; যেহেতু ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হয় যে ধন ও অধিকার হইলে আপনাতে অন্য কোন ত্রুটি আছে এমত অনুভব মনুষ্যের প্রায় হয় না ইতি।"[২]

এ যেমন তাঁর অধ্যাত্মদৃষ্টির কথা, তেমনি মানবিক হৃদয়াবেদনের দিক থেকে সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় রয়েছে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের তদানীন্তন বৈদেশিক মন্ত্রীর কাছে লেখা পাশপোর্টের জন্য আবেদনপত্রটিতে—'It is now generally admitted that not religion only but unbiased common *sense as well as the accurate deductions* of scientific research lead to the conclusion that all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches."[৩] 'একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, কেবল ধর্মের মাধ্যমেই নয়, নিরপেক্ষ সহজবুদ্ধি ও সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা সঠিক সত্যনির্ধারণের পথে এই সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হই যে, সমগ্র মানবজাতি এক বিশাল পরিবার, বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠী কেবল সেই বিপুল বৃক্ষের শাখাপ্রশাখামাত্র।'

উপলব্ধির আন্তরিকতায় রামমোহনের এই বাণী এ যুগের বিশ্বসংস্থার মন্দিরপ্রাঙ্গণে মর্মর-ফলকে উৎকীর্ণ হবার যোগ্য। সেই সঙ্গে এও লক্ষণীয় যে, ধর্ম বিজ্ঞান ও রাজনীতির ত্রিধাবিভক্ত দৃষ্টিভঙ্গী যে শেষ অবধি সেই মানবজাতির ঐক্যবোধে সম্মিলিত এমন অনন্য উদাহরণ উনিশ শতকের সূচনাপর্বেই আমরা রামমোহনমানসে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। ব্যক্তি, জাতি ও বিশ্বের এই সমীকরণেই আধুনিকতার যথার্থ সূচনা। রামমোহন সেই আধুনিকতার অগ্রদূত।

আনুষ্ঠানিক ভাবে দৌত্যকার্যের জন্যই ১৮২৯-এর আগস্ট মাসে দিল্লী-সম্রাট দ্বিতীয় আকবরশাহ রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে বিলাতে পাঠাতে চেয়েছিলেন। কোম্পানীর *শাসকবর্গ এতে রাজী না হ'লেও ব্যক্তিগত* দূতরূপে রামমোহন যখন ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত হ'লেন, তখন যে সম্মাননা তাঁর ভাগ্যে ঘটেছিল, তা রাজসম্মানেরই অনুরূপ। আধুনিক যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময়ের প্রথম ভারতীয় দূতরূপে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট।

আশৈশব ধর্মচর্চার ফলে বেদ-উপনিষদ্, কোরান, বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনার দ্বারা রামমোহন যে একেশ্বরবাদী সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তার মূলে তাঁর নিজস্ব মনন-স্বাতন্ত্র্য ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় নিরপেক্ষ সাহসিক দৃষ্টি স্বদেশ ও বিদেশে তাঁর প্রতি অনুরাগী ও বীত-

---

১, ২ রামমোহন-গ্রন্থাবলী [৪] সাহিত্যপরিষৎ সং পৃঃ ২৮

* রামমোহন অবশ্য ঠিক অদ্বৈতবাদী ন'ন, একেশ্বরবাদী। তবে সাধারণভাবে তিনি বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্যের অনুগামী।

৩ রামমোহন রায়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৭০

রাগীর সংখ্যা অনেক পরিমাণে বাড়িয়েছে। কিন্তু রামমোহনের ধর্মমত সম্বন্ধে সর্বাগ্রে একথা স্মরণীয় যে, যে-অর্থে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ চৈতন্য বা রামকৃষ্ণকে আমরা অধ্যাত্মসাধনার গুরুরূপে গ্রহণ করি, সে-অর্থে রামমোহন একজন ধর্মসংস্কারক, ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী বা অবতার পুরুষ ন'ন। রামমোহন যে বুদ্ধিযোগে বিভিন্ন আপাতবিরোধী ধর্মসাধনার অন্তর্নিহিত ঐক্যের অনুভবকে সমন্বয়সূত্রে গাঁথতে চেয়েছিলেন, তার দ্বারা শুধু ধর্মের নয়, সমগ্র মানবতার ঐক্যবোধের সূচনা হয়েছে। তবু এও বুদ্ধিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত, বোধির আলোকে উদ্ভাসিত অদ্বয়-চেতনা নয়। আর তা নয় বলেই রামমোহনের জীবন ও মননের অনেক অসংগতি সেকালের সমালোচকদের মতো বিদ্বেষজাত না হ'লেও, একালের নিরপেক্ষ অনুসন্ধিৎসুদের সশ্রদ্ধ কৌতূহলের সামগ্রী।

আশৈশব সাকারবাদী হিন্দুসংস্কারে লালিত রামমোহনের অন্তরে এক ব্রহ্মের উপাসনার জন্য আকুলতা কেমন ক'রে জেগে উঠেছিল, তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তাঁর জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—"(১) মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে পাঠ, (২) হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মবাদ, (৩) সুফীদিগের গ্রন্থ—বিশেষতঃ হাফেজ, মৌলানা রুমি, শামী, তাব্রিজ প্রভৃতি কবিগণের গ্রন্থপাঠে তাঁহার উৎসাহ ছিল।" এইসঙ্গে বাইবেল ও আনুষঙ্গিক খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রচর্চা এবং পাদ্রীদের সঙ্গে আলোচনার ফলে তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট-ধর্মের চিন্তাধারার প্রভাবের কথা স্মরণীয়। আপন ধর্মমতের এই ব্যাপ্তি অনুভব ক'রেই রামমোহন নিজের ধর্মমতকে Universal Religion বা 'সর্বজনীন ধর্ম' বলেছেন।

১৮২০-তে প্রকাশিত রামমোহনের An Appeal to the Christian Public (খ্রীষ্টধর্মীদের প্রতি আবেদন) বইটির ভূমিকায় রামমোহন আত্মপরিচয়ে লিখেছেন—"Rammohan Roy···although he was born a Brahman, not only renounced idolatry at a very early period of life, but published at that time a treatise in Arabic and Persian against that system; and no sooner acquired a tolerable knowledge of English, than he made his desertion of idol worship known to the Christian world by his English publication—a renunciation, that I am sorry to say brought serious difficulties upon him···"

(ক্রমশঃ)

নবযুগের নারীজাতি ও ভগিনী নিবেদিতা

অধ্যাপক অরবিন্দ পালই

নিবেদিতা! মহান্ উৎসর্গীকৃতপ্রাণ এক নারীর আত্মা প্রকাশমান হয়েছিল স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের যাদুস্পর্শে। অমৃতত্বলাভের জন্ম আকুলপ্রাণা আইরিশ দুহিতা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল লাভ করেছিলেন নতুন এক জন্ম। পাশ্চাত্যের মুক্ত নারীর মর্যাদা, গৃহজীবন-আস্বাদনের মোহ, প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যে ভরা ইউরোপীয় জীবন তাঁকে আকর্ষণ করেনি,—মাতা ভ্রাতা ও ভগিনীর সাহচর্যে ভরা স্নেহময় পরিবেশ তাঁর আত্মার সুবিপুল পিপাসা মেটাতে পারেনি। প্রশ্ন তাঁর সেই যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী মৈত্রেয়ীর—"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।" সম্পূর্ণ এক ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন ধর্মের প্রবল প্রাণশক্তিমান্ এক মহান্ পুরুষ তাঁকে দিলেন আলোর সন্ধান, নিবেদিতার যুক্তিনিষ্ঠ মন বারে বারে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ, যুক্তি ও বিচারের মাধমে যাচাই ক'রে নিল তাঁকে, আত্মসমর্পণের পূর্বে আলো ও আলেয়ার পার্থক্য জেনে নিলেন তিনি। শেষ সিদ্ধান্ত নিলেন মার্গারেট, ভারতে এলেন তিনি।

শ্রীগুরু বিবেকানন্দের জন্মভূমি পবিত্র, কারণ আত্মানুসন্ধানে মানুষের এমন সুবিরাট ও সুসংহত প্রচেষ্টা, অমৃতসন্ধানে এমন দুঃসাহসিক পদক্ষেপ আর কোন দেশে হয়নি, তাই ভারতবর্ষ মহান্। ভারতই তাঁর নব জন্মভূমি, ভারতীয় নরনারী তাঁর নিকট 'our people'—আর তিনি,—'mother, sister and friend to all'. গুরু নাম দিলেন নিবেদিতা।

বিংশ শতাব্দীর সংঘাতময় ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, নিবেদিতার জীবন- ও বাণী-আলোচনা চিত্তাকর্ষক, কিন্তু এ সংশয়ও ওঠে—নবযুগের নারীজাতি নিবেদিতার ভবিষ্যৎ নারীর আদর্শের কতটা অনুগামী হয়েছে? এ প্রশ্ন সত্যই কঠিন; ত্যাগের আদর্শে, কঠিন কর্মে, সুগভীর নিষ্ঠায়, বীর্যবান্ ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যে, অনুপম ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রমাধুর্যে তাঁর সঙ্গে তুলনীয় বোধ হয় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল—The Lady with the lamp. রোমাঁ রোলাঁ তাঁকে তুলনা করেছেন সেণ্ট ফ্রান্সিসের শিষ্যা সেণ্ট ক্লারার সঙ্গে। কিন্তু আত্মসাধনার আকুলতায়, এমন নবজন্মলাভে, স্বামীজীর সিংহিনী কন্যা নিবেদিতা অনন্যা, অতুলনীয়া।

নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব যেমনই অসাধারণ, তাঁর নারীত্বের আদর্শ সম্পর্কে মতামত তেমনি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। একথা অনস্বীকার্য—নিবেদিতার ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রাচ্যের অধ্যাত্ম-সাধনা, প্রাচ্যের জীবনদর্শন ও সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। এজন্য যখন তিনি সাধারণ ভারতীয় নারীর জীবনযাত্রা বর্ণনা করেছেন, তখন সে চিত্র অপরূপ হয়ে উঠেছে। "Of all the beautiful things of the world, there is probably nothing so beautiful as the life of a Hindu household. The great ideal of Indian womanhood is not romance, but renunciation." "জগতের সুন্দর জিনিসগুলির মধ্যে হিন্দু পরিবার-জীবনের মতো এত সুন্দর আর কিছুই নাই; ভোগ নয়, ত্যাগই ভারতীয় নারীত্বের মহান আদর্শ।" যে কল্যাণের শক্তি ও আদর্শ হিন্দুনারীর জীবনে

তিনি দেখেছেন, প্রবল ভাবপ্রবণা নিবেদিতার তারই ধ্যানে ও স্বপ্নে অভিভূত হয়ে পড়া অস্বাভাবিক নয়। নিবেদিতার মতে ভবিষ্যৎ ভারতীয় নারী হবেন আরও স্বাধীন, ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা-বোধে আরও জাগ্রত। স্বামি-বরণে ব্যক্তিগত রুচির স্থান আরও বেশী হবে। ভবিষ্যৎ নারীর মধ্যে থাকবে কল্যাণধ্যান, আধুনিক বিজ্ঞানবোধের সঙ্গে যুক্ত হবে সুপ্রাচীন আধ্যাত্মিকতা। মাতৃহৃদয় মিশ্রিত হবে বীরোচিত ইচ্ছাশক্তির সাথে। নারী হবেন সাহসিকা এবং কোমলতা ও মাধুর্যের প্রতীক। আবার ভারতবর্ষে কিছু সন্ন্যাসিনী ও নারী-শিক্ষিকার আবির্ভাব হবে, যাঁরা হবেন ধর্মের রক্ষাকর্ত্রী—"Bashi-Bazouks of religion." এঁদের শক্তিমতী হতে হবে—"Strength is the one quality called for." এঁরা হবেন সত্যের পূজারী ; সত্যে স্ত্রী-পুরুষে ভেদ নাই। যখন এঁরা স্বপ্নাতীত আত্মোন্নতির মহিমায় উদ্ভাসিত হবেন, তখন নারীত্বের দৈহিক ও মানসিক বাধা অপসারিত হবে। নিবেদিতার নিকট আদর্শ নারী হিসাবে সীতা, সতী, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর স্থান বহু উচ্চে। কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণা Indian Madona সীতা মহত্ত্বের তেজে দীপ্তিময়ী। সতী সত্ত্বগুণের প্রতীক—ভয়হীনা—যাঁর অন্তর স্বর্গীয় প্রশান্তিতে উদ্ভাসিত—বিয়োগের ব্যথায় শোকোচ্ছলা নয়, —প্রেমে গরীয়সী—"Indian conception of the glory of woman"—ভারতীয় নারীত্বের মহিমার মানসী প্রতিমা। সাবিত্রী—"Indian Alcestis[১], how good and how strong"—ভারতের আদর্শ কল্যাণময়ী শক্তিমতী বীরাঙ্গনা। দময়ন্তী—বীর্যবতী প্রাণশক্তিসম্পন্না এই আর্যনারী—আধুনিকার জটিল মানসিকতায় ভরা, তাঁর "royal maidenhood ও supreme wifehood"—উপমাহীন, "fairest flower of Indian heroic age." নিবেদিতা প্রশ্ন করেছেন—"where is her peer in Indo-European literature ?"—রাজকুমারীরূপে, রাজরানীরূপে তিনি অতুলনীয়া, সে যুগে ভারতের শ্রেষ্ঠ পুষ্প তিনি। ভারতীয় বা ইউ-রোপীয় সাহিত্যে এর অনুরূপ চরিত্র কোথায় ?

ভারতে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে নিবেদিতা স্বামীজীর পরামর্শের সত্যতা উপলব্ধি করেছিলেন। A race must cultivate a great respect for womanhood—জাতিকে নারীত্বের সম্মান দিতে শিখতে হবে, স্বামীজীর কথা। স্ত্রীশিক্ষার জন্য একদল ব্রতধারিণীর আবশ্যক। স্বামীজী আবেগভরে বলেছেন, "আমাদের বিদ্যালয় থেকে এমন সব মেয়ে শিক্ষিতা হবে, যারা ভারতের সকল মেয়ে-পুরুষের মধ্যে মনীষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে।" এঁরাই হবেন ভবিষ্যৎ ভারতীয় নারীর শিক্ষিকা—ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসিনীর দল। নিবেদিতা এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সে-যুগে যতটা সম্ভব ছিল তা করবার চেষ্টা করেছেন। বাধা ছিল বিপুল। ইউরোপীয় মহিলার সান্নিধ্য এড়িয়ে চলার চেষ্টা সে যুগের ভারতে স্বাভাবিক। তবু প্রবল মনঃশক্তির সাহায্যে অসাধারণ এই মহিলা এ কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। সফলতা যাই হোক, বিবেকানন্দের মতো নিবেদিতাও বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের জাতীয় শিক্ষায় ভারতীয় জীবনধারা বজায় থাকবে—থাকবে জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ-ধারা—unbroken continuity of national life.

আজকের যুগের নারীসমাজ কি নিবেদিতার স্বপ্নকে সফল করেছে ? কঠিন প্রশ্ন। কারণ

১ গ্রীক উপকথার নারী, যিনি অপরের বদলে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

ভারতবর্ষে বহুজনহিতায় ও বহুজনসুখায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ 'নিবেদিতার' দল এখনও আশানুরূপ সংখ্যায় গড়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়তঃ এ যুগের নারী হয়তো আজও নিবেদিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে পারেনি। কারণ আজকের অর্থকেন্দ্রিক, রাজনীতিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়সংকল্প নারী হয়তো নিবেদিতার মহান্ আদর্শ থেকে দূরেই চলে যাচ্ছে। সাধারণ দৃষ্টিতে অবশ্য তাই যেন প্রতিভাত হচ্ছে। নারীজাতি পেয়েছেন শিক্ষা, যার প্রকৃতিও বিতর্কমূলক—পেয়েছেন ভোটাধিকার অর্থাৎ গণতন্ত্রের নিয়ামকতা, পেয়েছেন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা—কিছুটা নতুন অর্থনীতির প্রভাবে এবং কিছুটা উত্তরাধিকার-আইনের সংশোধনে, বিবাহের আইনে স্বাধীন ইচ্ছা ও ব্যক্তিগত নির্বাচনের অধিকার। কিন্তু তবুও সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেন, তাঁরা হচ্ছেন শঙ্কিত, কারণ সমাজে ভাঙ্গাগড়ার কাজে অনাচার ও ঔদ্ধত্যের শক্তি আজ প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বিবর্তনের সুপরিচিত পথ যেন প্রায় পরিত্যক্ত এবং বিপ্লব এক নতুন স্বতঃসিদ্ধতা ও এক শক্তিমান্ দেবতার স্থান গ্রহণ করেছে। তবে কি আমরা Aldous Huxley-র Brave New World-এর non-attached womanhood—বিবাহবর্জিত অসংযুক্ত নারীসমাজের দিকে এগিয়ে চলেছি? অথবা কার্ল মার্ক্সের community of women? অথবা রুশোর state of nature? এ প্রশ্নের মীমাংসা আজই সম্ভব নয়। এছাড়া এ বিষয়ে সমস্ত ব্যক্তিগত মতামত স্বকপোলকল্পিত হওয়াই স্বাভাবিক। তবে এ সম্পর্কে একটুখানি আলোচনা চলতে পারে।

আমার মনে হয়, পৃথিবীতে মানবসমাজকে ঢেলে সাজার স্বপ্ন যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী আদর্শ সৃষ্টি করেছেন এবং সেই আদর্শের মাপে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়তে চেয়েছেন, এগুলির মধ্যে অনেক আদর্শবাদ স্বয়ংসম্পূর্ণও বটে। কিন্তু জীবন এবং মানবপ্রকৃতি বহু আপাতবিরোধী শক্তিতে ভরা—এর স্বভাব বহু সময়ই বহু ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সেজন্য কোন আদর্শবাদ কণ্ঠ ও বাহুর শক্তিতে মানুষের সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ফল পরিণামে শুভ নয়। প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেবেই। নিবেদিতা যে শান্ত তেজে মহান্ বিপ্লব চেয়েছিলেন, সে পথই মানুষের সমাজে অধিক প্রযোজ্য মনে হয়। কারণ মানুষ হাজার হাজার বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে কয়েকটি প্রথা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, যেমন বিবাহ ও তার শুচিতা। প্রথার বিকৃতি আছে, কিন্তু মানুষের চিন্তা ও কর্মের শক্তি সে বিকৃতি জয় করেছে,—নূতন সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছে; এমনি ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে দিয়েই চলেছে সমাজের বিবর্তন। কিন্তু মানুষ যা গড়েছে তা অপূর্ব, সুবিরাট। সুশৃঙ্খল, সচেতন, ছেদহীন, চলমান বিবর্তনের কৌশল আজ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। মনুষ্যেতর প্রাণীর সে শক্তি নাই।

সুতরাং গভীরভাবে চিন্তা করলে মনে হয় বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার স্বপ্ন সফলতার দিকেই এগিয়ে চলেছে। স্বাধীন, মুক্ত, আত্মমর্যাদা ও স্বাবলম্বনের অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে নারীসমাজ আজ এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত। নারীর শক্তি আজ অধিক জাগ্রত, জীবন সম্বন্ধে আজ তাঁরা অধিক সচেতন; আজ তাঁরা

limitations of femininity'র শৃঙ্খল ভেঙ্গে এক সুন্দরতর সমাজ এবং মাধুর্যে ভরা পৃথিবী সৃজনের জন্যই এগিয়ে চলেছেন। পথনির্বাচনে হয়ত ভুল হচ্ছে, সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর পবিত্রতার আদর্শের সঙ্গে নবযুগের এই আদর্শের সমন্বয়সাধন করতে হবে—এ বিষয়ে এখনো হয়ত সজাগতা আসেনি। কিন্তু ভুলভ্রান্তি, অসংখ্য বাধা এবং আদর্শের সংঘাত, শুধু প্রাণধারণের ও দিনযাপনের গ্লানি, রাজনীতির বজ্র-বিদ্যুৎ-অঙ্কিত আকাশ সে যাত্রাকে রুদ্ধ করতে পারবে না। শিক্ষার আলোকদীপ্তা নারী নিজেই ক্রমে সব ভুলভ্রান্তি সংশোধন ক'রে, সব বাধা অপসারণ ক'রে মানবসংস্কৃতির ছেদহীন ধারাকে বজায় রেখেই চলবেন। অন্ততঃ এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নিবেদিতার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়নি, যদিও তার সফলতার পথ এখনও অনেক বাকী আর সে পথ কণ্টকসঙ্কুল ও বন্ধুর।

চিরায়ত

শ্রীশিবশম্ভু সরকার

শুধু এ' জীবনে ?
—জন্ম জন্মান্তরে—
শুধু এ' ধরাতে ?
—গ্রহে গ্রহান্তরে—
তোমারে খুঁজেছি আমি
আনন্দে বেদনে
স্বপ্নে জাগরণে
দুখে সুখে
উদাসে উৎসুকে
ভুবনে ভুবনে ফিরি অশ্রান্ত চরণে
আলোকে আঁধারে পথে সাগরে কাননে।
দেখা নাহি পাই
শুধু তাই
জীবনের অন্ত হোতে নূতন জীবনে—
অবিরাম খোঁজা মোর মুখর ক্রন্দনে।

আজি শুভক্ষণে
অপাঙ্গ ঈক্ষণে
কে যেন কহিল কথা মর্মর-ভাষণে
আমি হিয়াটুকু চাই—প্রসন্ন মিলনে—
যার নাহি পাই
তুমি তাই
অহমের বেড়াখানি টানো একধারে
আমার আলোক যাবে—তোমার মাঝারে।
প্রাণ পেতে শুনি
তার পদধ্বনি
ঈষৎ ইসারা ভরা আশার সরণি—
কূল কি অকূল পটে আনিবে তরণী!
জীবনের শেষ কথা ওই
অহমেতে রক্ত ফোটে কই
চোখে তবে অস্ত যাবে অন্ধকার রাত
পীতমের মধু কণ্ঠে ফুটিবে প্রভাত।

আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার*

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

[অনুবাদক—ব্রহ্মচারী জ্ঞানচৈতন্য]

আজ সন্ধ্যায় আপনাদের কাছে আমার আলোচ্য বিষয় উপনিষৎ ও গীতা প্রভৃতি ভারতের আধ্যাত্মিক সাহিত্য; অবশ্য আজকের বক্তৃতা উহার প্রথম পর্যায় এবং সত্যি বলতে কি 'আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার'ই এই কেন্দ্রের মূল জীবনীশক্তি। এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হ'ল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানবজাতির উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক সম্পদের একত্রীকরণ। মানবজাতির ঐ সম্পদের একটি অংশ ভারতের চিরন্তন সম্পদ এবং তা হচ্ছে পুরোপুরিই আধ্যাত্মিকতা। এই দেশের অমর শাস্ত্রে যে-সব দর্শন মূর্ত হয়ে রয়েছে, বিশেষতঃ উপনিষৎ এবং গীতাতে, তা বাস্তবিকই শাশ্বত ও সনাতন। ঐগুলি হচ্ছে প্রাচীন ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা, সাধু ও মনীষীদের দর্শন—আর ঐগুলি মানবজাতির এক সপ্তমাংশ লোকের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। ঋষিদের ঐ দর্শনের ধারা যুগযুগ ধরে এমনকি আমাদের এই বর্তমানকাল পর্যন্ত বয়ে চলেছে আর ইহাই হচ্ছে সনাতন বস্তু। পৃথিবীর অন্যান্য বস্তু সব আসবে ও যাবে, কিন্তু উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের ঐ অনুভূতি অনন্তকাল ধরে থাকবে।

আমরা এই প্রসঙ্গ আলোচনা করবার সময় দেখব যে, ভারতের এই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল নরনারীর হৃদয়ের আদরের বস্তু। ভারতেতর দেশে ভ্রমণের সময় একটা জিনিস আমাকে খুব মুগ্ধ করেছে—তা হচ্ছে ভারতের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের প্রতি সকল দেশের মানবমনের একটা আবেগময় সাড়া। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয় উপেক্ষা ক'রেও ভারতের এই আধ্যাত্মিক বাণী সকল দেশের মানবহৃদয়কে স্পর্শ করেছে। এ হ'ল ভারতবর্ষের একটি রূপ —অন্য জাতির ন্যায় যার রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক প্রভৃতি পটভূমিকা রয়েছে, আবার অন্যদিকে রয়েছে অনন্ত পরিধি ও সীমাহীন ক্ষেত্র। ইহাই মানুষ ও প্রকৃতির চরম সত্তার সাক্ষিস্বরূপ হয়ে রয়েছে এবং এই আধ্যাত্মিক দান পৃথিবীর মানবজাতির গৌরব ও মহত্ত্বকে ফুটিয়ে তুলেছে। এই বর্তমান সঙ্কটময় পৃথিবীতে মানুষের সামগ্রিক ও স্বতন্ত্র সত্তার যোগসূত্র স্থাপন করতে এই অনুভূতিগুলিই সমর্থ।

স্বামী বিবেকানন্দের অমোঘ বাণীতে পাশ্চাত্যে যে বিস্ময়কর সাড়া জেগেছে—ইহা ইতিহাসের একটা স্বতন্ত্র বা খামখেয়ালী ঘটনামাত্র নহে। কয়েক শতাব্দী ধরে আমাদের বর্তমান পৃথিবী খুঁজছিল একটি সর্বজনীন বস্তু। আজ সমগ্র পৃথিবীতে এমন কি কম্যুনিস্ট-প্রধান দেশগুলিতে আমি দেখেছি যে, বহু লোক ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সুযোগ পেলেই তারা ঐসব বস্তু জানতে চায়। ভারতের বাণী কোন একটা ধর্মমতের, গোঁড়ামির বা সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে আবদ্ধ

---

* রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটুট অব কালচার-এ প্রদত্ত একটি ইংরেজী বক্তৃতার অনুবাদ।

নয়; উপরন্তু ইহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করে মানবের সামগ্রিক উন্নতি, অগ্রগতি এবং তাঁর চরম উৎকর্ষলাভের পন্থা। সত্যি বলতে কি, শুধু এই বস্তুটির জন্যই জগৎ অপেক্ষা করছে। চেকোস্লোভাকিয়ার লোকেরা আমাকে বলেছিল যে, ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তাঁদের বংশানুক্রমিক ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তাঁরা মুগ্ধ হয়েছে বেদান্তের ঐ সর্বজনীন আদর্শ দেখে। এই আদর্শ কোন সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়; ইহা কোন নির্দিষ্ট ধর্মমতের, সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিস্থিতির সহিত জড়িত নয়; উপরন্তু ইহা মানবীয়।...

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, জগৎ ভারতের এই চিন্তাধারার বিষয় খুব কমই জানে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষেরও খুব কম লোকই তাদের নিজেদের আধ্যাত্মিক সম্পদ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। আমরা আমাদের এই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারকে আমাদের নিজেদের জাতীয় গৌরব ব'লে সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে ফেলে রাখি না; উপরন্তু আমরা সকল মানবকে জানাই যে, এতে তাদেরও সমান অধিকার আছে, ভারতের মানুষ কয়েকটি বিষয় সহজে লাভ করেছে—সে মানুষের শ্রেষ্ঠ অনুভূতির চরম শিখরে উঠেছে, এবং তাদের সেই-সব দুর্লভ অভিজ্ঞতা দান ক'রে গেছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। আজকাল আমরা শুনি যে, মানুষ মাউণ্ট এভারেষ্ট এবং অন্যান্য উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করছে, কিন্তু ভারতবর্ষ উঠেছে অনুভূতির এবং মহত্ত্বের চরম শীর্ষে। ইহাই জগতের প্রতি তার শ্রেষ্ঠ অবদান। ইহার ভিতর কোন সীমাবদ্ধ বা সংকীর্ণ ভাব নাই, ইহা ঘোষণা করছে মানুষের মনের, চিন্তাধারার ও সামগ্রিক ভাবে কল্যাণলাভের দিগ্‌দর্শন।

মনুষ্যানুভূতির দাবী

ক্রমবিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে। এর ভিতর দিয়ে জীবনীশক্তি স্ফুট থেকে স্ফুটতর হয়েছে, আর মানুষের কাছে প্রকাশ করেছে সৌন্দর্য, শক্তি, সামর্থ্য এবং মহত্ত্বের উৎকর্ষ। ভারত ঐগুলি বহন ক'রে নিয়ে গেছে তাদের চরম অভিব্যক্তিতে। বহু যুগ পূর্বে ভারত জিজ্ঞাসা করেছে, "মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়?" এই জটিল প্রশ্ন ভারত সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করেছে। দেহ- ইন্দ্রিয় ও বিভিন্নক্ষমতা-সম্পন্ন হয়েও মানুষকে এগুতে হবে তার জন্মগত অনুভূতির শিখরে, আর উহা লাভ করতে হ'লে চাই জীবনের একমুখী চেষ্টা। তাই শিক্ষা ও ধর্ম এক এবং অভিন্ন। ভারত তার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রথম ভাগে কতিপয় ঋষি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তির দ্বারা এই মৌলিক সমস্যার সমাধান করেছে এবং ঐ সমস্যার অনুসন্ধিৎসার ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি উপনিষদের মতো অমর গ্রন্থ। এই সাহিত্য অমর, কারণ এর প্রসঙ্গ অমরত্ব ঘোষণা করেছে। উপনিষৎ ঘোষণা করেছে যে, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করাতেই রয়েছে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। আমরা বহু জিনিস অতিক্রম করেছি। আমরা আমাদের এই দেহমন-সমন্বিত মনুষ্য শরীরে পশুবৃত্তিটা কিয়ৎ পরিমাণে অতিক্রম করেছি কিন্তু ইহাই শেষ বা চরম লাভ নহে। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো উন্নত আধুনিক যন্ত্রশিল্প লাভ ক'রেও মানুষ তার সব কিছু চাহিদা মেটাতে পারেনি। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা লাভ ক'রেও মানুষ এখনও সেই আদিম পঙ্কে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাকে এখনও প্রচুর পরিমাণে পশুবৃত্তি ছাড়তে হবে। ক্রমবিবর্তনের পথে সে যথেষ্ট এগিয়েছে, কিন্তু লক্ষ্য এখনও তার

নাগাল থেকে অনেক দূরে। আরো অনেক পথ এগিয়ে গিয়ে নিজেকে অতিক্রম ক'রে মানুষকে লাভ করতে হবে সেই মহান সত্যকে।

উপনিষৎ মানুষের এই ক্রমবিকাশের ধারাকে এবং তার গভীরতম অনুভূতির দাবীকে স্বীকার করেছে এবং মানুষকে এগিয়ে দিয়েছে সেই অগ্রগতির পথে অর্থাৎ অনুভূতির শিখরে। উপনিষৎ দেখিয়ে দিয়েছে যে, মানুষের প্রকৃত সত্তা রয়েছে তার অমর দৈবী প্রকৃতির অনুভূতির মধ্যে। ইহাই হ'ল উপনিষদের বিষয়বস্তু এবং ইহা আমাদের সমস্ত সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে, আর ইহাই হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল উপাদান। বর্তমানকালে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখতে পাই মানুষের ভিতর দেবত্ব-বিকাশের চরম পরিণতি। উপনিষৎ থেকে ঐ ধারাটি প্রবাহিত হয়ে এসেছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আর এই ধারাটি হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে একটি আকর্ষণীয় বস্তু। শাশ্বত সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া কোন সংস্কৃতিই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সুদীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু যখন কোন সংস্কৃতির বনিয়াদ সুদৃঢ় গভীর অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহা জীবনের মৌলিক উপাদানগুলিকে স্পর্শ করে, কেবল তখনই উহা একত্ব এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে সমর্থ হয় এবং যুগ যুগ ধরে মানুষকে আলোকের পথে এগুতে প্রেরণা দেয়।

ভারতের ঐতিহাসিক পটভূমিতে আমরা দেখি যে, ভারত মানুষের জীবনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছে। অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, মানুষ সম্বন্ধে ভারতের চিন্তাধারা কেবল ধর্মীয় সাধকের মধ্যে সীমিত এবং তারা মাত্র কোন এক কাল্পনিক অতীন্দ্রিয় জগতের অন্বেষণ করে। কিন্তু উহা সত্য নহে। আমরা দেখি যে, জাতি হিসাবে ভারতবর্ষ ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত সর্বক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। ভারতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আনন্দময় জীবনের ক্ষেত্রে সে কোন বিষয়েই পিছিয়ে ছিল না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি চিন্তাধারা প্রাধান্য লাভ করেছে—যা মানুষ এবং জগতের আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর দিয়ে পৌঁছে দিয়েছে সেই চরম সিদ্ধান্তে—বহুত্বে একত্ব ও একত্বে বহুত্ব। সামাজিক ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভ ক'রে সেই উন্নতমনার দল এগিয়ে গেছেন এবং একটার পর একটা জিজ্ঞাসা করেছেন সেই মৌলিক প্রশ্নাবলীকে। এই সামাজিক মানুষ, এই দেহমনধারী জীব কি ক্রমবিকাশের শেষ স্তর? অথবা ইহা কি অন্য কোন উচ্চ পর্যায়ে রূপান্তরিত হ'তে পারে? অবশ্য এই জিজ্ঞাসা কয়েকটি মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালী বুদ্ধিমান ব্যক্তির উন্নত চিন্তাধারার পরিচায়ক। কেবল কয়েকটি প্রতিভাশালী ব্যক্তিই এই রহস্যপূর্ণ মৌলিক সত্যজিজ্ঞাসা বেছে নেয়; আর ইহারা সমাজের যে-কোন স্তর থেকে হ'তে পারে। উপনিষদের পৃষ্ঠা ওল্টাবার সময় আমরা দেখব যে, এই চিন্তানায়কদের মধ্যে আছে পুরুষ, স্ত্রী, শিশু, বুদ্ধিমান, রাজা ও সাধারণ লোক। আমাদের সবচেয়ে বেশী বিস্ময় ঘটায় সেই একটিমাত্র বস্তু—সেই চিন্তানায়কদের নিরবিচ্ছিন্ন ধৈর্যপূর্ণ জিজ্ঞাসা: মুক্তি কি? মানুষের সর্বোচ্চ অস্তিত্ব কোথায়? স্বচ্ছমন- ও পবিত্র-জীবনসম্পন্ন ঐ চিন্তানায়কেরা আত্মসংযম ও একাগ্রতার ভেতর দিয়ে পেয়েছিলেন সেই রহস্যপূর্ণ দুরূহ প্রশ্নের উত্তর; আর তা সুন্দর বাচনবিন্যাস, আকর্ষণীয় কথোপকথন ও

ছন্দোবদ্ধ অসম্পূর্ণ কবিতার ভিতর দিয়ে দান ক'রে গেছেন পরবর্তীকালের বংশধরদের জন্য। এইভাবেই ঐ সাহিত্য হয়ে রয়েছে অমর।

মানুষের প্রকৃত স্বরূপ

মনীষী রোমাঁ রোলাঁ তাঁর 'রামকৃষ্ণের জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন, "যে মানুষটির মূর্তিকে আমি এখানে কল্পনায় রূপ দিতে চাই, ত্রিশকোটি নরনারীর দুইসহস্রবৎসরব্যাপী আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ রূপ তিনি।" সেই রামকৃষ্ণ আমাদের কালে আবির্ভূত হয়েছেন (১৮৩৬-৮৬ খৃঃ) এবং তাঁর মহান আবির্ভাবের একমাত্র কারণ ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ধারাকে অব্যাহত রাখা। এ হ'ল সেই বিরামবিহীন স্রোতস্বিনী—যার ফল্গুধারা যুগ যুগ ধরে বয়ে চলেছে। সম্ভবতঃ আমাদের ভেতর অনেকেই ইহা জানে না এবং অনেকে হয়তো ঐ মহান ধারার সুযোগ-গ্রহণে সমর্থ নন, আবার কারো কারো কাছে তা খুব উচ্চে। কিন্তু যে-কেউ তা শুনেছে বা দেখেছে সেই বিস্ময়ে ও প্রশংসায় ভরপুর হয়ে গেছে। এ বিষয়ে ভগবদ্গীতাতে একটি সুন্দর শ্লোক আছে:

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ্
বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং
বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥

অর্থাৎ কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্যতুল্য দেখেন, অন্য কেহ ইহাকে আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করেন, অপর কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্যরূপে শ্রবণ করেন; খুব কম লোকে মানুষের সেই শাশ্বত মহিমাকে জানতে পারে।

তাহলে মানুষের শাশ্বত গৌরব কোথায়? এ হ'ল তার সেই জন্মগত দৈবী প্রকৃতি, যা জন্মমৃত্যুহীন, শুদ্ধ ও পবিত্র। সে শরীর- ও ইন্দ্রিয়ধারী জীব নয়—ঐগুলি হ'ল এই ক্ষণিক জগতের কর্মের ও প্রকাশের যন্ত্রমাত্র। সে হ'ল সেই অসীম অদ্বিতীয় বস্তু, যিনি আবার নিজেকে এই সসীম দেহমনবিশিষ্ট আকৃতিতে ব্যক্ত করছেন। ইহাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। ইহা কোন দার্শনিক মতবাদ নহে, কিন্তু পরীক্ষিত সত্য। সকল সংবেদনশীল মনই এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে। উপনিষৎ যখন প্রস্তুত হয় তখন উহা মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে, সহস্র বৎসর পরেও এবং এমনকি আজকালও উহা সমভাবে মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে। বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের এই জাগতিক উন্নতি এবং বর্তমানকালের এই ঐশ্বর্য- ও ক্ষমতাশালিনী পৃথিবী উপনিষদের ঐ যথাযথ সিদ্ধান্তপূর্ণ চিন্তাধারার গতিরোধ করতে পারেনি—উপরন্তু উহার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। আজকের জগৎ চাইছে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি; এবং ইহাই একমাত্র মানুষের মনের গতিহীনতা ভাঙতে সমর্থ, ধনাদির মোহে মানবমন তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে—'প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্' (কঠ, ১।২।৬)। ক্রমবর্ধমান গতিহীনতা মানেই মৃত্যু। সুতরাং সমগ্র মানবজাতির প্রতি উপনিষৎ তার মহান আশার বাণী সুন্দরভাবে ঘোষণা করছে: মানুষের ধন, ক্ষমতা এবং সব কিছুই থাকবে, কিন্তু উহার কোনটাতেই সে নিজেকে আবদ্ধ করবে না। ঐগুলি উপায়মাত্র, লক্ষ্য নয়; চরম অভিজ্ঞতার দ্বারা সে ঐসব ভেঙ্গে চুরমার ক'রে সচ্চিদানন্দস্বরূপ তার যে অন্তর্নিহিত দেবত্ব অর্থাৎ আত্মাকে অনুভব করবে। এইভাবে উপনিষৎ আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে সৃজনক্ষম পূর্ণতর জীবন।

এই 'সৃজনক্ষম জীবন' কথাটি বেশ সুন্দর এবং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেবল একটি

জিনিসকে বারবার প্রকাশ করাতেই সৃজনকারিতা প্রকাশ পায় না। শরীর, ইন্দ্রিয়বর্গ এবং স্নায়ুব্যবস্থার প্রতিনিয়ত সঞ্চালন ও ক্ষণিকের ভোগোন্মত্ত মাদকতা ঐ সৃজনক্ষম জীবন তৈরি করতে পারে না। আজই হউক আর কালই হউক, শরীর-মনের এই দাসত্বের নিগড় আমাদের ভাঙতেই হবে। তখনই আমরা ঠিক ঠিক ঐ সৃজনকারিতায় পৌছুব এবং উহাই উপনিষদের অভিপ্রেত। সেজন্যই আধুনিক নরনারীর কাছে উপনিষৎ অনুপ্রেরণা যোগায়। এইরূপ আধুনিকদের দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: প্রথমতঃ আধুনিক সুখ-সুবিধা ভোগকারীরাই আধুনিক এবং উহাই আধুনিক কথার সাধারণ অর্থ। কিন্তু ঐ কথার পিছনে রয়েছে একটা নিগূঢ় অর্থ, আর তা হচ্ছে -আধুনিক লোক সেই-ই যে বিজ্ঞানালোকে পুষ্ট, মনঃসংযমী, সত্যান্বেষী এবং মহান যীশুর মতো জিজ্ঞাসা করবার যার ক্ষমতা আছে—'খোঁজ, জিজ্ঞাসা কর এবং ধাক্কা দাও।' সেই অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিই আধুনিক --যার রয়েছে সত্যের জন্য তীব্র লালসা এবং বিচারশক্তি, যে কোন বস্তু পাওয়ামাত্রই গ্রহণ করে না কিন্তু সে চেষ্টা করে তার ঈপ্সিত বস্তুকে হৃদয়ের সঙ্গে এক ক'রে নিতে। তার হৃদয় ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করে—'এর পর কি? এর পর কি?' এইরূপ আধুনিক মনই উপনিষদের আলোকের নিকটবর্তী। এই উপনিষদে রয়েছে একটা জাগ্রত পরিবেশ, ক্রমাগত জিজ্ঞাসা, সত্যানুসন্ধিৎসা, এগিয়ে যাবার একটা তাগিদ এবং কোন জিনিসকে ভাবালুতার সঙ্গে গ্রহণ করা নয়। একমাত্র এই উপনিষদের সঙ্গেই রয়েছে আধুনিক ভাবের একটি সুন্দর যোগসূত্র।

সুতরাং আজকাল আমরা দেখি যে, সত্যান্বেষী, জীবনের মান-উন্নয়নকারী বিজ্ঞান-জগতের দিক্‌পালরা যখন উপনিষদের সংস্পর্শে আসেন, তখন তাঁরা এতে মুগ্ধ হয়ে অনুরক্ত হন। স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষৎ সম্বন্ধে বলেছেন, "...যদি ইংরেজী ভাষায় এমন কোন শব্দ থাকে, যদ্দ্বারা মানবজাতির উপর ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহা এই 'fascination' (আকর্ষণী শক্তি)। এই আকর্ষণীশক্তির একমাত্র কারণ—উহা মানুষকে একটা অতি উঁচু, পবিত্র এবং মহান স্তরে টেনে নিয়ে যায়। উপনিষদের তূর্য-নিনাদ মানুষকে টেনে নিয়ে যায় অগ্রগতির পথে। তাই আমরা কঠোপনিষদে দেখি, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' অর্থাৎ উঠ! জাগ! এবং শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের কাছে গিয়ে তত্ত্ব অবগত হও।"

আত্মশক্তির গতিশীলতা

গতিহীন বর্তমান মানবের অগ্রগতির পথে এগুতে প্রয়োজন এই শঙ্খনিনাদ। পৃথিবীর ইতিহাসে থেমে যাওয়ার কাহিনী যেন চিরাচরিত। সভ্যতা মাঝে মাঝে সসীম পঙ্কে আবদ্ধ হয় এবং থেমে যায়; ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই বদ্ধাবস্থা থেকে ছাড়া পাবার একটিমাত্র পথ আছে। কোন রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষকে এই চরম দুরবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারে না; এইগুলি সাময়িক উপশম হ'তে পারে; কিন্তু উহা কোন কৃষ্টি বা সভ্যতাকে বদ্ধাবস্থা থেকে তুলতে অথবা গতিশীল রূপ দিতে পারে না। উহা আধ্যাত্মিক রোগবিশেষ, সুতরাং উহার নিরাময়ত্বও রয়েছে ঐ আধ্যাত্মিকতার মধ্যে। উহা নিবারণ করতে একটিমাত্র পথই আছে এবং তা হচ্ছে ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন করা।

ইহাই ভারত বারবার করেছে। এই গতি-হীন জগৎকে গতিশীল করতে গেলে চাই শক্তির অভ্যুদয়—ভারতের ইতিহাস ইহা বহুবার সাক্ষ্য দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে' অর্থাৎ ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। যখন জীবন গতিহীন হয় এবং একটা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে তখন ভগবান, যিনি মানুষ ও প্রকৃতির অন্তরাত্মা, আবির্ভূত হন এবং সমাজকে নূতনভাবে শক্তি-শালী ও প্রাণবন্ত ক'রে তোলেন।

জগৎকে গতিশীল রূপ দিতে আত্মশক্তির প্রভাবের অপর একটি উদাহরণ দেখতে পাই আমরা বুদ্ধদেবের জীবনে (৫৬৩– ৪৮৩ খৃঃ পূঃ)। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রায় এক হাজার বছর পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। নির্বাণ লাভ করার পর সারনাথে তাঁর প্রথম অনুশাসন ছিল এই ধর্মচক্রকে গতিময় করা। ঐ অনুশাসনের নাম-করণও গুরুত্বপূর্ণ—'ধর্মচক্রপ্রবর্তনসূত্র' অর্থাৎ ধর্মচক্রকে গতিশীল করা। সেখানে ধর্মকে চক্রের সহিত এবং সমষ্টি- ও ব্যষ্টিগত মনুষ্য-জীবনকে চক্রসমন্বিত গোযানের সহিত তুলনা করা হয়েছে। যদি চাকা পঙ্কিল পঙ্কে আবদ্ধ হয় তবে তা ওঠাতে হারকিউলিসের মতো শক্ত কাঁধের দরকার হয়। কোন সমাজ বা ব্যক্তি দেহ-ইন্দ্রিয়ের ক্ষণিক সুখে মজে থাকতে পারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, রোমের সমাজ ঠিক এই কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং উহা আমাদের ইতিহাসেও দেখা যায়। ইন্দ্রিয়সুখে মশগুল হয়ে এবং জীবনের উচ্চাদর্শ হারিয়ে ফেলে সমাজ অতলে তলিয়ে যায়। সারনাথে বুদ্ধদেব তাই বলেছিলেন, "এস, আমরা সকলে এই চাকায় কাঁধ লাগিয়ে ইহাকে গতিময় ক'রে তুলি।" চক্রের অর্থই গতি; তাই বুদ্ধদেব বললেন, "এই ধর্মচক্রকে ঘোরাবার জন্যই আমি এসেছি।" শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "এই ধর্মশক্তিকে সঞ্চালিত করতে আমি এসেছি।" সত্যি বলতে কি, ভারতের ইতিহাসে ইহাই বারবার ঘটেছে। আর আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ কি করলেন? আপাতদৃষ্টিতে তিনি কিছুই করেননি; সেই-কালের তুমুল রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের বাইরে থেকে তিনি একটা অনাড়ম্বর শান্তিপূর্ণ জীবন কাটালেন। কিন্তু তাঁর ভিতর থেকে যে প্রচণ্ড শক্তি বেরিয়েছিল, তা সে সময়কার বহু মানুষকে এবং আন্দোলন-গুলিকে অনুপ্রাণিত করেছিল, অধিকন্তু কিছু-কালের মধ্যেই তা এই বর্তমান পৃথিবীর ওপর একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভিতরে ও বাইরে ছিলেন তিনি আধ্যাত্মিকতার মূর্ত বিগ্রহ এবং মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের বাস্তব রূপ তিনি দেখিয়ে গেছেন। তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখিয়েছেন— ধর্মের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা, সকল ধর্মের একত্ব আর ধর্মের নামে ঝগড়া ও যুদ্ধের প্রয়োজনহীনতা। ঝগড়া বিবাদ ধর্মকে বিকৃত ক'রে তোলে। কিন্তু ধর্ম তো ছলচাতুরী নয়, ধর্ম মানুষকে দেখিয়ে দেয় তার জীবনের প্রকৃত পথ, প্রকৃত মুক্তির আস্বাদ।

দেহগত ও সমাজগত মানুষ কখনই মুক্ত হ'তে পারে না; সে বাইরের ও ভিতরের বস্তু-নিচয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ। একমাত্র আধ্যাত্মিক ভূমিতেই রয়েছে প্রকৃত স্বাধীনতা ও একত্ব এবং সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ; আর ঐ অমরত্ব ও দেবত্ব আমরা এই মনুষ্য-জীবনেই লাভ করব। এই-ই হচ্ছে প্রকৃত অগ্রগতি এবং উন্নতি— আর এই-ই ধর্ম। এই আদর্শ নিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন এবং তিনি এতে এমন প্রচণ্ড শক্তি দান করেছিলেন যে, পরবর্তীকালে যখন কোন লোক তাঁর কাছ

থেকে ঐ আদর্শ গ্রহণ ক'রত তখন সঙ্গে সঙ্গে সে ঐ শক্তিরও অধিকারী হয়ে যেত। ঐ আদর্শের সত্যতা সম্বন্ধে সে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ ক'রত, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ নিজজীবনে সেই সত্যকে রূপদান করেছিলেন।

এইভাবে গতিহীন সমাজ গতিশীল হয় এবং আবার চলতে শুরু করে। সুস্থ শরীরে যেমন রক্ত সঞ্চালিত হয় সেইরূপ সমগ্র রাষ্ট্রজীবনে এই আধ্যাত্মিকতার স্রোত বওয়ানো উচিত। মহামানব আসেন তাঁর অপরিমিত শক্তি নিয়ে। আমরা আবার চলতে শুরু করেছি এবং ঐ জড়তা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। মানুষ আবার তার জীবনের প্রকৃত বস্তু খুঁজতে শুরু করেছে। মহাপুরুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আসেন তাঁর শক্তিশালী সাঙ্গোপাঙ্গের দল—যাঁদের থাকে গভীর জিজ্ঞাসা এবং তার সমাধানের একটা তাগিদ। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ কি? মানুষ কি ক'রে তা জানতে পারে? তার জীবনের লক্ষ্য কি এবং কিভাবে সে তা লাভ করতে পারে? আধ্যাত্মিকতা কি কয়েকটি মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবান ব্যক্তির অধিকার, না উহাতে প্রত্যেকের অধিকার আছে?

উপনিষৎ তাই দর্পভরে ঘোষণা করছে যে, এই আধ্যাত্মিকতায় রয়েছে সকলের অধিকার। এই পবিত্র অমর আত্মা প্রত্যেক নরনারী-শিশুর অন্তরাত্মা। ইহাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ এবং ইহা প্রত্যেক প্রাণীরও প্রকৃত স্বরূপ, কিন্তু তারা একথা অনুভব করতে পারে না। কেবল এই দেহমন-সমন্বিত মানুষ বহু বিবর্তনের পরে এই সত্যকে লাভ করবার ক্ষমতা লাভ করে। এই পথের পথিক একমাত্র মানুষই হতে পারে। মানুষের বিচারশক্তি প্রভৃতি কতকগুলি সুবিধা আছে এবং যখন সে সেগুলি অভ্যাস করতে থাকে তখন সে আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে সমর্থ হয়। উপনিষৎ শিক্ষা দেয় যে, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরব নয়। ভোগসুখের প্রতি ধাবমান মানবকে উপনিষৎ ঘৃণা করেনি; শুধু বলেছে, 'এর চেয়েও সুন্দর ও মহত্তর বস্তু রয়েছে।' উপনিষৎ সব সময় আমাদের জোর ক'রে ঠেলে দিয়েছে আমাদের ভিতরের সেই বস্তুর অনুভবের পথে। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এক কাঠুরিয়া সম্বন্ধে একটি ছোট সুন্দর গল্প বলেছেন। এক কাঠুরিয়া বনে কাঠ কাটতে গিয়েছিল এবং এক সাধু তাকে বললেন, 'এগিয়ে যাও।' তাঁর উপদেশ শুনে কাঠুরিয়া চন্দনকাঠের বন পেল, তারপর রূপার খনি, তারপর সোনার খনি এবং আরও গভীর জঙ্গলে গিয়ে সে হীরের খনি পেল এবং এক মস্ত বড় ধনী হয়ে গেল। এই গল্প শেষ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তাই বলছি যে, তুমি জীবনের যে-কোন স্তরেই থাক না কেন তুমি সেই সুন্দর ও পবিত্র বস্তু লাভ করতে পারবে যদি তুমি আরও এগিয়ে যাও।' (ক্রমশঃ)

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া

শ্রীমতী ইন্দুবালা মিত্র

এই পুণ্যভূমি ভারতভূমি চির মহান চির পবিত্র। যুগযুগান্তর হ'তে এই ভূমি বহু অবতার মহামানব দেবমানবের জন্মভূমি—লীলাস্থান।

আমাদের আবাসভূমি এই বঙ্গমাতাও রত্ন-প্রসবিনী—রত্নগর্ভা জননী, বহু মহামানব ও মহীয়সী নারীর জন্মদাত্রী।

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে শ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, নিমাই অবতীর্ণ হন।

নিমাই পণ্ডিত যখন লেখাপড়া শেষ ক'রে অধ্যাপকরূপে পরিচিত হয়েছিলেন, সেই সময়ে তিনি পূর্ববঙ্গে যান দেশভ্রমণে। সে সময় যান-বাহনের বহু অসুবিধা সত্ত্বেও অধ্যাপক-পণ্ডিতেরা দূর দূর দেশে গমন করতেন, গৃহে প্রত্যাবর্তন করা বহু বিলম্বের ব্যাপার হ'ত। বোধ হয় তিন-চার মাস পরে গৃহে ফিরে নিমাই জানতে পারলেন তাঁর পত্নী লক্ষ্মীদেবী সর্পাঘাতে দেহত্যাগ করেছেন। মাতাকে যদিও তিনি সংসারের অনিত্যতা প্রভৃতি তত্ত্বকথায় প্রবোধ দিয়ে তাঁর শোক-নিবারণের চেষ্টা করলেন, তথাপি অন্তরে তিনি প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করেছিলেন। সেই হ'তে তাঁর অন্তরে বৈরাগ্যের ভাব প্রবেশ করল। যদিও মহামানবদের সর্ব-কার্যেই কিছু না কিছু উপলক্ষ দেখতে পাওয়া যায়, এটিও হয়ত তেমনিই। এ ঘটনার পরেই তিনি পিতৃকার্যে গয়াধামে গমন করেন এবং 'ঈশ্বরপুরী'র নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। গয়া হ'তে একেবারে অন্যরূপে দেশে ফিরে আসেন সম্পূর্ণ প্রেমোন্মাদ হয়ে। কোন দিকে দৃষ্টি নাই—শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি মুখে।

সংসারে উদাসীন ঈশ্বরগতপ্রাণ পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে শচীদেবী অপরূপ সুন্দরী বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়াকে পুত্রবধূ ক'রে ঘরে আনেন। ১০ বৎসর বয়সে বিবাহকালে বিষ্ণুপ্রিয়া শুনেছিলেন যে, তিনি অশেষ ভাগ্যবতী। নবদ্বীপের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত অধ্যাপক তাঁর স্বামী। সবই সত্য! কিন্তু তখন হ'তেই নিমায়ের জীবনে ও চরিত্রে অন্য ভাবের আবির্ভাব—কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ। ভাবসমাধিতে একেবারে বাহ্যচৈতন্যলোপ! যে কয়দিন তাঁকে শয়নমন্দিরে দর্শন করেছেন তিনি তাতেই নিজেকে ধন্য, সার্থকজীবন জ্ঞান করেছেন প্রভুপদ স্পর্শ ক'রে। বহু যত্নে ও মায়ের বিশেষ অনুরোধে নিশার দ্বিতীয় তৃতীয় যামে গৃহপ্রবেশ। নচেৎ নৃত্য কীর্তন সমাধি সকলই বাহির মহলে—এই বালিকার চক্ষের অন্তরালে। এক পুরাতন ভৃত্য এই অভাগিনী বালিকার মনোভাব অনুমান ক'রে সদর অন্দর দুই স্থানের মধ্যবর্তী এক নিভৃত স্থানে একটু ছিদ্র ক'রে বালিকার পতিদর্শনতৃষ্ণা-নিবারণের উপায় ক'রে দেন সকলের অগোচরে। এটুকুকেই তিনি অনেক মনে করেছেন। কোন দিন কোন অনুযোগ অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে করেন নাই। এদিকে তিনি দেবী জানকীর সগোত্রীয়া। এ ভাগ্যও প্রত্যহ তাঁর হ'ত না। প্রভু যেদিন অন্যত্র যেতেন সেদিন দারুণ হতাশা নিয়ে জাগরণ ও অর্ধজাগরণে রজনীর অবসান হয়ে যেতো। পরদিন প্রভাতেরও পরে প্রভু গঙ্গাস্নানান্তে গৃহে আসতেন। স্বামিসেবার জন্য অতি যত্নে শয্যা এবং অন্য বহুবিধ আয়োজন

অনর্থক, ব্যর্থ হয়ে যেতো। চৈতন্য প্রভুর ধরা-বাস ৪৮ বৎসর দুইভাগে বিভক্ত—২৪ বৎসর গৃহবাস, ২৪ বৎসর সন্ন্যাস। বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনে বিবাহের পরেই স্বামীর প্রেমোন্মাদ-অবস্থা আরম্ভ হয়, যে চার বৎসর গৃহে ছিলেন ঐ ভাবেই দিনযাপন করেছেন। স্বামীর ও তাঁর সঙ্গী ভক্তদের সেবা-পরিচর্যার সব আয়োজন অন্তরাল হ'তে করেছেন। আহারেরও যাবতীয় আয়োজন ক'রে শচীদেবীকে সাহায্য করেছেন অনলসভাবে প্রতিদিন। কোনদিন যদি স্বামীর সামান্য দুটি বাক্য বা একটু স্নেহ-দৃষ্টি লাভ করেছেন, সেদিন নিজেকে ধন্য সার্থক মনে করেছেন, দেবচরণে বহু প্রণতি জানিয়েছেন। আবার সকলের মুখে স্বামীর মহিমা ও নানারূপ প্রশংসা শুনে তাঁর অভিমান বাড়ে নাই, আরও দীনভাব ও সঙ্কোচ এসে তাঁকে অধিক নম্র করেছে নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করিয়ে। শচীদেবী বিলাপ করতেন, পুত্রের এরূপ উদাসীনতায় বধূকে নানাভাবে উপদেশ দিতেন, পুত্রকে গৃহবাসী করাবার জন্য নানা কথা বলতেন। তখন নানা অমঙ্গল-আশঙ্কায় বালিকা চিন্তায় ও ভয়ে অর্ধমৃতবৎ হয়ে যেতেন, কারণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ইনি গৃহত্যাগী হবেন, এইরূপ আভাস-ইঙ্গিত প্রায়ই পাওয়া যেত সকলের আলোচনা হ'তে। অথচ স্পষ্টরূপে কিছু বোঝা যেত না। বালিকাবধূ কারও কাছে নিজ মনোবেদনা প্রকাশ করতে না পেয়ে অজানিত অমঙ্গল-আশঙ্কায় জর্জরিত কণ্টকিত হয়ে দিন যাপন করতেন। আশ্চর্য এই যে, সকলেই করুণাকটাক্ষ অথবা 'আহা' বলা ভিন্ন কোন কিছু পরিষ্কারভাবে তাঁকে বুঝিয়ে বলতেন না।

জীবনে তাঁর স্বামিসম্ভাষণভাগ্য কয়দিন হয়েছে তাও চিন্তাসাপেক্ষ। কথনো সেই ভাগ্য হ'লে, প্রভু কিছু স্বাভাবিকভাবে শয়ন-মন্দিরে এলে বালিকা চরিতার্থ হতেন এবং অতি দীন বিনীত ভাবে জানাতেন, প্রভু যেন যেভাবে আছেন সেভাবেই গৃহে থাকেন, গৃহ-ত্যাগ না করেন। বৃদ্ধা শোকাকুলা মাতা প্রাণত্যাগ করবেন—তাঁর অদর্শনে, অতএব এত বড় নির্দয় আচরণ প্রভু যেন না করেন। তিনি করুণাময়। আর দাসী বিষ্ণুপ্রিয়া কখনও তাঁর পথে কণ্টক হবেন না, তিনি যা আজ্ঞা করবেন তা-ই করবেন। যদি তিনি চান, তবে দাসী বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর সম্মুখেও আসবেন না। শুধু তিনি গৃহে থাকুন—এই প্রার্থনা।

এরূপ মহৎ চরিত, এ আত্মবিলুপ্তি এত সামান্য বয়সের বালিকার অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। শত শত সাধ্বী পতিব্রতা ও মহীয়সী রমণীর জন্মদাত্রী এই পুণ্যতীর্থ ভারত জন্ম-ভূমিতেও তাহা বিরল। অবশ্য একথাও নিশ্চিত যে, অবতারপুরুষের ধর্মপত্নী কখনই সাধারণ মানবী নন। কিন্তু এত সামান্য বয়সেও এই দুর্লভ মহিমা কিরূপে সম্ভব? মনে হয় এও অলৌকিক। এ অভাগিনী বালিকার জীবন-কথা ভাবলে একদিকে দুঃখ ক্ষোভ ও বেদনায় সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন হয়, নয়ন অশ্রুভারে পূর্ণ হয়ে উঠে, অন্যদিকে এই মহৎ ত্যাগ ও অপার্থিব প্রেম স্মরণ ক'রে শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও ভক্তিতে মস্তক নত হয় আপনা হ'তেই। দীর্ঘ ৮৭ বৎসরের জীবনে কিভাবে তিনি দিনযাপন করেছিলেন, তার সঠিক বিবরণ সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনাই হয়নি। সমস্ত প্রামাণ্য গ্রন্থাদিতে শচীমাতার গুণগ্রামবর্ণন এবং তাঁরই দুঃখবেদনা নিয়ে বহু আলোচনা হা-হুতাশ বরাবরই আছে, কেবল এই মহীয়সী নারীর দুঃখ, বেদনা প্রভৃতির কথা কারো তেমন জাগেনি। কিছু না পেয়েও তিনি ধন্যা, প্রণম্যা,

এটুকুকেই বহু ব'লে মনে করেছেন। অনেকের মনোভাব অনেকটা এমনি, 'এই বালিকা শুধু করুণার পাত্রী।' 'আহা'!—ঐ টুকুর অধিক যেন তাঁর প্রাপ্য নাই! এই ভাবের প্রকাশই অধিকাংশ স্থলে দেখতে পাওয়া যায়। তবে বিষ্ণুপ্রিয়া বুঝতেন যে, কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ হলেও, স্বামী তাঁর প্রতি স্নেহহীন নহেন।

তবুও প্রভুর গৃহত্যাগ এবং সন্ন্যাস-সঙ্কল্প ক্রমে স্থির সিদ্ধান্তে পরিণত হ'ল, ভক্ত ও পার্ষদদের মধ্যে মাত্র পাঁচজন জানলেন, বহু আলোচনা বিচার বিতর্ক অনেকদিন ধরে চলল এবং এ সংবাদে যে শচীদেবীর প্রাণান্ত হবে, এই আশঙ্কাই সকলের অন্তরে উদিত হ'ল। প্রভুকে তা জানানও হ'ল। কেবল সেই অভাগিনী সরলা বালিকার কি অবস্থা হবে, সে কথা কারও স্মরণেও আসেনি কি? অথবা এসেছিল, অনর্থক বোধে কেহ প্রকাশ করেননি? নচেৎ বালিকাকে হয়ত পাষাণ-প্রতিমা মনে করেছিলেন—যার অন্তরে কোন মানসিক বোধই নাই? অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট এ ঘটনার আভাসমাত্রও প্রকাশ করা হবে না পূর্বে। প্রভুর গৃহত্যাগের পর অপর সাধারণ সকলের ন্যায় বিষ্ণুপ্রিয়াও জানতে পারবেন। পূর্বে জানবার অধিকার তাঁর নাই? কি মর্মান্তিক পরিতাপ! দেবী জানকীর জীবন চিরদুঃখময় ব'লে পরিচিত। কিন্তু প্রথম জীবনে তিনি বহুদিন স্বামিসঙ্গ লাভ করেছেন বিবাহের পরে। এমনকি বনবাসকালেও দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর তিনি রামের সহিত একত্র বাস করেছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া মাত্র ৪ বৎসর কাল তাঁর বিবাহের পর স্বামীর দর্শন পেয়েছিলেন—কখনও দূর হ'তে, কখনও বা নিকটে। আর পতিপদ-স্পর্শের ভাগ্যও তাঁর দৈবাৎ ঘটেছে। এ দিক হ'তে বিষ্ণুপ্রিয়া একাকিনী, অনন্যা, অদ্বিতীয়া।

সন্ন্যাসগ্রহণের ও গৃহত্যাগের স্থির সিদ্ধান্তই শুধু নয়, তার তিথি নক্ষত্র ও তারিখ সব কিছু স্থির ক'রে একদিন নিশীথে জননীর অগোচরে গৃহত্যাগ করবেন নিমাই। শোনা-মাত্রই শচীদেবী মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন ভক্ত পার্ষদদের আশঙ্কাকে সত্য ক'রে। পরম মাতৃভক্ত নিমাই অতি যত্নে জননীর চৈতন্য সম্পাদন ক'রে নানাভাবে তাঁকে প্রবোধ দিয়ে শান্ত করলেন তখনকার মতো। আর কেহ যেন একথা না জানে, সে বিষয়ে মাতাকে সতর্ক ক'রে দিলেন। এই "আর কেউ" যে বিষ্ণুপ্রিয়া, একথা শচী তখনই বুঝেছিলেন। তিনি কিন্তু প্রবোধ মানলেন না; বার বার এই নির্দয় সঙ্কল্প ত্যাগ ক'রে যেভাবে আছেন, সেভাবেই থাকতে বললেন। পুত্রের অদর্শনে, তিনি প্রাণত্যাগ করবেন। আর ঐ অভাগিনী বধূর কি হবে? সে যে উন্মাদিনী হবে এ অসহনীয় দুঃখে!

উত্তরে পুত্রও বার বার মাতাকে বোঝালেন যে, গৃহে বদ্ধ হয়ে থাকলে তাঁর শরীর থাকবে না। সে শোক জননী কিরূপে সহ্য করবেন? মাতা সম্মতি না দিলে তিনি গৃহত্যাগ করতে পারবেন না। তাঁর যা কিছু সবই জননীর, তাঁর ঈশ্বর-ভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম, সকলই জননীর দান, এবার পুত্রকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দান—সন্ন্যাসের অনুমতি দিন। মাতা যখনি স্মরণ করবেন, পুত্র সেই ক্ষণেই উপস্থিত হবেন। মধ্যে মধ্যে এসে তাঁকে দর্শন ক'রে যাবেন এইরূপ নানাবিধ প্রবোধ ও তত্ত্বজ্ঞান দিলে তবে অতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও শচীদেবী অনুমতি দিলেন পুত্রের সন্ন্যাস-গ্রহণের। বধূর কথা চিন্তা ক'রে আকুল ক্রন্দনে অধীরা হতেন শচীদেবী বধূর অসাক্ষাতে। এই সময় নিমাই কতকটা প্রকৃতিস্থ অবস্থায় শয়নমন্দিরে প্রবেশ করতেন। প্রতিদিন

স্বামীকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করবেন ব'লে বিষ্ণুপ্রিয়া আয়োজন ক'রে রাখতেন। ক্বচিৎ তাঁর ভাগ্যে এ সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে। আর স্বামীর নিকট হ'তেও ক্বচিৎ তাঁর গলদেশের ভক্তপ্রদত্ত মাল্য বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাপ্য হয়েছে।

অবশেষে এল সেই দিন। মাঘ মাসের পূর্ণিমাতিথি, অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার নারী-জীবনের পরম সৌভাগ্য ও চরম দুর্ভাগ্যের রজনী—যেদিন নিমাই গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ ক'রে যাবেন ইহজীবনের মতো। আর বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বামিদর্শনও শেষ হবে ইহজীবনের মতো।

কয়দিন স্বামীর বাহ্যদশায় দর্শন পেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া অতি আনন্দে দিন যাপন করছেন। আজ পূর্ণিমাতিথিতে গৃহদেবতার বিশেষ পূজা ও ভোগ হয়ে থাকে। প্রভুর ভক্ত-পার্ষদরাও আজ অনেকেই উপস্থিত। শচীদেবী বহুবিধ সামগ্রী পাক করেছেন, যাহা নিমায়ের প্রিয় খাদ্য। বধূ শ্বশ্রূকে সাহায্য ক'রে যাচ্ছেন পরম আনন্দে। নিমাই আজ অতি উৎফুল্ল। দ্রুত সব কর্তব্য সমাপন ক'রে চলেছেন। গঙ্গাস্নান ক'রে নিত্য পূজার্চনা সমাধা ক'রে ভোজনে বসে জননীর সন্তোষ-বিধানার্থ বহু আহার্য্য গ্রহণ করলেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি সঙ্গীদের সহিত হাস্যকৌতুকের মধ্যে ভোজন সমাধা ক'রে উঠলেন। সামান্য বিশ্রাম ক'রে পাঠ কীর্তন নিত্যকার মতো সবই হ'ল। যথাকালে সায়ংসন্ধ্যা ও নৃত্যগীত সবই সমাধা হয়ে গেল।

নিমাই শয়নমন্দিরে প্রবেশ করলেন, অন্য দিন অপেক্ষা বহু পূর্বে এবং সম্পূর্ণ সহজ অবস্থায়—যা বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনে বোধ হ'ল এই প্রথম। পত্নী নিদ্রাভিভূতা হ'লে তিনি জন্মের মতো এ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করলেন। সন্তর্পণে শয্যাত্যাগ ক'রে গৃহতলে দাঁড়ালেন। পত্নীর প্রতি কিছুক্ষণ দৃষ্টিপাত ক'রে মনে মনে অভাগিনীকে কৃষ্ণপদে সমর্পণ করলেন। পূর্বে মাঝে মাঝে বাহ্যাবস্থায় শয়নগৃহে পত্নীকে কি উপদেশ দিয়েছেন, যেভাবে জননীকে দিয়েছেন?—"সংসার অনিত্য। অলীক মায়া-মোহে কেন বদ্ধ হও? সার বস্তুতে মন দাও। কে কার পুত্র, কে কার স্বামী? সেই জগৎস্বামীকে চিন্তা কর। 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাম সার্থক কর বিষ্ণুপূজা ক'রে।"

অতি ধীরে গৃহের দ্বার মুক্ত ক'রে নিমাই অঙ্গনে নেমে জননীর গৃহ-দাওয়ায় উঠলেন। শচীদেবী নীরবে অশ্রুবিসর্জন করছিলেন। নিমাই সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন জননীর চরণে। পদধূলি বার বার মস্তকে ধারণ ক'রে মাতাকে প্রদক্ষিণ করলেন সাত বার। আবার প্রণাম ক'রে বিদায় নিয়ে অঙ্গন পার হয়ে দ্বার দিয়ে বার হয়ে পথে এলেন—অতি দ্রুত গঙ্গাতটের পথ ধরে কাটোয়ার উদ্দেশে চললেন। সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর নিকট হ'তে সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ ক'রে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-মানসে যাত্রা করবেন। শচীদেবীও মূর্ছিতা হয়ে পড়ে রইলেন। নিত্যানন্দ প্রমুখ পাঁচ জন দূর থেকে অলক্ষ্যে ওঁর পশ্চাদ্গামী হলেন।

জ্ঞান হবার পর শচীর ক্রন্দনে বধূ জাগরিতা হন। চেয়ে দেখলেন শয্যা শূন্য, গৃহদ্বার মুক্ত। প্রতিবেশী বন্ধুরাও একে একে এসে সব জানলেন।

নিমায়ের গৃহত্যাগ সম্বন্ধে অন্য মত আছে—জননীর নিকট বিদায় নেওয়ার ব্যাপারটায়। জননী নিদ্রিতা ছিলেন। গৃহদ্বারে তাঁর উদ্দেশে বহু বার প্রণাম ও দ্বারের ধূলি মস্তকে লেপন ক'রে, গৃহ প্রদক্ষিণ ক'রে, জন্মের মতো পরিত্যাগ ক'রে দ্বার পার হয়ে পথে এলেন। নবদ্বীপ ত্যাগ করলেন।

দীক্ষার পর মুণ্ডিত মস্তক, অঙ্গে গৈরিক বাস, হস্তে দণ্ড-কমণ্ডলু, নববেশ, নবজন্ম, গুরুদত্ত নবনাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। নবীন সন্ন্যাসী কোনদিকে দৃকৃপাত না ক'রে দ্রুতপদে গঙ্গাতীর ধরে চললেন সেই ব্রজরাজের দর্শন লাভ করতে। মুখে অবিরত হরিনাম. নয়নে প্রেমাশ্রুধারা। পাঁচজন সঙ্গী অলক্ষ্যে আছেন। অন্যেরা সরে গেলেন। একজন শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে সংবাদ দিতে গেলেন। প্রভু তখন কৃষ্ণনামে এত বাহ্যশূন্য যে, গঙ্গাকেই 'যমুনা' ভাবছেন! পার্শ্বস্থিত বনকে 'বৃন্দাবন' ভাবছেন। অত পরিচিত নিত্যসঙ্গী, প্রিয় সুহৃদ নিত্যানন্দকে দেখেও চিনতে পারেন নাই। না জানি এ কি অপার্থিব অবস্থা, অলৌকিক প্রেম ও ভাব! মনে পড়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতোপম বাণী—"প্রেম কি সহজ জিনিস গা? চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। 'জল দেখে যমুনা ভাবে,' 'বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে।'··· নিজের দেহ যে এত প্রিয়, তাও ভুল হয়ে যায়। বার বার মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ছেন, শরীর ব'লে বোধ নাই। ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, নিদ্রা নাই। এই প্রেম।"

সেজন্য প্রভু নিত্যানন্দ অনায়াসে সেই অবস্থায় 'বৃন্দাবনে নিয়ে যাই' ব'লে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে লয়ে যান নৌকায় গঙ্গাপার হয়ে। অদ্বৈতকে দেখে তবে চৈতন্য প্রভু বাহ্যদশা প্রাপ্ত হন। নিত্যানন্দের ছলনা বুঝতে পারেন। তখন সকলে শচীদেবীকে ব'লে তাঁকে নিয়ে আসা হবে, না শ্রীচৈতন্য দেশে যাবেন—এই প্রস্তাব করতে চৈতন্যদেব বললেন, 'যেন একা জননী আসেন। অন্য কেহ না আসে। সন্ন্যাসীর গৃহে গমন নিষিদ্ধ।'

ওখানে শচীদেবী আগেই সংবাদ পেয়ে বধূসঙ্গে শান্তিপুর যাত্রার উদ্যোগ করছেন রুত। পুত্রের প্রিয় খাদ্য, বসন, ভূষণ সব কিছু সঙ্গে নিচ্ছেন—'সে একবস্ত্রে চলে গেছে।'

এমন সময় নিত্যানন্দ চৈতন্যের বার্তা নিয়ে এলেন এবং অতি সঙ্কুচিত হয়ে জানালেন, চৈতন্যের সেই হৃদয়বিদারক আদেশ! "তুমি একা যাবে, মা, প্রভুর এই আদেশ।"

শ্রবণমাত্র পুত্রগতপ্রাণা শচীদেবী পুত্রকে 'নির্মম, নিষ্ঠুর, নির্দয়' ইত্যাদি বহু কিছু ব'লে বললেন, "আমি যেতে চাই না, কোন্ প্রাণে এ অভাগীকে রেখে একা যাব আমি?"

এই স্থানেই বিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব, অসাধারণ আত্মসংযম, অলৌকিক ত্যাগ, অপরিসীম স্থিরবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বালিকাই অসীম ধৈর্য নিয়ে স্থির থেকে বহুরূপে প্রবোধ দিয়ে শচীদেবীর ক্রন্দন শান্ত ক'রে তাঁকে পুত্রের সাক্ষাৎলাভ জন্য শান্তিপুর পাঠিয়ে দেন। বালিকার সে সময়ের অবিচলিত শান্তভাব দেখে সকলেই বিস্মিত হন। অত অল্প বয়সে এরূপ মহৎ অপূর্ব চরিত্র-মাধুর্য দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। আমাদের এই বঙ্গজননীর দান এই অপার্থিব চরিত্র।

সারা দেশে নিমায়ের সন্ন্যাসের কথা আলোচনা। বহুজন শান্তিপুরে নিমাই-দর্শনে আসতে লাগলেন। সকলেরই অবারিত দ্বার—শুধু একজন নিষিদ্ধ। যিনি সব ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভক্তিতে অতুলনীয়া, ত্যাগে শ্রীচৈতন্যেরই সমতুল্যা, যাঁর স্থান সর্বাগ্রে, তিনিই হলেন অনাদৃতা। যিনি পশুপক্ষীরও দুঃখে কাতর হয়েছেন, যাঁর উদার মহৎ হৃদয়ের প্রেম ও করুণা বৃষ্টিধারার মতো সর্বত্র বর্ষিত হয়েছে, তাঁর সে করুণার একবিন্দুও পাবার অধিকার ছিল না অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার!

সর্বতীর্থ পরিক্রমা ক'রে যখন নীলাচলে বাস স্থির করলেন শ্রীচৈতন্য, তখন গৌড়ের যত ভক্ত

শিষ্য পার্ষদরা প্রতি বৎসর রথযাত্রার পূর্বে নীলাচলে গমন করতেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁদের আত্মীয়গণও কেহ কেহ যেতেন। চারমাস সেখানে থেকে রাসপূর্ণিমার পরে সব দেশে আসতেন। তখন যানবাহন কিছুই ছিল না, সকলে পদব্রজে যাওয়া আসা ক'রত। যাবার সময় সকলেই নানারূপ খাদ্যদ্রব্য, যাহা নিমাই ভালবাসতেন, সেই-সব সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যেতেন। শচীদেবীও দিতেন; বধূর সাহায্যে প্রস্তুত করতেন এরূপ মিষ্টান্ন, যাহা অতদূর যাবার পরও ভাল থাকে। সেগুলি 'মায়ের ভিক্ষা'। শ্রীচৈতন্যও জগন্নাথদেবের মহা-প্রসাদ, প্রসাদী অঙ্গবস্ত্র প্রভৃতি দুর্লভ বস্তু জননীর নিকট পাঠিয়ে দিতেন তাঁরা ফেরার সময়। শচীদেবীর সহিত একই গৃহবাসিনী কিশোরী বধূ শুধু কোন দ্রব্যের কণা-মাত্রেরও অধিকারিণী হ'ত না। তখন তার মনের অবস্থা কি হ'ত? সে খবর অজানা।

শুধু জননীকে নয়। পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয় গ্রামবাসী যে-কেহ যেতে অপারগ হয়েছেন, চৈতন্যদেব তাঁদের নাম ক'রে ক'রে নানা প্রসাদ পাঠিয়েছেন; সে যুগে এ সব দুর্গম পথের মহাতীর্থের কোন জিনিস, তা সে যত সামান্যই হোক, অত্যন্ত দুর্লভ ছিল। সেই-কারণে দিতেন তিনি। তাঁর করুণা সবার উপর বর্ষিত। বিষ্ণুপ্রিয়ার শুধু এটুকুর প্রত্যাশা রাখা চলবে না।

অথচ বৃদ্ধা জননীর সেবা-শুশ্রূষা, পরিচর্যা, পুত্রবিরহবেদনায় সান্ত্বনাদান, সব কিছুই তো সম্পূর্ণভাবে সেই অভাগিনীকেই করতে হবে। স্থিরচিত্তে বিনা অনুযোগে তিনি তা ক'রে গেছেন। যতদিন শচীদেবী জীবিতা ছিলেন, ঐরূপেই কাল কেটেছে বিষ্ণুপ্রিয়ার। কিন্তু তার পরের অবস্থা কল্পনার অতীত। অথচ কখনও কোন দিন তিনি স্বামীর প্রতি কোনরূপ দোষারোপ অনুযোগ অভিযোগ কিছুই করেন নাই তাঁর এই অবস্থার জন্য। এ বিষয়ে সেই পুরাণ-বর্ণিতা ধরিত্রী-তনয়া জানকীর ন্যায় তিনি সর্বংসহা।

বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীচৈতন্যের যে পাদুকা পূজা করতেন, তাহা অদ্যাপি শ্রীনবদ্বীপধামে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতিষ্ঠিত ও অর্চিত শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্তির সম্মুখে অবস্থিত। সেই স্থানই নিমায়ের গৃহ ও জন্মস্থানরূপে পরিচিত এবং ঐ স্থানেই বিষ্ণুপ্রিয়া আমরণ বাস করেছিলেন ব'লে জানা যায়। শচীদেবীর দেহান্তের পর তাঁর ভ্রাতারা বিষ্ণুপ্রিয়ার তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁদের সাহায্যেই তিনি ঐ মূর্তি নির্মাণ করেন।

নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ-মন্দির-সংলগ্ন একটি ছোট অঙ্গনযুক্ত ও প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানে অতি ছোট একটি ঘরে দুটি মাটির মূর্তি বসানো দেখা যায়—এক গৌরবর্ণা স্থূলাঙ্গী বৃদ্ধা, তার পাশে অন্য এক নারী-মূর্তি—নাম 'শচীমাতা', 'বিষ্ণুপ্রিয়া'। এছাড়া আর কোথাও বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্তি দেখি নাই।

যে বিপুল অধ্যাত্মশক্তির বলে তিনি এভাবে সারাজীবন কাটিয়ে গেলেন বহির্জগতের কোন সম্বলেরই অপেক্ষা না রেখে, তাঁর অন্তরের কথা আমরা প্রায় কিছুই জানি না। যদি জানা যেত, শ্রীচৈতন্যের বাণীর মতোই সে বাণী থেকেও অসংখ্য হৃদয় বিপুল শক্তির সন্ধান পেতো অমৃতধামে যাবার পথে।

অবতারের সঙ্গে তিনিই বারে বারে আসেন জীবের মুক্তির জন্য 'অশেষ যাতনা সহিতে'। জগৎ-কল্যাণের জন্য চিরদুঃখিনীর সাজে আবির্ভূতা চিরবন্দিতা সেই ভগবতীর চরণে বার বার প্রণাম জানাই।

বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি

স্বামী নির্বেদানন্দ

অদ্বৈত অনুভূতির ফলে মনের সব সংশয় চিরতরে মুছে যাবার পর এবং মূল অজ্ঞানের পিঞ্জর টুটে বীরদর্পে প্রকৃতির নাগালের বাইরে চলে আসার পর তেইশ বছর বয়স্ক নরেন্দ্রনাথ বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ধারণা করবার, তার মর্ম গ্রহণ করবার, অপরকে তা স্পষ্ট ক'রে বোঝাবার ও তদনুসারে জীবনযাপন করার কাজে। পূর্বের এক অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্যান্য সন্ন্যাসী শিষ্যগণের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিবিধানের ভার নরেন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং কাশীপুর উদ্যানবাটীতে রোগশয্যাশায়িত শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করার সময় নরেন্দ্রনাথের যোগ্য সস্নেহ তত্ত্বাবধানে যুবক ভক্তগণ একপ্রাণে একত্র মিলিত হয়ে ভাবী সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের গোড়াপত্তন করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে এই যুবকভক্তগণের মনের ওপর দিয়ে বৈরাগ্য এবং ভগবানলাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতার ঝড় বয়ে যায়, আর সে ঝড়ের বেগ সংসারের নোঙর ছিঁড়ে একে একে তাঁদের সকলকে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে বাইরে টেনে নিয়ে আসে। তারক, লাটু ও বুড়োগোপাল পূর্বেই গৃহত্যাগ করেছিলেন ; ভাড়ার মেয়াদ যতদিন ছিল ততদিন তাঁরা কাশীপুর উদ্যানবাটীতেই রয়ে যান। দলের নেতা নরেন্দ্রনাথ এবং বাকী আর সবাই প্রতিদিন সেখানে এসে গভীর আধ্যাত্মিক সাধনায় ও তাঁদের গুরুর জীবন ও বাণীর অনুধ্যানে বেশ কিছুক্ষণ ক'রে কাটিয়ে যেতেন। ভাড়ার মেয়াদ মাস শেষ হওয়ার সঙ্গেই ফুরিয়ে গেল ; শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিতে মধুর, তাঁর পরশে পবিত্র, তাঁর বিচ্ছেদের ব্যথায় ভরা সে বাড়ীখানি নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁরা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন।

তখনই কাশীপুর ও দক্ষিণেশ্বরের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত বরাহনগরে একটা পুরোনো বাড়ী ভাড়া করা হ'ল এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অস্থি প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে কাশীপুর উদ্যানবাটী ছেড়ে তাঁরা সেখানে এসে উঠলেন। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের মঠ গড়ে ওঠে। সুরেশচন্দ্র মিত্র, বলরাম বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহস্থ ভক্তগণ এই মঠের খরচ যোগাতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানে তাঁর সঞ্জীবনী স্পর্শের অভাবে এই-সব গৃহস্থ-ভক্ত তখন এরূপ একটি শান্ত পরি-বেশের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করছিলেন —যেখানে যুবকভক্তগণের অচলা ভক্তি, ত্যাগ ও আরাধনা-সম্ভূত অবিমিশ্র আধ্যাত্মিকতার অতি শুদ্ধ পরিবেশে অবসর সময়ে এসে তাঁরা একটু জুড়োবার অবকাশ পেতে পারেন। কাজেই তাঁরা যে যুবকসঙ্ঘের এই কঠোরতাময় অনাড়ম্বর বাসস্থানের খরচ যোগাবার কাজে খুবই আগ্রহান্বিত হয়ে উঠবেন, তা খুবই স্বাভাবিক।

দুঃসহ শোকাবহ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রীভক্তগণের অন্যতমা, বিশেষ ভক্তিমতী বাবুরামের মায়ের নিমন্ত্রণে নরেন্দ্রনাথ কয়েকজন গুরুভ্রাতাকে সঙ্গে নিয়ে বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দের) দেশের বাড়ীতে দিনকয়েক কাটিয়ে আসতে গেলেন।

গ্রামের শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে নরেন্দ্রনাথের অগ্নিবর্ষী আলোচনা শুনতে শুনতে আধ্যাত্মিকতালিপ্সু এই যুবকদলটির হৃদয়ে সর্বস্বত্যাগরূপ আদর্শের আগুন জ্বলে উঠল এবং ভ্রাতৃত্ববন্ধনে চির-আবদ্ধ করল তাঁদের। একদিন গভীর নিশীথে প্রজ্বালিত অগ্নির সম্মুখে বসে বহুক্ষণ ধ্যান করার পর সকলে মিলে নরেন্দ্রনাথের হৃদয়-নিঃসৃত ভাবগম্ভীর বাণী শুনছিলেন। তাঁদের সর্বসম্মত নেতা নরেন্দ্রনাথ তাঁদের মানসপটে যীশুখৃষ্টের পবিত্র জীবনের উজ্জ্বল চিত্র এঁকে চলছিলেন সে সময়; আর নাজারাথের ঈশদূতের মতোই ত্যাগ ও সেবার আদর্শে জীবনকে উন্নত করার জন্য তাঁদের অনুপ্রাণিত করছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সেদিন তাঁদের হৃদয়ে এই কথাটা দৃঢ়মুদ্রিত ক'রে দিলেন—তাঁদের প্রাণপ্রিয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ চাইতেন যে, আধ্যাত্মিক অনুভূতির আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত করার জন্য একাগ্রচিত্তে তাঁদের অশেষ প্রয়াসে ব্রতী হ'তে হবে এবং মানবজাতির পরিত্রাণকল্পে নিজেদের জীবন পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ করতে হবে। তিনি বোঝালেন, প্রায় দুই হাজার বছর আগে যীশুখৃষ্ট যা করেছিলেন তাঁদেরও তাই করতে হবে, কালবিলম্ব না ক'রে পারিবারিক জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছেড়ে বাইরে এসে ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্টিকে একসঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরতে হবে। একে একে শ্রীরামকৃষ্ণের যুবক ভক্তগণের হৃদয়ে ঈশ্বর ও মানুষের পায়ে সর্বস্ব উৎসর্গ করার প্রেরণা প্রবল হয়ে দেখা দিল; সন্ন্যাসরূপ চরম ত্যাগ ও আত্মনিবেদনের পবিত্র ব্রতে দীক্ষিত হ'তে তাঁরা উদ্যোগী হলেন।

ত্যাগের নবীন প্রবল প্রেরণা হৃদয়ে পোষণ ক'রে সেখান থেকে আসার পর তাঁরা গৃহ-পরিজনের সংস্রব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করলেন; বছর দুয়েকের মধ্যে সকলেই এসে বরাহনগর মঠে যোগ দিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে থাকার পর দক্ষিণেশ্বরের ঠিক দক্ষিণ দিকে আলমবাজারের একটি বাড়ীতে মঠ স্থানান্তরিত হয়। বরানগর মঠে এক শুভলগ্নে তাঁরা বাহ্যসন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুদের যুগযুগ-প্রচলিত বিরজাহোম অনুষ্ঠানের ফলে বরাহনগর মঠ সেদিন পবিত্র হয়। সেদিন মঠবাসীরা সকলে শঙ্করপন্থী হিন্দুসন্ন্যাসীদের পূত প্রথানুযায়ী সর্ববিধ কঠোর বিধি অনুসরণ ক'রে এই যজ্ঞানুষ্ঠান সুসম্পন্ন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হ'তে তাঁরা যে অন্তঃসন্ন্যাস পেয়েছিলেন, সন্ন্যাসের যে ভাবটিকে এতদিন তাঁরা পরম শ্রদ্ধাভরে হৃদয়ে পোষণ ক'রে আসছিলেন, এখন সেই ভাবেরই পরিপূরক প্রয়োজনীয় বাহ্য ক্রিয়াকলাপ সমাধা ক'রে তাঁরা গৈরিক বসন, কৌপীন ও সন্ন্যাসের নতুন নামে ভূষিত হলেন, তাঁদের নবজীবনের সুপ্রভাত হ'ল।

অধ্যাত্মভাবোন্মত্ত এই নবীন সন্ন্যাসীর দল কঠোর নিয়মগুলি আকুল আগ্রহে স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিয়ে তৎকালে আধ্যাত্মিক সত্য-লাভকেই জীবনের একমাত্র কাম্য জেনে তার সন্ধানে আত্মনিয়োগ করলেন। শরীরধারণের জন্য অপরিহার্য সামান্য আহার মাত্র তাঁরা গ্রহণ করতেন; বিশ্রাম করতেন স্বল্পকাল, আর বাকী সব সময় আপ্রাণ চেষ্টা করতেন আধ্যাত্মিক সাধনায় ডুবে থাকতে। ধ্যান, নিদিধ্যাসন, স্তবপাঠ, প্রার্থনা, ভজন ও শাস্ত্রালাপ—শুধু এই সব নিয়েই তাঁরা সময় কাটাতেন। ভগবদারাধনার ঝড় বয়ে যেত মঠে; দিনরাত্রিগুলি সে ঝড়ের বেগে কিভাবে কোথায় উড়ে যেত, টেরই পেতেন না কেউ।

স্বামীজীর একজন গুরুভাই রামকৃষ্ণানন্দ সঙ্ঘের হৃদয়াধিপতি গুরুমহারাজের সেবায়

মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে মঠে তাঁর স্মৃতির যাগ-প্রদীপ জেলে রাখতেন। একটি ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবশেষ ও ব্যবহৃত দ্রব্য রেখে, বেদীর ওপর তাঁর প্রতিকৃতি বসিয়ে ঠাকুরঘর করেছিলেন তিনি; অন্তরের ভক্তি নিঃশেষে উজাড় ক'রে তিনি সেখানে সেবায় ব্রতী হ'লেন—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবৎকালে যেভাবে তাঁর সেবা করতেন, ঠিক সেই ভাবেই তাঁর সেবা করতে লাগলেন। যেভাবে একান্ত নিষ্ঠা নিয়ে সেবার প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজ তিনি যথাসময়ে ক'রে যেতেন তাতে সকলেই অনুভব করতেন, ঠাকুর সশরীরে মঠে বিরাজ করছেন। আদর্শ ভক্তের মতো জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত তিনি অবতারজ্ঞানে একনিষ্ঠভাবে গুরুমহারাজের সেবা ক'রে গিয়েছিলেন। তাঁর এই অধ্যবসায়, আগ্রহ ও জ্বলন্ত ভক্তি ঠাকুরসেবার একটি ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। ঠাকুরের দেহত্যাগের কয়েক দশকের মধ্যেই সঙ্ঘ যে-সব মঠ প্রতিষ্ঠা করেছে, সেখানে সর্বত্র এই ঐতিহ্য আজও সংরক্ষিত হয়ে আসছে।

রামকৃষ্ণানন্দ-কর্তৃক প্রবর্তিত মঠের এই নতুন বৈশিষ্ট্যটি সেখানে বাস্তবিকই একটা আনন্দময় আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল; প্রাণপ্রিয় গুরুর বিচ্ছেদবেদনার আগুনে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ উভয়বিধ ভক্তেরই হৃদয় পুড়ে যাচ্ছিল; এই সেবার মাধ্যমে সেই তাপিত চিত্তে সান্ত্বনার একটু স্পর্শ লাগাবার মতো একটা অবলম্বন তাঁরা পেয়ে গেলেন। কিন্তু এতে বিপদের সম্ভাবনাও ছিল; সে বিপদ থেকে রক্ষা করার সুব্যবস্থা না করতে পারলে তার ফলে একটা নতুন সম্প্রদায় গড়ে উঠে সঙ্ঘকে চিরদিন তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ক'রে ফেলতে পারত। সঙ্ঘের কেন্দ্রস্বরূপ বিবেকানন্দ এ বিপদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন, এবং সাম্প্রদায়িকতার হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখে সঙ্ঘকে পরিচালিত করার মতো শক্তিও তাঁর ছিল। গভীর ভালবাসা, সস্নেহ তত্ত্বাবধান ও অদ্ভুত উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য বিবেকানন্দ সমগ্র সঙ্ঘের সশ্রদ্ধ আনুগত্যের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড আকর্ষণে সকলেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'তেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের কত প্রশংসা করতেন, তা সকলেরই মনে পড়ে যেতো; তাঁর কাছ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার মর্মার্থ জানবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হ'তে যে-সব উচ্চ ভাব ও আদর্শ বিবেকানন্দ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ গড়ে তোলার জন্য যেগুলিকে অবশ্য-প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য ব'লেই মনে হ'ত, সে-সব কথা তিনি গুরুভাইদের শোনাতেন। তাঁদের কল্পনায় তিনি ফুটিয়ে তুলতেন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক সন্ন্যাস-জীবন যা গভীর আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী উদার, বিশ্বজনীন ও মানুষের জন্য ভালবাসায় ভরা। তিনি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, তাঁদের গুরুর জীবনে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না, বস্তুতঃ তাঁদের গুরু ছিলেন সর্ববিধ ধর্মবিশ্বাসের জীবন্ত বিগ্রহ। স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনধারণ করেছিলেন সারা জগৎকে ধর্মশিক্ষা দেবার জন্য; তাঁর বিভিন্ন অনুভূতির দীপ্ত শিখার স্পর্শে পৃথিবীর সর্ববিধ ধর্মমত ও ধর্ম-বিশ্বাস পুনরুদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তিনি গুরুভাইদের মনে গেঁথে দিতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণকে পূজা করার ফলে তাঁদের হৃদয়ে সমস্ত ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি সশ্রদ্ধ ভাব জেগে ওঠা উচিত, কারণ এইরূপ ভাবেরই জ্বলন্ত প্রতীক ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। গুরুভাইদের তিনি সাবধান ক'রে

দিয়েছিলেন, ধর্মের নামে মঠে যেন কেবল হালকা ভাবোচ্ছ্বাসের ঘটা না চলে। বিশুদ্ধ যুক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান ও নিখুঁত চরিত্র সহায়ে আধ্যাত্মিক ভাবাবেগের সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য তিনি তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতেন। আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্যের জ্ঞানালোকবর্ষী আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারের জন্য তিনি সচেষ্ট হ'তেন। তাছাড়া তিনি সকলকে সজাগ ক'রে দিতেন যে, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার সীমা ছাড়িয়ে এসে নিজ নিজ মুক্তিসাধনের সঙ্গে সঙ্গেই মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টায়ও তাঁদের ব্রতী হ'তে হবে; আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাই-ই চাইতেন। তাঁদের প্রাণের ঠাকুর তাঁদের স্কন্ধে যে এক গুরু দায়িত্বের ভার তুলে দিয়ে গেছেন, সেকথা সর্বদা স্মরণ রাখার জন্য তিনি এই নবীন সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের সকলকেই উৎসাহিত করতেন। এভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনরূপ উত্তুঙ্গ শিখর হ'তে আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শের যে পূত মন্দাকিনী-ধারা বিবেকানন্দের হৃদয়ে নেমে এসেছিল, বিবেকানন্দের হৃদয় হ'তে নিঃসৃত হয়ে এখন ধীরপ্রবাহে সে-ধারা বইতে শুরু করল সঙ্ঘের সকলেরই হৃদয় জুড়ে।

মঠবাসী সন্ন্যাসীদের অন্তরে ত্যাগের যে অগ্নিশিখা নিরন্তর জ্বলে চলেছিল, সময় সময় তা এত বেশী প্রদীপ্ত হয়ে উঠতে লাগল যে, মঠের সীমানার মধ্যে বাস করাও তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। একমাত্র রামকৃষ্ণানন্দ মঠ ছেড়ে কখনো বাইরে যেতে চাননি, গুরুমহারাজের সেবাকার্য আঁকড়ে মঠেই রয়ে গিয়েছিলেন। গুরুভাইদের সঙ্গরূপ সোনার শিকলের বন্ধনও ছিঁড়ে ফেলে বেরিয়ে আসার জন্য, মঠ থেকে দূরে চলে গিয়ে পরিব্রাজক সাধু বা নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর মতো কঠোর নির্জন জীবন যাপন করার জন্য সঙ্ঘের অন্যান্য সকলের হৃদয়ে মাঝে মাঝে প্রেরণা জাগত। ফলে, যাযাবর পাখীর মতো এই সন্ন্যাসিগণ বরাহনগর মঠের ক্ষুদ্র নীড় পরিত্যাগ ক'রে কিছুকাল দেশের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াতেন, উত্তুঙ্গ হিমালয়ের কোলে কোন নির্জন প্রদেশে অথবা নর্মদাতীরে, কখনো বা কোন তীর্থস্থানের সান্নিধ্যে বসবাস ক'রে বেশ কিছুকাল কাটিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে তাঁরা বরাহনগর মঠে ফিরে আসতেন ক্লান্ত পক্ষপুটের বিশ্রামের জন্য, আবার মুক্ত আকাশে পাড়ি দেবার মতো শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই অভেদানন্দ, যোগানন্দ, অদ্ভুতানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন গুরুভ্রাতা পরিব্রাজক-জীবন শুরু করেছিলেন। বিবেকানন্দ প্রথম থেকেই সঙ্ঘগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাই তীর্থপর্যটনে বের হন একটু দেরীতে। দু'চার দিন দেওঘর বা কাশী ঘুরে এসেই তিনি তৃপ্ত থাকতেন, তাঁর মন সর্বদা পড়ে থাকতো সঙ্ঘকে সুসম্বদ্ধ করার দিকে। কিন্তু শীঘ্রই তাঁরও মনে তরঙ্গায়িত প্রবাহের মতো স্বচ্ছন্দগতিতে বয়ে যাবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা জাগল, মঠের সীমানার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠল না। সন্ন্যাসজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক পর্যটনের জন্য অগণিত মুনি-ঋষির আধ্যাত্মিক উপলব্ধির স্মৃতিবিজড়িত পর্বত ও অরণ্যানী, নদীতীর ও উপত্যকা, মন্দির ও শাস্ত্রচর্চার স্থানগুলি তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। সে আদেশতুল্য আহ্বান তাঁকে অস্থির ক'রে তুলল, সঙ্ঘপ্রেমের পসরা কিছু দিনের জন্য ঘাড় থেকে নামিয়ে রেখে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির দুবছর পরে তিনি তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন।

বারাণসী, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, বৃন্দাবন এবং হিমালয় পর্যটন করলেন তিনি। ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট থাকলেও তাঁর হৃদয় কলাবিদ্যার মহান অবদানের সৌন্দর্যগ্রহণের জন্যও উন্মুক্ত ছিল; ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট স্থানগুলিতে যতটা আগ্রহ দিয়ে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, ততটা আগ্রহ নিয়েই তিনি দেখতে গিয়েছিলেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি। এই সময় পর্যটনকালে তাঁর দেদীপ্যমান ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক উৎসাগী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এককথায় গৃহত্যাগ ক'রে তাঁর সঙ্গ নেন, এবং তাঁর পর্যটনের অবশিষ্ট কাল ছায়ার মতো তাঁকে অনুসরণ ক'রে চলেন। পরে তিনি বিবেকানন্দের কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ ক'রে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য পর্যটনের পথে কিছুদিনের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ায় দুজনকে একসঙ্গেই বরাহনগর মঠে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল।

বসন্তরোগাক্রান্ত গুরুভাই যোগানন্দকে সেবা করার জন্য ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বিবেকানন্দ এলাহাবাদে আসেন। এখানে তিনি অল্পদিন ছিলেন, কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর শুদ্ধ পবিত্র চরিত্র ও গভীর সুদূরপ্রসারী জ্ঞান সেখানকার বাঙ্গালী বাসিন্দাদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এখানেই তিনি গাজীপুরের মহাযোগী পওহারী বাবার কথা শুনতে পান এবং পরবৎসর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান।

পওহারী বাবাকে দেখে তিনি খুবই মুগ্ধ হন এবং তাঁর কাছে যোগশিক্ষা ক'রে, শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাবিরুদ্ধ হলেও, সব সময় সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকার জন্য একদা প্রলুব্ধও হন। বিবেকানন্দের রহস্যোদ্ঘাটক স্বজ্ঞা কিন্তু এই ইচ্ছায় সায় দেয়নি। পওহারী বাবার কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করার জন্য ক্রমান্বয়ে দিনের পর দিন তিনি সঙ্কল্প করতেন, আর প্রতিদিনই রাত্রে দেখতেন শ্রীরামকৃষ্ণ এসে শিয়রে দাঁড়িয়েছেন, নীরব-অনুরোধমাখা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। শেষ পর্যন্ত স্বজ্ঞাই জয়ী হ'ল, মনের ওপর ইচ্ছার যে পাতলা মেঘাবরণ জমেছিল, স্বজ্ঞার উদ্ভাসে তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সমাধি-ক্ষেত্র থেকে যীশুখৃষ্টের রহস্যময় পুনরুত্থানের মতো শ্রীরামকৃষ্ণের এই পুনরাবির্ভাব শিষ্যের হৃদয়-সিংহাসনে তাঁকে চির-অধিষ্ঠিত ক'রে দিল এবং মহিমময় ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের অনুরক্ত চিরদাস হয়ে থাকার জন্য তিনি মনে মনে কৃতসঙ্কল্প হলেন। জনৈক বন্ধুর কাছে তিনি তাঁর এই মনোভাব পত্রে লিখে জানিয়েছিলেনঃ "আর কোন মিঞার কাছে যাইব না।…এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অহেতুকী দয়া, সে প্রগাঢ় সহানুভূতি বদ্ধ-জীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই।… বিপদে, প্রলোভনে 'ভগবান রক্ষা কর' বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি কেহই উত্তর দেয় নাই—কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাহাই হউন, নিজ অন্তর্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন।" যোগমার্গে সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকার তীব্র ইচ্ছা দমন ক'রে মানব-জাতির আধ্যাত্মিক-উন্নতিসাধন রূপ ভগবদিচ্ছা কার্যে রূপায়িত করার জন্য বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশমত চলতে লাগলেন।

অসুস্থ গুরুভ্রাতা অভেদানন্দের সেবার জন্য গাজীপুর থেকে তাড়াতাড়ি তিনি কাশী চলে এলেন। অভেদানন্দ নিরাময় হয়ে ওঠার পরও কিছুকাল তিনি প্রমদাদাস মিত্রের বাগান-বাড়ীতে থেকে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন।

এখানে থাকার সময় শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহস্থভক্ত বলরাম বসুর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি বরাহনগর মঠে ফিরে যান। প্রমদাবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আপেক্ষিক জগতের অনিত্যতা যাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে অতি স্পষ্ট, সেই বিবেকানন্দের মতো একজন ঘোর বেদান্তী আবার শোকে এত কাতর হন কি ক'রে? এর উত্তরে বিবেকানন্দ তাঁর সন্ন্যাসজীবনের নিজস্ব নীতি শুনিয়ে প্রমদাবাবুকে নিরস্ত করেছিলেন: "আমরা শুকনো সাধু নই। বলেন কি মশাই! আপনি কি বলতে চান, সন্ন্যাসী হ'লে তার আর হৃদয় ব'লে কিছু থাকবে না?" হয় সে-হৃদয় নির্বিকল্প সমাধিতে লীন হয়ে যাবে, আর না হয় ভগবান ও মানুষরূপী ভগবানের জন্য প্রেমে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে, সব ব্যক্তির ব্যথা এসে সে-হৃদয়ে সহানুভূতির স্পন্দন তো তুলবেই! বলরামবাবুর শোকার্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বারাণসীর এই শান্তিপূর্ণ নির্জন বাগানবাড়ীটি ছেড়ে অবিলম্বে তিনি কলকাতায় ফিরলেন।

প্রায় ছ'মাস তিনি বরাহনগর মঠে ছিলেন। সন্ন্যাসী ভাইদের সঙ্গে, শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহস্থ ভক্তগণের সঙ্গে এবং যাঁরা মঠে যাতায়াত করতেন তাঁদের সঙ্গে নিজের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে আলাপ-আলোচনা ক'রে তাঁর দিন কাটতে লাগল। তাঁর ভেতরকার বিরাগী সত্তাটি কিন্তু তাঁকে অস্থির ক'রে তুলল মানুষের সংশ্রব থেকে বহু দূরে একটা উপযুক্ত আশ্রয়ের সন্ধানে বেরুবার জন্য, যেখানে অবিচ্ছেদে দীর্ঘদিন তিনি ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকতে পারবেন। আধ্যাত্মিকতার অভাবে লোকে যে কি অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, সম্প্রতি দেশভ্রমণকালে নিজের চোখে তিনি তা দেখে এসেছেন। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল যে, এদের জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে কোন বিপুলশক্তি আধ্যাত্মিক-তড়িতাধারের সংস্পর্শে এনে সেই তড়িৎ-স্পর্শে এদের শক্তিমান ক'রে তোলা ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পন্থা নেই। তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর নিজেরই অভ্যন্তরে সে তড়িতাধার রয়েছে; সেখান থেকে বের ক'রে এনে তাকে কার্যকরী ক'রে তোলার জন্য প্রবল ইচ্ছা জাগল তাঁর মনে। এই ভাব তাঁকে পেয়ে বসল; তিনি স্থির করলেন তখনই মঠ ছেড়ে বেরিয়ে পড়বেন এবং স্পর্শমাত্রে মানুষের ভেতর পরিবর্তন এনে দেবার মতো আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত মঠে আর ফিরবেনই না। এরূপ দৃঢ়সঙ্কল্পবান হয়ে, শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ১৮৯ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে অনির্দিষ্ট কালের জন্য তিনি দীর্ঘ যাত্রাপথে পা বাড়ালেন।

ইতিমধ্যে অখণ্ডানন্দ উত্তর ভারতের বিস্তৃত অংশ, কাশ্মীর, হিমালয়, এমনকি তিব্বতও পর্যটন ক'রে ফিরে এসেছেন। বিবেকানন্দ তাঁকে পথপ্রদর্শক ও সাথী হিসাবে সঙ্গে নিলেন এবং দেওঘর, ভাগলপুর, কাশী অযোধ্যা ও নৈনিতাল হয়ে হিমালয়ের কোলে আলমোড়ায় গিয়ে পৌঁছুলেন। এই আলমোড়ায় একটি বটবৃক্ষতলে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে অবস্থানকালে তিনি একটি গূঢ় আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করেন। সেদিনকার তারিখ দিয়ে দিনপঞ্জীতে তিনি তার কিয়দংশ লিখে রেখেছিলেন: "বিশ্বের একটা ক্ষুদ্র অংশ আর বিরাট ব্রহ্মাণ্ড, উভয়ই একই পরিকল্পনায় রচিত। ব্যষ্টি জীবাত্মা যেমন প্রাণীর দেহাবরণের ভেতর রয়েছেন, বিশ্বাত্মাও তেমনি চেতন প্রকৃতির—দৃশ্যমান বিশ্বের—অন্তরে রয়েছেন। শিবা (কালী) শিবকে আলিঙ্গন ক'রে রয়েছেন; ইহা কল্পনা নয়। এই একের (আত্মার)

অপরের (প্রকৃতির) দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে থাকার উপমা দেওয়া চলে ভাব ও ভাবের প্রকাশক ভাষার মধ্যে যে সম্পর্ক, তার সঙ্গে। ভাব ও ভাষা অভিন্ন, আমরা শুধু কল্পনাতেই এদের মধ্যে পার্থক্যের রেখা টানতে পারি। শব্দ ছাড়া চিন্তা করা অসম্ভব। এই জন্যই 'প্রথমে শব্দের উৎপত্তি' ইত্যাদি (শাস্ত্রবাক্য রয়েছে)। বিশ্বাত্মার এই দ্বিত্বভাব চিরন্তন। কাজেই আমরা যা কিছু ধারণা করি বা অনুভব করি, তা সবই হচ্ছে এই নিত্য-সাকার ও নিত্য-নিরাকারের সম্মিলন।" দৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে তো শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গী এইরূপই ছিল! মানুষের সঙ্গে তাঁর সর্ববিধ আচরণও তো অনুরূপ প্রত্যক্ষানুভূতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হ'ত! আলমোড়ায় এই সত্য উপলব্ধি ক'রে বিবেকানন্দ বোধ হয় হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, ইহধাম-পরিত্যাগের কিছু পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভেতর নিজের যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার ক'রে-ছিলেন, সে শক্তির বিকাশ এখন ঘটছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শোনা জীব ও শিবের একত্ব এতদিন তাঁর বুদ্ধি-অনুমোদিত বিষয়মাত্র ছিল, এখন নিজের সত্তার তীব্র আলোকসম্পাতে সে-সত্য জীবন্ত হয়ে দেখা দিল। আজ ঈশ্বর ও প্রকৃতির অভিন্নস্বরূপ মহাসত্যটি তাঁর উপলব্ধিতে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে; তাঁর অন্তর্মুখ মনের সঙ্গে গুরুকর্তৃক আদিষ্ট মানবসেবাব্রতের সামঞ্জস্য-বিধানের কাজে এই উপলব্ধি সহায়ক হ'তে পারবে। এই জন্যই বোধ হয় ধ্যানান্তে আসন ছেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সহচারী অখণ্ডানন্দকে তিনি বলেছিলেন, "এখানে, এই বটবৃক্ষতলে, আমার জীবনের একটা সবচেয়ে বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।"

আলমোড়ায় বাসকালে বিবেকানন্দের কাছে তাঁর ভগ্নীর আত্মহত্যার মর্মন্তুদ সংবাদ পৌঁছায়। তখনই তিনি হিমালয়ের গভীরতর অরণ্য-অঞ্চলে একটা নির্জন নিস্তব্ধ স্থান খুঁজে বের করার জন্য রওনা হলেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি এবং অখণ্ডানন্দ উভয়েই অসুস্থ হয়ে পড়ায় এ নির্জনতার অনুসন্ধান পরিত্যাগ ক'রে গাড়োয়াল প্রদেশের শ্রীনগরের দিকে তাঁদের অগ্রসর হ'তে হ'ল। শেষে তাঁরা দেরাদুনে গিয়ে উঠলেন। সেখানে অখণ্ডানন্দকে দৈবাৎ-পরিচিত একজন ভদ্রলোকের সহৃদয় তত্ত্বাবধানে রেখে বিবেকানন্দ হৃষীকেশের পথে রওনা হ'লেন; সঙ্গে নিলেন সারদানন্দ এবং তুরীয়ানন্দকে—তাঁরা ইতিমধ্যে সেখানে এসে জুটেছিলেন। হৃষীকেশের অনুকূল পরিবেশে আবার তাঁর মনে তীব্র তপস্যার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তিনি মরণাপন্ন হন। জ্বর সেরে গেল, কিন্তু দুর্বল শরীর নিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে থাকা আর সম্ভব হ'ল না; এক রকম বাধ্য হয়েই তাঁকে সমতল ভূমিতে নেমে আসতে হ'ল। সুদীর্ঘকাল ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকার উপযোগী একটা স্থান হিমালয়ের বুকে খুঁজে বের করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা এভাবে দৈবদুর্বিপাকের সমাবেশে সহসা ব্যর্থতায় পর্য-বসিত হ'ল। তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর নিঃসঙ্গ-তায় ডুবে যাবার প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি ক'রে একটা শক্তি তাঁকে টেনে নিয়ে আসছিল মানুষের সমাজের দিকে। অখণ্ডানন্দ তাঁকে বহুবার বলতে শুনেছেন, "নীরবতা ও তপস্যার মধ্যে যখনই আমি ডুবে থাকতে চাই, তখনই ঘটনার চাপে তা ছেড়ে দিতে আমাকে বাধ্য হ'তে হয়।"

যাই হোক, হরিদ্বারে ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁরা সাহারাণপুরে গমন করেন। সেখান থেকে মীরাট যান। মীরাটে প্রায় পাঁচমাস ছিলেন; এখানে অখণ্ডানন্দের সঙ্গে

সাক্ষাৎ হয়। এখানকার স্থানীয় পুস্তকালয়ের গ্রন্থাগারিক বিবেকানন্দের অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। বিবেকানন্দ মাত্র একদিনের মধ্যেই স্তর জন লাবকের রচনাবলী সব পড়ে শেষ ক'রে ফেলেছিলেন; এই অবিশ্বাস্য ঘটনা সত্য কিনা, তা পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্য গ্রন্থাগারিক ঐ রচনাবলীর বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, এবং সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেয়ে বিস্ময়ে হতবাক হন।

বিবেকানন্দের ভেতরের মানুষটি কিন্তু ক্রমাগত তাঁকে প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছিল সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে থাকার জন্য, এমনকি গুরুভাইদেরও সুখ-সঙ্গ পরিত্যাগ করার জন্য। তাঁর বুকের ভেতর কয়েকটি প্রচণ্ডশক্তি তোলপাড় করছিল, যার জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠছিলেন। জীবনের মহান উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে, কার্যারম্ভের সঠিক একটি পন্থা খুঁজে বের করতে হবে; এজন্য তাঁর সমগ্র সত্তা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। প্রায় দুবছর আগে তাঁর একজন সন্ন্যাসী শিষ্য তাঁর মানসিক উদ্বেগের কারণ জানতে চাইলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "বাবা, একটা মহান উদ্দেশ্য আমাকে সিদ্ধ করতে হবে; কিন্তু সেজন্য নিজের শক্তির স্বল্পতার কথা ভেবে আমার মনে হতাশা জাগছে। কাজটি সমাধা করার জন্য আমি গুরুকর্তৃক আদিষ্ট; কাজটি হ'ল গোটা ভারতবর্ষকে পুনরুজ্জীবিত করা, তার একটুও কম না। দেশে আধ্যাত্মিকতার মান কত নীচে নেমে গেছে! দেশজুড়ে চলছে অনাহারের তাণ্ডবলীলা! ভারতকে আবার শক্তিশালী হয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে, নিজ আধ্যাত্মিকতা দিয়ে সারা জগৎ জয় করতে হবে।" গুরু তাঁকে ব'লে গিয়েছিলেন মানবসেবাকে জীবনের উদ্দেশ্য করতে; সে কথা তাঁর মনে সব সময় ভাসছিল। আলমোড়ায় ঈশ্বর ও প্রকৃতির সামঞ্জস্য উপলব্ধি করার পর থেকে তাঁর আধ্যাত্মিকতা-লিপ্সা এবং ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষের সেবা, এদুটি ভাবকে আলাদা করার মতো কোন কিছুরই অস্তিত্ব বোধ হয় তাঁর মনে আর ছিল না, পূর্বের মতো এদুটির মাঝখানে থেকে একবার এদিকে একবার ওদিকে দোল খাবার ভাব চলে গিয়েছিল। আত্ম-মগ্নতা ও সেবা এদুটির প্রান্তরেখা পরস্পরের দিকে এগিয়ে এসে মিলে গিয়ে একই নিরবচ্ছিন্ন গভীর আধ্যাত্মিক জীবনের দুটি সঞ্চরণক্ষেত্র গড়ে তুলেছিল। তখনো তাঁর মন শান্ত হয় নাই। তখনো তাঁর কর্মপন্থা নির্দিষ্ট হয় নাই। দুর্ভিক্ষের মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখে তাঁর গুরুর হৃদয় যেমন বিগলিত হয়েছিল এবং তার প্রতিকারকল্পে তাঁকে অস্থির ক'রে তুলেছিল, চারিদিকের লোকের একটানা দুঃখদৈন্য দেখে বিবেকানন্দের হৃদয়েও তেমনি প্রচণ্ড আঘাত লাগল এবং অবিলম্বে সে দুঃখকষ্টের স্থায়ী প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করতে তিনি প্রায় পাগল হয়ে উঠলেন; এ দৃশ্য অসহ্য, অবিলম্বে কাজে লেগে পড়ার জন্য নিজেকে তৈরী না করলে আর চলে না। এর জন্য তাঁর প্রয়োজন চিন্তার একাগ্রতা, দেশের লোকের অবস্থার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয়, এবং হিন্দুশাস্ত্র ও আধুনিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে আরো গভীর, আরো বিস্তৃত জ্ঞান। ইতিপূর্বে ভ্রমণ উপলক্ষ্যে উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র জনগণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন, এখন ঠিক করলেন দক্ষিণভারতের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে কন্যাকুমারীর পুণ্য মন্দিরে মাকে দর্শন করবেন; তাহলেই হিমালয় থেকে কুমারিকা-অন্তরীপ পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের কাজ সম্পূর্ণ হবে। আর এই পরিকল্পিত পথে সম্পূর্ণ একাকী

চলে তিনি এসব দেখতে চাইলেন, যাতে যে-সমস্যাটির আশু সমাধানের জন্য তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠেছে, পুরো মনটাই সেই সমস্যার ওপর দিতে পারেন। কিছুদিনের মতো তাঁকে গুরু-ভাইদের কথা ভুলে থাকতে হবে, তাঁর ভালবাসা ও উৎকণ্ঠার ওপর গুরুভাইদের যে দাবী তা উপেক্ষা করতে হবে; জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য এবং তাঁর প্রিয়তম গুরুর আদেশ পালন করার জন্য তিনি তা করতে পারবেন। এই ভেবে গুরুভ্রাতাদের প্রতি স্নেহের বন্ধনকে ছিন্নভিন্ন ক'রে ১৮৯: খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাসে তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে সরে পড়লেন।

(ক্রমশঃ)

গান

শ্রীপ্রবীরকুমার রায়

ধুলায় কেন চরণ তোমার
ধুসর মলিন হবে,
হে দয়াল, উৎকণ্ঠে হিয়া
পদপরশ লোভে।

যুগে যুগে তব প্রকাশ প্রভু,
প্রতি হিয়ার বিচিত্রতায় তবু
চির নুতন হয়েই সদা রবে!

ব্যাপ্ত কর আমায় প্রভু
তোমার সৃষ্টি জুড়ে,
সকল স্বার্থ বিলীন হোক
নিখিল হৃদয় ভরে।
অন্তবিহীন প্রকাশ মাঝে
যেথায় তোমার স্বরূপ রাজে
তারি মাঝে আমায় তুমি লবে।

প্রার্থনা

ডক্টর মতিলাল দাশ

হৃদয় মাঝে ভেষজ আনো, শম্ভু, তুমি মধুর বায়ু
হৃদয় ভরো আনন্দেতে দাও আমাদের দীর্ঘ আয়ু। ১
তুমি মোদের পরম পিতা, তুমি মোদের সোদর ভ্রাতা
শক্তি দেহ জীবন ভরে হও আমাদের দুঃখত্রাতা। ২
তোমার ঘরে সুধা আছে অমৃত যে পরম নিধি
দাও আমাদের প্রাণের তরে নবীন প্রাণের নবীন বিধি। ৩

[ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল, ১৮৬ সূক্ত]

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীগুরুদাস দাশ

'ওরে, ভীরু কাপুরুষ ধর্ম বোঝে কি? কোথা পাবে সেই শক্তি?
তোরা দুর্বলে আগে বলশালী কর্, তারপরে শোনা মুক্তি!'
বল কোন্ সে দিশারী কম্বুকণ্ঠে নির্ঘোষে হেন বাণী?
করে উষর মরুরে উর্বরা ভূমি দীন-দরদী-ধ্যানী!
নিতি উদ্দাম কার কর্মের গতি মুক্ত করিতে বিশ্ব?
সে যে বিন্দুর মাঝে সিন্ধু গড়িছে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য!

সদা দুর্গত-জন-দৈন্য ঘুচা'তে বিহ্বল কার চিত্ত?
কতো অজ্ঞ-জনারে জ্ঞান বিতরে, উন্নত করে নিত্য!
চির- মুক্তিরে কেবা তুচ্ছ করে গো মানুষের সেবা-কর্মে?
কে সে মুক্ত পুরুষ মুক্তি বিলায় শ্রেষ্ঠ মানব-ধর্মে!
কেবা বিশ্ববাসীর ভ্রান্তি ছুটায়—মোহ-কালিমা-দ্বন্দ্ব?
সে যে বাংলার ছেলে বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ!

সমালোচনা

আচার্য অভেদানন্দ : হাসিরাশি দেবী। পৃষ্ঠা ১০৬, মূল্য দুই টাকা। **Swami Abhedananda The Patriot Saint :** Asutosh Ghosh ; Price Rs. 2/-. প্রকাশক : শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬।

স্বামী অভেদানন্দজীর শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-আয়োজিত বর্ষব্যাপী উৎসব-আয়োজনের অঙ্গস্বরূপ উক্ত মঠের কর্তৃপক্ষ বাঙালী ও বিশ্ববাসী পাঠকবর্গের উদ্দেশ্যে উপহারস্বরূপ এই সংক্ষেপিত জীবনীদুটি প্রকাশ ক'রে পাঠকসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। স্বল্প পরিসরে শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান কালীতপস্বীর জীবন, বাণী ও সাধনার পরিচয়-লাভে সমুৎসুক পাঠকদের কাছে এই শোভন সংস্করণে অথচ স্বল্প মূল্যে প্রকাশিত দুটি রচনাই বিশেষ সমাদরের সঙ্গে রক্ষণযোগ্য।

বাইরের ঘটনাবৈচিত্র্য যথেষ্ট থাকলেও স্বামী অভেদানন্দজীর জীবনকথার আসল তাৎপর্য অসাধারণ মনন-মহিমায়। কলকাতা-জীবনের প্রথম পর্বের পর বেদান্তপ্রচারে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় আমেরিকায় ব্যয়িত। এই দুই পর্বেই জ্ঞাননিষ্ঠ অধ্যাত্মসাধক ও অধ্যাত্ম-উপদেষ্টারূপে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যদৃষ্টিতে পূর্বজন্মের মহাযোগী এই সাধকের এই ছিল শেষ জন্ম। তাই হয়তো জ্ঞানসাধনার নিরন্তর চর্চা ও চর্যাই স্বামী অভেদানন্দের অন্তর্মুখী জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কর্ম ও ভক্তির সম্মেলনে অভেদানন্দ-জীবনকথা পূর্ণতালাভ করেছে।

তবু তাঁর জন্মকাহিনী থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যলাভ, কঠোর তপস্যার ধ্যানমগ্নতা থেকে বিশ্বের দরবারে ভারতের বাণী সমুপস্থিত করার বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব, জীবনসায়াহ্নে তাঁর প্রিয় জননী-জন্মভূমির কল্যাণকল্পে চিন্তা ও প্রচেষ্টা— এ সবই শ্রদ্ধেয়া লেখিকার আলোচ্য জীবনীটিতে নিগূঢ় ব্যঞ্জনাময় অধ্যাত্ম-ইতিহাসের অঙ্গস্বরূপ হয়ে উঠেছে। ঘটনাগ্রন্থন এবং চিন্তারাশির সংহত রূপায়ণে তাঁর প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। তবু প্রথমাংশের তুলনায় বাংলা জীবনীর শেষাংশ একটু শিথিলবিন্যস্ত। পরবর্তী সংস্করণে এ দিকে দৃষ্টি দিলে জীবনীটি আরও উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ ইংরেজী জীবনীটির যে নাম দিয়েছেন তার তর্জমা—'স্বামী অভেদানন্দ : দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ'। সংক্ষিপ্ত আকারে সরল ভাষায় তিনি অভেদানন্দজীবন-ও মননের প্রধান বক্তব্যগুলি সবই বলতে পেরেছেন—এটি কম কৃতিত্বের কথা নয়। স্বামী অভেদানন্দ যে 'সবার উপরে জন্মসিদ্ধ দার্শনিক ও সৃজনশীল চিন্তানায়ক' ('After all Swami Abhedananda was a born philosopher and a creative thinker')—শ্রীঘোষের এই মন্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে ভারতাত্মার অনুধ্যানে ও ভারতকল্যাণে সদাজাগ্রতপ্রাণ এই মহাপুরুষের স্বদেশপ্রীতির প্রেরণাসঞ্চারের বৈশিষ্ট্যটুকুও আমরা এই জীবনীর অন্ত্যভাগে সানন্দে লক্ষ্য করতে পারি। মহৎজীবনের অনুধ্যানে আমরা মুহূর্তের জন্য হ'লেও সেই মহত্ত্বের অংশভাগী। আলোচ্য জীবনীদুটিই সেদিক থেকে প্রেরণার পাথেয়স্বরূপ।

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

ওরাও জানে বাসতে ভাল : লেখা ও আলোকচিত্র : শিশির চৌধুরী ; প্রকাশক : প্রকাশন বিভাগ, চিত্রাংশু, ৩৯, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা ২৯ ; মূল্য : দুই টাকা।

পৃষ্ঠা কুড়ির এই নয়নলোভন শিশুপাঠ্যগ্রন্থটি হাতে নিয়ে প্রথমে মনে হ'তে পারে যে, বিদেশী কোনো বিখ্যাত প্রকাশকের চিত্রোজ্জ্বল একটি সংস্করণ হাতে এসে পড়লো বুঝি। ছোটদের জন্য এমন যত্ন, কল্পনাশক্তি ও আন্তরিকতায় মণ্ডিত প্রকাশন যে এ দেশেও সম্ভব তার প্রমাণ এই আশ্চর্যসুন্দর শিশুসাহিত্যের উদাহরণটি। এর পাতায় পাতায় সুন্দর আলোকচিত্রের সঙ্গে নিটোল একটি গল্পকথা, একটি ছোট্ট মুর্গী-পরিবারের সঙ্গে একটি মানবপরিবারের আন্তরিকতা ও মমতার বিষণ্ণমধুর কাহিনী ফুটিয়ে তুলেছে। কবি ও শিল্পীর এমন যুগল অধিকার নিয়ে খুব কম লেখকই বাংলাসাহিত্যে দেখা দিয়েছেন। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় —প্রতিভার এই পুষ্পাঞ্জলি নিবেদিত হয়েছে বাংলার ঘরে ঘরে সেই সব শিশু-নারায়ণদের উদ্দেশে, যাদের আনন্দ ও শিক্ষালাভ দুই-ই এই গ্রন্থের দ্বারা সার্থক হয়ে উঠবে।

এমন একটি উচ্চমানের শিশুসাহিত্যের প্রকাশনের প্রতি দেশবাসীর এবং বাংলা ও ভারতের প্রকাশকমণ্ডলীর বিশেষ দৃষ্টিপাত স্বাভাবিক ভাবেই আশা করা যায়। ছোটদের জন্য শ্রেষ্ঠ লেখামাত্রেই বড়োদেরও সমান আগ্রহ ও উপভোগের বিষয়—এ বইটির পাতায় পাতায় তার নিশ্চিত প্রমাণ।

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা : অনিল বিশ্বাস। প্রকাশক : শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। পৃষ্ঠা ১৪৮ ; মূল্য পাঁচ টাকা।

এমন এক সময় ছিল যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বলিলে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বুঝাইত এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা মনে আসিত। আশুতোষ ছিলেন স্বনামধন্য পুরুষ, বহুমুখী ছিল তাঁহার প্রতিভা, কিন্তু তাঁহার শিক্ষাচিন্তার স্থান সর্বোচ্চে। দেশের সন্তানগণকে কিভাবে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবেন—এই সাধনায় তিনি মনপ্রাণ নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

শ্রীঅনিল বিশ্বাস 'আশুতোষ সংগ্রহশালা' হইতে এবং অন্যান্য সূত্র হইতে অতি মূল্যবান প্রামাণিক তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া 'আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা' শিক্ষাব্রতীদের উপহার দিয়াছেন। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা দিয়াছে, সেইজন্য এই গ্রন্থখানির মূল্য অপরিসীম। মনীষী আশুতোষের শিক্ষা সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত শিক্ষাকর্ণধারগণকে যথাযথ দিগ্‌দর্শন দিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

আশুতোষের প্রতিভার যেমন পরিচয় রহিয়াছে এই গ্রন্থে, তেমনি পাওয়া যাইবে বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ও নির্দেশ। "উত্তরকালে যাঁহাদের হস্তে বাঙ্গালার সারস্বত রাজ্যের ভার অর্পিত হইবে, তাঁহারা যদি বঙ্গভাষাতেই স্ব স্ব জ্ঞানের চরম ফল লিপিবদ্ধ করিয়া যান, তখন বিদেশীয়গণের অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিকেই আগ্রহপূর্বক বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে হইবে।" —শিক্ষানায়ক আশুতোষের এই নির্দেশ অনুধাবন ও শিরোধার্য করিবার সময় আসিয়াছে।

গ্রন্থের পরিশিষ্টে আশুতোষের রচনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন ও গ্রন্থপঞ্জী প্রদত্ত হওয়ায় গ্রন্থখানির মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে

জেনারেল প্রিণ্টার্স ও পাব্লিশার্সকে শোভন মুদ্রণ সহকারে এই গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

সূফী-গাথা (ভূমিকা)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক: শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায়, ভারত-প্রকাশভবন, ২৪বি, বুধু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ৮৪; মূল্য এক টাকা।

সূফীগণ একটি ঐশ্লামিক সম্প্রদায় বলিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধ। সূফী-সাধনায় পরমেশ্বরকে দয়িত মনে করিয়া তাঁহার সহিত মিলনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। প্রেমনিষ্ঠ আরাধনা এই সাধনার মর্মবাণী।

গ্রন্থকার সূফী-গাথার ভূমিকা-রচনায় ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, কঠোপনিষৎ, মহানির্বাণতন্ত্র, ঋগ্বেদ, চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উপযুক্ত উদ্ধৃতি বিশেষ বিশেষ স্থানে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। ভূমিকাটি পাঠ করিলেই 'সূফী-গাথা' সম্বন্ধে পাঠকবর্গের একটি পরিষ্কার ধারণা হইবে।

'মসনবী' হইতে উদ্ধৃতিগুলির সাবলীল ব্যাখ্যা মনে রাখিবার মতো।

সুপণ্ডিত গ্রন্থকারকে আমরা মূল গ্রন্থখানি সত্বর প্রকাশ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

বেদপরিচয়—সত্যবান। প্রকাশিকা: অমিতা দেবী, ৭৮।২।১১, বীরেন রায় রোড (ওয়েস্ট), কলিকাতা ৩৪। পৃষ্ঠা ১৬২; মূল্য পাঁচ টাকা।

'দৈনিক বসুমতী'তে ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রকাশিত ছোটদের জন্য সহজ সরল ভাষায় লিখিত জ্ঞানগর্ভ আলোচনাগুলি বর্তমানে গ্রন্থরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত। নিঃসন্দেহে বলা যায়—শুধু ছোটরা নয়, বড়রাও এই পুস্তকপাঠে উপকৃত হইবেন। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

অপৌরুষেয় 'বেদ' সম্বন্ধে জানা খুব কম লোকেরই আছে। সুপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ গ্রন্থকার গল্প বলার ভঙ্গীতে ভারতের শাশ্বত মহিমা সাধারণ পাঠকসমাজের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছেন।

গ্রন্থে বেদ কি, বেদ ও শিক্ষা, দেবতা শব্দের অর্থ, বেদপাঠের ফল প্রভৃতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন পরিচ্ছেদে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক কিছু এবং প্রত্যেক যুগের বৈশিষ্ট্য বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে পরিবেশিত। পরিশিষ্টে উপনয়নসংস্কার, গায়ত্রীর অর্থ, প্রণবের রহস্য, প্রাণায়ামের ফল প্রভৃতি যুগোপযোগী করিয়া আলোচিত। বেদ-বহির্ভূত অনেক জিনিস আলোচ্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পুস্তকখানির নামকরণটি তাৎপর্যবোধক হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

ওড়িশা : গত এপ্রিল (১৯৬৮) মাসে ওড়িশার কটক জেলায় পট্টমুণ্ডাই সেবাকেন্দ্র হইতে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বাত্যাবিপর্যস্ত জনগণের সেবাকার্যে চাল ৪,৩৩৫'৫ কেজি ও আটা ১৩৯'৫ কেজি ১,২৫৯ ব্যক্তিকে বিতরণ করা হইয়াছে। ১৭৫টি তুলার কম্বল, একখানি পশমী কম্বল, ২৯ খানি ধুতি, ২ খানি রঙিন কাপড়, ৮৫টি পায়জামা ও ২৭ জোড়া পশমী মোজা ২০৮ জনকে দেওয়া হইয়াছে। ৫৪,৩৬০ জনকে (সমষ্টি সংখ্যা) ৮৭৫ কেজি গুঁড়া দুধ দেওয়া হয়। পট্টমুণ্ডাই তহশীলের গ্রামসমূহে ৩টি নলকূপ বসানো হইয়াছে।

পট্টমুণ্ডাই সেবাকেন্দ্রের বাত্যাপীড়িতদের সেবাকার্য শেষ হওয়ায় গত ২৬শে এপ্রিল কেন্দ্রটি বন্ধ করা হইয়াছে।

ওড়িশার ঢেনকানল জেলায় শীঘ্রই খরাত্রাণ-কার্যের জন্য একটি সেবাকেন্দ্র খোলা হইবে।

মহারাষ্ট্র : গত ১৩ই এপ্রিল হইতে ১২ই মে, ১৯৬৮, রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মহারাষ্ট্রের কয়না এবং সাতারায় ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত জনগণের সেবাকার্যে ৭১৪'৪৭ কুইণ্টাল গম বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা— ১৭,৩০৩।

কার্যবিবরণী

লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র

লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। লণ্ডনের এই কেন্দ্রটি ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে স্বামী ঘনানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ৬৮ নং ডিউকস অ্যাভেনিউ, মাসওয়েল হিল, লণ্ডন এন. ১০-এ নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে ৫৪ নং হল্যাণ্ড পার্ক, লণ্ডন ডব্লিউ. ১১-তে একটি গৃহে শাখাকেন্দ্রও খোলা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে লণ্ডনের প্রধান কেন্দ্র ও শাখা—উভয় স্থানে নির্ধারিত কর্মধারা যথারীতি অনুসৃত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে উভয় কেন্দ্রের মোট পরিদর্শক-সংখ্যা ৭,৬৩৯; তন্মধ্যে শাখাকেন্দ্রের পরিদর্শক ১,৭৯৯ জন। কেন্দ্রদ্বয়ে অনুষ্ঠিত সভাসমূহের শ্রোতৃসংখ্যা ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে।

লণ্ডন প্রধান কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত 'Vadanta for East and West' পত্রিকাখানি ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ভারতের ও পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের রচনা-সম্ভারে সজ্জিত হইয়া 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থ শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করিবে। ১,০০০ পাউণ্ডের অধিক মূল্যের পুস্তকাবলী, ছবি প্রভৃতি লণ্ডন কেন্দ্র হইতে বিক্রীত হইয়াছে। ক্রেতাদিগের মধ্যে অনেকে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের এবং নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী।

৫৪ নং হল্যাণ্ড পার্ক কেন্দ্রে স্বামী ঘনানন্দ ১৭টি রবিবাসরীয় সভা পরিচালনা করেন। স্বামী পরহিতানন্দ ১৯টি রবিবাসরীয় সভা ছাড়া ব্র্যাডফোর্ড ও সাদামটন বিশ্ববিদ্যালয়ে, বান্ধব সমিতিতে ও ট্রেনিং কলেজে বক্তৃতা দেন। স্বামী শান্তানন্দ আমেরিকা হইতে ভারত প্রত্যাবর্তনকালে লণ্ডন হইয়া যান, এই সময় তিনি হল্যাণ্ড পার্ক আশ্রমে 'কর্ম ও যোগ' সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

লণ্ডন বেদান্ত কেন্দ্র 'কমনওয়েলথ ওয়ার

গ্রেভস্ কমিশন'-এর সহিত সহযোগিতা করেন এবং যে-সব দেশে ভারতীয়েরা আছেন, সেখানে বিজ্ঞপ্তি পাঠাইয়া অনুরোধ করেন, দুইটি যুদ্ধে যাঁহারা মৃত্যু বরণ করিয়াছেন তাঁহাদের জন্য ২১শে মে দিনটি 'প্রার্থনা-দিবস'-রূপে যেন উদ্‌যাপিত হয়। স্বামী ঘনানন্দ 'ওয়ার গ্রেভস্ কমিশন' কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া ওয়েষ্ট-মিনিস্টার অ্যাবে-তে ২১শে মে অনুষ্ঠিত সান্ধ্য প্রার্থনা-সভায় যোগদান করেন। রয়্যাল কমনওয়েলথ কর্তৃক মার্লবরো-ভবনে আয়োজিত সভাতেও স্বামী ঘনানন্দজী আমন্ত্রিত হইয়া যোগ দেন।

শ্রীভদ্রগিরি কেশবদাস কর্তৃক দুইটি হরি-কথার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয় মাসওয়েল হিলের আশ্রমে। দ্বিতীয়টি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ক্যাকস্টন-হলে ভারতের দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যার্থে। উভয় স্থানে দুই দিন শ্রী টি. এস. এস. রাজ কর্তৃক বীণা-বাদনের ব্যবস্থা করা হয় দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের সাহায্যার্থে।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্ম-তিথি যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী, দুর্গাষ্টমী এবং খৃষ্টজন্মদিনও যথারীতি উদ্‌যাপন করা হইয়াছে।

আমেরিকায় বেদান্ত

রামকৃষ্ণ-বেদান্ত কেন্দ্র, নিউ-ইয়র্ক—এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও প্রচারক স্বামী নিখিলানন্দজী গত মার্চ, ১৯৬৮ প্রতি রবিবার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেন :

শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অনুভূতি; ভগবদ্গীতার জ্ঞান; ঈশ্বর, আত্মা ও বিশ্ব; ঈশ্বরকে কেন জানিবার চেষ্টা কর না? ব্রহ্ম—আত্মা—ওঁ।

এতদ্ব্যতীত তিনি প্রতি শুক্রবার ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করেন।

উৎসব সংবাদ

নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১লা মার্চ হইতে ৮ই মার্চ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব আটদিনব্যাপী কার্যসূচীর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যহই সকালে পূজাপাঠাদির ব্যবস্থা ছিল।

১লা মার্চ: দুপুরে প্রায় ৩/৪ শত নর-নারীকে বসাইয়া এবং অনেককে হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়, বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ কাজী মোতাহের হোসেন সাহেবের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বামী যোগদানন্দ ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ পোদ্দার শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। ডঃ মোতাহের হোসেন তাঁহার ভাষণে বর্তমান বিশ্বে সর্বপ্রকার বিভেদ ভুলিয়া প্রকৃত শান্তিলাভের উপায় সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও কোরানের মহাবাণীগুলি জীবনে বাস্তবায়িত করিবার জন্য বিশেষ জোর দেন।

২রা মার্চ: বিকালে ঢাকা হাইকোর্টের এডভোকেট অধ্যাপক বি. কে. পাণ্ডে মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্বামীজীর জীবন-আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্বামী যোগদানন্দ, শ্রীমণ্টু সরকার, শ্রীঅনিল সরকার, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দাস ও ব্রহ্মচারী সুকুমার স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে বলেন: স্বামীজীর বাণী সর্বজনীন। বিশ্বের সমস্ত ধর্মের বাণী মূলতঃ এক। বিভিন্ন ধর্মে উপাস্যের নাম ভিন্ন হইলেও সকলেই একই ভগবানের আরাধনা করে। সভান্তে রাত্রে রামায়ণ-গান হয়।

৩রা মার্চ : বিকালে পাকিস্তানের খ্যাতনামা মহিলা-কবি বেগম সুফিয়া কামালের সভানেতৃত্বে এক মহিলাসভার আয়োজন করা হইয়াছিল। স্বামী যোগদানন্দ, ব্রহ্মচারী সুকুমার ও বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষয়িত্রী হেনা দাস শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন। সভাশেষে রাত্রিতে রামায়ণ-গান হয়।

৪ঠা মার্চ : অপরাহ্ণে অধ্যক্ষ খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পরিষদের সভ্য এবং সিটি ল-কলেজ একাডেমীর অধ্যক্ষ ডঃ আলীম-আল-রাজী প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। রামমালা ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ ডঃ রাসমোহন চক্রবর্তী স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-দর্শন সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন।

অধ্যাপক বি. কে. পাণ্ডে, অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ, শ্রীশচীন্দ্রনাথ পোদ্দার, মিঃ শহীদুল্লা কাইসার ও ব্রঃ সুকুমার স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

প্রধান অতিথি তাঁহার ভাষণে ধর্মেতিহাসের প্রথম হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত আলোচনা করিয়া অকুণ্ঠচিত্তে দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, বিশ্বে শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মহামানবের আগমন পূর্বে কখনও হয় নাই, মানুষকে পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মহাবাণীগুলি অনুসরণ করিতে হইবে। সভাপতি তাঁহার ভাষণে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের উপর আলোকপাত করেন। ৫ই মার্চ হইতে ৭ই পর্যন্ত শ্রীশ্রীনামসংকীর্তন সম্পন্ন হয়।

৮ই মার্চ দুপুরে প্রায় ১৭।১৮ হাজার নরনারী বসিয়া খিচুড়ি-প্রসাদ পান।

বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব ও আশ্রম-বিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক উৎসব (১৯৬৮) গত ১৭ই মে হইতে দিবসত্রয় আশ্রম-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিবস অবিচ্ছেদে উদয়াস্ত স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা পাঠ হয়। বিকালে সঙ্গীতাদির পর ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী জীবানন্দ ও স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ উভয়েই স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে মুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দ স্বামীজীর বাণী দুর্নীতি-দমনে ও মানুষ-গঠনে যে একান্ত সহায়ক তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করেন। সভাশেষে 'জয়দেব' চলচ্চিত্র বিপুল-সংখ্যক দর্শকের চিত্তবিনোদন করে।

পরদিবস অপরাহ্ণে মাথুর-পালাকীর্তন, ব্যায়াম প্রদর্শনী, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়। রাত্রি নয়টার পর কাসুন্দিয়া (হাওড়া) মায়ের মন্দির কর্তৃক 'ভগবান যুগে যুগে' লীলাকীর্তন এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

১৯শে মে নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুসারে আশ্রমস্থ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ আবৃত্তি, গান, বিতর্ক ও বক্তৃতার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। এইদিন সকালে প্রার্থনাগৃহে ৺কৃপাময়ী কালীকীর্তন সম্প্রদায় মায়ের নাম কীর্তন করেন। বৈকালে বিদ্যালয়সমূহের পুরস্কার-বিতরণী সভায় আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী নির্জরানন্দ প্রথমে বিদ্যালয়সমূহের ধারাবাহিক বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। তৎপর শ্রীহিমাংশুবিমল মজুমদার সভাপতির ভাষণে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বহু জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। প্রধান অতিথি শ্রীমতী মজুমদার ছাত্রদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন। রাত্রে বিচিত্রানুষ্ঠান ও একাঙ্কিকা নাটিকা অভিনীত হওয়ার পর উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

বিবিধ সংবাদ

অখিল ভারত নিবেদিতা ব্রতীসঙ্ঘ : 'ভগিনী নিবেদিতার চিন্তাধারা' বিষয়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষাসেবা আলোচনাচক্র

বর্তমানে আমাদের দেশে এক নিদারুণ আদর্শের সঙ্কট ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে, যাহার ফলে দেশের তরুণ-সমাজ তথা নারীসমাজের মধ্যে জীবনবোধে বিশ্বাসের অভাব, উদ্দেশ্যহীনতা, আদর্শের ক্ষেত্রে ঐকান্তিক শূন্যতা ক্রমশঃ এক গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা নানা অবাঞ্ছিত কার্যকলাপে প্রকটিত। এ অবস্থার নিরাকরণার্থে প্রয়োজন সর্বাগ্রে দেশের নারীসমাজকে ভারতের চিরাগত মূল্যবোধের উপর দাঁড় করানো, কারণ ভগিনী নিবেদিতার ভাষায় "দেশের নৈতিক সভ্যতার রক্ষয়িত্রী তাহার নারীসমাজ"। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য কিছুকাল পূর্বে কতিপয় শিক্ষিকা, ছাত্রী ও সমাজ-সেবিকা অগ্রণী হইয়া একটি সর্বভারতীয় সংস্থা গঠন করেন। যাঁহার মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় নারীর পুণ্যময়তা এবং আধুনিক নারীর ব্যবহারিক জ্ঞান-বিস্তার অপূর্ব সম্মিলন ঘটিয়াছে—সেই মহীয়সী নারী নিবেদিতার নামেই এই সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে। বিগত ১৫ই জানুআরি শ্রীসারদা মঠের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার শুভেচ্ছা গ্রহণ করিয়া ডঃ রমা চৌধুরীকে সভানেত্রী-পদে বরণ করিয়া এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত ১৯শে জানুআরি সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ইহার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন-কার্য সম্পন্ন করেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী। সম্প্রতি দশটি পাঠচক্র, একটি রবিবাসরীয় সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়, দুইটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এই সঙ্ঘ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে (কার্যালয়—ব্লক এ, ফ্ল্যাট নং ২, এণ্টালী গভর্ণমেণ্ট হাউসিং এস্টেট, কলিকাতা ১৪)।

গত ২৯শে ও ৩০শে এপ্রিল সন্ধ্যায় এই সঙ্ঘের উদ্যোগে এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় গোলপার্কস্থিত বিবেকানন্দ-হলে শিক্ষার্থী-শিক্ষাসেবী মণ্ডলীকে লইয়া 'নিবেদিতার চিন্তাধারা' বিষয়ে একটি আলোচনাচক্রের অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিনের সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী চিদাত্মানন্দজী। নিবেদিতার 'জাতীয় ও পৌর আদর্শ', 'জীবন-দর্শন' ও 'ধর্মের ধারণা' সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনা করেন যথাক্রমে ডাঃ সুবিমল মুখোপাধ্যায়, প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা ও অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা। নিবেদিতার 'ভারতবোধ', 'শিক্ষাচিন্তা', 'কবি-মানস' এবং 'শিল্পমানস' সম্পর্কে গভীর আলোকপ্রদ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন যথাক্রমে অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ, ডঃ উমা রায়, প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা ও শ্রীমতী সুধা বসু।

সভায় স্বাগত সম্ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে সঙ্ঘের সভানেত্রী ডঃ রমা চৌধুরী এবং সম্পাদিকা অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত। বহু ছাত্রছাত্রী সহ প্রথম দিনের সভায় সহস্রাধিক ও দ্বিতীয় দিনের সভায় পাঁচশতাধিক জনসমাগম হয়।

উৎসব ও সভাদি

ভাঙ্গামোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ৩১শে মার্চ পূজাপাঠ, রামায়ণগান ও আলোকচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী-প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়। প্রায় সাড়ে চার হাজার ভক্ত দুপুরে

প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকালে ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ ও প্রধান অতিথি শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন আলোচনা করেন।

আগরতলা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদেশ্বরী মঠে গত ৫ই হইতে ৭ই এপ্রিল পূজাপাঠাদি, শতাধিক বস্ত্রবিতরণ ও প্রায় দ্বি-সহস্রাধিক লোকের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন দিনে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী চিদাত্মানন্দজী, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ, শ্রীমণীন্দ্র ভৌমিক, ডাঃ নীরা চাটার্জী, শ্রীঅমূল্যকিশোর লোধ, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমতী বেবী গুপ্তা প্রভৃতি। উৎসবান্তে স্বামী চিদাত্মানন্দজী উদয়পুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, বাইখোড়া স্কুল, গাঙ্গাইল রোডস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও অন্যান্য স্থানে কয়েক দিন ভাষণ দেন।

১১ই এপ্রিল স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মঠে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

সিন্ত্রী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ৭ই এপ্রিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি-প্রতিষ্ঠাকার্য সুসম্পন্ন হয়। স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী ঐ কার্য সম্পন্ন করেন। ঐদিন সমবেত সহস্রাধিক নরনারী পূজাদর্শন ও পুষ্পাঞ্জলিপ্রদানের পর বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় অধ্যাপক শ্রী কে. পি. গুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী ইংরেজী ও বাংলায়, স্বামী পূজ্যানন্দজী হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর জীবন আলোচনা করিবার পর সভাপতি সারগর্ভ ভাষণ দান করেন।

মন্দির-নির্মাণে প্রায় ৩৬,০০০৲ খরচ হইয়াছে এবং সমস্ত টাকাই ভক্তেরা দান করিয়াছেন।

ভদ্রকালী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাচক্রের মুখপত্র 'সারদা'র ১ম সংখ্যা প্রকাশ উপলক্ষ্যে গত ২০শে এপ্রিল একটি সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ প্রধান অতিথি হিসাবে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন; ইঁহারা এবং বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। স্থানীয় ভক্তবৃন্দের এবং সহৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

সারদা সংঘের (কলিকাতা) উদ্যোগে গত ২২শে এপ্রিল রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অব্ কালচারের বিবেকানন্দ হলে ভগিনী নিবেদিতা শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সম্পাদক স্বামী ভূতেশানন্দজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ডঃ রমা চৌধুরী, অধ্যাপিকা রেবা ভট্টাচার্য, এবং প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা নিবেদিতার বাণী আলোচনা করেন। সভাপতি মহারাজ তাঁহার ভাষণে বলেন যে, নিবেদিতা শ্রীশ্রীমাকে নারীকুলের আদর্শ মনে করিতেন। ভারতের সহিত একাত্ম হইয়া তিনি ভারতের কল্যাণে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীমতী সুভদ্রা হাক্‌সার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরলোকে সুধীরচন্দ্র দাশগুপ্ত

বিক্রমপুর, কলমা (ঢাকা)-নিবাসী সুধীরচন্দ্র দাশগুপ্ত গত ৫ই এপ্রিল,'৬৮ ৬২ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া ২২শে সজ্ঞানে পরলোক গমন করিয়াছেন। সত্যনিষ্ঠ, সদালাপী ও সতত সদাচারী সুধীরবাবু স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর সিভিল ইঞ্জিনীয়ার (বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত) ছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত জীবনে তিনি বিভিন্ন লোককল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পূত আত্মা শ্রীভগবচ্চরণে মিলিত হইয়া শান্তিলাভ করুক।

উদ্বোধন

দিব্য বাণী

বেদমনূচ্যাচার্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি।—সত্যং বদ। ধর্মঞ্চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।

—তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ১।১১।১

শিষ্যগণ করি যবে পাঠ সমাপন
বরণ করিতে যায় গার্হস্থ্য জীবন,
গুরু তাঁহাদের কন সে জীবন-পথে
কিভাবে চলিবে লব্ধ বিদ্যার আলোতে :
"(শিক্ষা সমাপন করি গার্হস্থ্য জীবন
বরণ করিছ তুমি। তব আচরণ
শিক্ষিতের আচরণ ; জীবন তোমার
সমাজ-জীবন 'পরে প্রভাব বিস্তার
করিবে বিপুলভাবে ; এই কথা যেন
কোন দিন নাহি হয় তব বিস্মরণ।
তোমার প্রতিটি কর্ম, প্রতি ব্যবহার
হয় যেন অনবদ্য, তব সদাচার।)
কবে সত্য কথা, ধর্ম-অনুষ্ঠানে রত
রবে সদা, শাস্ত্রপাঠে হবে না বিরত।
ধনদানে আচার্যেরে সন্তুষ্ট করিয়া
পালিও সংসারধর্ম গৃহেতে ফিরিয়া।
সত্য হতে, ধর্ম হতে হ'য়ো না বিচ্যুত,
ধনদ মঙ্গল কর্মে রবে নিয়োজিত।
শাস্ত্র-অধ্যয়ন আর শাস্ত্রের ব্যাখ্যান
অনলস ভাবে যেন ক'রো আজীবন।"

দেবপিতৃকার্যাভ্যাম্ ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি। ২

"দেবকার্য, পিতৃকার্য অবশ্য সাধিবে ;
মাতা, পিতা, আচার্যেরে দেবতা ভাবিবে,
অতিথিও দেব জানি'—এ সকল জনে
সেবাদি করিবে সদা ভগবান-জ্ঞানে।
যা কিছু করিবে তুমি তা যেন সতত
হয় অনিন্দিত, হয় শিষ্টানুমোদিত।
নিন্দিত, অভদ্র কর্ম ক'রো না কখন ;
আমরা, আচার্যগণও হেন আচরণ
করি যদি, যাহা নয় শিষ্টজনোচিত,
যাহা নয় সদাচার—রহিবে বিরত
তদনুকরণ হতে ; শুধু নিবে তাহা
আমাদেরও আচরণে সদাচার যাহা।"

যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। ৩

"শ্রেষ্ঠ যাঁরা, উচ্চাসনে তাঁহাদেরে বরি'
লইবে সহজ ভাবে—সে-আসন হেরি
ঈর্ষাবশে দীর্ঘশ্বাস যেন নাহি ঝরে !
যখন করিবে দান, দিবে শ্রদ্ধাভরে —
কখনো ক'রো না দান শ্রদ্ধা-বিরহিত।
দিও না যা মূল্যহীন। বিনয়াবনত,
সতর্ক হইয়া সদা—লজ্জা-ভয়-সহ—
মৈত্রী-ভাবাপন্ন হয়ে দানে রত হ'য়ো।"

অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্তেরন্। তথা তত্র বর্তেথাঃ। ·· এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষদ্। ..." ৪

"(জটিল জীবন পথে চলিতে চলিতে)
কোন আচরণে কিংবা কোন কর্তব্যেতে
সংশয় যদ্যপি জাগে, তাহলে তখন
দেখিবে অপর সব সুধী-র জীবন ;
কেবল পণ্ডিত নয়—শক্তি আছে যাঁর
ভাল-মন্দ নিজে নিজে করিতে বিচার,
অপরের দ্বারা যাঁরা হন না চালিত,
নহে রুক্ষ-মতি, নহে কামনা-তাড়িত—
যাঁরা সদা ধর্মকামী, যাঁহারা ব্রাহ্মণ—
ভগবানে স্থিরমতি, তাঁহারা তখন
তোমার সন্দেহ যাহে সেই আচরণ,
সেই কর্ম যে-ভাবেতে করেন সাধন,
তুমিও তাহাই ক'রো। (জীবন তাঁদের
আঁধার ঘুচাবে তব জীবন-পথের।)
ইহাই শাস্ত্রের বিধি—ইহাই আদেশ,
বেদ-বেদান্তেরও কথা, এই-ই উপদেশ।"

কথাপ্রসঙ্গে

শিক্ষার উন্নয়ন

পরিবেশ

শিশু যখন জগতে আসে, সে আসে ধোয়া মন লইয়া। জগৎ জুড়িয়া সব দেশের শিশুরাই এদিক দিয়া এক—একেবারে প্রথম হইতেই তাহারা শিখিতে শুরু করে; যে দেশে, যে সমাজে তাহারা বড় হইতে থাকে সেখানকার খাওয়া-দাওয়া, রুচি, নীতিবোধ, ধর্মবোধ ক্রমেই সে নিজস্ব করিয়া লইতে থাকে। এই সমস্ত বোধ ক্রমে তাহার ব্যক্তিত্বকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়া তোলে। পৃথিবী জুড়িয়া বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যময় জাতি-সৃষ্টির বিপুলশক্তিময় কারণরূপে এখানে আমরা দেখিতে পাই পরিবেশকে। সীমিত ক্ষেত্রে ইহার অপর নাম ধারাবাহিকতা, 'ট্র্যাডিসন'।

এই পরিবেশ বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় যাহাদের সহিত বাস করিতেছি প্রধানতঃ তাহারাই, যে স্থানে বাস করিতেছি তাহার বাহ্য প্রকৃতিও।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পরিবেশকে তাই বিশেষ স্থান না দিয়া উপায় নাই; এখানে শিক্ষা গ্রহণ করি আমরা স্বেচ্ছায়, স্বাভাবিক ভাবে, অপরের জীবনরূপ পুস্তক পাঠ করিয়া। যাহাদের সহিত বাস করিতেছি, ভাবের আদানপ্রদান করিতেছি, যাহাদের আচরণ সর্বদা চোখে পড়িতেছে, আমাদের মনের উপর প্রাথমিক প্রভাব পড়ে তাহাদেরই। বহুক্ষেত্রে এই প্রভাবগুলিই কার্যকরী হয় প্রায় আজীবন। বিদ্যায়তনের শিক্ষা ছাড়াও কেবল এই পরিবেশ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া জাতীয় আদর্শের চরম উৎকর্ষ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন, এমন মানুষেরও সন্ধান ইতিহাস দেয়।

বৌদ্ধিক ও মানসিক শিক্ষা

শিক্ষার অপর দিকটি আনুষ্ঠানিক। ইহার মোটামুটি দুইটি বিভাগ আছে বলা যায়, যদিও বর্তমান সময়ে আমরা তাহার একটির কথাই মনে রাখিয়াছি, অপরটি ভুলিয়াই গিয়াছি। একটি হইল বৌদ্ধিক শিক্ষা—সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবা করিবার জন্য বিভিন্ন বিদ্যা আয়ত্ত করা; সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করিবার জন্য, ঐ সব বিষয়ে মানবজাতি যুগ-যুগান্তের সাধনায় আজ পর্যন্ত যে-সকল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে ও পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেখান হইতে শিক্ষকের সহায়তায় তাহা আয়ত্ত করা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে অসংখ্য মানুষের জীবনব্যাপী সাধনার ফল-স্বরূপ যে রত্নরাজি মানবজাতির জ্ঞান-ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়াছে এ-যুগে জন্মগ্রহণের ফলেই আমরা তাহা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইতেছি। আমরা শিক্ষালাভ বলিতে প্রধানতঃ এই বিদ্যালাভই বুঝি। শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতির শিক্ষা এই পর্যায়ের অন্তর্গত। দ্বিতীয়টি হইল মনের উন্নতি-বিধানের শিক্ষা। ইহাও প্রথমটির মতো পূর্বগ মানবগণের জীবনব্যাপী সাধনা- ও অভিজ্ঞতা-লব্ধ; কিন্তু ইহা শুধু জানা নহে, এ শিক্ষা লাভ করার অর্থ জীবনে ইহার প্রয়োগ-অভ্যাস; জীবনে রূপায়িত না হইলে ইহা অর্থহীন। এই শিক্ষায় পুস্তক অপেক্ষা পরিবেশের প্রভাব সমধিক।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবেশ ও মানসিক শিক্ষা অবহেলিত

আমাদের দেশে প্রাচীন কালের শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরিবেশ এবং বৌদ্ধিক ও মানসিক শিক্ষা—সকল দিকেই সমভাবে দৃষ্টি রাখা হইত। বর্তমানে পরিবেশ ও মানসিক শিক্ষার দিক দুটির প্রতি আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন। শিক্ষাব্যবস্থায় এ দুটির যে কোন প্রয়োজন আছে, তাহা ভাবিও না।

অথচ বিদ্যার্থীরা বিদ্যায়তন হইতে যখন 'শিক্ষিত' হইয়া বাহির হয়, তখন আমরা ধরিয়া লই তাহারা মানসিক ক্ষেত্রেও উন্নত হইবে, ধরিয়া লই এ বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলেও হইবে এবং না হইলে তাহাদেরই দোষ দিই। বর্তমান সময়ে ঘা খাইয়া এ বিষয়ে খানিকটা হুঁশ আমাদের হইয়াছে, কিন্তু বেশী কিছু হইয়াছে বলিয়াও তো মনে হয় না।

ইংরেজ-প্রবর্তিত এই শিক্ষাব্যবস্থায় প্রথম হইতেই মানসিক শিক্ষার কোন স্থান ছিল না। তথাপি কিছু দিন পূর্ব পর্যন্তও ছাত্রদের মানসিক গঠন কিছুটা হইত। তবে তাহার কারণ ছিল; প্রাচীন যুগ হইতে আগত ভারতের জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতি সমাজের মধ্যে দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনযাত্রাতেই এ শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিয়াছিল। কতকগুলি ছোট খাট বিধিনিষেধ-পালন, সকাল-সন্ধ্যায় কোন-না-কোন আকারে ভগবচ্চিন্তার মাধ্যমে একাগ্রতার সাধনা, রামায়ণ-মহাভারতাদি পাঠ বা শ্রবণের দ্বারা উচ্চজীবনের সহিত পরিচয়, এসবের মাধ্যমেই মনের গঠন কিছুটা হইয়া যাইত স্বাভাবিক-ভাবে, প্রায় অজ্ঞাতসারে। আর, সাধারণতঃ গৃহে বা বিদ্যায়তনে পরিবেশও ছিল এ বিষয়ে অনুকূল—মাতাপিতা, প্রতিবেশী ও শিক্ষক-গণের মধ্য হইতে অনেকগুলি উচ্চজীবনের সংস্পর্শ বিদ্যার্থীরা পাইতই। তাহার ফলে কিছুটা হইত।

কিন্তু সম্প্রতি পারিবারিক জীবন হইতে সে-সব সদভ্যাসগুলি প্রায় বিদায় লইয়াছে গৃহ ও বিদ্যায়তন উভয় স্থানেই অনুকূল পরিবেশের আজ একান্ত অভাব; বরং বলা যায় কোথাও কোথাও ভয়াবহরূপে প্রতিকূল, বিশেষ করিয়া বিদ্যায়তনে। বিদ্যায়তনগুলি শিক্ষার শুভ্র পবিত্র পীঠ না থাকিয়া ক্রমশঃ কালিমালিপ্ত, রাজনৈতিক স্বার্থের সক্রিয় লীলা-ভূমি হইয়া উঠিতেছে। এমনকি শিক্ষকগণও, যাঁহাদের উপর বিদ্যার্থীদের জীবনগঠনের দায়িত্ব অর্পিত তাঁহারাও, বহু ক্ষেত্রে নানা কারণে ছাত্রগণের বিভ্রান্তির কারণ হইতেছেন। আমাদের দেশের বিদ্যার্থিগণের মানসিক শিক্ষার বিপর্যয়ের মূলে গৃহ ও বিদ্যায়তন উভয় স্থানের বিপরীত পরিবেশই ক্রিয়াশীল, তন্মধ্যে শেষেরটির প্রভাবই বর্তমানে অত্যধিক মাত্রায় বেশী। তাছাড়া, প্রথমটিতে ইতিমূলক সচ্চিন্তার অভাব মাত্র, দ্বিতীয়টিতে ইহার অভাবই শুধু নহে, বিপরীত চিন্তা পরিবেশনেরও বিপুল আয়োজন।

প্রাচীন পদ্ধতির সহিত আধুনিক পদ্ধতির সম্মিলনই পথ

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন ও উন্নতিসাধন সম্বন্ধে বহুদিন ধরিয়া বহু শিক্ষাবিদ চিন্তা করিতেছেন, রাষ্ট্রের ব্যবস্থায় ইহা লইয়া অনুসন্ধান, তথ্যাদি সংগ্রহ, আলোচনা প্রভৃতিও হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু এখনো কোন স্থিরসিদ্ধান্ত বা উহা কার্যকরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল না। স্বামী বিবেকানন্দ এবিষয়ে যে সুচিন্তিত সুনির্দিষ্ট অভিমত দিয়া

গিয়াছেন, তাহার কোন মূল্য ইঁহাদের নিকট আছে বলিয়া মনে হয় না। কেহ কেহ যে সেদিকে মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা কখনো করেন না তাহা নহে, কিন্তু তাহার বেশী কিছু নহে, কার্যতঃ তাহার কিছুই গ্রহণ করা হয় নাই। গভীরতর পরিতাপের বিষয়, স্বামীজীর এই শিক্ষাচিন্তাকে বাস্তব রূপ দিবার জন্য স্বল্পসংখ্যক যে কয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সাধ্যমত সচেষ্ট রহিয়াছে, সেগুলির কয়েকটিকে বিব্রত করিয়া অপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সহিত বিপর্যয়ের সমস্তরে নামাইয়া আনিবার জন্য একদল লোক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

রাষ্ট্র ও সমাজের সেবকরূপে যেরূপ শিক্ষিত মানুষ আজ আমরা প্রত্যাশা করিতেছি, স্বামীজীর পরিকল্পনা মতো শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢালিয়া না সাজিলে তাহা পাওয়া যাইবে না। স্বামীজী চাহিয়াছিলেন প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার জাতীয় শিক্ষার মূল ভাবগুলির সহিত আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটাইতে; যাহার ফলে আমাদের বিদ্যার্থিগণ আধুনিক শিল্পবিজ্ঞানাদি শিক্ষায়, বুদ্ধির উৎকর্ষ ও প্রসারে যুগের অধুনা-বিস্তৃত সীমারেখাও স্পর্শ করিতে পারে বা তাহাও অতিক্রম করিয়া যায়, আবার এই বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা মানসিক ক্ষেত্রেও উন্নত হইয়া উঠিতে পারে। ইহার জন্য আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মানসিক শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ এবং এই শিক্ষা আয়ত্ত করার জন্য অভ্যাসের ব্যবস্থা রাখার একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন।

শুধু ভারতেই নয়, আলডাস হাক্সলি-র মতে গোটা পৃথিবীর ছাত্রাবাসগুলিকেই এই আদর্শে ঢালিয়া সাজিবার সময় আসিয়াছে। আজ বিশ্বব্যাপী ছাত্র-বিক্ষোভের দিনে স্বাভাবিকভাবেই তাঁহার একথাটি মনে জাগিয়া উঠে। ছাত্রগণকে সারাজীবন অবলম্বন করিয়া থাকিবার মতো একটা সর্বজনীন অটল আদর্শের সন্ধান, এবং সর্বাবস্থায় সানন্দে তাহা আঁকড়াইয়া থাকিবার মতো শক্তিলাভের পথের সন্ধান দিতে হইলে ইহা ছাড়া অন্য উপায় আর নাই। ইহার অভাবে আজ ছাত্রগণ অবলম্বনের জন্য যাহা সামনে পাইতেছে, তাহারই দিকে ছুটিতেছে।

শিক্ষকের আদর্শ জীবন

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবেশ সবদিক দিয়াই জীবনগঠনের অনুকূল ছিল। শহরের হট্টগোল হইতে দূরে এই শিক্ষাপীঠগুলি থাকিত এবং যাঁহাদের উপর বিদ্যার্থীদের শিক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল তাঁহাদের জীবনে উচ্চাদর্শ মূর্ত থাকিত, আবার সর্ববিধ পার্থিব বিদ্যাতেও তাঁহারা পারদর্শী ছিলেন। সংযমী, সত্যাশ্রয়ী, হৃদয়বান, স্বল্পে সন্তুষ্ট এবং উচ্চতম সত্যে প্রতিষ্ঠিত আচার্যগণ শিক্ষা দান করিতেন। সর্বক্ষেত্রে শহর হইতে দূরে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করা এখন হয়ত সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা শিক্ষক, তাঁহাদের উচ্চাদর্শে অন্ততঃ নিষ্ঠা থাকা চাই-ই, জীবনও যত তদনুরূপ হয়, ততই ভাল। শিক্ষক-নির্বাচনের সময় শিক্ষকের জীবনের এই দিকটিও প্রধান মাপকাঠি হওয়া বাঞ্ছনীয়, কেবল তাঁহার বিদ্যা নহে। এটি আমাদের সর্বাগ্রে করিতে হইবে; আমরা ইচ্ছা করিলে এটি করিতে পারিও। আর, যেখানে শহর হইতে দূরে উপযুক্ত পরিবেশে বিদ্যায়তনগুলিকে সরাইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব, সেখানে তাহাও করা প্রয়োজন। এবিষয়েও পূর্বে চিন্তা করা হইয়াছে, কিন্তু কার্যতঃ কিছু করা হইয়া উঠে নাই।

একাগ্রতা-ও ইচ্ছাশক্তি-বর্ধনের অভ্যাস

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতিতে মানসিক শিক্ষার ব্যবস্থায় কতকগুলি অভ্যাসের উপর বেশী জোর দেওয়া হইত। এখনই আমরা অন্ততঃ সব ছাত্রাবাসগুলিতে তাহার প্রবর্তন আরম্ভ করিতে পারি। অভ্যাস ছাড়া মনের গঠন হয় না। উচ্চচিন্তার পরিবেশন একান্ত প্রয়োজন নিশ্চয়ই (তাহাও আমরা এখনো করিতে পারিলাম না), তাহা তো করিতেই হইবে। কিন্তু শুধু কতকগুলি সদ্‌গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তকের তালিকাভুক্ত করিলেই ফল হইবে না। বুদ্ধি আমাদের জীবনের চলার পথে আলোকপাত করিতে পারে মাত্র, দেখাইয়া দিতে পারে কোন্ পথটি ভাল, কোন্‌টি মন্দ। কিন্তু সে-পথে চলিবার ব্যাপারে মনই আমাদের নিয়ন্তা। মনের যাহা করিতে ভাল লাগে তাহাই সে করে, যে পথে চলিতে ভাল লাগে, সে-পথেই আমাদের টানিয়া লইয়া যায়, বুদ্ধি তাহার বিরুদ্ধে হাজার চীৎকার করিলেও শোনে না। মনকে বুদ্ধির কথা শুনাইতে পারে, যাহা ভাল বলিয়া বুঝে মনের ভাল না লাগিলেও তাহা করিতে পারে একমাত্র তাহারা, যাহাদের ইচ্ছাশক্তি প্রবল। এই ইচ্ছাশক্তির তারতম্যেই ব্যক্তিত্বের তারতম্য ঘটে, বুঝিবার শক্তির তারতম্যে নহে। ইচ্ছাশক্তিকে চেষ্টা করিয়া অভ্যাস দ্বারা বাড়ানো যায়; প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতিতে ইহার উপর জোর দেওয়া হইত। আর জোর দেওয়া হইত একাগ্রতা-অভ্যাসের উপর। কারণ যে-কোন শিক্ষাকে স্বল্প সময়ে ভালভাবে আয়ত্ত ও জীবনে উহার প্রয়োগ করিতে দুটির-ই প্রভাব অসীম। ভোরে ওঠা, সকাল সন্ধ্যায় ভগবচ্চিন্তায় কিছুক্ষণ মনকে একাগ্র করার চেষ্টা প্রভৃতি কতকগুলি ছোটখাট নিয়মপালন, সেবার সাহায্যে স্বার্থত্যাগ-শিক্ষা, কিছু কায়িক শ্রম প্রভৃতি দৈনন্দিন অভ্যাসের মাধ্যমে মানসিক শিক্ষার, ইচ্ছাশক্তিবর্ধনাদির ব্যবস্থা সেখানে ছিল। যে-কোন নিয়মপালন এদিক দিয়া ইচ্ছাশক্তিকে বাড়াইয়া দেয়, সে নিয়মের নিজস্ব কোন মূল্য না থাকিলেও। জীবনগঠনে পবিত্রতা আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যাহা উচ্চতর শক্তির উৎস, মনের প্রশান্তি ও ধৈর্যের উৎস। পবিত্রতা, একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তিবর্ধনের সহায়ক হয় এমন কতকগুলি অভ্যাস নিয়মিতভাবে করিবার ব্যবস্থা এবং বিদ্যার্থিগণকে উহাতে উদ্বুদ্ধ করিবার মতো পরিবেশসৃষ্টি বিদ্যায়তনে, বিশেষ করিয়া ছাত্রাবাসগুলিতে করিতে পারিলে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আমরা যথার্থ উন্নত করিয়া তুলিতে পারিব। স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষিত এরূপ একটি ছাত্রাবাস দেখিয়া, যেখানে স্বামীজীর শিক্ষা-চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়ণের প্রচেষ্টা চলিতেছিল, একদা নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাহার যথার্থ মূল্যায়ন করিয়া ছাত্রাবাসটির প্রতিষ্ঠাতাকে বলিয়াছিলেন, 'আপনারা কয়েকটি Sample গড়ে তুলুন, পরে আমরা সারা দেশে সেগুলি Multiply করবো।' আজ আমরা স্বাধীন হইয়াছি, শিক্ষাব্যবস্থাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলার ক্ষমতা আমাদের নিজেদেরই হাতে, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার দিকে এত গভীরভাবে দৃষ্টি আজও কোন দেশনেতার পড়িল না।

বিরোধী ভাব হইতে রক্ষার ব্যবস্থা

এই ব্যবস্থার সঙ্গে প্রয়োজন, ইহার বিরোধী যে-সব ভাব ও শক্তি আজ ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছে সেগুলির হাত হইতে ছাত্র-গণকে রক্ষা করার ব্যবস্থা রাখা। অবশ্য একথা নিশ্চিত যে, ইতি-মূলক ব্যবস্থা

সর্বদাই নেতি-মূলক ব্যবস্থা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ; শীতনিবারণের জন্য আমরা গরম জামা পরিতে পারি—ইহা নেতি-মূলক ব্যবস্থা, যেটুকু তাপ আমার দেহে আছে, তাহা যেন বাহির হইয়া না যায় তাহার ব্যবস্থা; অন্য ব্যবস্থা, কোন অগ্নিকুণ্ড হইতে শরীরে তাপ গ্রহণ করিয়া দেহে অধিক তাপ সঞ্চয় করা; ইহা ইতি-মূলক। সচ্চিন্তা ও সদভ্যাসে ছাত্রগণকে অনুরাগী করাই ইতি-মূলক ব্যবস্থা; ইহা সুষ্ঠুরূপে করিতে পারিলে বিরোধী ভাবের প্রতিরোধ তাহারা নিজেরাই করিবে। কেবল তখনই সমগ্র ব্যবস্থাটি স্থায়ী, সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু যতদিন না আমরা ততদূর করিতে পারিতেছি, ততদিন তাহাদের অশুভ প্রভাবের হাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা না রাখিয়া উপায় নাই। চারা গাছের চারিদিকে বেড়া দিতেই হইবে, এবং বেড়া কেহ ভাঙ্গিতে আসিলে তাহাকে বাধাও দিতে হইবে। এ দায় কাহারো একার নহে, দেশনেতা, শিক্ষক, অভিভাবক, দেশবাসী সকলেরই। জাতীয় জীবনে শিক্ষা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। "এমন কোন সমস্যা নাই, শিক্ষার যাদুকাঠির স্পর্শে যাহার সমাধান না হয়।" কাজেই প্রতিরক্ষা ও খাদ্যোৎপাদন-ব্যবস্থার মতো সৎশিক্ষার ব্যবস্থাও আজ আমাদের প্রধান জাতীয় কর্তব্যেরই অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনতালাভের পর সর্বপ্রথম এগুলিতে পূর্ণ মনোযোগ দিবার কথা। আমরা তাহা করি নাই। প্রতিরক্ষা ও খাদ্যোৎপাদনের ব্যাপারে আঘাত খাইবার পর আমাদের হুঁশ হইয়াছে। শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপারে অধিকতর আঘাতের জন্য অপেক্ষা না করাই শ্রেয়ঃ। শিক্ষার জন্য আমরা কিছুই ভাবি নাই, করি নাই—একথা বলা উদ্দেশ্য নহে; আমরা তাহার প্রসারের জন্য, বৌদ্ধিক উন্নতিসাধনের জন্য এবং পরিচালনার সহিত সংযুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের উন্নতির জন্য অনেক কিছুই ভাবিয়াছি, করিয়াছি, করিতেছিও। কিন্তু তাহাকে ভারতীয় করিবার জন্য, তাহার সহিত মানসিক শিক্ষাকে সংযুক্ত করিবার জন্য প্রায় কিছুই ভাবি নাই, কিছুই করি নাই।

প্রয়োজনবোধ মনে না জাগিলে কোন কর্মসাধনে কেহ অগ্রসর হয় না। ভারতের ভাগ্যবিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, আমাদের দৃষ্টিকে আবিলতামুক্ত করিয়া, কিঞ্চিৎ অন্তর্মুখী করিয়া তিনি আমাদের অন্তরে ইহার প্রয়োজন-বোধ জাগাইয়া তুলুন।

"সকল শিক্ষাপ্রণালীর লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষ তৈয়ারী করা।"

"যাহা জনসাধারণকে জীবনসংগ্রামের উপকরণ জোগাইতে সহায়তা করে না, তাহাদের মধ্যে চরিত্রবল, লোকহিতৈষণা এবং সিংহের মতো সাহস উদ্বুদ্ধ করিতে সহায়তা করে না, তাহা কি শিক্ষা নামের যোগ্য?"

"অন্তর বলিয়া যদি কিছু না রহিল, তবে শুধু বহির্দেশটিকে পালিশ করিয়া লাভ কি?"

—স্বামী বিবেকানন্দ

আবেদন

পশ্চিমবঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যার্ত-সেবা

সম্প্রতি প্রবল বারিপাতের ফলে কলিকাতার কতকগুলি অঞ্চল জলমগ্ন হওয়ায় সেখানকার অধিবাসিগণ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। বহু গৃহ ভূমিসাৎ অথবা বাসের অযোগ্য হওয়ায় বহু লোককে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এরূপ দুটি প্লাবিত অঞ্চল তপসিয়া এবং বেলিয়াঘাটায় যথাক্রমে ১,২০০ এবং ১,০০০ জন বিপন্ন নরনারীকে রামকৃষ্ণ মিশন গত ১৪ই জুলাই হইতে খিচুড়ি বিতরণ করিতেছেন। ইহা ছাড়া পাঁউরুটি, বেবিফুড, ভিটামিন প্রভৃতি এবং বস্ত্রাদি দিয়াও সাহায্য করা হইতেছে। বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে এখনো যাঁহারা রহিয়াছেন, মাছির উপদ্রবে তাঁহাদের মধ্যে সংক্রামক রোগ আরম্ভ হওয়ায় কীটনাশক ঔষধও ছড়াইতে হইতেছে।

সরকার জলনিকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু আশঙ্কা হয় অবস্থা স্বাভাবিক হইতে আরো কয়েকদিন লাগিবে। মিশনের সেবাকার্য ততদিন পর্যন্ত চালাইতে হইবে। আমরা আশা করি কলিকাতার সহৃদয় জনসাধারণ এই দুর্দশাগ্রস্ত প্রতিবেশীদের সাহায্যে যথাসম্ভব তৎপর হইবেন।

প্রবল বন্যায় ভারতের নানা অঞ্চলে যে বিপত্তির সৃষ্টি হইয়াছে, বাংলাও তাহা হইতে বাদ পড়ে নাই। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ব্যাপকভাবে প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে ; সেখানকার অধিবাসিগণ বাহির হইতে আশু সাহায্যের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার ২নং ব্লকে আটটি অঞ্চলে সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই আটটি অঞ্চলের ৭৫,০০০ অধিবাসীদের মাসাধিককাল সাহায্যের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে তাহার সংস্থান করা জনসাধারণের অকুণ্ঠ সাহায্য ছাড়া সম্ভব নহে। আশা করি সহৃদয় ব্যক্তিগণ এই সেবাকার্যে মুক্তহস্তে দান করিয়া মিশনকে আরব্ধ বিপন্ন নরনারায়ণের সেবাকার্যটি সুসম্পন্ন করিতে সহায়তা করিবেন।

এই সেবাকার্যের জন্য প্রেরিত সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলিতে পাঠাইলে উহা কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে ; চেক 'রামকৃষ্ণ মিশন' (Ramakrishna Mission)—এই নামে লিখিবেন :

১। রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া

২। উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩

৩। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা ২৯

বেলুড় মঠ, হাওড়া
১৭. ৭. ৬৮

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

স্বামী সুবোধানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

Sonargaon Sri Ramkrishna Sevasram
Tazpur, Aminpur P. O.
Dacca
13. 4. 1925
সোনারগাঁ, সোমবার, ৩০শে চৈত্র

পরমকল্যাণীয়া

শ্রীমতী প্রতিভাবালা দেবী

মায়ী, তোমাদের পত্র পাইয়া আমি খুব আনন্দিত ও সুখী হইলাম। আমি ব্রহ্মপুত্র অষ্টমী-স্নানের মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। অনেকে বলে প্রায় তিন লক্ষ লোক হইয়াছিল; ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সোনারগাঁ—এই তিন জায়গার সেবাশ্রমের অনেক লোক ভলানটিয়ার হইয়া সুন্দর কাজকর্ম করিয়াছিল।

আমি শারীরিক ভাল আছি। এখানকার আশ্রমের সকলে ভাল আছে। শীঘ্রই ঢাকায় যাইব। আর কয়েকটা দিন এখানে আছি। সম্ভবতঃ অক্ষয়তৃতীয়ার পূর্বে ঢাকায় যাওয়া হবে।

মায়ী, তুমি জানিয়া রাখিবে মানুষ যদি ভগবান সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা করিয়া চলে, সে বরাবর মনের শান্তিতে থাকে। মনে ২ কত লোকের কত রকম দুর্ভাবনা আসে, তাহাতে সেই লোক অশান্তি ভোগ করে। সুখ দুঃখ লইয়া প্রত্যেক মানুষের জন্ম; যদ্যপি মানুষ ভগবান সম্বন্ধে চিন্তা ও সেই সুখে সুখী হয়, তার দুঃখ যদি আসে, স্থানাভাবে তার দুঃখ চলিয়া যায়। কারণ সে ভগবানের চিন্তায় সুখী; তার কাছে দুঃখ স্থান পায় না; জায়গা পেলে তো আসবে?

মায়ী, খুব শীঘ্রই দেখা হইবে। এখানে মধ্যে ২ বৃষ্টি হয়। সোনারগাঁ বেশ ঠাণ্ডা জায়গা; বোধ হয় ঢাকাতেও বৃষ্টি হইয়াছে, এখন আর তত গরম নাই। দেখা হইলে আবার কথাবার্তা হবে। আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা তুমি জানিবে, তোমার পিতামাতাকে জানাইবে ও সকলকে জানাইবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসুবোধানন্দ

পুঃ—সোনারগাঁয়ে এখন আর পত্র দিবার আবশ্যক নাই। শীঘ্রই ঢাকায় যাইব। আশা করি শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় সমস্ত কুশল।

আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

অনুবাদক : ব্রঃ জ্ঞানচৈতন্য

ব্যাপক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতি সত্ত্বেও ভারতের কৃষ্টি দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; উহার কারণ ভারত এখনও তার শিক্ষার ধারাকে ভোলেনি। এখন অগ্রগতির পথে ভারতকে এগুতে হলে দরকার তার প্রাচীন কৃষ্টির সহিত বর্তমান পাশ্চাত্য-কৃষ্টির সারাংশের সম্মিলন। কিন্তু উহা করতে সে তখনই সমর্থ হবে যখন সে তার উত্তরাধিকার সম্বন্ধে অবহিত হবে এবং উহার দ্বারা সে অনুপ্রাণিত ও শক্তিশালী হবে। আমাদের এই ঐতিহ্যের প্রাণবন্ত ধারা এসেছে উপনিষৎ থেকে আর উপনিষৎ-অধ্যয়নের ভিতর রয়েছে একটা বিশেষ তাৎপর্য যা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সকল মানবকে অনুপ্রাণিত করছে।

ভারতের ক্ষেত্রে, এই উপনিষৎ তার সন্তানদের উহার মূল্য জানিয়ে দেবে আর জানিয়ে দেবে তাদের ইতিহাসকে এবং বাঁচবার রাস্তাকে। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো ঐ মূল্যবান বস্তুগুলি চাই; কিন্তু কৃষ্টি তো অনায়াসলভ্য বস্তু নয়। এতে অনুশীলনের দরকার, আর প্রয়োজন উপলব্ধির। এই কৃষ্টির মূল্যায়ন এবং উপলব্ধি এ যুগের ভারতের নর-নারীকে দেবে বর্তমান জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করবার শক্তি এবং তা ভারত ও ভারতেতর দেশ-গুলিকে মানবিক কল্যাণে সুষ্ঠুভাবে নিয়োজিত করবে। তাই বর্তমান ভারতের শিক্ষিত নাগরিকদের জানতে হবে এবং উপলব্ধি করতে হবে উপনিষৎ এবং ভগবদ্গীতাকে। উহাকে শুধু সাহিত্য বা দর্শন হিসাবে গ্রহণ করলে চলবে না; উহার গভীরে ঢুকে জীবনের সঙ্গে এক ক'রে ফেলতে হবে উহার মহান ভাব-রাশিকে।

যখন আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হব তখন সেই প্রাচীন গ্রীকযুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের সমস্ত চিন্তা-নায়কদের মহান ভাবধারা গ্রহণ করতে সমর্থ হব। আজকালকার যুগে মানুষের কৃষ্টি ও সভ্যতা সংকীর্ণ নয়, উহাতে বিশ্বের সকল মানবের অধিকার আছে; বিশ্বের যে-কোন প্রান্তের কোন কিছু গৌরবজনক আবিষ্কারে সমগ্র পৃথিবীরই অধিকার আছে। সুতরাং সমগ্র মানবের ঐতিহ্য আজকের প্রত্যেক মানুষেরই শিক্ষার বস্তু হওয়া উচিত। বর্তমান ভারতের ছেলেমেয়েরা স্কুলে কলেজে গিয়ে বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের ভিতর দিয়ে পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যের বিষয় পড়াশুনা করে এবং এইভাবে তারা ঐ চিন্তাধারার অধিকারী হয়। ঠিক একই ভাবে পাশ্চাত্যের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাও ভারতের এই মূল্যবান কৃষ্টির ধারাকে নিয়ে ব্যাপক হওয়া উচিত। এইরূপ ব্যাপক শিক্ষাই বর্তমান জগতের সকল সমস্যার সমাধান করবে। অতীতে এই সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা জগতের মহা অকল্যাণ করেছে; সুতরাং ঐগুলি তাড়িয়ে দিয়ে এই পৃথিবীকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

ভারতবর্ষ বহু মহান চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্মদাতা; আর সত্যি বলতে কি আমরা বিশেষ ভাগ্যবান যে, কয়েকজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ তাঁদের বিরাট আদর্শ স্থাপন করতে এইযুগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খৃঃ) থেকে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত প্রত্যেকেই ভারতের ঐতিহ্যে গর্বিত ছিলেন; তাঁরা ব'লে গেছেন যে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির যা গৌরবময় দান আছে তা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা করতে হবে।

বর্তমান ভারতের এই মহান নেতারা আমাদের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর ভিতর থাকতে কোন উপদেশ দেননি এবং শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের ঐতিহ্যকে নিয়েও গর্ব করতে বলেননি। তাঁরা বলেছেন জগতের যে-সমস্ত শ্রেষ্ঠ অবদান আছে সেগুলি প্রাণভরে গ্রহণ করতে; কিন্তু তার পূর্বে নিজেদের কৃষ্টি উপলব্ধি ক'রে সেই অনুপাতে পাশ্চাত্যের ভাবধারাও গ্রহণ করতে। আমাদের কৃষ্টি না বুঝলে আমরা অপরেরটা বুঝতে পারব না এবং তাতে কোন লাভই হবে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ এটাই বর্তমানে ঘটছে। আমাদের দোষযুক্ত শিক্ষা আমাদের গৌরবময় কৃষ্টি ও মহান চিন্তাধারাকে বুঝতে অবকাশ দেয়নি; তাই আমরা পাশ্চাত্যের কৃষ্টির সারাংশ গ্রহণ করতে পারিনি। আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের মহান ঐতিহ্যের ধারা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অবশ্য স্বাধীন ভারত উহা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে, তবুও আজকের ভারতের একজন শিক্ষিত নাগরিক তার কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধে অত্যন্ত অজ্ঞ। বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের ক্ষেত্রে আমি তা লক্ষ্য করেছি। আমার পাশ্চাত্য বন্ধুদের কাছে শুনেছি এবং ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বহু পাশ্চাত্য মনীষীর লেখার মধ্যে দেখেছি যে, ভারতীয় ছাত্রেরা ও রাষ্ট্রদূতেরা ভারত ও ভারতের কৃষ্টি বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। আমরা যখন অপরের কৃষ্টি গ্রহণ করতে যাব, নিজেদের শক্তিহীনতার দরুন তখন উহার গৌরবের দিকটার পরিবর্তে সহজলভ্য অপ্রীতিকর দিকটাই অনুকরণ করতে বাধ্য হব; আর যদি নিজেরা শক্তিশালী হই তবেই অপরের সুন্দর দিকটা আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে।

শিক্ষার এই ত্রুটি আমাদের শোধরাতে হবে। অবশ্য স্কুল-কলেজে ইহা ঠিক করতে কিছু সময় নেবে, কিন্তু সাধারণ নাগরিকেরা যদি মনপ্রাণ দিয়ে তাদের মহান ঐতিহ্যের ধারাটা দেখে নেয় তবে ঐ দোষগুলি অনায়াসে দূর হ'তে পারে। যদি উপনিষৎ লেখা না হ'ত, যদি ঐ মহান ঋষিরা এই চিন্তারাশি উপলব্ধি ক'রেই চলে যেতেন, তথাপি ভারতের আকাশে বাতাসে উহা ধ্বনিত হ'ত এবং খুব কম লোকই ঐগুলি গ্রহণ করতে সমর্থ হ'ত। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মহাপুরুষগণই তাঁদের পবিত্র মনপ্রাণ দিয়ে ঐ তরঙ্গায়িত চিন্তারাশি গ্রহণ করতে পারতেন; কিন্তু উহা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে থাকতো। সমগ্র মানবজাতির সৌভাগ্যের বিষয় যে, ঋষিদের ঐ চিন্তারাশি লেখা হয়েছিল এবং তার ফলেই আমাদের সহিত ঐ সব ঋষিদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। ঐতিহ্যের ধারা প্রবাহিত হয় আদান-প্রদান, ভাষা, শিল্পকলা প্রভৃতির ভিতর দিয়েই; মানুষ তার পরবর্তী বংশধরদের জন্য ঐ অনুভূতি দান করতে পারে এবং এইভাবে সে পায় ঐতিহ্যের ধারাকে অর্থাৎ কৃষ্টিকে। এই আদান-প্রদান ও সঞ্চালনের ভিতর দিয়েই কৃষ্টি বিস্তার লাভ করে, উন্নতিলাভ করে এবং মহৎ থেকে মহত্তর হ'তে